মাসুদ রানা

কুরুক্ষেত্র

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

কুরুক্ষেত্র

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফ্রেঞ্চ আল্পস পর্বতমালার জমাট বরফের ভিতর
পাওয়া গেল একশো বছরের পুরনো এক লাশ,
কাছেই বরফশীতল হ্রদের গভীরে ডুবে আছে
একটি পুরনো বিমান। কারা যেন উঠেপড়ে লেগেছে
ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য।
ওদিকে মহামারীর মত আটলান্টিকের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে
এক ভয়ঙ্কর শৈবাল, স্কটিশ দ্বীপপুঞ্জে
তাণ্ডব শুরু করেছে হিংস্র একদল পিশাচ!
সবকিছুই একসূত্রে গাঁথা।
ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গেল মাসুদ রানা।
পর্দার অন্তরালে থাকা অসম্ভব ক্ষমতাশালী
শত্রুর বিরুদ্ধে নামতে হলো অসম লড়াইয়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৪০৬

কুরুক্ষেত্র

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7406-8

এক

আগস্ট, ১৯১৪। ফ্রেঞ্চ আল্পস্ পর্বতমালা।

বরফের মুকুট পরা রাজসিক পাহাড়গুলোর মাথার উপর মস্ত এক চাঁদোয়া হয়ে ঝুলছে সুনীল আকাশ। আর সেখানেই প্রাণ বাঁচানোর জন্য যুঝছে থিয়োডর বুভারি। কয়েক মিনিট আগে বাতাসের এক অদৃশ্য দেয়ালে আচমকা ধাক্কা খেয়েছে তার বিমান, প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠেছে গোটা ফিউজলাজ। ভয়ে শুকিয়ে গেছে জিভ, মাথা ঝন ঝন করছে থিয়োডরের। কোনোমতে কিছুটা সামলে নিয়ে এখন ভয়াবহ টার্বিউলেন্সের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে ও। আতঙ্ক চেপে রেখে স্মরণ করতে চাইছে ফ্রেঞ্চ ফ্লাইং ইন্সট্রাকটরের শিখিয়ে দেয়া নিয়মকানুন, সাধ্যমত সামাল দিচ্ছে বিপদটা।

একটু পরেই বাতাসের অত্যাচার ভেদ করে বেরিয়ে গেল থিয়োডরের *মোরান-সলনিয়ের* বিমানটা। গোটা শরীরে স্বস্তি অনুভব করল ও বিপদটা কেটে যেতে, নিজের অজান্তেই মুদে ফেলল দু'চোখ—তার ফলে দেখা দিল নতুন বিপদ। ক্ষণিকের জন্য অচেতন হয়ে পড়ল থিয়োডর, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাক খেতে শুরু করল বিমান। চোখের পলকে নেমে গেল কয়েকশো ফুট।

সংজ্ঞাহীনের মত এলিয়ে থাকলেও থিয়োডর ঠিকই অনুভব

করতে পারল, কানের পর্দায় বাতাসের চাপ কমে গেছে। ঝট্ করে সিধে হলো ও, মাথা ঝাঁকিয়ে কাটাবার চেষ্টা করল ঘোরটা। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল কন্ট্রোল নিয়ে। আলতো হাতে লেভেল করে আনল বিমানকে, তারপর ধীরে ধীরে বাড়াতে শুরু করল উচ্চতা। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, ঠাণ্ডা বাতাস খচ্ করে বিঁধছে ফুসফুসে। বিড় বিড় করে নিজেকে অভিসম্পাত দিল থিয়োডর—এভাবে চোখ বোজা ঠিক হয়নি। আরেকটু হলেই ঘটে যাচ্ছিল দুর্ঘটনা। ফলাফল হতো ভয়াবহ—ব্যর্থ হয়ে যেত ওর অভিযান।

না, ব্যর্থ হওয়া চলবে না ওর। তা হলে মারা যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ!

মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে কথাটা বার বার উচ্চারণ করল থিয়োডর। নতুন উদ্যম সৃষ্টি হলো বুকে। ঘোলা হয়ে যাওয়া গগলসের কাঁচ পরিষ্কার করে সামনে তাকাল ও। এক বিন্দু মেঘ বা কুয়াশা নেই কোথাও, বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। দিগন্তকে ঢেকে রেখেছে বরফে ছাওয়া উঁচু-নিচু নানা আকারের পর্বতশৃঙ্গ; পাহাড়ি উপত্যকায় মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ছে ছোটখাট গ্রাম। সোনালি রোদে স্নান করছে যেন প্রকৃতি।

দু'চোখ ভরে এই অপরূপ শোভা দেখল থিয়োডর, তারপর কান পাতল ইঞ্জিন একজস্টের আওয়াজ শোনার জন্য। আশি হর্সপাওয়ারের চার স্ট্রোক *নোম* রোটারি ইঞ্জিনটা ঠিকমতই কাজ করছে... অন্তত ওটার আওয়াজে কোনও গড়বড় নেই। তারপরও নার্ভাস ফিল করছে ও, মনে পড়ে যাচ্ছে একটু আগে কী ভয়ানক বিপদ দেখা দিয়েছিল। নতুন একটা অভিজ্ঞতা ওটা থিয়োডরের জন্য—ভয় কাকে বলে, সেটা এতদিন জানত না ও। সবচেয়ে বড় কথা, ভয়টা মৃত্যুর নয়... ব্যর্থতার। ইস্পাতকঠিন মনোবল রয়েছে ওর, কিন্তু ব্যথা-বেদনার অনুভূতি মনে করিয়ে দিচ্ছে—শরীরটা

রক্তমাংসে গড়া। মনোবলই সব নয়।

শরীরে এক ধরনের আড়ষ্টতা অনুভব করছে থিয়োডর। বিমানের উন্মুক্ত ককপিটটা আকারে অত্যন্ত ছোট, নড়াচড়ার জায়গা নেই। তার ওপর ওর গায়ে শীতের ভারী পোশাক—উলের সোয়েটার, টার্টলনেক... একদম তলায় বৈমানিকদের এক প্রস্থ কভারঅল। উলের একটা স্কার্ফ জড়িয়ে রেখেছে গলায়; মাথা আর কানকে রক্ষা করছে চামড়ার একটা হেলমেট; চোখে গগলস্; দু'হাত ঢাকা পড়ে আছে ইনসুলেটেড লেদার গ্লাভসে। পায়েও দিয়েছে ক্লাইম্বার বুট। সবমিলিয়ে পোলার কণ্ডিশনের জন্য আদর্শ একটা সাজ, তবু কেন যেন আটকাচ্ছে না ঠাণ্ডা—জামাকাপড়ের পরত পেরিয়ে একেবারে হাড্ডিমজ্জায় গিয়ে আঘাত হানছে। কাঁপছে থিয়োডর... ফ্লাইঙের সময় যতটা অ্যালার্ট থাকা দরকার, ততটা থাকতে পারছে না। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক—*মোরান-সলনিয়ের* চালাতে গেলে অখণ্ড মনোযোগ ধরে রাখতে হয়।

চরম ক্লান্তির মাঝেও স্রেফ একরোখামির বশে নিজেকে কাজ করতে বাধ্য করছে থিয়োডর। এই একরোখা স্বভাবটাই ওকে দুনিয়ার সবচেয়ে সফল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের একজনে পরিণত করেছে। ওর ধূসর দুই চোখ আর রুক্ষ চেহারার দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওখানে সারাক্ষণই লেগে থাকে অস্বাভাবিক এক দৃঢ়সংকল্পের ছাপ। শিকারী ঈগলের সঙ্গে কেবল এর তুলনা চলে। মজার ব্যাপার হলো, এই পাখি ওদের পরিবারের প্রতীকও বটে। এ-মুহূর্তে থিয়োডরের বিমানের লেজে আঁকা ফ্যামিলি ক্রেস্টে দেখা পাওয়া যাবে তিন মাথাঅলা একটা হিংস্র ঈগলের।

আবার বিড়বিড় করল থিয়োডর—*ব্যর্থ হওয়া চলবে না; তা হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে!* কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল গোঙানির মত শব্দে। সারা ইয়োরোপের ব্যবসায়ী সমাজ

যে-বাজখাঁই কণ্ঠ শুনে কেঁপে ওঠে, তার সঙ্গে এখনকার কণ্ঠটার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা নিয়ে ভাবিত হলো না থিয়োডর, হাত বাড়িয়ে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল একটা ছোট ফ্লাস্ক, ওতে উইস্কি রয়েছে... ওর নিজের বাগানের আঙুর থেকে তৈরি মদ। ছিপি খুলে লম্বা দু'ঢোক পেটে চালান করল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরায় যেন বইতে শুরু করল আগুনের ঝড়। চোখের পলকে অনেকটাই কেটে গেল শীত-জনিত আড়ষ্টতা। সিটের মধ্যে নড়ে-চড়ে বসল থিয়োডর। মানসচোখে ভেসে উঠল গরম সুইস চকলেট আর তাজা পাউরুটির ছবি—পর্বতমালার ওপারে গেলেই পাওয়া যাবে খাবার। হাসি পেল ওর—দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষদের একজন হবার পরও সামান্য চকলেট আর পাউরুটির স্বপ্ন দেখছে! ওর স্বপ্নে তো আসা উচিত ছিল রাজভোজের ছবি!

অ্যালকোহলের প্রভাবেই হোক, কিংবা পরিস্থিতির কারণে... মনটা আচমকা ফুরফুরে হয়ে গেল থিয়োডরের। ওর এস্কেপ-প্ল্যান চমৎকারভাবে কাজে লেগেছে, এবং এখন পর্যন্ত সব এগোচ্ছে ঠিকঠাকভাবে। পারিবারিক কাউন্সিলে বিরুদ্ধাচরণ করায় নজরবন্দি করা হয়েছিল ওকে... ওর কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল সবাই। কিন্তু থিয়োডরও ছাড়ার পাত্র না। গত সন্ধ্যায় মদ খেয়ে মাতাল হবার ভান করেছে ও, বাটলার ওকে বেডরুমে নিয়ে শুইয়ে দেবার পর নিঃসাড়ে পড়ে থেকেছে অনেকক্ষণ। রাত গভীর হলে দরকারি জিনিসপত্র ভরেছে ব্যাকপ্যাকে, তারপর শ্যাতোর জানালা গলে বেরিয়ে এসেছে ওখান থেকে। গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় এরপর পৌঁছেছে এয়ারফিল্ডে, সেখান থেকে নিজের বিমান নিয়ে টেকঅফ করতে কোনোই অসুবিধে হয়নি।

ফ্লাস্কে চুমুক দিতে দিতে কম্পাস আর ঘড়ি দেখল থিয়োডর। ঠিক কোর্সেই এগোচ্ছে, শিডিউলেও খুব একটা পিছিয়ে পড়েনি।

সামনের নিচু পাহাড়চূড়াগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, লম্বা জার্নির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ও। খুব শীঘ্রি জুরিখের পানে ফাইনাল অ্যাপ্রোচ করবে।

পোপের প্রতিনিধির সঙ্গে কী আলাপ করবে, সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল; হঠাৎ মনোযোগ টুটে গেল স্টারবোর্ড উইঙের দিক থেকে বিচ্ছিরি একটা শব্দ ভেসে আসায়। ডানদিকে মাথা ঘোরাতেই চমকে উঠল থিয়োডর, চোখে পড়ল ছিন্নভিন্ন এয়ারফয়েল আর ডানার গায়ে বড় বড় কয়েকটা গর্ত—গুলির আঘাত!

স্রেফ বৈমানিক-সুলভ ইন্সটিঙ্কটের বশে পরের কাজগুলো করল থিয়োডর। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ঘোরাল বিমানকে; ইচ্ছাকৃতভাবে মোচড় খেল, গোঁত্তা খেল আকাশের বুকে—যেন একটা আহত পাখি। গুলির ধারা এড়াবার প্রয়াস আসলে এসব। দ্রুত আকাশে চোখ বোলাল ও। ছ'টা বাইপ্লেন দেখতে পেল, ভি ফরমেশনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। উত্তেজিত হলো না থিয়োডর, শান্তভাবে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল বিমানের, যেন আনপাওয়ারড্ ল্যাণ্ডিঙের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভারী একটা পাথরের মত আকাশ থেকে খসে পড়তে শুরু করল মোরান-সলনিয়ের।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাজটা আত্মহত্যার শামিল, কারণ শত্রুপক্ষ ওকে সহজেই নাগালে পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে হামলাকারী বিমানগুলোর মডেল চিনতে পেরেছে থিয়োডর, ওগুলো *এভিয়াটাক*, ফরাসি ডিজাইনে তৈরি জার্মান বিমান, মূলত রিকনিসান্স কাজের উপযোগী। একটা মেশিনগান ফিট করা আছে বটে, তবে ওটা শুধুমাত্র উপরদিকে ফায়ার করতে পারে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়ায় ঝপ্ করে নীচে নেমে গেল মোরান-সলনিয়ের, হামলাকারীদের ফায়ারিং আর্কের বাইরে।

মাথার উপর দিয়ে এভিয়াটাকগুলো ওকে পেরিয়ে যেতেই আবার ইঞ্জিন চালু করল থিয়োডর, নাকটা একটু উঁচু করে উঠে এল শত্রুপক্ষের পিছনে।

শিকারী এবার শিকারে পরিণত হয়েছে।

সবচেয়ে কাছের এভিয়াটাকের উপর নিশানা স্থির করল থিয়োডর, তারপর ট্রিগার চাপল। *মোরান-সলনিয়ের*-এর ডগায় বসানো *হচকিস* গান থেকে ট্রেসার বুলেটের ধারা বেরুল বিকট শব্দ করে; সরাসরি গিয়ে আঘাত করল এভিয়াটাকের লেজে। চোখের পলকে আগুন ধরে গেল ক্ষত-বিক্ষত বিমানটাতে, ধোঁয়ার মেঘ তুলে মাটির দিকে খসে পড়ল ওটা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আরেকটা এভিয়াটাককে ঘায়েল করল থিয়োডর। সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল অবশিষ্ট হামলাকারীদের। পাশার ছক উল্টে গেছে। ভি-ফরমেশন ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল তারা। ওদেরকে ধাওয়া করল না থিয়োডর, করে লাভও নেই। এলিমেণ্ট অভ সারপ্রাইজের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। সতর্ক হয়ে গেছে শত্রু, ওদেরকে আর ঘায়েল করা যাবে না। বরং চারদিক থেকে হামলা করে ওকেই বেকায়দায় ফেলে দেবে ওরা। কন্ট্রোল স্টিক নেড়ে বিমান ঘুরিয়ে ফেলল ও, প্রায় খাড়াভাবে উঠে এল এক হাজার ফুট, ঢুকে পড়ল ঘন মেঘের একটা কুণ্ডলীতে। কুয়াশার মত গাঢ় ধূসর পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল মোরান-সলনিয়ের... প্রতিপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে।

বিমানকে লেভেলে এনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করল থিয়োডর। গুলির আঘাতে ডানার ফ্যাব্রিক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের কাঠামো। মনে মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত করল ও, ভেবেছিল মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে পিঠটান দেবে, গতির জোরে পরাস্ত করবে শত্রুদেরকে, কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। এভিয়াটাকের চাইতে মোরান-সলনিয়ের দ্রুতগামী

বটে, তবে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় নয়। পালাতে পারছে না, ইচ্ছে না থাকলেও লড়াইয়ে নামতেই হবে ওকে।

পরিস্থিতি গুরুতর। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় ভারী; গোলাবারুদের দিক থেকেও তারা শক্তিশালী। কিন্তু ভয় পেল না থিয়োডর, ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ওর মোরান-সলনিয়ের যথেষ্ট খেলা দেখাতে পারবে। অত্যন্ত উন্নত এক বিমান, রেসিং প্লেন থেকে ডেভেলপ করা হয়েছে, আঙুলের সামান্য ছোঁয়াতেই সাড়া দেয়। এমনিতে সমান্তরালভাবে অন্তত দুটো ডানা থাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের যে-কোনও বিমানে, কিন্তু মোরান-সলনিয়েরের রয়েছে মাত্র একটা—মিড-উইংড্ মনোপ্লেন ওটা। বুলেট শেপের বিমানটার দৈর্ঘ্য মাত্র বাইশ ফুট, তাই নড়াচড়া করতে পারে অতি সহজে—খুব কম সময়ে। চোখা নাকটার মাথায় রয়েছে প্রপেলার, ঠিক পিছনে মাথা তুলে রেখেছে মেশিনগান—সিংক্রোনাইজিং মেকানিজমের কল্যাণে উড়ন্ত অবস্থায় প্রপেলার ব্লেডগুলোর মাঝখানের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে ফায়ার করতে পারে। মেকানিজমে ত্রুটি দেখা দিলেও ভয় নেই, ব্লেডগুলো মেটাল ডিফ্লেক্টরে মোড়া, বুলেটের আঘাতে কিছুই হবে না। সব মিলিয়ে সে-আমলের বিচারে একেবারে অত্যাধুনিক এবং অনবদ্য একটা আকাশযান ওটা।

লড়াইয়ে নামার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিল থিয়োডর। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল সিটের তলায়। ইস্পাতের তৈরি একটা স্ট্রং-বক্স আছে ওখানে, পাশে একটা মখমলের থলে। থলেটা কোলের উপর তুলে নিল ও, মুখের বাঁধন খুলে ভিতর থেকে বের করে আনল একটা ধাতব শিরোস্ত্রাণ বা হেলমেট। জিনিসটা প্রাচীন, নকশাকাটা; অনেক বছর থেকে ওদের পরিবারে আছে। আনমনে ওটার সারফেসের খোদাইয়ে একটা আঙুল বোলাল থিয়োডর। ধাতব হেলমেটটা বরফের মত ঠাণ্ডা, কিন্তু ওটার

স্পর্শে শিরায়-উপশিরায় অদ্ভুত এক উত্তাপের সৃষ্টি হলো। মনোবল বেড়ে গেল চোখের পলকে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে হেলমেটটা মাথায় দিল থিয়োডর, লেদার কাভারিঙের উপর দিয়ে অনায়াসে বসে গেল ওটা। ভাইজর-টা অদ্ভুত, ঠিক যেন একটা মানুষের মুখ—চেহারা অনেকটা থিয়োডরেরই মত, চোখের জায়গাদুটোতে কেবল ফুটো রয়েছে। ওখান দিয়ে ঠিকমত দৃষ্টি চলে না, তাই ভাইজর-টা উপরদিকে তুলে দিল ও। তারপর দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে আঁকড়ে ধরল বিমানের কন্ট্রোল স্টিক।

মেঘের আবরণ পাতলা হয়ে এসেছে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকছে সূর্যরশ্মি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মেঘের সীমানা পেরিয়ে উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল মোরান-সলনিয়ের। দ্রুত আশপাশে নজর বোলাল থিয়োডর, এভিয়াটাকগুলোকে দেখতে পেল কয়েকশো ফুট নীচে—ডুবন্ত জাহাজকে ঘিরে ক্ষুধার্ত হাঙরের পাল যেভাবে চক্কর দেয়, ঠিক সেভাবে ওর অপেক্ষায় ঘুরপাক খাচ্ছে। শিকারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই হিংস্র ভঙ্গিতে ছুটে এল।

একটু বাঁক নিয়ে বিমানটাকে স্থির করল থিয়োডর, ওর পিছু নিল এভিয়াটাকগুলো। ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে পেতে চাইছে ওকে। এক ঝটকায় সিটবেল্টটা শক্ত করে এঁটে নিল থিয়োডর, নিজের দিকে টানতে শুরু করল কন্ট্রোল স্টিক। দ্রুত নাক উঁচু হতে থাকল মোরানের—প্রথমে খাড়া, তারপর উল্টে যাচ্ছে। আসলে দর্শনীয় একটা ব্যাকওয়ার্ড লুপ নিচ্ছে বিমানটা।

হতভম্ব হয়ে ওর এই কৌশল দেখল এভিয়াটাকের বৈমানিকেরা, ভাবতেও পারেনি থিয়োডর এই ধরনের একটা ইভেসিভ ম্যানুভার করতে পারে। লুপ যখন শেষ হলো, তখন এভিয়াটাকগুলো সামনে, মোরান চলে গেছে পিছনে। আবারও শিকারীতে পরিণত হয়েছে নিঃসঙ্গ বিমানটা। মুচকি হাসি ফুটল

থিয়োডরের ঠোঁটে, ফায়ার ওপেন করল। তবে এই দফা আগের চাইতে সতর্ক হয়ে গেছে শত্রুরা, ওর মতলবও আঁচ করতে পেরেছে। শাঁই শাঁই করে ডানে-বাঁয়ে সরে গেল ওরা। বুলেটের ধারা একটা এভিয়াটাকের টেইল ফিনে আঁচড় কাটল শুধু। ওটাকেই প্রথম টার্গেট হিসেবে বেছে নিল থিয়োডর, নাক ঘুরিয়ে ধাওয়া শুরু করল।

এঁকে-বেঁকে ঘন ঘন দিক বদল করল এভিয়াটাক, মোরানের লাইন অভ ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য। থিয়োডরের কৌশলটার পুনরাবৃত্তি করতে চাইল, ব্যাকওয়ার্ড লুপ নিয়ে যেতে চাইল ওর পিছনে। কিন্তু দ্রুতগামী মোরানের কাছে সব কৌশলই হার মানল। আঠার মত এভিয়াটাকের লেজে লেগে থাকল মোরান, কিছুতেই পিছু ছাড়ল না। ধাওয়া করছে বটে তবে গুলি ছুঁড়ল না থিয়োডর, অ্যামিউনিশনের স্বল্পতার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ও, নিশ্চিত না হয়ে একটা গুলিও আর অপচয় করতে চায় না।

ছুটতে ছুটতে চওড়া এক উপত্যকার মুখে পৌঁছুল এভিয়াটাক, উল্টো ঘোরার পথ রুদ্ধ করে ওটাকে ভিতরে ঢুকতে বাধ্য করল থিয়োডর। তারপর মোরান-সলনিয়ের নিয়ে ঢুকে পড়ল নিজেও। দু'পাশে পাহাড়ি প্রাচীর, ফাঁদে পড়ার দশা হয়েছে এভিয়াটাকের, হচকিস গান থেকে ফায়ার করল থিয়োডর। ডানে-বাঁয়ে দোল খেয়ে কোনোমতে নিজেকে বাঁচাল এভিয়াটাকের পাইলট, তারপর নীচের দিকে ডাইভ দিল—মোরানের লাইন অভ ফায়ারের বাইরে চলে যেতে চাইছে। ছাড়ার পাত্র নয় থিয়োডর, ও-ও ডাইভ দিল। মাটি থেকে এখন মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপর দিয়ে ছুটছে বিমানদুটো।

উপত্যকার উপর চকিতে নজর বোলাল থিয়োডর। ছোট ছোট ঘর-বাড়ি, গোলাঘর, আস্তাবল আর ফসলের খেত চোখে পড়ছে—এলাকাটা কৃষিপ্রধান। দূরে, উপত্যকার একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা গ্রাম। সরু একটা নদী চলে গেছে উপত্যকার

বুক চিরে, গ্রামটার প্রবেশপথে রয়েছে একটা পাথরের তৈরি সেতু, নদীর উপর দিয়ে গেছে ওটা। উঁচু-নিচু জমি আর পাহাড়ি ঢালের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য নদীর উপর দিয়ে ছুটছে এভিয়াটাক, পিছন পিছন মোরান-সলনিয়ের। নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বার বার ডানে-বাঁয়ে মোড় নিতে হচ্ছে, তাই গুলি করতে পারছে না থিয়োডর।

হঠাৎ অনুকূল পরিস্থিতি দেখতে পেল ও। বড় একটা বাঁক ঘুরতেই নদীর ধারা প্রায় সরলরেখার মত হয়ে এল, গ্রামের প্রবেশপথের সেতুটা রয়েছে এই সরলরেখার শেষ মাথায়। সেদিকে সোজা ছুটে যাচ্ছে এভিয়াটাক, কোনও আড়াল নেই। লক্ষ্য স্থির করে ফায়ার করল থিয়োডর। গুলির শব্দ শুনে স্রেফ ইন্সটিঙ্কটের বশে ভয়াবহ একটা কাজ করে বসল এভিয়াটাকের পাইলট, বামদিকে কাত হয়ে ফাঁকি দিতে চাইল ট্রেসার বুলেটের ধারা। এর ফলও পেয়ে গেল হাতেনাতে। গুলির হাত থেকে বাঁচল বটে, কিন্তু কাত হওয়ায় সাঁই করে নীচে নেমে গেল বিমান, একটা পাখা আঘাত করল নদীর বুকে। যেন ল্যাং মারা হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেল এভিয়াটাক, আছড়ে পড়ল পানিতে। ডানা আর প্রপেলার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল প্রথম আঘাতে, পানির সারফেসে পর পর কয়েকটা ডিগবাজি খেল প্লেনের ফিউজলাজ—প্রতিবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে কাঠামোটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তলিয়ে গেল পানির নীচে।

এভিয়াটাকের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে সজোরে ছুটে গেল মোরান-সলনিয়ের। থিয়োডরের ঠোঁটে হালকা এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে। ককপিট থেকে গ্রামের দিকে তাকাল, ওখানকার নিরীহ বাসিন্দারা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, হতভম্ব চোখে তাকিয়ে দেখছে ঘটনাটা। কন্ট্রোল স্টিক নেড়ে উচ্চতা বাড়াতে গেল থিয়োডর, পরমুহূর্তে চমকে উঠল। উপর থেকে একটা ছায়া নেমে

এসেছে ওর গায়ে। চোখ তুলতেই দেখল, আরেকটা এভিয়াটাক উদয় হয়েছে মোরানের উপরে, উচ্চতা কমিয়ে গায়ের উপর প্রায় চড়ে বসার চেষ্টা করছে। নতুন একটা শব্দ কানে আসতেই ঝট্ করে পিছনে তাকাল—তৃতীয় এভিয়াটাকটাও এসে গেছে, রয়েছে ওর ঠিক পিছনেই!

ফাঁদটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। মোরানকে বক্স ফরমেশনে ফেলে দিয়েছে দুই এভিয়াটাক—উপরে উঠতে দিচ্ছে না, দিচ্ছে না গতি কমাতেও। ভয়াবহ একটা পরিণতি ঘটতে চলেছে—পাথুরে সেতুটার গায়ে আছড়ে পড়বে বিমান, ধ্বংস হয়ে যাবে। সেতুর দিকে তাকাল থিয়োডর, গাধায় টানা খড়ভর্তি একটা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে পড়েছে মাঝখানটায়, ওটার চালক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তীব্র বেগে ছুটে আসতে থাকা তিনটে পাগলা বিমানের দিকে।

তাগিদ অনুভব করল থিয়োডর। কিছু একটা করতে হবে... এক্ষুণি! নইলে নিশ্চিত মৃত্যু! কন্ট্রোল স্টিক ছেড়ে ঝট্ করে একটা হাত কোমরের কাছে নিয়ে গেল ও, একটা হোলস্টার আটকানো আছে বেল্টের সঙ্গে, ওটা থেকে বের করে আনল নিজের নিত্যসঙ্গী পিস্তলটা। ছোট্ট অস্ত্রটা এভিয়াটাকের ক্ষতি করবার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না। পিস্তল ধরা হাতটা খোলা ককপিটের উপরে প্রসারিত করল ও, গুলি করতে শুরু করল।

ইঞ্জিনের ভারী গর্জন ছাপিয়ে কানে বাজল পিস্তলের তীক্ষ্ণ শব্দ, মোরানের ঠিক উপরে থাকা এভিয়াটাকের পেটে একসারিতে সৃষ্টি হলো কয়েকটা গভীর গর্ত। থিয়োডরের কপাল ভাল বলতে হবে, একটা বুলেট ফিউজলাজের আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হলো, ককপিট ফুটো করে বেরিয়ে গেল ওটা। বিমানের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি, পাইলটও অক্ষত, তবে গুলিটা ভয় পাইয়ে

দিল তাকে। পাগলের মত কন্ট্রোল স্টিক নেড়ে সরে গেল সে মোরানের উপর থেকে।

থিয়োডরও কন্ট্রোল স্টিক টানতে শুরু করল। ধীরে ধীরে নাক উঁচু করল মোরান-সলনিয়ের, সেতুর সীমানায় গিয়ে ধনুকের মত একটা পথে সাঁই করে উপরে উঠল... একেবারে শেষ মুহূর্তে। ল্যাণ্ডিং হুইলের বাড়ি খেয়ে উল্টে পড়ল ওয়্যাগনটা, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল শুকনো খড়। তবে নিরাপদেই সেতু পেরিয়ে যেতে পারল বিমানটা।

মোরানের মত সৌভাগ্য হলো না পিছনে থাকা এভিয়াটাকের। সেতুর দূরত্ব ঠিকমত আঁচ করতে পারেনি পাইলট, ব্যস্ত ছিল থিয়োডরকে ধাওয়া করায়। মোরান-সলনিয়ের সরে যেতেই আচমকা সে দেখতে পেল বাধাটাকে, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তুমুল গতিতে সেতুর গায়ে আছড়ে পড়ল এভিয়াটাক। সংঘর্ষের প্রচণ্ড আওয়াজ হলো, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো ইঞ্জিন। জ্বলন্ত একটা আগুনের গোলা হয়ে নদীর বুকে খসে পড়ল এভিয়াটাকের ধ্বংসাবশেষ।

গ্রামের সীমানায় একটা ছোটখাট জটলা সৃষ্টি হয়েছে, অবাক হয়ে সবাই দেখছে দৃশ্যটা। চারপাশে নজর বোলাল থিয়োডর, গুলি খাওয়া এভিয়াটাকটাকে দেখা গেল না কোথাও, বোধহয় ভয় পেয়ে চম্পট দিয়েছে। গ্রামের ঘরবাড়ির উপর দিয়ে বাঁক নিয়ে ফিরতি পথ ধরল থিওডর, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবে।

কিছুদূর যেতেই উপত্যকার মুখের কাছে একটা আলোর ঝলকানি চোখে পড়ল—ধাতব একটা আকৃতির গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যরশ্মি। চতুর্থ এভিয়াটাক! চেহারায় কাঠিন্য ভর করল থিয়োডরের, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল কন্ট্রোল স্টিক, গতি বাড়িয়ে সরাসরি ছুটে যাচ্ছে শত্রুর দিকে, হচকিস মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়তে তৈরি।

প্রায় একই সময় ফায়ার ওপেন করল দুই পক্ষ। দুই বিমানের মধ্যকার দূরত্ব তখন তিনশো গজ। ট্রেসার বুলেটের ধারা ছুটে আসতে দেখেই মোরানকে পাক খাওয়াল থিয়োডর, গুলির সমান্তরাল দুই সারির মাঝখানে অবস্থান নিল, ফায়ার করতে থাকল একই সঙ্গে। পুরোপুরি রক্ষা পেল না তাতে, মোরানকে নড়তে দেখে এভিয়াটাকও পাক খেতে শুরু করেছে, তবে গতি অনেকটা শ্লথ। তারপরও ভারী অ্যামিউনিশনের আঘাতে গভীর অনেকগুলো ক্ষত সৃষ্টি হলো মোরান-সলনিয়েরের বাইশ ফুট দীর্ঘ ফিউজলাজে। এরচেয়ে বেশি ক্ষতি হলো এভিয়াটাকের—হচকিস মেশিনগানের বুলেট ওটার একটা ডানা প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল, গুঁড়িয়ে দিল প্রপেলার আর ইঞ্জিন। কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে খসে পড়ল বিমানটা মোরানের সামনে থেকে।

এভিয়াটাকের পরিণতি দেখার আর চেষ্টা করল না থিয়োডর, তুমুল বেগে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এল ও। তারপর শরীর এলিয়ে দিল সিটে। বিজয়ের আনন্দে ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ঝুলছে। মোরানের ফিউজলাজে গুলি লাগলেও বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি। অনায়াসেই এই বিমান নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে ও।

•

এই আত্মপ্রসাদটাই হলো থিয়োডর বুভারির জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

ওর অজান্তে ধীরে ধীরে পিছনে উদয় হলো দ্বিতীয় এভিয়াটাক—পিস্তলের গুলি খেয়ে যেটা পালিয়ে গিয়েছিল। বিপদ সম্পর্কে থিয়োডর সচেতন হবার আগেই ফায়ার ওপেন করল ওটা। টেইল সেকশন গুঁড়িয়ে গেল মোরানের, ছুরি দিয়ে মাখন কাটার ভঙ্গিতে ফিউজলাজকে দু'টুকরো করে ফেলল বুলেটের বৃষ্টি। তারপরও ক্ষান্ত দিল না এভিয়াটাকের পাইলট, ফায়ার করতে থাকল।

হঠাৎ বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল থিয়োডর। চোখ নামাতেই দেখল, টার্টলনেক সোয়েটারের সামনের দিকটা ভিজে যাচ্ছে লাল রঙে, উষ্ণ রক্ত গড়িয়ে নামছে শরীর বেয়ে, কোলের কাছটায় সিটের উপর জমা হচ্ছে রক্তের পুকুর। গুলি লেগেছে ওর গায়ে! মুখের ভিতরও নোনা স্বাদ পাচ্ছে ও।

ব্যথায় সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে, সেটাকে সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল থিয়োডর। নিচু হয়ে সিটের তলা থেকে বের করে আনল ইস্পাতের তৈরি স্ট্রং-বক্সটা। ওটার হাতলের সঙ্গে একটা ভি-স্ট্র্যাপ আছে, কবজিতে বেঁধে ফেলল ওটা। তারপর সিটবেল্ট খুলে মুক্ত করল নিজেকে। পরমুহূর্তে গোঁত্তা খেল মোরান-সলনিয়ের, পুরোপুরি উল্টে যেতেই ককপিট থেকে স্ট্রং-বক্সসহ পড়ে গেল থিয়োডর। বিমান ওকে পিছনে ফেলে সরে যেতেই কাঁধের কাছে বেরিয়ে থাকা রিপকর্ড টানল। খুলে গেল প্যারাশুট।

বাতাসে ভাসতে ভাসতে এখন নীচে নামছে থিয়োডর, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। ধূসর একটা পর্দা নেমে আসছে ওর চোখের সামনে। জ্ঞান হারাবার আগে এক ঝলকের জন্য চোখে পড়ল বরফে ছাওয়া একটা জলাশয় আর ওটার পাশে উঁচু হয়ে থাকা গ্লেসিয়ারের দৃশ্য।

শারীরিক যন্ত্রণা ছাপিয়ে থিয়োডরকে আরও বেশি কষ্ট দিচ্ছে মানসিক যাতনা। ব্যর্থ হয়েছে ও। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে এখন, ঠেকাবার আর কেউ রইল না। শেষবারের মত কেশে উঠল থিয়োডর, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত, তারপরই নিথর হয়ে গেল দেহটা।

ছাতার মত ফুলে থাকা প্যারাশুটটাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল এভিয়াটাক, এক পশলা গুলি করল। গুলির আঘাতে হারনেসে ঝুলতে থাকা থিয়োডরের দেহ ঝাঁকি খেল শুধু, কোনও

ব্যথা-বেদনা অনুভব করল না। সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে ও। ধীরে ধীরে ক্ষত-বিক্ষত লাশটা নেমে যাচ্ছে বরফে ছাওয়া গ্লেসিয়ারের দিকে। সূর্যের আলোয় অপার্থিব দ্যুতি ছড়াচ্ছে ওর মাথায় পরা প্রাচীন শিরোস্ত্রাণটা।

দুই

সাম্প্রতিক সময়। স্কটিশ ওর্কনি দ্বীপপুঞ্জ।

রেগে বোম হয়ে আছে এডিথ ম্যাকলিন... রাগটা নিজেরই উপর। কোন্ দুঃখে যে *আউটকাস্ট* নামের রিয়্যালিটি শো-তে যোগ দিতে গিয়েছিল! ব্যাপারটা এখন গলার ফাঁস হয়ে দেখা দিয়েছে, কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। চুক্তি ভাঙলে অনুষ্ঠানের প্রযোজক পিটার হ্যালোরান ওর নামে মামলা ঠুকে দেবে। অথচ পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ বিকেলে জ্বলন্ত অঙ্গারে ভরা একটা বিশাল গর্তের উপর দিয়ে দড়ি বাইতে হয়েছে ওকে। নিরাপত্তার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল অবশ্য, হাত ফসকালেও আগুনে পড়ত না, সেফটি লাইনে বাঁধা হারনেস ওকে রক্ষা করত। তারপরও দড়ি বাইতে যে-কষ্টটা পোহাতে হয়েছে, সেটা নরকযন্ত্রণার শামিল। গত দু'মাস ধরে বলতে গেলে রোজই এমন সব অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, অন্তত আরও তিন সপ্তাহের আগে অনুষ্ঠানটা শেষ হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। বলা যায় না, ভাল রেটিং পেলে মেয়াদটা দ্বিগুণও হয়ে যেতে পারে।

আতঙ্ক জাগানোর মত একটা ব্যাপার!

বিশ্ববিখ্যাত রিয়্যালিটি শো *ফিয়ার ফ্যাক্টর* এবং *সার্ভাইভার*-এর আদলে তৈরি করা হয়েছে *আউটকাস্ট*। সৃজনশীলতা কিংবা নতুন কিছু করবার চিন্তা নেই নির্মাতাদের মধ্যে, জনপ্রিয় শো-দুটোর প্রতি দর্শকদের আকর্ষণের ফায়দা লোটার জন্যই *আউটকাস্ট* তৈরি করা হয়েছে। ফরম্যাটেও তেমন কোনও বৈচিত্র্য নেই। দশজন প্রতিযোগীকে নির্জন একটা দ্বীপে তিন মাসের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে ওদেরকে, টিকে থাকতে হবে। বিচ্ছিরি সব চ্যালেঞ্জ—জ্বলন্ত অঙ্গারে ভরা গর্ত পাড়ি দেয়াটা আসলে কিছুই না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওদেরকে পোকামাকড় বা সরীসৃপে ভরা ডোবা বা জলায় ডুব দিতে হয়, জ্যান্ত কাঁকড়াও খালি হাতে টুকরো টুকরো করে চিবুতে হয়েছে একবার। দর্শকদের জন্য এসবের সঙ্গে বাড়তি *আকর্ষণ* হিসেবে রাখা হয়েছে প্রতিযোগীদের দ্বন্দ্ব। কে কতটা নীচে নামতে পারে, কে কার পিঠে ছুরি বসাতে পারে, কে কত ঝগড়াঝাঁটি করতে পারে... এসবেরও প্রতিযোগিতা চলছে। মুলোর মত সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে প্রথম পুরস্কার—এক মিলিয়ন ডলার। আট-দশদিন পর পর একজন করে প্রতিযোগী বাদ পড়ে দর্শক ভোট এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের মতামতের ভিত্তিতে, শেষ পর্যন্ত থাকবে দু'জন, তাদের নিয়ে হবে গালা-ফাইনাল। রিচার্ড কনেলের বিখ্যাত গল্প *দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম*-এর আদলে পরস্পরকে শিকার করবে তারা। শেষ পর্যন্ত যে বিজয়ী হবে, সে-ই পাবে প্রতিশ্রুত এক মিলিয়ন ডলার।

টাকার লোভেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে এডিথ, ভেবেছিল নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে। লম্বা, একহারা শরীর ওর: নিয়মিত ব্যায়াম করায় ফিটনেসও ভাল।

সার্ভাইভালের পরীক্ষায় উতরে যাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, বিশ্বাসটা ততই টলে যেতে শুরু করেছে। *আউটকাস্ট*-এ শারীরিক ফিটনেসের কোনও মূল্য নেই, এখানে মূল্য রয়েছে শুধু চেহারা-সুরত, আর দর্শকপ্রিয়তার। নির্মাতারা ফেয়ার প্লে-তে বিশ্বাসী নয়, অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ধরে রাখার জন্য খেয়াল-খুশিমত যাকে-তাকে বাদ দিচ্ছে, কিংবা টিকিয়ে রাখছে। ভোটাভুটির যে-বিধানটা আছে, সেটা সম্পূর্ণ লোক-দেখানো। ইতিমধ্যে ছ'জন প্রতিযোগী বাড়ি ফিরে গেছে, শো-এর প্রযোজক পিটার হ্যালোরানের মর্জি অনুসারে। শেষ চারজনের একজন হলো এডিথ নিজে, তবে এই পজিশনে পৌঁছুনোর পিছনে ফিটনেস বা দক্ষতার কোনও ভূমিকা নেই, সব কৃতিত্ব রূপ-যৌবনের। অত্যন্ত সুন্দরী ও—মুখটা ডিম্বাকৃতি, পটলচেরা চোখ, মাথাভর্তি একরাশ ঘন সোনালী চুল। হাঁটার সময়ে শিকারী বাঘ-সিংহের মত মনোহর ঢেউ ওঠে সারা শরীরে, জামার ভিতর দুর্বিনীত স্তন জোড়া কাঁপে। বেশিরভাগ সময়ে বিকিনি পরা অবস্থায় ক্যামেরার সামনে হাজির হতে হয় ওকে, তখন সম্ভবত হিমালয়ের মুনি-ঋষিদের ধ্যানও টুটে যায়। ওর অপূর্ব দেহ-সৌষ্ঠব দেখার জন্যই অসংখ্য দর্শক প্রতি সোমবার রাতে বসে থাকে টিভির সামনে। এমন একজন প্রতিযোগীকে হটিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারবে না কোনও বুদ্ধিমান প্রযোজক... এবং পিটার হ্যালোরান মোটেই বোকা নয়।

এতেই কপাল পুড়েছে এডিথের। *আউটকাস্ট* এখন ওর কাঁধে সিন্দাবাদের ভূতের মত সওয়ার হয়ে আছে, তাকে নামানোর কোনও উপায় নেই। গত সপ্তাহে একবার চেষ্টা করে দেখেছিল এডিথ, কুইজ রাউণ্ডে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলভাল জবাব দিয়েছিল সহজ সব প্রশ্নের। ভেবেছিল পয়েন্ট না পাওয়ায় ওকে বাদ দিতে বাধ্য হবে নির্মাতারা, দর্শকরাও এমন বেকুব একজন

প্রতিযোগীকে দেখে বিরক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় শুটিং হওয়া রেজাল্ট এপিসোডে দেখা গেল—বহাল তবিয়তে টিকে আছে ও। বরং কুইজ রাউণ্ডে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়েও বাদ পড়েছে জেমস হাওয়ার্ড—ভারমণ্ট থেকে আসা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

আনমনে মাথা নাড়ল এডিথ। নাহ্, আর কোনও আশা নেই। প্রতিযোগিতার শেষ দিন পর্যন্ত ওকে এই নরকতুল্য দ্বীপেই কাটাতে হবে। চারপাশে নজর বোলাল ও। কী এক জায়গা! সভ্যতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া লাগেনি এখানে। ঝোপঝাড়, গাছপালা, পাথুরে টিলা আর খানাখন্দে ভরা আদিম পরিবেশ বিরাজ করছে সবখানে। দ্বীপটার নাম বেশ হাস্যকর—*পি আইল্যাণ্ড*। অর্থ করলে দাঁড়ায়, প্রস্রাব দ্বীপ! প্রথম দিন এ নিয়ে প্রতিযোগী আর শুটিং ক্রু-রা বেশ একচোট হাসাহাসি করেছে। প্রযোজক পিটার হ্যালোরান অবশ্য বেশ গম্ভীর ছিল। বুঝতে পেরেছিল, অনুষ্ঠানে এই নাম ব্যবহার করলে তার কপালে খারাবি আছে। তাই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল, 'আজ থেকে এই দ্বীপের নাম স্কাল আইল্যাণ্ড... খুলি দ্বীপ। সবাই এই নামেই ডাকবে জায়গাটাকে, ঠিক আছে? খবরদার, আসল নাম কেউ উচ্চারণ কোরো না!'

'কিন্তু দ্বীপটা তো খুলির মত না,' ঠাট্টা করে বলেছিল একজন। 'ডিমের ভাঙা কুসুমের মত! *ব্রোকেন এগ আইল্যাণ্ড* বললেই বেশি মানানসই হবে।'

কথাটা শুনে আরও জোরে হেসে উঠেছিল সবাই।

'রসিকতা করছ আমার সঙ্গে?' খেপে উঠে বলেছিল হ্যালোরান। 'পাছায় লাথ মেরে যখন ইউনিট থেকে তাড়াব, তখন দেখা যাবে, কত রস থাকে তোমার!'

ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিল জটলা। হ্যালোরান আদেশের সুরে বলেছিল, 'আজ থেকে এটা স্কাল আইল্যাণ্ড। ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েছিল সবাই। বিড়বিড় করে এডিথ শুধু বলেছিল, 'হ্যাঁ, খুলি দ্বীপই বটে। তোমার গোবর ভরা মাথার খুলি!'

বুকের ভিতর ছটফটানি অনুভব করল এডিথ। নাহ্, কিছু একটা না করলেই নয়। মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন নেই ওর, এই দ্বীপ ছাড়তে পারলেই খুশি। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল প্রযোজক পিটার হ্যালোরানের দিকে। হাতে ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে জেমস হাওয়ার্ডকে সান্ত্বনা দেয়ায় ব্যস্ত লোকটা। লম্বা পা ফেলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল এডিথ।

'মি. হ্যালোরান?' ডাকল ও।

ঢুলু ঢুলু চোখে এডিথের দিকে তাকাল হ্যালোরান। 'এডিথ! মাই ডিয়ার! তুমি এখানে কেন? ড্রিঙ্ক দরকার?' জড়ানো গলায় বলল সে। মদের নেশায় টলছে। 'নাকি অন্য কিছু?' চোখ টিপল কথাটা বলে।

'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে,' ইশারাটাকে পাত্তা না দিয়ে বলল এডিথ।

'পরে বললে হয় না?' হাসল হ্যালোরান। হাতের গ্লাস দেখাল। 'এখন তো ফুর্তির সময়! কাম, জয়েন আস!'

'না, এখুনি কথাটা বলতে চাই আমি!' জোর দিয়ে বলল এডিথ। 'ফুর্তিটা কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি করুন।'

মুখ দিয়ে গোঙানির মত একটা শব্দ করল হ্যালোরান। 'মেয়েমানুষ!' হাওয়ার্ডের দিকে ফিরে ফিসফিসাল। তারপর মুখোমুখি হলো এডিথের। 'বলো তোমার জরুরি কথা।'

'আমি চলে যেতে চাই, মি. হ্যালোরান। আই ওয়াণ্ট টু লিভ দ্য শো।'

যেন কারেন্টের শক খেয়েছে, এমন একটা ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেল হ্যালোরান, সিধে হয়ে দাঁড়াল। নেশা ছুটে গেছে। অবিশ্বাসের

সুরে বলল, 'কী বললে তুমি?'

'কানে কম শোনেন নাকি?' রাগী গলায় বলল এডিথ। 'আমি *আউটকাস্ট* থেকে চলে যেতে চাইছি।'

'ক্...কিন্তু কেন?'

'আই হেট দিস প্লেস। জীবনে এরচেয়ে জঘন্য জায়গা দেখিনি আমি, এমন দুর্দশাও পোহাইনি...'

বাধা দিয়ে হ্যালোরান বলল, 'এর জন্য মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার আছে। ওটা না পেলেও প্রতি সপ্তাহে পার্টিসিপেশন ফি বাবদ প্রচুর টাকা পাচ্ছ!'

'টাকা চাই না আব আমি। এই নরক থেকে মুক্তি চাই!'

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল হ্যালোরানের। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এডিথের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বোঝার চেষ্টা করছে, মেয়েটা সত্যিই চলে যেতে চাইছে, নাকি ভুয়া হুমকি দিয়ে ওর পকেট থেকে কিছু খসাতে চাইছে।

'ওভাবে তাকানোর কিছু নেই, মি. হ্যালোরান,' বুঝতে পেরে বলল এডিথ। 'আমি সিরিয়াস।'

শব্দ করে একটা শ্বাস ফেলল হ্যালোরান। পাশ থেকে একটা ক্যাম্পচেয়ার টেনে নিয়ে বসল তাতে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল, তারপর মুখ খুলল।

'যেতে চাইলেই তো আর যেতে পারবে না, মাই ডিয়ার এডিথ,' শান্ত গলায় বলল সে, মাতলামি করছে না আর। 'নিয়মকানুন আছে। ইচ্ছা করলেই হাওয়ার্ড যেমন থেকে যেতে পারে না, তেমনি তুমিও খেয়াল-খুশিমত চলে যাবার আবদার জুড়তে পারো না।'

'আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম,' বলল এডিথ। 'এখানে নিয়মকানুনের কোনও বালাই নেই। সব চলছে একজন মাত্র মানুষের মর্জি অনুসারে... আপনার মর্জি! কাজেই চাইলে যাকে

খুশি বিদায় করতে পারেন আপনি, রাখতেও পারেন। এই যেমন আজ বেচারা হাওয়ার্ডকে তাড়িয়ে দিলেন। যাবার তো কথা আমার! গত কয়েকটা রাউণ্ডে ইচ্ছে করে ঠিকমত পারফর্ম করিনি আমি, তারপরও দেখি বহাল তবিয়তে টিকে আছি। অথচ হাওয়ার্ড... ওর মত সিরিয়াস আর কেউ ছিল না টিমে...'

জেমস হাওয়ার্ড কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হ্যালোরান মুখ খোলায় বাধা পেল। 'হাওয়ার্ডকে দলে টানার চেষ্টা করে লাভ নেই,' বলল প্রযোজক। 'ও এখন বাতিলের খাতায় চলে গেছে। উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলে বরং বিপদে পড়বে। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে মামলা ঠুকব আমি, পার্টিসিপেশন ফি-র সমস্ত টাকা ফেরত চাইব। কী হাওয়ার্ড, কিছু বলতে চাও?'

সভয়ে মাথা নাড়ল হাওয়ার্ড।

কুটিল ভঙ্গিতে হাসল হ্যালোরান। এডিথের দিকে তাকাল। 'বুঝেশুনে কথা বলা উচিত তোমার, এডিথ। নইলে তোমাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাব আমি... মানহানির অভিযোগে।'

'ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করাতে চাইছেন, না?' থমথমে গলায় বলল এডিথ। 'সত্যকে চাপা দিতে চাইছেন?'

'নাটক কোরো না,' বিরক্ত গলায় বলল হ্যালোরান। 'ভয়াবহ কোনও অন্যায় করছি না আমি। কাম অন, দিস ইজ শোবিজ! এখানে মেধা কিংবা শারীরিক শক্তির চাইতে রূপের মূল্য বেশি। নিজেই বলো, দর্শক টানার ক্ষমতা কার বেশি—তোমার, নাকি হাওয়ার্ডের? দর্শক কাকে দেখতে চায়—কুৎসিত এক জিনিয়াস, নাকি রূপবতী একজন তরুণী?'

'তারমানে আমাকে যেতে দেবেন না আপনি?' ফুঁসতে ফুঁসতে বলল এডিথ।

'না, ডিয়ার। গালা-ফাইনালে তোমার পজিশন পাকা করে রেখেছি আমি বহুদিন আগেই। বাকিরা এখন ফাইট করছে

তোমার প্রতিপক্ষ হবার জন্য।'

'আমি যদি রাজি না হই?'

'সেক্ষেত্রে লম্বা একটা সময় কোর্ট-কাচারিতে দৌড়াতে হবে তোমাকে,' শীতল গলায় বলল হ্যালোরান। 'মুখটা অমন বাঁকা কোরো না, এডিথ। তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিনি আমি। ফর গডস্ সেক, ভালমত ভেবে দেখো! ফার্স্ট প্রাইজটা বলতে গেলে তোমার হাতের মুঠোয় তুলে দিচ্ছি আমি। এক মিলিয়ন ডলার! এরপরও তুমি চলে যেতে চাও?'

জবাব দিল না এডিথ; নীরব হয়ে গেল। ভাবতে শুরু করেছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই রাগটা পড়ে যেতে শুরু করল। ঠিকই তো, এমন সুযোগ ক'জনে পায়? মিলিয়নেয়ার হবার জন্য তো লোকে আত্মা পর্যন্ত বিসর্জন দেয়! ওকে তো কেবল ক'টা দিনের কষ্ট সইতে হবে। পারবে না?

চেহারায় সন্তোষ ফুটল ধুরন্ধর প্রযোজকের। বলল, 'মনে হচ্ছে, ঠিক লাইনেই এবার চিন্তা শুরু করেছ। যাও, গিয়ে একটা ঘুম দাও। সকালে জাগার পর দেখবে, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কী ভুলটাই না করতে যাচ্ছিলে, সেটা ভেবে নিজেকে গাল দেবে।'

ফাঁদে পড়ে গেছে এডিথ। শেষ চেষ্টার সুরে বলল, 'কিন্তু তাঁবুতে আমার ঘুম আসে না! এয়ার-কণ্ডিশন আর গরম পানি ছাড়া আমি কোনোদিন থাকিনি...'

'আহ্হা! এ আবার এমন কী?' বলে উঠল হ্যালোরান। 'যাও, আজ রাতের জন্য তোমার ইচ্ছেপূরণ করে দিচ্ছি। ক্রু-দের ট্রেইলারে একটা কামরা খালি আছে। রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দাও। এসি, হট ওঅটর... সব পাবে। কাল সকালে নাহয় তাঁবুতে ফিরে যেয়ো।'

ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে তাকাল এডিথ। 'ওরা তাতে মাইণ্ড করবে না?'

'বলব তোমার শরীর খারাপ, তাই আজ রাতে ক্রু-দের কোয়ার্টারে থাকছ। তারপরও যদি মাইণ্ড করে, তা হলে ওদের আমি...' কুৎসিত একটা গালি দিল হ্যালোরান।

শ্রাগ করল এডিথ। 'ঠিক আছে, আমি তা হলে ট্রেইলারে যাচ্ছি।'

'এত তাড়া কীসের?' বলল হ্যালোরান। 'আজ রাতে ক্যাম্পফায়ার-পার্টি আছে তো! এই তো, একটু পরেই শুরু হবে।'

মুখ বাঁকাল এডিথ, এ আরেক উপদ্রব। দু'চারদিন পর পরই পার্টি দেয় হ্যালোরান। পার্টি মানে আগুন ঘিরে নাচানাচি আর মাতলামির উৎসব। সবাই যে ব্যাপারটা পছন্দ করে, তা নয়। কিন্তু প্রযোজককে খেপানোর সাহস নেই কারও, তাই ইচ্ছে না থাকলেও সব প্রতিযোগী আর প্রোডাকশন ক্রু-কে অংশ নিতে হয় ওতে। তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। ওকে তোয়াজ করছে হ্যালোরান, সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

'ধন্যবাদ, মি. হ্যালোরান,' বলল এডিথ। 'তবে আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। খুব অস্বস্তি লাগছে। শাওয়ার নিয়ে শুয়ে পড়ব যত দ্রুত সম্ভব।'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যালোরান। 'বেশ, তা হলে আর জোর করব না। আফটার অল, ইউ আর দ্য স্টার অভ মাই শো। যাও, সকালে দেখা হবে। প্রোডাকশন বয়কে জিজ্ঞেস করলেই ট্রেইলারটা দেখিয়ে দেবে।'

'সো নাইস অভ ইউ! গুড নাইট, মি. হ্যালোরান।'

'গুড নাইট, ডিয়ার।'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল এডিথের। ঘুম ভাঙলেও নড়ল না, কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড়ে শুয়ে রইল। তারপর হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে হাতঘড়ি তুলল চোখের সামনে। লিউমিনাস ডায়াল

বলছে—রাত দেড়টা বাজে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর—গভীর, শান্তিময় ঘুমটা এমন অসময়ে ভেঙে গেল কেন? পরমুহূর্তেই আবছাভাবে শুনতে পেল হৈ-হল্লার আওয়াজ... আনন্দময় নয়, আতঙ্কের! দলবদ্ধভাবে আর্তনাদ করেছে যেন অনেকে। ঘুমের মধ্যেও শুনতে পাচ্ছিল শব্দটা, মনে হচ্ছিল স্বপ্নের কারসাজি; কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, সত্যিই হচ্ছে শব্দটা। এই ভয়ানক শব্দই জাগিয়ে তুলেছে ওকে ঘুম থেকে।

বিছানা থেকে নামল এডিথ। হচ্ছেটা কী বাইরে? হ্যালোরানের পার্টিতে সবসময় কোনও না কোনও কাণ্ড ঘটে, আজও মনে হচ্ছে কিছু ঘটেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি নিশ্চয় তারই ফলাফল। গায়ে একটা রোব জড়াল ও, উঁকি দিল দরজা ফাঁক করে।

কাউকে দেখা গেল না কোথাও, হৈ-হল্লার আওয়াজ শুধু বেড়ে গেল দরজা খোলায়। প্রতিযোগীদের ক্যাম্পের দিকে তাকাল এডিথ, নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড, ওখানে কেউ নেই। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সৈকতের দিক থেকে, মনে হচ্ছে ওখানেই আজ আসর বসিয়েছে হ্যালোরান।

কাঁধ ঝাঁকাল এডিথ, এখন আর ঘুম আসবে না। খিদেও পেয়েছে। পার্টিতে যাবে বলে ঠিক করল। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, সবাই আজ এভাবে চেঁচাচ্ছে কেন? জিন্স আর টি-শার্ট পরে ট্রেইলার থেকে নেমে এল ও, গাছপালার মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া হাঁটাপথ ধরে লঘু পায়ে এগোল সৈকতের দিকে।

চেঁচামেচি আর হট্টগোলের আওয়াজ বেড়ে গেছে আরও। উল্লাস নয়, এ আওয়াজ আতঙ্ক আর যন্ত্রণার। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল এডিথের। কিন্তু থামল না, কী এক দুর্দমনীয় আকর্ষণে এগিয়ে চলল। একটু পরেই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সৈকতের প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল নরকযজ্ঞ।

দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য, ভীতিকর... কিন্তু বাস্তব। *আউটকাস্ট*-এর ক্রু-রা হামলার শিকার হয়েছে, আর হামলাকারীরা মানুষ নয়! চোখের সামনে একদল কুৎসিত, লোমশ, দ্বিপদী, হিংস্র প্রাণী দেখতে পেল এডিথ; এমন প্রাণী জীবনে কোনোদিন দেখেনি ও। উন্মত্ত ভঙ্গিতে অসহায় মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা, ধারালো নখ-দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলছে নরম মানবদেহ। মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে এডিথের সঙ্গী-সাথীরা, নিথর হয়ে পড়ছে হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে।

পিটার হ্যালোরানকে খুন হতে দেখল এডিথ—তার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ল একটা প্রাণী, বিশাল এক কামড় দিয়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলল। ছিন্নভিন্ন শ্বাসনালী দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুল হ্যালোরানের, নেতিয়ে পড়ল দেহটা নিমেষে। ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল এডিথ। আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কোলাহল। ঝট্ করে সিধে হলো প্রাণীগুলো, মাথা ঘোরাল সৈকতের প্রান্তে... এডিথের দিকে!

কয়েক মুহূর্ত কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করল, তারপরই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল প্রাণীগুলো, ছুটে এল নতুন শিকারের দিকে। উল্টো ঘুরল এডিথ, ছুটতে শুরু করল জানপ্রাণ দিয়ে, কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছে, পালাতে হবে ওকে। যেভাবেই হোক!

সচেতনভাবে নিজেদের ক্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেল এডিথ, ওখানে লুকানোর জায়গা নেই, কোণঠাসা হয়ে পড়বে। তাই ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে থাকল দ্বীপের জঙ্গলের গভীরে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠল। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক, মাথার ভিতরটা দপদপ করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ—যত না তৃষ্ণায়, তারচেয়ে বেশি আতঙ্কে! সবচেয়ে বড় কথা, প্রাণীগুলো পিছু ছাড়েনি, ধাওয়া করে চলেছে, খুব কাছেই

শোনা যাচ্ছে ওদের পায়ের শব্দ।

আর একটু দ্রুত ছোটার চেষ্টা করল এডিথ। কিন্তু পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল আবার। তাকিয়ে দেখল, গাছপালার আচ্ছাদন পেরিয়ে দ্বীপের পাহাড়ি অংশে পৌঁছে গেছে ও। সামনেই সংকীর্ণ গিরিপথের মত একটা জায়গা। ঢুকে পড়ল ওখানে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা বাঁক দেখতে পেল ও। বাঁকটা ঘুরেই দেখল সামনে আর পথ নেই—বিরাট বিরাট বেলে পাথরে বন্ধ হয়ে আছে পথ। কমপক্ষে দশ ফুট উঁচু হবে পাথরের স্তূপটা। ছোটবড় অসংখ্য ফাটল দেখা যাচ্ছে ওটার গায়ে। উল্টো ঘোরার উপায় নেই, প্রাণীগুলোর সামনে পড়লে খুন হয়ে যেতে হবে। স্তূপটা টপকানোর সিদ্ধান্ত নিল এডিথ।

মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে একটা ফাটলে ডান পা রেখে হাতড়ে হাতড়ে উপরে আরেকটা ফাটলে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরল ও। অন্য পা দিয়ে নীচের দিকে একটা ঠেলা দিয়ে উঠে পড়ল ফাটলটায়। মাটি থেকে সাত-আট ফুট উপরে সরু একটা পাথরের তাকের মত দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ধাক্কায় তাকটার উপরে উঠে পড়তে পারল এডিথ। ওখান থেকে চূড়াটা তিন ফুটের বেশি হবে না। ছোট ছোট দুটো ফাটলে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল ও চূড়ায়। সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, তাকাল নীচে। বাঁকের ওপাশে পৌঁছে গেছে প্রাণীগুলো, ভয়াবহ হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

শোয়া থেকে উঠে বসল এডিথ, পাথরস্তূপের অন্যপাশ দিয়ে নেমে যেতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। পিশাচগুলো পৌঁছুনোর আগেই। পাথরের স্তূপের উপরটা ভীষণ এবড়োখেবড়ো। বসা অবস্থায়ই কুঁজো হয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল ও অন্য প্রান্তের দিকে, যাতে নীচ থেকে ওকে দেখা না যায়। সামান্য দূরত্ব পেরোতেই জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো।

শেষ মাথায় পৌঁছে নীচে তাকাল এডিথ। এদিকে মাটি প্রায়

পনেরো ফুট নীচে। অসংখ্য খানাখন্দ রয়েছে স্তূপের এ-পাশের দেয়ালেও। স্তূপের প্রান্তভাগ দিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে পেছন দিকে একটু হেলে শরীর ঢিল করে দিল ও। লাফ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। কয়েক সেকেণ্ডের চেষ্টায় পা দুটো একটা খোঁড়লে আটকাতে পারল, কিন্তু হাতে ধরার মত কোনও জায়গা খুঁজে পেল না। হিংস্র গর্জন ভেসে এল খুব কাছ থেকে, প্রাণীগুলো এসে পড়েছে! লাফ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল এডিথ। যা হয় হবে; এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে, যেন হাত-পা না ভাঙে। গোড়ালির একটুখানি মাত্র বেধে আছে খোঁড়লে। একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করেছে পা দুটো।

নীচে খানিকটা সমতল জায়গা। ওখানেই লাফ দিয়ে পড়তে চায় এডিথ। টলমল করতে করতে ঝাঁপ দিল ও।

সশব্দে মাটিতে পড়ল এডিথ। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারল না। পায়ের নীচ থেকে সরে গেল অবলম্বন... বিনা নোটিশে ধরণী দ্বিখণ্ডিত হলো, হুড়মুড় করে ধুলোবালির একটা ধারার সঙ্গে খসে পড়ল এডিথ নীচে। ধপাস করে একটা শক্ত পাথরের উপর আছাড় খেল ও, ককিয়ে উঠল ব্যথায়। অন্ধকার দেখল চোখে, ঠিকমত শ্বাস নিতে পারছে না, পতনের ধাক্কায় ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেছে, মচকে গেছে গোড়ালি।

অচেতনের মত অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে রইল এডিথ। চারপাশে কী ঘটছে, আর বুঝতে পারছে না। ঘোরের মধ্যে পশুগুলোর কলজে কাঁপানো চিৎকার শুনল, ওকে খুঁজে না পেয়ে খেপে গেছে। তারপর শুনল ছিটেফোঁটা গোলাগুলির শব্দ। সত্যি কি কল্পনা, কে জানে। শরীরের ব্যথা কমে এলে উঠে বসল ও। তাকাল চারপাশে। পাহাড়ি একটা ফাটলের ভিতর পড়ে গেছে ও, জায়গাটা সংকীর্ণ। দেয়ালের খাঁজে পা বাধিয়ে বেরুনো সম্ভব, কিন্তু ওর সে-উপায় নেই। ইতিমধ্যে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে মচকে

যাওয়া গোড়ালিটা। দুর্ঘটনাক্রমে এই ফাটলে পড়ে গিয়ে হিংস্র প্রাণীগুলোর হাত থেকে বেঁচেছে বটে, কিন্তু তা কেবল ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে তিলে তিলে মরার জন্য।

সংকীর্ণ পাহাড়ি ফাটলের ভিতর বসে ফোঁপাতে শুরু করল এডিথ।

ভাগ্যদেবী কিন্তু এতটা নির্দয় হতে পারলেন না এডিথ ম্যাকলিনের প্রতি। পরদিন সকালেই মেইনল্যাণ্ড থেকে একটা কার্গো হেলিকপ্টার হাজির হলো পি আইল্যাণ্ডে, *আউটকাস্ট*-এর ক্রু-দের জন্য সাপ্তাহিক সাপ্লাই নিয়ে। দ্বীপটা সম্পূর্ণ জনশূন্য অবস্থায় পেল তারা। জীবিত বা মৃত, কোথাও একজন মানুষও খুঁজে পেল না। খবর পেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাজির হলো কোস্টগার্ড, সার্চ পার্টি গঠন করা হলো।

পুরো দ্বীপে তন্ন-তন্ন করে চালানো হলো তল্লাশি, সন্ধেবেলায় এডিথকে পাওয়া গেল পাহাড়ি ফাটলের ভিতরে—জ্বরে কাঁপছে, প্রলাপের ঘোরে বিড় বিড় করে বলছে অদ্ভুত একদল প্রাণীর কথা। ওর গল্প কেউ বিশ্বাস করল না, কারণ গোটা দ্বীপে একটি লাশ পাওয়া যায়নি, পাওয়া যায়নি এক ফোঁটা শুকনো রক্তও। অমীমাংসিত এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রইল পি আইল্যাণ্ড থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলো।

তিন

এডিনবরা, স্কটল্যাণ্ড। রাত আটটা।

চেম্বারস্ স্ট্রিটের দশতলা উঁচু একটা অ্যাপার্টমেণ্ট কমপ্লেক্সের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি ক্যাব। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন। বুক ভরে টেনে নিল জন্মভূমির বাতাস। মনে হচ্ছে যেন বহুযুগ পর ফিরে এসেছে মায়ের কোলে। আসলে সময় পেরিয়েছে মাত্র ন'মাস।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল হেণ্ডারসন। লিফটে চেপে উঠে এল ছ'তলায়। আনমনে প্রিয় একটা গানের সুর ভাঁজছে। করিডোর ধরে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টের দিকে এগোল, সামান্য সময়ের জন্য থামল পাশের বাসার দরজায়। বেল চাপতেই ষাটোর্ধ্ব মিসেস বেলমণ্ড দরজা খুললেন।

'ওয়েসলি! হোয়াট আ প্লেজ্যাণ্ট সারপ্রাইয!' আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'তুমি ফিরে এলে?'

'গুড ইভ্‌নিং, মিসেস বেলমণ্ড,' হাসল হেণ্ডারসন। 'জী, এইমাত্র পৌঁছুলাম। কেমন আছেন আপনি?'

'ভাল, ভাল। থাকার জন্য এসেছ তো? নাকি দু'দিন পরেই আবার কেটে পড়বে?'

'না, না। আপাতত আর কোথাও যাচ্ছি না। প্রজেক্টের কাজ শেষ।'

'শুনে খুব খুশি হলাম। তুমি ছিলে না, এতদিন বুকটা খাঁ খাঁ করছিল। ভাল কথা, ডিনার করেছ?'

'না না, তবে আপনার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। ফ্রেশ হয়ে কোনও রেস্টুরেন্টে চলে যাব।'

'এটা কোনও কথা হলো?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস বেলমণ্ড। 'আমি থাকতে তুমি রেস্টুরেন্টে যাবে কেন?'

'না, মানে...'

'কোনও কথা শুনতে চাই না,' বাধা দিলেন ভদ্রমহিলা। 'যাও, হাতমুখ ধুয়ে জামা বদলাও। আমি খাবার নিয়ে আসছি।'

'সো নাইস অভ ইউ!' হাসল হেণ্ডারসন, সরে এল স্নেহময়ী মহিলার দরজা থেকে। চাবি বের করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের তালা খুলতে খুলতে অনুভব করল, গোটা দুনিয়ায় ওর আপন বলে যদি কেউ থেকে থাকে, তা হলে সে এই মিসেস বেলমণ্ড। বাবা-মা মারা গেছেন অনেক বছর আগে, ভাই-বোন বা আত্মীয়স্বজন নেই হেণ্ডারসনের। পাশের বাড়ির নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাটিই আদর-স্নেহ দিয়ে ওর মনের বড় একটা জায়গা দখল করে রেখেছেন। সত্যি বলতে কী, ওঁর কারণেই অ্যাপার্টমেন্টটা ছাড়েনি হেণ্ডারসন। ন'মাস ধরে দেশের বাইরে... বাড়ির ভাড়াটা জমালেও অনেক টাকা হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে হারাতে হতো মমতাময়ী মহিলাটিকে।

বেডরুমে ঢুকে সুটকেসটা নামিয়ে রাখল হেণ্ডারসন। জ্যাকেট আর টাই খুলতে খুলতে লক্ষ করল, টেলিফোনের আন্সারিং মেশিনের লাল বাতিটা জ্বলছে-নিভছে। তারমানে মেসেজ জমা হয়ে রয়েছে ওতে। বিছানায় বসে আন্সারিং মেশিনের প্লে বাটন চাপল ও, জুতো খুলতে খুলতে মেসেজ শুনবে।

'ওয়েসলি, দিস ইজ মরগান...' স্পিকারে ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর। 'সামথিং ইজ রং! তুমি খবরের কাগজ দেখেছ? না দেখে

থাকলে এখুনি দেখো... ফর গডস্ সেক! *টাইমস্ টুডে*... তৃতীয় পৃষ্ঠা!'

ভুরু কুঁচকে গেল হেণ্ডারসনের, ক্লাইভ মরগান ওর সহকর্মী এক বিজ্ঞানী, সদ্য শেষ হওয়া প্রজেক্টটাতে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা। উঁকি দিয়ে আন্সারিং মেশিনের ডিসপ্লে দেখল—মেসেজটা পনেরো দিনের পুরনো। কীসের কথা বলছে মরগান? কী আছে ওই পেপারে?

ভাবনাটা শেষ না হতেই দ্বিতীয় মেসেজ বাজতে শুরু করল। এটাও মরগানের।

'ওয়েসলি, দোহাই লাগে! আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।' আবার ঘটেছে ব্যাপারটা। আজকের *টাইমস্ টুডে*-র তৃতীয় পৃষ্ঠায় পাবে খবরটা...

পরবর্তী কয়েক মিনিটে বিচলিত হয়ে পড়ল হেণ্ডারসন। সাতটা মেসেজ শোনা হয়ে গেছে ততক্ষণে, সবগুলোই মরগানের তরফ থেকে। প্রতিটাতেই একেক দিনের খবরের কাগজ দেখতে বলছে সে। কিছু একটা নিয়ে ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে ব্যাপারটা হালকাভাবে নেবার উপায় নেই। পত্রিকাগুলো জোগাড় করতে হবে।

শেষ মেসেজটা পাঁচ দিন আগের, তাতে মরগান বলছে, 'মনে হচ্ছে তুমি বাড়িতে নেই, ওয়েসলি। কিংবা বাকিদের মত তুমিও...। এনিওয়ে, এই মেসেজ যখনই পাও, দয়া করে যোগাযোগ কোরো আমার সঙ্গে, দেরি কোরো না। সবগুলো পেপার কাটিং আমি তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। তা হলেই বুঝবে, আমি কেন এতটা উদ্বিগ্ন...'

তাড়াতাড়ি ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল হেণ্ডারসন, ডায়াল করল মরগানের নাম্বারে। জানা দরকার কী ঘটেছে।

বেশ কয়েকবার রিং হলো, তারপর রিসিভ করা হলো কল।

ওপাশ থেকে ধরা গলায় কেউ বলল, 'হ্যালো?'

'হ্যালো, আমি ড. ওয়েসলি হেগ্তারসন বলছি। এটা কি ড. ক্লাইভ মরগানের নাম্বার?'

'জী। আমি মিসেস মরগান।'

'গুড ইভনিং, মিসেস মরগান। আপনার স্বামীকে একটু ডেকে দেবেন? আমরা পুরনো সহকর্মী।'

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

'জী, এডিনবরা থেকে। দেশের বাইরে ছিলাম, আজই ফিরেছি...'

'তারমানে আপনি জানেন না? ক্লাইভ তো...' ফুঁপিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

'ক্...কী হয়েছে ওর?'

'ও নেই, ড. হেগ্তারসন! গত পরশু... হাঁটতে বেরিয়েছিল... রাস্তা পার হবার সময় একটা গাড়ি এসে...' কথা আটকে যাচ্ছে মিসেস মরগানের।

থমকে গেল হেগ্তারসন। কী শুনছে ও! মরগান মারা গেছে? গাড়িচাপা পড়ে? অ্যাকসিডেন্ট? নাকি অন্যকিছু?

আর কিছু ভাবতে পারল না ও। কোনোমতে দুঃখ প্রকাশ করল, তারপর নামিয়ে রাখল রিসিভার। হাতমুখ আর ধোয়া হলো না, স্থবির হয়ে গেল হেগ্তারসন। মনে পড়ে যাচ্ছে ন'মাস আগের কথা।

এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রিতে শিক্ষকতা করছিল তখন ও, এমন সময় পেল চমৎকার একটা চাকরির অফার। যে-কোনও রিসার্চ কেমিস্টের জন্য ওটা একটা স্বপ্ন—সম্পূর্ণ গবেষণাধর্মী একটা প্রজেক্টে যোগ দেয়ার আহ্বান। বেতনও আকাশচুম্বী। দেরি না করে ইন্টারভিউ দিল হেগ্তারসন, চাকরিটা নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ইস্তফা দিয়ে প্রজেক্টে যোগ দিল।

ব্যস্ততার সীমা ছিল না কাজটাতে, সেই সঙ্গে বজায় রাখতে হয়েছে কঠোর গোপনীয়তা। প্রজেক্টের অনেকগুলো টিমের মধ্যে একটার নেতৃত্ব দেয়া হয় ওকে। ক্লাইভ মরগান ছিল ওর-ই টিম মেম্বার। ওদের গবেষণার বিষয় ছিল *এনযাইম*, বা জটিল প্রোটিন, যা বিভিন্ন ধরনের বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন তৈরি করে।

চরম গোপনীয়তার মধ্যে ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে চলছিল গবেষণা। থাকা-খাওয়ার কোনও সমস্যা ছিল না, রীতিমত রাজার হালে রাখা হয়েছিল সবাইকে। নিষেধাজ্ঞা ছিল শুধু বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে। বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, কিন্তু মোটা অঙ্কের বেতন পাওয়ায় এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে উচ্চবাচ্য করেনি কেউ। হেণ্ডারসনের মনে কোনও খেদ ছিল না, আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই ওর, নিজের পেশাটাই ওর জন্য সবকিছু। গবেষণায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল জগৎসংসার ভুলে।

শুরুতে অনেকগুলো দিন চমৎকার কেটেছিল। কিন্তু তারপরই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে নানা রকম প্রশ্নের উদয় হয়। হেণ্ডারসন আর মরগান-সহ বেশ কয়েকজন সরাসরি মুখোমুখি হয়েছিল নিয়োগকর্তাদের, জবাব চেয়েছিল। কিন্তু জবাব দেয়া হয়নি ওদেরকে, তার বদলে প্রজেক্টের কাজ স্থগিত করে ছুটি দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানীদের। বলা হয়েছে, প্রজেক্টের অগ্রগতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সবাইকে পরে আবার খবর দেয়া হবে। দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনদের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছিল বিজ্ঞানীরা, প্রজেক্টের উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সবাই ফিরে গেছে যে-যার বাড়িতে।

অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল হেণ্ডারসন। পিছুটান নেই ওর, বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না। তাই ও চলে গিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে, বেড়ানোর জন্য। মাসখানেক ভ্রমণের পর আজই ফিরে এসেছে

ঘরে পা রাখতে রাখতে এই দুঃসংবাদ! মরগানের মৃত্যুটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অত্যন্ত সতর্ক প্রকৃতির লোক ছিল সে; না দেখেশুনে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির তলায় পড়বে... এ তো একেবারেই অবিশ্বাস্য! মনের ভিতর কুডাক শুনতে পাচ্ছে হেণ্ডারসন

দরজায় শব্দ হলো, তারপর ডাক। 'ওয়েসলি! কোথায় তুমি? আমি খাবার নিয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি এসো!'

মিসেস বেলমণ্ড

ঝট্ করে সোজা হলো হেণ্ডারসন। একটা কথা মনে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে।

'এ কী!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন মিসেস বেলমণ্ড। 'তুমি তো দেখছি কাপড়ই বদলাওনি.

'মিসেস বেলমণ্ড!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল হেণ্ডারসন। 'আমার চিঠিপত্র কোথায়? সব তো আপনার ঠিকানায় ফরওয়ার্ড করে রেখে গিয়েছিলাম!'

'আছে, সবই আছে। বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিয়েছি।' ডাইনিং টেবিলে খাবারের পাত্র রাখতে রাখতে আশ্বস্ত করলেন বৃদ্ধা। এখন তুমি খেতে এসো।'

'না, এখুনি দরকার চিঠিগুলো,' বলল হেণ্ডারসন। 'প্লিজ, ব্যাপারটা জরুরি।'

একটু যেন মনঃক্ষুণ্ন হলেন বৃদ্ধা। তবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু পর হাতে চিঠিপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে ফিরে এলেন। প্রায় ছোঁ মেরে বাণ্ডিলটা তাঁর হাত থেকে নিল হেণ্ডারসন, বাঁধন খুলে দেখতে শুরু করল একেকটা খাম। ক্লাইভ মরগানের পাঠানো প্যাকেজটা পেতে দেরি হলো না। কাঁপা কাঁপা হাতে খামের মুখ ছিঁড়ল ও, ভিতর থেকে বের করে আনল অনেকগুলো পেপার কাটিং। চোখ বোলাল ওগুলোর উপর।

শিরোনাম ভিন্ন, কিন্তু ভিতরের বিষয়বস্তু প্রায় সবক'টারই এক। যেমন:

গাড়ি দুর্ঘটনায় বিজ্ঞানীর মৃত্যু...

অগ্নিকাণ্ডে বিজ্ঞানী নিহত...

স্কিয়িং অ্যাকসিডেন্ট প্রাণ কেড়ে নিল উদীয়মান বিজ্ঞানীর...

স্ত্রী-সন্তানকে হত্যার পর বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা...

যেন মড়ক লেগেছে বিজ্ঞানী-সমাজে, গত এক মাসে মারা গেছে সাত-আটজন বিজ্ঞানী। কিন্তু দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, মৃতদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে হেণ্ডারসন; সদ্য-সমাপ্ত প্রজেক্টে এদের সবাই ওর সঙ্গে কাজ করেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল ওর, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—*পালাও! নইলে তোমারও একই দশা হবে!*

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি করল না হেণ্ডারসন, দেরি করবার কিছু নেইও। সুটকেস গোছানোই আছে, শুধু বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, ঘুরল মিসেস বেলমণ্ডের দিকে।

'মাফ করবেন, মিসেস বেলমণ্ড। আমাকে এখুনি আবার বেরুতে হবে।'

'বেরুতে হবে মানে! খালিপেটে কোথায় যাবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন বৃদ্ধা।

'দুঃখিত, এ-মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না। কিছু মনে করবেন না। আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

একছুটে বেডরুমে ঢুকে জুতো পরল হেণ্ডারসন, তারপর বেরিয়ে এল সুটকেস নিয়ে। মিসেস বেলমণ্ডকে প্রায় জোর করে বের করল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা গুঁজে দিল বৃদ্ধার হাতে।

'বাড়িটা দেখেশুনে রাখবেন...

'ওয়েসলি, মাই চাইল্ড... কী হয়েছে বলো আমাকে! তোমার চেহারা এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কেন?'

'যত কম জানবেন, ততই মঙ্গল,' তাড়াতাড়ি বলল হেণ্ডারসন। 'প্লিজ, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না! আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।'

'নিশ্চয়ই...'

বৃদ্ধাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না হেণ্ডারসন। লিফটে ঢুকে পড়ল। নেমে এল গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার দশা হয়েছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, বিল্ডিঙের উপর নিশ্চয়ই নজর রাখছে শত্রুরা। ওকে বাগে পাবার এটাই একমাত্র উপায়। মেইন এন্ট্রান্স দিয়ে বেরুনোর সাহস পেল না, উল্টো ঘুরে চলে গেল বিল্ডিঙের পিছন দিকে, সার্ভিস ডোর দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কানাগলিতে।

গলির মুখে বড় রাস্তা, ওখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল হেণ্ডারসন। কপাল ভাল বলতে হবে! ডাকার ভঙ্গিতে হাত তুলতেই ছুটে এল ট্যাক্সিটা, ঘ্যাচ করে দাঁড়াল ওর জুতো থেকে ছ'ইঞ্চি দূরে। দরজা খুলে উঠে বসল ও।

'এয়ারপোর্ট! জলদি!!' হুকুমের সুরে বলল হেণ্ডারসন। 'বাড়তি বখশিশ পাবে।' যোগ করল লোভ দেখানোর জন্য।

দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল ট্যাক্সি। ডান দিকে একটা গলি পড়ল, সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় আড়চোখে তাকাল ড্রাইভার। গলির একটু ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো একটা ক্যাডিলাক। হেলান দিয়ে দাঁড়ানো একজন লোক তাড়াহুড়ো করে উঠছে তাতে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিল হেণ্ডারসন, ক্যাডিলাকটাকে দেখতে পায়নি। ভাবল, যাক, নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বিল্ডিং থেকে। কেউ বাধা দেয়নি। এয়ারপোর্টে

পৌঁছুতে পারলেই হয়, যে-ফ্লাইট পাবে, সেটারই টিকেট কেটে উঠে বসবে। বিমান ওকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটা পরে দেখা যাবে।

চোরা চোখে রিয়ার-ভিউ মিররে তাকাচ্ছে ড্রাইভার, হেণ্ডারসনকে দেখে ভাব-সাব বোঝার চেষ্টা করছে।

হাইওয়েতে এসে পড়ল ট্যাক্সি। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে এক হাত দিয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা অ্যারোসল স্প্রের বোতল তুলে নিল ড্রাইভার।

মুখ তুলল হেণ্ডারসন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরা অবস্থায় সিটের উপর ঘুরে গেল ড্রাইভার, আরেক হাত বাড়িয়ে দিল হেণ্ডারসনের দিকে। চমকে উঠে ফিরতে শুরু করল হেণ্ডারসন। দম আটকে রেখেছে ড্রাইভার, বোতাম টিপে ওর একেবারে মুখের উপর গ্যাস স্প্রে করল সে।

কয়েক সেকেণ্ডেই সিটের উপর এলিয়ে পড়ল হেণ্ডারসন, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

সোজা হয়ে বসল ড্রাইভার, আরোহীর কী অবস্থা হলো দেখার জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করল না। হাইওয়ে থেকে নেমে একটা সাইড রোডে ঢুকল ট্যাক্সি। ঠিক একেবারে পিছনে চলে এসেছে ক্যাডিলাক।

থামল দুটো গাড়িই। অজ্ঞান বিজ্ঞানীকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনে ওঠানো হলো ক্যাডিলাকে। ট্যাক্সিটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে ড্রাইভারও উঠল ওই গাড়িতে। রওনা হয়ে গেল অজানার উদ্দেশে।

কয়েক ঘণ্টা পর উদার হস্তের চড়-চাপড় আর পানির ছিটা খেয়ে জ্ঞান ফিরে এল হেণ্ডারসনের। ঘোর ঘোর ভাব লেগে রয়েছে, ওই অবস্থাতেই আবিষ্কার করল, ছোট আকারের একটা প্রাইভেট

জোটের প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। হাত-পা বাঁধা। ইঞ্জিনের আওয়াজে মনে হলো, উড়ছে বিমানটা। মাথাটা একবার এপাশ-ওপাশ করল হেণ্ডারসন, ভাল করে তাকাল। মুখোমুখি সিটে রুক্ষ চেহারার একজন যুবক বসে আছে।

'ওয়েলকাম ব্যাক, ডক্টর!' হাসিমুখে বলল সে।

'কে তুমি?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল হেণ্ডারসন। মুখের ভেতর অস্বাভাবিক বড় লাগছে জিভটাকে। ঠোঁট জোড়া সীসার মত ভারী। অ্যারোসল স্প্রে-তে এরা কী ব্যবহার করেছে কে জানে, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ও।

'আমার পরিচয় নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে,' বলল যুবক। 'রিল্যাক্স, এনজয় দ্য ফ্লাইট।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা আমাকে?' খসখসে কণ্ঠে প্রশ্ন করল হেণ্ডারসন। 'মেরে ফেলতে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল যুবক। 'মারতে চাইলে তো এডিনবরাতেই কাজটা করতে পারতাম।'

'তা হলে?'

'আপনাকে নিয়ে, ডক্টর,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল যুবক, 'আমাদের অন্যরকম প্ল্যান আছে।'

চার

বেশ আঙ্গুস পর্বতমালা।

উঁচু-নিচু উপত্যকা আর গিরিখাদের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে একটি *অ্যারোস্প্যাশিয়াল অ্যালিউট* লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার। বিশাল প্রকৃতির মাঝে ওটাকে দেখাচ্ছে নগণ্য একটা বিন্দুর মত। কপ্টার আকাশছোঁয়া একটা পর্বতশৃঙ্গের কাছাকাছি পৌঁছুতেই প্যাসেঞ্জার সিটে বসা স্টিভেন ক্যাসিডি নড়ে উঠল, আঙুলের ইশারায় তার সহযাত্রীকে দেখাল সামনের পাহাড়টা।

'ওটাই *ল্য ডরমেয়ার,*' বলল ও। 'মানে, ঘুমন্ত মানুষ। প্রোফাইলটা ভাল করে দেখো, ঘুমন্ত চেহারার সঙ্গে মিল পাবে ওটার।'

আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আছে ক্যাসিডি, গ্লেসিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। বয়স চল্লিশ ছুঁলেও আচার-আচরণ তরুণদের মত। উচ্ছল। চঞ্চল। অত্যন্ত সুদর্শন, চুল-দাড়ি কেটে ফিটফাট থাকতে পছন্দ করে। তবে বেশ কিছুদিন ফিল্ডে কাটানোয় এখন তার চেহারা হয়ে গেছে বুশ পাইলটদের মত। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাদামি চুল বাবরি হয়ে নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত; তার ওপর মাথায় পরেছে এভিয়েটর হেলমেট, চোখে ফ্লাইং গগলস্।

পর্বতশৃঙ্গটা ভাল করে দেখল কপ্টারের দ্বিতীয় যাত্রী জেফ কলিন্স। মন্তব্য করল, 'পোয়েটিক লাইসেন্স বোধহয় একেই বলে, স্টিভ। হ্যাঁ... ভুরু, নাক আর থুতনির মত আকৃতি দেখতে পাচ্ছি বটে; কিন্তু তাই বলে মুখটাকে ঘুমন্ত ভাবা ঠিক না।'

আউটসাইড নামের একটা ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে কলিন্স, বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি। ক্যাসিডির ঠিক বিপরীত বলা যায় তাকে। বয়সে তরুণ হলেও তারুণ্য নেই ওর মাঝে, সারাক্ষণ এক ধরনের ভারিক্কি ভাব বজায় থাকে। ক্যাসিডি তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, সেই সূত্রেই জানতে পেরেছে আল্পস্ পর্বতমালার গভীরে চলতে থাকা সায়েন্টিফিক প্রজেক্টের খবর। বিষয়টা ইন্টারেস্টিং, ওটার উপর প্রতিবেদন লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। হাতেকলমে সবকিছু দেখাবার জন্য ওকে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাসিডি।

হেলিকপ্টারের বাইরে, আল্পসের নির্মল বাতাস এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করেছে। পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে বড্ড কাছে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। প্রকৃতির এই প্রতারণায় প্রভাবিত হলো না হেলিকপ্টারের অভিজ্ঞ পাইলট, কোর্স মেইনটেন করে পেরিয়ে এল পর্বতশৃঙ্গকে। সামনে একটা খাড়া রিজ দেখা গেল, ওটা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে উচ্চতা কমিয়ে আনল।

প্রকৃতির শুভ্র পটভূমিতে বিশাল একটা মাউনটেইন বেসিন দেখতে পেল কলিন্স, প্রায়-নিখুঁত একটা বৃত্তাকার হ্রদ আছে তলায়। সময়টা গ্রীষ্মকাল হলেও পানিতে ভাসছে বড় বড় বরফের চাঁই।

'লক দ্যু ডরমেয়ার, বা ডরমেয়ার লেক,' ঘোষণা করার সুরে বলল ক্যাসিডি। 'বরফ যুগে গ্লেসিয়ার ক্ষয়ে গিয়ে উৎপত্তি হয়েছে এর, গর্তটা সেই থেকে ভরে রাখছে গ্লেশ্যাল ওঅটর।'

'আমার দেখা সবচেয়ে বড় মার্টিনি অন দ্য রকস্!' কৌতুক

করল কলিন্স।

ক্যাসিডি হাসল। 'তাই বলে স্বাদ নিতে যেয়ো না। দাঁত-জিভ সব বরফ হয়ে যাবে।' আঙুল তুলে হ্রদের এক কিনার দেখাল। পাহাড়ের গা কেটে ওখানে অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে--সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া, মাঝখানে একটা বড় বিল্ডিং। ছোট-বড় নানা আকারের টিনের শেড ঘিরে রেখেছে বিল্ডিংটাকে। 'ওটা পাওয়ার প্ল্যান্ট। সবচেয়ে কাছের শহরটা মাউন্টেইন রেঞ্জের ওপারে।'

লেকের সারফেসে স্থির হয়ে থাকা একটা বড় জাহাজের উপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার। জাহাজের ডেকে নানা ধরনের ক্রেন, বুম আর উইঞ্চের ছড়াছড়ি। তা লক্ষ করে কলিন্স বলল, 'কী করছে ওরা?'

'ঠিক শিয়োর না, সম্ভবত কোনও আর্কিয়োলজিকাল প্রজেক্ট,' কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাসিডি। 'বেশ কয়েকদিন হলো এসেছে।'

'লেকের মাঝখানে জাহাজ এল কোত্থেকে?'

'ওই যে, একটা নদী বেরিয়েছে লেক থেকে,' আঙুল তুলে ডানদিক দেখাল ক্যাসিডি, 'ওটা ধরে এসেছে।'

'গ্লেশ্যাল লেকে আর্কিয়োলজিকাল প্রজেক্ট? ইন্টারেস্টিং!' খুশি হয়ে উঠল কলিন্স। এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। বাড়তি একটা ফিচার নিয়ে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই খুশি হবে সম্পাদক।

কয়েক মুহূর্ত পরই সামনের দৃশ্য দেখে দুই ফিচারের কথা ভুলে গেল সে। হ্রদের একপ্রান্তে, বিশাল এক জমাট বরফের চাঁই দিয়ে রুদ্ধ করে দিয়েছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাঁজ। সোনা রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে ওখানে, ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

'ওয়াও!' নিজের অজান্তেই বলে উঠল কলিন্স। 'ওটাই আমাদের গ্লেসিয়ার?'

'জী, জনাব!' নাটুকে কণ্ঠে বলল ক্যাসিডি। '*ইম ল্যাণ্ড দ্য ডরমেয়ার*... মানে ঘুমন্তের জিহ্বা। সহজ ভাষায় ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারও বলতে পারো।'

বরফের বিস্তারের উপর দিয়ে একটা চক্কর দিল হেলিকপ্টার। বোঝা গেল, চওড়া এক উপত্যকাকে ঢেকে দিয়েছে এই গ্লেসিয়ার, মিশেছে ডরমেয়ার লেকের গায়ে। কালো পাথরের ভাঙাচোরা ফুটহিল ঘিরে রেখেছে গ্লেসিয়ারকে, কিনারগুলো এবড়ো-থেবড়ো। বরফের রঙও পুরোপুরি সাদা নয়, কালের প্রবাহে নীলচে বর্ণ ধারণ করেছে।

'জিভের রঙ পাল্টে গেছে,' ঠাট্টা করে বলল কলিন্স। 'ঘুমন্ত মানুষটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'ভাল বলেছ,' হাসল ক্যাসিডি। 'হোল্ড অন, এবার ল্যাণ্ড করব আমরা।'

বাঁক নিয়ে গ্লেসিয়ারের উপর থেকে সরে এল হেলিকপ্টার। লেকের পাড় থেকে একশ' গজ দূরে একখণ্ড সমতল জায়গায় ল্যাণ্ড করল। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই নেমে পড়ল আরোহীরা। কপ্টারে পিছন থেকে মালামালের কার্টন নামাতে শুরু করেছে পাইলট, তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল ক্যাসিডি। কলিন্সকে পরামর্শ দিল হাঁটাহাঁটি করে হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কাটাতে।

গুটি গুটি পায়ে পানির কাছে চলে গেল সাংবাদিক। হ্রদের পানি একেবারে নিথর হয়ে আছে, একটাও ঢেউ নেই। পায়ের কাছ থেকে একটা নুড়িপাথর তুলে পানিতে ছুঁড়ে মারল কলিন্স। মৃদু শব্দ হলো, ডরমেয়ার লেকের বুকে সৃষ্টি হলো ছোট ছোট তরঙ্গের। এবার কলিন্সের চোখ আটকে গেল তীর থেকে সিকি মাইল দূরে নোঙর করে থাকা জাহাজটার উপর। সারা শরীর আকাশী নীল, একপাশে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে: *নুমা!*

ভুরু কুঁচকে গেল সাংবাদিকের। নুমা, বা ন্যাশনাল

আমেরিকা ওশটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি সম্পর্কে জানা আছে তার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র-গবেষণাধর্মী সরকারী সংস্থা ওটা, ডিরেক্টরের নাম অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন—কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সমুদ্র থেকে এত দূরে নুমার জাহাজ কী করছে?

বুঝতে পারছে কলিন্স, ভাল একটা স্টোরির খোঁজ পেয়েছে। নুমার অভিযান যেনতেন ব্যাপার নয়। ইচ্ছে হলো এখুনি ছুটে যায় জাহাজে, খোঁজ নেয় অভিযান সম্পর্কে... কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। হাতছানি দিয়ে ক্যাসিডি ডাকছে ওকে। লক্কড়ঝক্কড়-মার্কা একটা সিকোর্স্কি হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে ল্যাণ্ডিং প্যাডের দিকে, ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

একটু পরেই হেলিকপ্টারের পাশে এসে থামল সিত্রোঁ। মোটাসোটা একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন ভিতর থেকে, গাড়িটা তাঁর জন্য আকারে একটু ছোটই হয়ে গেছে। মানুষটা মাঝবয়েসী, গায়ের রঙ শ্যামলা, লম্বা চুল ঝুঁটি বেঁধে রেখেছেন, মুখভর্তি ঘন কালো দাড়ি।

'ওয়েলকাম ব্যাক, প্রফেসর,' ক্যাসিডির সঙ্গে করমর্দন করে বললেন ভদ্রলোক, কণ্ঠে কড়া ফরাসি টান। তাকালেন কলিন্সের দিকে। 'আপনি নিশ্চয়ই মসিয়ো কলিন্স? দ্য গ্রেট রিপোর্টার?' হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমি ড. জাঁ দ্যুবোয়া। ওয়েলকাম টু ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার।'

'ধন্যবাদ, ড. দ্যুবোয়া,' হাত মিলিয়ে বলল কলিন্স। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটা কাজ করছেন আপনারা, সবকিছু নিজ চোখে দেখার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'খুব ভাল। পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'নাহ্। স্টিভ ঠিক সময়েই পিকআপ করেছে আমাকে। একটুও অপেক্ষা করতে হয়নি।'

'আসুন তা হলে,' প্রায় জোর করেই কলিন্সের হাত থেকে ওর ডাফল ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলেন দ্যুঁবোয়া। 'ফিফি অপেক্ষা করছে।'

'ফিফি?' প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে ক্যাসিডির দিকে তাকাল কলিন্স।

'ডক্টরের গাড়ি...' ইশারায় দেখাল ক্যাসিডি, 'ওটাকেই ফিফি বলে ডাকেন উনি।'

'কারেক্ট!' বললেন দ্যুঁবোয়া। 'পরের প্রশ্নটা কী হবে, তাও আন্দাজ করতে পারি। মেয়েলি নাম রেখেছি কেন, এই তো?'

'ঠিকই ধরেছেন।' কলিন্স হাসল।

'কারণ আমার ফিফি হলো আদর্শ নারীর প্রতিচ্ছবি। অত্যন্ত পরিশ্রমী... বিশ্বস্ত... এবং রূপসী! কোনও কোনও সময়ে দেমাগীও বটে!'

'ব্যস, ব্যস, আমি কনভিন্সড!' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল কলিন্স। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

হেলিকপ্টারে আনা মালপত্র সিত্রোঁর ছাতের র‍্যাকে তুলে ফেলা হলো। সামনে, দ্যুঁবোয়ার পাশে বসল ক্যাসিডি, পিছনের সিটে কলিন্স। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরালেন ডক্টর, কাঁকরে ভরা ভূমির উপর দিয়ে ফিফিকে ফিরতি পথে ছোটালেন। গ্লেসিয়ারের ডানদিকে অতিকায় পাখির মত ডানা মেলে থাকা পর্বতশ্রেণীর গোড়া লক্ষ্য করে এগোচ্ছেন। গাড়িটা দূরে সরে যেতেই টেকঅফ করল হেলিকপ্টার, উচ্চতা বাড়িয়ে রিজ টপকাল, হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

'আমাদের সাবগ্লেশ্যাল অবজারভেটরির ব্যাপারে কী শুনেছেন আপনি, মসিয়ো কলিন্স?' মাথা না ঘুরিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন ড. দ্যুঁবোয়া।

'প্লিজ, আমাকে জেফ বলে ডাকুন,' বলল কলিন্স, তারপর জবাব দিল প্রশ্নের। 'খুব বেশি কিছু না। তবে শুনেছি, নরওয়ের স্ভারটিসেন গ্লেসিয়ারের মতই সেটআপ আপনাদের।'

'ঠিক বলেছ।' সিটের উপর একটু ঘুরল ক্যাসিডি। 'গভারটিসেন ল্যাব হলো বরফের সাতশো ফুট গভীরে, আর আমাদেরটা প্রায় আটশো। তবে দু'জায়গাতেই একই ধরনের কাজ চলছে। গ্লেশ্যাল ওঅটরকে টারবাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা হচ্ছে।'

'পানির প্রবাহ টারবাইন পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে কীভাবে?' জানতে চাইল কলিন্স।

'গ্লেসিয়ারের তলায় অনেকগুলো টানেল খুঁড়েছে ইঞ্জিনিয়াররা, আমাদের অবজারভেটরিও অমন একটা টানেলের মধ্যে বসানো হয়েছে। হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, আমরা শুধু ওদের সাহায্য নিয়ে নিজস্ব গবেষণা চালাচ্ছি।'

পাইনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সিত্রোঁ। ট্র্যাকটা অত্যন্ত সরু, মাটিও এবড়ো-থেবড়ো। ঝাঁকি খেতে শুরু করল গাড়ি, বিচ্ছিরি শব্দে প্রতিবাদ করছে ইঞ্জিন—পুরনো, লক্কর-ঝক্কড় গাড়ির উপযোগী নয় মোটেই রাস্তাটা।

'ফিফি মনে হয় রেগে যাচ্ছে,' টিটকিরির সুরে বলল ক্যাসিডি। 'বয়স হয়েছে তো, বুড়ো হাড়ে এমন ঝাঁকুনি সহ্য হচ্ছে না।'

'ওকে তুমি চেনো না,' কথাগুলো গায়ে না মেখে বললেন দ্যুঁবোয়া। 'শরীর বুড়ো হতে পারে, কিন্তু মনটা ওর চিরতরুণ।'

কথায় না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাসিডি। কলিন্স উঁচু গলায় হেসে উঠল।

মিনিটদশেক এগোনোর পর গাড়ি থামালেন দ্যুঁবোয়া। বললেন, 'এখানেই নামতে হবে। ফিফি আর সামনে যাবে না।'

নেমে পড়ল যাত্রীরা। সামনে একটা ভাঙাচোরা কাঠের সেতু দেখতে পেল কলিন্স, নীচে গভীর পাহাড়ি ফাটল। সিত্রোঁর ওজন সইতে পারবে না ওই সেতু। সঙ্গীদেরকে একটা করে শোল্ডার

হারনেস দিলেন দ্যুঁবোয়া, নিজেও নিলেন একটা। সাপ্লাইয়ের কার্টনগুলো হারনেসে বেঁধে পিঠে ঝোলাতে হবে।

'কুলিগিরি করাচ্ছি বলে কিছু মনে কোরো না,' বলল ক্যাসিডি। 'আসলে... এখানে জিনিসপত্রের বড্ড অভাব কি না! তোমার সঙ্গে নতুন সাপ্লাই আনার সুযোগটা তাই হাতছাড়া করতে পারিনি।'

'কুলিগিরিতে আমার কোনও আপত্তি নেই,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল কলিন্স, 'যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাই আর কী!'

'পাচ্ছ তো! চমৎকার একটা ফিচার লেখার জন্য সমস্ত মালমশলা!'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ।'

'চলুন, এগোনো যাক।' বললেন ড. দ্যুঁবোয়া।

সেতু পেরিয়ে পাইনের বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল তিনজনে। সমতল পেরিয়ে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই, এরপর ঢালু পথ—উপর দিকে উঠে গেছে। পিচ্ছিল, নুড়িপাথরে ভরা, বিপজ্জনক। ফাটলও দেখা গেল বেশ কিছু, বরফে ভরে আছে। লাফ দিয়ে পেরুতে হলো ওগুলো।

হাঁপাতে শুরু করল কলিন্স, কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত নয় ও। ওর গায়ের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে হারনেসে বাঁধা জিনিসপত্রের ওজন। বিশ মিনিট পর একটা পাহাড়ি শেলফে পৌঁছে যখন থামল দলটা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া গেছে। আশপাশটা দেখে নিল চকিতে। লেকের সারফেস থেকে প্রায় দুইশ' ফুট উপরে উঠে এসেছে ওরা। গ্লেসিয়ারটা পাহাড়ি ঢালের আড়ালে পড়ে গেছে, তবে ওটার শীতল পরশ অনুভব করা যাচ্ছে এখান থেকেও। মনে হলো যেন রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলে রেখেছে কেউ।

'ওয়েলকাম টু আইস প্যালেস!' সহাস্যে বলল ক্যাসিডি। এক

হাত বাড়িয়ে শেলফের প্রান্তে পাহাড়ি প্রাচীরের গোড়াটা দেখাল। বৃত্তাকার একটা ওপেনিং রয়েছে ওখানে।

'ওটা?' ভুরু কোঁচকাল কলিন্স। 'দেখে তো ড্রেনেজ পাইপের মত লাগছে।'

'এসো, ভাল করে দেখো,' আহ্বান জানাল ক্যাসিডি।

দুই বিজ্ঞানীর পিছু নিয়ে ওপেনিং দিয়ে ভিতরে ঢুকল কলিন্স। ছোট একটা প্যাসেজ ওটা, উচ্চতায় পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। ওটা ধরে একশ' ফুট এগুতেই বিশাল একটা টানেলে পৌঁছে গেল। ভিতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে, অদ্ভুত আভা ছড়াচ্ছে মেটামরফিক পাথরের কমলা-রঙা দেয়াল, তার উপর কালো পেইন্ট দিয়ে ডোরা কাটা ডিজাইন রয়েছে।

'ওরে বাবা!' সবিস্ময়ে বলে উঠল কলিন্স। 'এখানে তো রীতিমত একটা ট্রাক ঢোকানো যাবে!'

'ট্রাক কেন, ডাবল-ডেকার বাসও ঢুকবে,' গর্বের সুরে বলল ক্যাসিডি। 'টানেলের ডায়ামিটার ত্রিশ ফুট।'

'হুম,' মাথা দোলাল কলিন্স। 'খালি ফিফিই ঢুকতে পারছে না। ওকে আনা গেলে আমাদেরকে আর মালপত্র বইতে হতো না। ঢাল দিয়ে যদি একটা রাস্তা করা যেত...'

'ফিফিকে ঢোকানো যায় তো!' বলল ক্যাসিডি। 'পাওয়ার প্ল্যান্টের পাশে আরেকটা ওপেনিং আছে, ওখান দিয়ে অনায়াসে আনা যায়।'

'তা হলে আমরা খামোকা হেঁটে মরছি কেন?'

'দ্যুঁবোয়ার ধারণা, টানেলের ভিতরে ড্রাইভ করলে ফিফির ক্ষতি হবে।'

'ও বড্ড নাজুক,' কৈফিয়তের সুরে বললেন দ্যুঁবোয়া। তারপর টানেলের দেয়ালে ফিট করা একটা লকার খুলে রাবার বুট আর মাইনিং হেলমেট বের করলেন সবার জন্য।

গ্লাভ্স আর হেলমেট পরে আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। কদাচিৎ একটা-দুটো বালব জ্বলতে দেখা যায়, নইলে সামনে নিকষ আঁধার, হেলমেটের হেডল্যাম্পের আলোয় সে-আঁধার মোটেই কাটে না।

'আলো নেই কেন এখানে? অন্ধকারে আমরা আবার পথ ভুল করব না তো?' শঙ্কা প্রকাশ করল কলিন্স।

'ভয়ের কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল ক্যাসিডি। 'টানেলের অলিগলি আমাদের মুখস্থ।'

'তারপরও... আলো থাকা উচিত ছিল।'

'টানেল খোঁড়ার সময় ইঞ্জিনিয়াররা প্রচুর বালব লাগিয়েছিল, এখন ফিউজ হয়ে গেছে। সময় আর লোকের অভাবে ওগুলো রিপ্লেস করা যাচ্ছে না।'

'অ!' মাথা ঝাঁকাল কলিন্স। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আচ্ছা সিড, গ্লেসিয়োলজিতে তুমি আগ্রহী হয়ে উঠলে কীভাবে?'

'কেন, সাবজেক্টটা অদ্ভুত?' হাসল ক্যাসিডি।

'না, না, তা হবে কেন...'

'বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু তা-ই ভাবে। লক্ষ-কোটি বছরের পুরনো বরফের চাঁই নিয়ে গবেষণা করি আমরা। এর গুরুত্বই বা কী, এতে রোমাঞ্চ-আনন্দই বা কোথায়? রাইট?'

'কে বলেছে রোমাঞ্চ নেই?' বলে উঠলেন দ্যুঁবোয়া। 'বরফ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এক এস্কিমো মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়ে গিয়েছিল আমার। সে-নিয়ে যা ঘটেছে, লিখতে বসলে গোটা একটা মহাকাব্য হয়ে যাবে!'

ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গি শুনে হাসি চাপতে পারল না কলিন্স।

'স্পোকেন লাইক আ ট্রু গ্লেসিয়োলজিস্ট,' বলল ক্যাসিডি। 'আসল কথা হলো, আমরা প্রকৃতিপ্রেমী। বেশিরভাগ মানুষ বন-বনানী ভালবাসে, আমরা ভালবাসি বরফ। ওটাও তো

প্রকৃতিরই অংশ, তাই না? জীবনে প্রথম আইসফিল্ড দেখি আমি বারো বছর বয়সে, শুভ্র এই জগতের প্রেমে পড়ে যাই তখুনি। গ্লেসিয়োলজিকে নেশা আর পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি সে-কারণেই।'

'গ্লেসিয়োলজিস্টদের কাজ কিন্তু মোটেই সহজ নয়,' বললেন ড. দ্যুঁবোয়া। 'বরফের তলায় কেঁচোর মত বাস করতে হয় আমাদেরকে। দিনের পর দিন কেটে যায়, সূর্যের দেখা পাই না। আমাকে দেখুন, সাব-যিরো টেম্পারেচার আর হানড্রেড পারসেন্ট হিউমিডিটি কী দশা করেছে শরীরের! লম্বা-চওড়া, হ্যাণ্ডসাম মানুষ ছিলাম আমি এককালে। এখন হয়ে গেছি বেঁটেভূত!'

'আপনি আবার হ্যাণ্ডসাম ছিলেন কবে?' ঠাট্টা করল ক্যাসিডি। 'সারাজীবন তো আপনাকে এই চেহারাতেই দেখছি।'

'হাহ্, যৌবনে তো দেখোনি আমাকে। মেয়েরা পাগল হয়ে যেত।'

'তারমানে সত্যিই পাগল ছিল ওরা।'

'কী বললে?' চটে উঠলেন দ্যুঁবোয়া।

তাড়াতাড়ি নাক গলাল কলিন্স। 'বাদ দিন স্টিভের কথা। আপনাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে বলুন। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই শুনলাম, তা হলে গবেষণা করছেন কী নিয়ে?'

'গ্লেসিয়ারের মুভমেন্ট এবং তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিন বছরের একটা স্টাডি কণ্ডাক্ট করছি আমরা। নীরস সাবজেক্ট, তবে আশা করছি আপনার আর্টিকেলে ব্যাপারটা এক্সাইটিং করে ফুটিয়ে তুলবেন।'

'ওটা কঠিন নয়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সারা দুনিয়ায় মাতামাতি হচ্ছে, গ্লেসিয়োলজির ব্যাপারে তাই অনেকেই ইদানীং আগ্রহী হয়ে উঠেছে।'

'না হয়ে উপায় আছে? জলবায়ু আর গ্লেসিয়ার ওতপ্রোতভাবে

সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর টেম্পারেচার বেড়ে গেলে গ্লেসিয়ার আর পোলার আইসক্যাপ গলতে শুরু করবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে, প্রত্যেকটি মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো তলিয়ে যাবে পানির নীচে।'

'ভয়াবহ একটা ঘটনা হবে ওটা,' স্বীকার করল কলিন্স।

'এই তো এসে গেছি,' বলে উঠল ক্যাসিডি। 'মাই ডিয়ার কলিন্স, *ক্লাব ডরমেয়ার*-এ স্বাগতম!'

ট্রেইলার হোম আকৃতির চারটা বিল্ডিং দেখতে পেল কলিন্স—টানেলের পাশে বিশাল এক খোঁড়ল বানিয়ে তার ভিতর স্থাপন করা হয়েছে ওগুলো। প্রথম বিল্ডিংটার দরজা খুলে ধরল ক্যাসিডি।

'এখানেই থাকি আমরা,' বলল সে। 'চারটে বেডরুম আছে, আটজন রিসার্চার থাকতে পারে। আর আছে কিচেন, বাথরুম এবং লিভিং রুম। আধুনিক আরাম-আয়েশের মোটামুটি সব ব্যবস্থাই আছে... টেলিভিশন ছাড়া।'

'এ-মুহূর্তে কতজন আছে এখানে?' বিল্ডিঙে ঢুকে জানতে চাইল কলিন্স।

'তিনজন। ড. দ্যুঁবোয়া, আমি, আর আমার এক রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট। বাকিরা ছুটি কাটাতে গেছে।' শোল্ডার হারনেস খুলতে শুরু করল ক্যাসিডি। 'মালপত্র এখানেই নামিয়ে রাখো, তারপর তোমাকে ল্যাব দেখাতে নিয়ে যাবো।'

'কোথায় ওটা?'

'এখান থেকে আধঘণ্টার পথ। টানেল ধরে নীচে যেতে হবে। ওখানেই আমাদের অবজারভেটরি, রিসার্চ টানেল আর ল্যাব রুম। ফোন কানেকশন আছে ওখানে। দাঁড়াও, আমার সহকারীকে জানিয়ে দিই আমাদের আসার খবর।'

কাঁধ থেকে মালপত্র নামিয়ে ওয়াল-ফোনের রিসিভার কানে

ঠেকাল ক্যাসিডি। ডায়াল করে কথা বলতে শুরু করল। হঠাৎ ওর মুখের ভাব বদলে গেল।

'কী বললে?' অবিশ্বাস ফুটল ক্যাসিডির কণ্ঠে। 'আবার বলো!' চুপ করে কথাগুলো শুনল। 'ঠিক আছে, আমরা এখুনি আসছি।'

'কী হয়েছে, প্রফেসর?' ক্যাসিডি রিসিভারটা নামাতেই জিজ্ঞেস করলেন দ্যুঁবোয়া। 'কোনও সমস্যা?'

'অবিশ্বাস্য... অসম্ভব!!' বিড়বিড় করল ক্যাসিডি, ফরাসি বিজ্ঞানীর কথা যেন কানেই যায়নি।

'স্টিভ!' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল কলিন্স। 'কী হয়েছে?'

ফ্যাল ফ্যাল করে দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল ক্যাসিডি। যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না, এমন সুরে বলল, 'আমার অ্যাসিসটেন্ট বলছে, ও একটা লাশ খুঁজে পেয়েছে... বরফে জমাট বাঁধা অবস্থায়!'

পাঁচ

ডরমেয়ার লেকের দুইশ' ফুট গভীরে, চরম শীতল পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি সাবমারসিবল। পরিবেশটা বিরূপ, কিন্তু ওটার গোলক-আকৃতির স্বচ্ছ অ্যাক্রিলিক ককপিটে বসে থাকা দুই নরনারীকে দেখে মনে হতে পারে, প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছে ওরা। যুবকটি সুদর্শন, সুঠামদেহী। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখদুটো

আশ্চর্য মায়াময়, কিন্তু ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে মানুষটা, অথচ মুখের চেহারা হাসিখুশি।

মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র হলে, কিংবা কোথাও মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনও অশুভ তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহসের সঙ্গে সেটা ঠেকাবার জন্য ছুটে যেতে হয় ওকে। শুধু তা-ই নয়, আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে ওর। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির এক বা একাধিক শাখা ছড়ানো রয়েছে—ও তার প্রধান, জাতিসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট, ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিশেষ স্নেহভাজন প্রিয়পাত্র। শত্রুতাবশত কোন দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, নুমার এমন যে-কোনও শুভ ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আপত্তি নেই রানার; তা ছাড়া নুমার সঙ্গে রয়েছে ওর আত্মার সম্পর্ক। সে-কারণেই এবার ফ্রেঞ্চ আল্পসে এসেছে ও, লেক ডরমেয়ারের চরম শীতল পানিতে নতুন প্রযুক্তির একটি সাবমারসিবলের টেস্ট-ট্রায়ালে সাহায্য করতে। প্রযুক্তিটা আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশের এক গুণী বিজ্ঞানী; নুমা থেকে কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়েছে সাবমারসিবল তৈরির জন্য, বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের অনুরোধে। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেছেন নুমার ডিরেক্টর, সেই সঙ্গে সাবমারসিবলের টেস্ট-ট্রায়ালের জন্য রানাকেও চেয়ে নিয়েছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন, নতুন সাবমারসিবল-টেকনোলজির ব্যাপারে বিভিন্ন মহল উৎসাহী হয়ে উঠবে। টেস্ট-ট্রায়ালের সঙ্গে যদি রানা জড়িত থাকে, তা হলে প্রযুক্তি-চুরির ভয় থাকে না।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকবার সাবমারসিবলের ব্লু-প্রিন্ট চুরির চেষ্টা চালিয়েছে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা, রানার কারণে সফল হতে পারেনি। তবে কঠিন সময়টা পেরিয়ে গেছে, নির্মাণশেষে জলযানটা নিয়ে আসা হয়েছে ডরমেয়ার লেকে, পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখার জন্য। আর্কিয়োলজিকাল একটা প্রজেক্টের জন্য নুমার জাহাজ *স্টারফিশ* এমনিতেই আসছিল আল্পসের এই হ্রদে, ওটায় তুলে দেয়া হয়েছে সাবমারসিবলটা। গত কয়েকদিন বেশ কয়েকবার ওটা নিয়ে পানিতে নেমেছে রানা, কোনও সমস্যা হয়নি। তাই আজ একজন সঙ্গী নিয়েছে।

মাসুদ রানা বিখ্যাত মানুষ, তাই বলে সাবমারসিবলের মহিলা যাত্রীটিকে হেলাফেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই। ফরাসি নাগরিক, পেশায় আর্কিয়োলজিস্ট, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ, নাম লুনা পারসেল। ফ্রান্সের বিখ্যাত সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। অত্যন্ত মেধাবী, নুমার ডরমেয়ার প্রজেক্টের মূল উদ্যোক্তা সে-ই। মেধার পাশাপাশি ওর রূপেরও কমতি নেই। ফর্সা-মসৃণ ত্বক, নিখুঁত মুখাবয়ব, ঢেউখেলানো গাঢ় বাদামি চুল আর অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব যে-কোনও সুপারমডেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। বয়সও বেশি নয়, ত্রিশ ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি। এরই মধ্যে জাহাজের সবার মন জয় করে নিয়েছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে রানার সঙ্গেও—যেন কত যুগের পরিচয়! মেয়েটিকে দেখলেই লুভার মিউজিয়ামের একটা পেইন্টিঙের কথা মনে পড়ে যায় রানার। কয়েক শ' বছর আগেকার একটা পোর্ট্রেট, তাতে অপরূপা এক তরুণীর ছবি এঁকেছেন শিল্পী অত্যন্ত দক্ষ হাতে। তুলির আঁচড়ে মেয়েটির দৃষ্টিতে বাসা বাঁধা দুষ্টুমি, নিষ্কলুষতা, আর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। লুনার মাঝে কেন যেন ছবির ওই তরুণীর চিহ্ন দেখতে পায় রানা।

'পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও, মানসচোখে লুভারের পেইন্টিংটা ভাসছে।

একটু অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল লুনা। গ্লেশ্যাল জিয়োলজি নিয়ে কথা বলছিল দুজনে, এর মাঝে পুনর্জন্ম এল কোত্থেকে!

'কী জানি, কখনও ভেবে দেখিনি,' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?'

'এমনিতেই। কোনও কারণ নেই,' হাসল রানা। 'তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'কীসের অসুবিধে?'

'না... মানে, প্রথমবার সাবমারসিবলে চড়লে শারীরিক অসুবিধে হয় অনেকের। মাথা ঘোরে, দম আটকে আসে...'

'ওসবের দিকে নজর দেবার সময় কই!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল লুনা। 'আমার তো এক্সাইটমেন্টই কাটছে না। ওফ্, আনবিলিভেবল! কখনও ভাবতে পারিনি, স্বচ্ছ একটা বুদবুদে চড়ে পানির তলায় ঘুরে বেড়াব।'

'হুঁ, স্বীকার করছি, মিউজিয়ামের পুরনো বর্ম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার চেয়ে এটা অনেক বেশি এক্সাইটিং।'

'মিউজিয়ামে আজকাল আমি খুব কম সময় কাটাই, রানা,' লুনা বলল। 'নিজস্ব রিসার্চ ওঅর্কের ফাণ্ড জোগাড়ের জন্য আমাকে কর্পোরেট জব করতে হয়।'

রানার কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল। 'তুমি হলে প্রাচীন ইতিহাসের উপর বিশেষজ্ঞ। কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা তোমাকে চাইবে কেন?'

'খুব সহজ—ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার জন্য। বুঝিয়েই বলি। ব্যবসার জগৎ অত্যন্ত কঠিন, টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে আত্মরক্ষা করে চলতে হয়, সেই সঙ্গে জানতে হয়

প্রতিযোগীদের দমিয়ে রাখার নিয়ম।'

'নিয়মটা তুমি শেখাও?'

'না, আমি শুধু ওদের চিন্তাভাবনার পরিধি বাড়িয়ে দিই। লেকচার দিই, সিমিউলেশনের আয়োজন করি—পুরনো আমলের বিভিন্ন যুদ্ধের সিনারিয়ো রিক্রিয়েট করে তাতে ওদেরকে দুই পক্ষের দায়িত্ব নিতে দিই। এক ধরনের ওঅর গেম বলতে পারো। ক্লায়েন্টরা খুব এনজয় করে খেলাটা। মাথাও খোলে ওদের। প্রতিপক্ষকে হারাবার জন্য নিত্যনুতন কৌশল আবিষ্কার করতে হয় কিনা!'

'শুনে তো খুব মজার মনে হচ্ছে।'

'আসলেই তাই। এতে আমিও লাভবান হচ্ছি। দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পাততে হচ্ছে না, নিজের টাকায় আর্কিয়োলজিকাল এক্সপিডিশন আয়োজন করতে পারছি।'

'কী খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি? প্রাচীন আমলের ট্রেড রুট?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'বিশাল একটা আবিষ্কার হবে, যদি প্রমাণ করতে পারি—এদিককার স্থলপথ ধরে এককালে বাণিজ্যিক মালামাল আনানেয়া করা হতো। পথটা *অ্যাম্বার রুট* নামে পরিচিত। আল্পসের ভিতরকার গিরিপথ আর উপত্যকার মাঝ দিয়ে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওখান থেকে ফিনিশিয়ান আর মিনোয়ান জাহাজে করে সব মাল নেয়া হতো ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে। আমার ধারণা, দুদিকেই চলত বাণিজ্য।'

'তোমার এই থিয়োরিটিক্যাল ট্রেড রুট তো অত্যন্ত জটিল।'

'এমনটা ভাবছ কেন?'

'বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে। স্থলপথে জিনিসপত্র নেয়ায় ঝক্কি অনেক।'

'তা তো বটেই। রুটটা গেছে সেল্ট আর ইত্রোস্ক্যান এলাকার মাঝ দিয়ে। বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ওদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে

চুক্তি করতে হয়েছিল। এর অর্থ বুঝতে পারছ? আধুনিক ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন আর নাফটা-র বহু আগেই এ-মহাদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংহতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওটাই আসলে প্রমাণ করতে চাই আমি।'

'প্রাচীন গ্লোবালাইজেশন? উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা লক্ষ্য—বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার শুভকামনা রইল।'

'শুভকামনার চেয়েও অনেক বেশি করছ। আসলে... নুমার সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এতদূর এগোনো সম্ভব হতো না। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমার বাবার বিশেষ বন্ধু, তাই বলে গোটা একটা জাহাজ পাঠিয়ে দেবেন আমার এক্সপিডিশনের জন্য, এটা ভাবতে পারিনি।'

'অ্যাডমিরাল আসলে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করছেন। তোমার এক্সপিডিশনে সাহায্য হচ্ছে, আবার আমরা ইনল্যাণ্ড ওঅটরে আমাদের জাহাজ আর এই সাবমারসিবলের পারফর্মেন্স পরীক্ষা করে দেখতে পারছি।'

'তারপরও... ইটস্ সো নাইস অভ হিম।' সাবমারসিবলের স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে বাইরে তাকাল লুনা। 'পরিবেশটা খুবই রোমাণ্টিক। শ্যাম্পেন থাকলে সোনায় সোহাগা হতো।'

'শ্যাম্পেন নেই, আপাতত স্যাণ্ডউইচ আর পানি দিয়ে কাজ চালাও।' সিটের পাশ থেকে একটা কুলার তুলল রানা। 'এটা আমাদের লাঞ্চ।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই।' কুলার থেকে স্যাণ্ডউইচ আর পানির বোতল বের করল লুনা। নিজে নিল, রানাকেও দিল।

সাবমারসিবলকে থামিয়ে ফেলল রানা। লেকের একটা চার্ট মেলে ধরল কোলের উপর, স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে জরিপ করল ওটা।

'আমরা এখানে,' দেখাল রানা, আঙুল ঠেকাল আঁকাবাঁকা

একটা রেখার উপরে। 'ন্যাচারাল এই শেলফটার পাশে। তীরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে এটা। কয়েক হাজার বছর আগে শেলফটা হয়তো পানির উপরে ছিল।'

'আমার থিয়োরি তা-ই বলে,' লুনা বলল। 'অ্যাম্বার রুটের একটা অংশ ডরমেয়ার লেকের পাশ ঘেঁষে গেছে। ওটা ডুবে যাবার পর হয়তো সওদাগররা বিকল্প পথ খুঁজে নিয়েছিল। এখানে সে-সময়কার নিদর্শন পাওয়া যাবার কথা।'

'ঠিক কী ধরনের নিদর্শন আশা করছ?'

'দেখলে বুঝতে পারব।'

'আমাকে বোঝানো যায় না?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

হেসে ফেলল লুনা। 'অবশ্যই! শোনো, পুরনো আমলের ক্যারাভানগুলোকে নিশ্চয়ই বিশ্রাম এবং রিসাপ্লাইয়ের জন্য মাঝে মাঝে থামতে হতো। ডরমেয়ার লেকের পাড় সে-ধরনের রেস্টিং প্লেস হিসেবে আদর্শ। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তা হলে ট্রেড রুটের স্টপেজে যে-ধরনের সেটেলমেন্ট থাকে, তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব আমরা।'

'চলো তা হলে। দেখি তোমার ধারণা কতখানি সত্যি।'

ঝটপট লাঞ্চ শেষ করল দুজনে। তারপর সাবমারসিবলের কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। ব্যাটারি-চালিত ইলেকট্রিক মোটর গুঞ্জন করে উঠল, চালু হলো গোলকের তলায় লাগানো টুইন ল্যাটারাল থ্রাস্টার। এগিয়ে চলল সাবমারসিবল।

আদর করে নাম রাখা হয়েছে সাবমারসিবলের—*জলপরী*। পনেরো ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া; দুজন যাত্রী বহন করতে পারে, পানির পনেরো হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত নামতে পারে অনায়াসে। বারো নটিক্যাল মাইল রেঞ্জ ওটার, সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় আড়াই নট। অন্যান্য সাবমারসিবলের তুলনায় এটার নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ। গাড়ি চালানোর মত করেই চালানো যায়

জলপরীকে, দ্রুত বাঁক নেয়া যায়, ব্রেক কষার ভঙ্গিতে থামিয়েও ফেলা যায়। এমন চমৎকার ম্যানুভারিবিলিটি আর কোনও জলযানে দেখা যাবে না।

নেভিগেশনের জন্য অ্যাকুস্টিক ডপলার ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করল রানা, জলপরীকে ডুবন্ত শেলফের উপর নিয়ে গেল। শেলফটা ঢালু, ধীরে ধীরে নেমে গেছে নীচে। বেসিক সার্চ প্যাটার্ন অনুসরণ করল রানা—কাল্পনিক একটা গ্রিড এঁকে ওটার রেখার উপর আগুপিছু করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে সাবমারসিবলের বাইরে লাগানো চারটে শক্তিশালী হ্যালোজেন ল্যাম্প, শেলফের উপরিভাগ আলোকিত হয়ে উঠেছে তাতে।

ঘণ্টাদুই ঘোরাফেরার পর আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠল লুনা। ততক্ষণে একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে রানা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ ওর কাঁধ খামচে ধরল লুনা, অন্যহাতটা প্রসারিত করে রেখেছে সামনে।

'ওই যে!'

জলপরীর স্পিড কমাল রানা, তাকাল সামনে। হ্যালোজেন ল্যাম্পের সীমানার ওপারে আবছা একটা আকৃতি ফুটে উঠেছে। সাবমারসিবলের নাক ঘুরিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেল ও। আলো পড়তেই বোঝা গেল জিনিসটা। বিশাল এক পাথর—বারো ফুট লম্বা, চওড়ায় অর্ধেক। তবে কিনারায় বাটালির আঘাতের চিহ্ন বলছে, ওটা প্রাকৃতিক নয়; মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে।

আরও পাথর দেখা গেল আশপাশে—কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কিছু খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু পড়ে আছে এলোমেলোভাবে, কিছু আবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে আর্চওয়ের আকারে।

'মনে হচ্ছে পথ ভুল করে স্টোনহেঞ্জে চলে এসেছি,' ঠাট্টা করল রানা।

'বলেছে তোমাকে!' ওর কাঁধে চিমটি কাটল লুনা। 'ওগুলো পারিয়াল মনুমেন্ট। আর্চওয়েগুলো হচ্ছে সমাধিতে ঢোকার প্রবেশপথ।'

থ্রাস্টারের পাওয়ার বাড়াল রানা। ত্রিশ ফুটের ব্যবধানে দাঁড়ানো ছ'টা আর্চওয়ে পেরিয়ে এল। এরপর উঁচু হতে শুরু করল জমি, দেখা পাওয়া গেল একটা সংকীর্ণ ডুবো-উপত্যকার। দু'পাশের পাহাড়ি ঢাল কেটে সমান করে ফেলা হয়েছে, পাহাড় ওখানে প্রাচীরে পরিণত হয়েছে। উপত্যকার শেষপ্রান্তে একটা খাড়া দেয়াল দেখা গেল। মাঝে একটা আয়তাকার ওপেনিং আছে—একটা দরজা। দরজার উপরে আছে একটা পাথুরে ছাউনি। ছাউনির উপরে আছে একটা তেকোণা ফুটো।

'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল লুনা। 'এ তো দেখছি একটা *থোলোস!*'

'কী?' রানা ঠিক বুঝতে পারছে না।

'গণসমাধি, রানা। একসঙ্গে অনেককে কবর দেয়া হয়েছে ভিতরে। মাইসেনিতে দেখেছি আমি এমন আরেকটা গণসমাধি। *দ্য ট্রেজারি অভ অ্যাট্রিওস* নাম ওটার।'

'মাইসেনি!' রানা অবাক হলো। 'সে তো গ্রিসে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওই সমাধির ডিজাইন গ্রিক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। খ্রিস্টজন্মের আড়াই হাজার বছর আগে ক্রিট দ্বীপ আর ঈজিয়ানের লোকেরা এভাবে মৃতদের একসঙ্গে কবর দিত।' জ্বলজ্বলে চোখে রানার দিকে তাকাল লুনা। 'এর অর্থ বুঝতে পারছ, রানা? প্রাচীন আমলে ঈজিয়ান আর ইয়োরোপের মধ্যকার বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, এটা প্রমাণ করে দিতে পারব আমরা। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এমন সম্ভাবনার কথা।'

'ইন্টারেস্টিং!' সঙ্গিনীর উচ্ছ্বাস দেখে মন্তব্য করল রানা।

'ইশ্‌শ্‌,' তৃষিত নয়নে সমাধির দিকে তাকাল লুনা, 'ভিতরটা

দেখার জন্য আমি একটা চোখ হারাতেও রাজি।'

'অত বড় মূল্য দিতে হবে না,' হাসল রানা। 'ডুবো-সমাধি পরিদর্শন করাবার জন্য আমি সাধারণত একটা ডিনার-ডেট দাবি করি।'

'কী বলছ!' অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকাল লুনা। 'তুমি আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন নয়? এন্ট্রান্সটা যথেষ্ট চওড়া। জলপরীও পানির তলায় জাদু দেখাতে পারে। একটু সাবধানে যেতে হবে আর কী!'

'যা খুশি করো, ভিতরে চলো এখুনি। *দিপেশ তোয়া! ভিত্... ভিত্!!'* মাতৃভাষায় তাড়া লাগাল লুনা।

হেসে ফেলল রানা। জয়স্টিক নেড়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়াল জলপরীকে। হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলোয় সমাধির প্রবেশপথ আলোকিত হয়ে উঠল। ওখানে নাক ঢোকাতে যাবে জলপরী, এমন সময় খড় খড় করে উঠল সাবমারসিবলের রেডিও রিসিভার।

'রানা, দিস ইজ উলফ। কাম ইন, প্লিজ।'

কণ্ঠটা ক্রিস্টোফার উলফের—নুমার জাহাজ স্টারফিশের ক্যাপ্টেন। মাইক্রোফোন তুলে নিল রানা। 'রানা স্পিকিং। হাউ ডু ইউ রিড মি?'

'একটু দুর্বল, তবে শুনতে পারছি,' বললেন উলফ। 'মিস পারসেলকে বলো, মসিয়ো অঁরি কথা বলতে চান ওঁর সঙ্গে।'

ফরাসি সরকারকে সৌজন্য দেখিয়ে একজন অবজারভার নিয়েছে নুমা, ফ্রাঁসোয়া অঁরি, তার কথাই বলছেন ক্যাপ্টেন। মাইক্রোফোনটা লুনার হাতে তুলে দিল রানা। শুরু হলো উত্তপ্ত বাদানুবাদ। গোঁয়ারের মত কিছুক্ষণ লড়াই করল লুনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হলো। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকাল রানার দিকে।

'সরি রানা, আমাদেরকে উপরে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন? এখনও যথেষ্ট অক্সিজেন আর পাওয়ার আছে জলপরীতে।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। সরকারের এক বড়কর্তার কাছ থেকে মেসেজ পেয়েছে অঁরি, আমাকে এখুনি একটা আর্টিফ্যাক্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য যেতে বলা হয়েছে।'

'শুনে তো ইমার্জেন্সি বলে মনে হচ্ছে না। থেকে যেতে পারো না?'

'পারলে কি আর ফিরতে বলছি তোমাকে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুনা। 'সমস্যা হলো, এখানে এক্সপিডিশন চালাবার জন্য সরকারি অনুমতি নিতে হয়েছে আমাকে। ওদের কথা না শুনলে অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। আই অ্যাম সরি।'

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'কিচ্ছু ভেবো না। কয়েক হাজার বছর ধরে এখানে পড়ে আছে সমাধিটা। আমি পাহারায় থাকছি—কোথাও পালিয়ে যাবে না। দু'চারদিন পরে ঢুকলে কোনও অসুবিধে নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুনা। চেহারা বিমর্ষ। শেষবারের মত রহস্যময় প্রবেশপথটার দিকে তাকাল রানা, তারপর জলপরীর নাক ঘুরিয়ে নিল, বেরিয়ে এল উপত্যকা থেকে, ভার্টিক্যাল থ্রাস্টার ব্যবহার করে উঠতে শুরু করল উপর দিকে।

সারফেসে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। পুরো দেহ ভেসে উঠতেই স্পিডবোটের মত জলপরীকে ছোটাল রানা, স্টারফিশের পাশে ভেড়াল পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

কেইবল বেঁধে সাবমারসিবলকে জাহাজে তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্রু-রা, ল্যাডার বেয়ে আপার ডেকে উঠে এল রানা-লুনা। সিঁড়ির পাশেই অপেক্ষা করছিল ফ্রাঁসোয়া অঁরি, লুনার চেহারা দেখে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটায় আমি

অত্যন্ত দুঃখিত, মাদমোয়াজেল পারসেল। কিন্তু সরকার থেকে জোরালো নির্দেশ পেয়েছি, আমার কিছু করার ছিল না।'

'ইট'স ওকে, মসিয়ো অঁরি,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লুনা। 'কী করতে হবে, তা-ই বলুন।'

হ্রদের কিনারের পাহাড়সারি দেখাল অঁরি। 'ওরা আপনাকে ওখানে যেতে বলেছে।'

'গ্লেসিয়ারটাতে?' ভ্রূকুটি করল লুনা। 'আপনি শিয়োর?'

মাথা ঝাঁকাল অঁরি। 'আমিও অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু ওখানেই যেতে হবে আপনাকে। বরফের মধ্যে কী যেন পাওয়া গেছে, আমি এর বেশি কিছু জানি না। বোট অপেক্ষা করছে, আপনি এখুনি রওনা হয়ে যান।'

হতাশ ভঙ্গিতে রানার দিকে ফিরল লুনা। মুখ খুলবার চেষ্টা করতেই বাধা পেল। রানা বলল, 'নিশ্চিন্তে চলে যাও। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি ওই সমাধিতে যাচ্ছি না। এখানেই অপেক্ষা করব।'

'*মার্সি*, রানা,' রানাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল লুনা। ফিসফিসাল, 'লেফট্ ব্যাঙ্কে একটা ভাল রেস্টুরেন্ট আছে। ওখানে নিতে পারো আমাকে।'

রানার দৃষ্টিতে শূন্যতা ফুটল, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না।

হেসে উঠল লুনা। 'ডিনারের কথা ভুলে গেছ নাকি? নিমন্ত্রণটা আমি গ্রহণ করছি!'

'সমাধি পরিদর্শনের পর!' রানাও হাসল।

একটা পাওয়ার-বোট অপেক্ষা করছে শিপের অন্যপাশে, ল্যাডার বেয়ে ওটায় নেমে পড়ল লুনা। আউটবোর্ড মোটর গর্জে উঠল, যাত্রীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল তীরের উদ্দেশে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। লুনাকে ভাল লেগে গিয়েছিল, মেয়েটা হঠাৎ চলে যাওয়ায় কেমন যেন নিঃসঙ্গতা অনুভব করছে। অনুভব

করছে কৌতূহলও—কী এমন আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে গ্লেসিয়ারে, যার কারণে এত উত্তেজনা দেখা দিয়েছে? আনমনে মাথা নাড়ল। হাতে আপাতত কাজ নেই, লুনার সঙ্গে গেলে মন্দ হতো না। ওর সঙ্গ পাওয়া যেত, কৌতূহলটাও মিটত।

রানার জানা নেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ও টের পাবে, লুনা পারসেলের সঙ্গী না হয়ে ভালই করেছে।

ছয়

হ্রদের তীরে লুনাকে অভ্যর্থনা জানালেন ড. দ্যুঁবোয়া। গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ফিরে আসতে হয়েছে বলে মেয়েটার মেজাজ খারাপ, কিন্তু স্বভাবজাত ভঙ্গিতে ভদ্রলোক ওর মুড ভাল করে দিলেন। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল, ফিফির সিটে বসে খিলখিল করে হাসছে লুনা।

আইসফিল্ডের একটা পাশ লক্ষ্য করে ছুটছে সিত্রোঁ। ব্যাপারটা খেয়াল করে লুনা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা গ্লেসিয়ারে যাচ্ছি না?'

'গ্লেসিয়ারেই, তবে উপরে না, ওটার পেটের ভিতর,' বললেন দ্যুঁবোয়া। 'ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের আটশো ফুট গভীরে আমাদের অবজারভেটরি, ওখানে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

'অবজারভেটরি! কীসের?'

'ওখান থেকে আইস-মুভমেন্ট পর্যবেক্ষণ করছে আমাদের টিম। তিন বছরের প্রজেক্ট।'

'জানতাম না তো! খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, আরেকটু খুলে বলবেন?'

নিজেদের প্রজেক্ট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন দ্যুবোয়া। শুনতে শুনতে মগ্ন হয়ে গেল লুনা, মনের মধ্যে যা বিরক্তি ছিল, সব মিলিয়ে গেল।

'লেকে আপনারা কী করছেন?' অবজারভেটরির কথা শেষ করে জানতে চাইলেন দ্যুবোয়া। 'অবজারভেটরি থেকে বেরিয়ে একদিন দেখি, আপনারা হাজির। কেউ বলেনি আমাদেরকে আপনাদের আসার কথা।'

'আমি পেশায় আর্কিয়োলজিস্ট, ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির সহায়তা নিয়ে একটা এক্সপিডিশন করছি। ডরমেয়ার লেকের তলায় প্রাচীন অ্যাম্বার রুটের ট্রেডিং পোস্ট খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা।'

'তা হলে আপনার প্রজেক্টও তো কম ইন্টারেস্টিং নয়! কিছু পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আর সে-কারণেই সাইটে দ্রুত ফিরে যাওয়া দরকার আমার। দয়া করে বলবেন, কী কারণে আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে?'

'বরফের ভিতর আমরা একটা লাশ পেয়েছি।'

'লাশ?' লুনা ভুরু কোঁচকাল।

মাথা ঝাঁকালেন দ্যুবোয়া। 'আমাদের ধারণা, লাশটা একজন পুরুষের।'

'*আইসম্যান*-এর মত?'

এই আল্পস পর্বতমালাতেই কয়েক বছর আগে জমাট বাঁধা অবস্থায় নিয়োলিথিক যুগের এক শিকারীর দেহ পাওয়া গিয়েছিল। স্পেসিমেন-টাকে *আইসম্যান* বলে ডাকা হয়।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন দ্যুবোয়া। 'না। আমাদের

ধারণা, এই বেচারা আরও সাম্প্রতিক সময়কার। শুরুতে মনে হয়েছিল, ক্লাইম্বার। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে বরফের ফাটলে পড়ে গেছে। কিন্তু পরে ধারণাটা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছি।'

'কেন?'

'ওটা আপনাকে নিজ চোখে দেখতে হবে।'

বিরক্তি ফুটল লুনার মুখে। 'দয়া করে হেঁয়ালি করবেন না, ডক্টর। প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র আর বর্মের উপর বিশেষজ্ঞ আমি, লাশের উপর নই। কেন আমাকে এর মাঝখানে ডেকে এনেছেন?'

'মাফ করবেন, মাদমোয়াজেল। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। জায়গামত পৌঁছুনোর আগে মসিয়ো লেগ্রাঁ কিছু বলতে মানা করেছেন।'

লুনার চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'লেগ্রাঁ? অগাস্টিন লেগ্রাঁ? স্টেট আর্কিয়োলজিকাল বোর্ডের লেগ্রাঁ?'

'এক ও অদ্বিতীয়। আবিষ্কারটার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই উনি হাজির হয়েছেন এখানে সরকার থেকে ওঁকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ব্যাপারটা হ্যাণ্ডেল করবার জন্য। আপনি চেনেন ভদ্রলোককে?'

'জী, চিনি। খুব ভাল করেই চিনি।' বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে সিটে হেলান দিয়ে বসল লুনা। মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে। অগাস্টিন লেগ্রাঁর কথা শুনলে খিঁচড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

সরবোনে অ্যানথ্রোপলজির শিক্ষক ছিল লেগ্রাঁ, তখন থেকে তাকে চেনে লুনা। অত্যন্ত নিচু-মনের সুযোগসন্ধানী মানুষ। নারীলোভী... চোখে-মুখে লালসা। শিক্ষকতার চেয়ে রাজনীতি নিয়েই বেশি আগ্রহ ছিল তার। ওপরঅলাদেরকে খুশি করে এখন সর্বোচ্চ প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা—স্টেট আর্কিয়োলজিকাল বোর্ডের একটা বড়-সড় পদ বাগিয়ে নিয়েছে। অপব্যবহার করে চলেছে ক্ষমতার। লুনার উপর তার নজর রয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের

দিনগুলো থেকে, সুবিধে করতে পারেনি। এখন নতুন কৌশল খাটাচ্ছে। ওর বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট আটকে দিয়েছে সে, আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়েছে—ওর সঙ্গে বিছানায় গেলে সবগুলোর অনুমতি আদায় করে দেবে। জবাবে কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে বলেছে লুনা—বরং বুনো একটা পশুর সঙ্গে শোবে ও, লেগ্রাঁর সঙ্গে নয়। সেই থেকে দু'জনের মধ্যকার সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। ডরমেয়ার লেকের প্রজেক্টটাও আটকে যাচ্ছিল প্রায়; অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, লেগ্রাঁকে ডিঙিয়ে অনুমতি নিয়েছে লুনা।

ভাঙা সেতুর কাছে গাড়ি পার্ক করলেন দ্যুঁবোয়া। লুনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন টানেল এন্ট্রান্সের সামনে। ভিতরে ঢুকে রাবার বুট আর মাইনিং হেলমেট বিতরণ করলেন। এন্ট্রান্সে লাগানো ফোনের রিসিভার তুললেন ফরাসি বিজ্ঞানী, সঙ্গীদের জানিয়ে দিলেন ওদের পৌঁছুনোর খবর। একটু পর হাঁটতে শুরু করল দুজনে। ভেজা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল ওদের পায়ের আওয়াজ।

'মনে হচ্ছে যেন ভেজা বুট পরে হাঁটছি,' বলল লুনা।

'সাইকোলজিকাল এফেক্ট—প্রথম প্রথম এমন হয়,' হাসলেন দ্যুঁবোয়া। 'পা কিন্তু খটখটে শুকনো আপনার। কয়েকদিন এখানে কাটালে দেখবেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে চারপাশে তাকাচ্ছে লুনা। পাহাড় আর বরফের ভিতর দিয়ে এমন টানেল তৈরি করা যে চাট্টিখানি কথা নয়, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। দ্যুঁবোয়াকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকল, বিজ্ঞানীও খুশিমনে ওর কৌতূহল নিবৃত্ত করে চললেন।

কিছুদূর যেতেই একটা টানেলের দেয়ালে একটা ভারী ইস্পাতের দরজা দেখতে পেল লুনা। জানতে চাইল, 'দরজাটা কীসের?'

'আরেকটা টানেলে যাওয়া যায় ওখান দিয়ে। ওখানে একটা

হাইড্রলিক সিস্টেম আছে। বছরের শুরুতে পানির প্রবাহ দুর্বল থাকে, তখন ওই সিস্টেমের সাহায্যে পাম্প করে বাড়তি পানি ঢোকানো হয় টানেলে। এখন অবশ্য পানির প্রবাহ অনেক শক্তিশালী, তাই বন্ধ করে রাখা হয়েছে দরজা। ওটা খুললে এই টানেল তলিয়ে যাবে।'

'এখান দিয়ে পাওয়ার প্ল্যান্টে যাওয়া যায়?'

'সব টানেলই পাওয়ার প্ল্যান্টে গেছে, কিন্তু পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে পারবেন শুধু শুকনোগুলো দিয়ে। বাকিগুলো ব্যবহার হয় পানির প্রবাহের জন্য। গ্লেসিয়ারের তলা দিয়ে নদী গেছে, এই মৌসুমে স্রোত খুব জোরালো থাকে। আমরা সাধারণত এই সময়টাতে অবজারভেটরি বন্ধ রাখি, ঝুঁকি এড়াবার জন্য। কিন্তু এ-বছর বিভিন্ন ঝামেলায় ডাটা কালেকশনে বিঘ্ন ঘটেছে। তাই নির্ধারিত শিডিউলের বাইরেও আমাদের কাজ করতে হচ্ছে।'

'এখানে বাতাস আসে কীভাবে?'

'ল্যাব পেরিয়ে যদি এক কিলোমিটার এগোন, তা হলে বড় একটা ওপেনিং পাবেন—গ্লেসিয়ারের অন্যপ্রান্তে। মাইন এন্ট্রান্সের মত ব্যবহার করা হয় ওটা—মালামাল আনা হয়, বের করা হয়; বাতাসও আসে ওখান দিয়ে।'

ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল লুনা। 'আপনাদের প্রশংসা না করে পারছি না। এমন পরিবেশে কোনও ধরনের কাজই সহজ নয়।'

হাসলেন দ্যুঁবোয়া। 'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। জঘন্য পরিবেশ! মাঝে মাঝে যখন বাইরে বেরুই, তখন আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না। ভিতরে যখন থাকি, তখন আমরা বেশিরভাগ সময় ল্যাবেই কাটাই। ওখানে কম্পিউটার আছে, সেডিমেন্ট-ফিল্টারিঙের জন্য ভ্যাকুয়াম পাম্প আছে, এমনকী ওয়াক-ইন ফ্রিজারও আছে। না গলিয়েই আইস-স্যাম্পল নিয়ে কাজ করা যায়। দিনে আঠারো ঘণ্টা খাটি আমরা, বাকি সময়

ঘুমিয়ে কাটাই। বোরিং জীবন, নিঃসন্দেহে, তবে সময় ঠিকই পেরিয়ে যায়।'

আরও কিছুক্ষণ এগোনোর পর ল্যাবের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। লিভিং কোয়ার্টারের মত ল্যাবের ট্রেইলারগুলোও টানেলের গা কেটে বসানো হয়েছে। ওরা কাছে যেতেই প্রথম ট্রেইলারের দরজা খুলে গেল, একজন লম্বা, শুকনো মানুষ বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। অগাস্টিন লেগ্রাঁকে চিনতে পেরে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল লুনার। তে-কোনা মুখ, ছুঁচালো নাক, চওড়া কপাল লোকটার। মাথার চুল পাতলা, লাল-রঙা। চেহারাতেই ফুটে রয়েছে এক ধরনের শয়তানি।

এগিয়ে এসে হাত মেলাল লেগ্রাঁ। 'সুপ্রভাত, মাই ডিয়ার লুনা। কষ্ট করে এই অন্ধকার, ভেজা গুহায় এসেছ বলে ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, প্রফেসর,' নীরস গলায় বলল লুনা। 'দেখতে পাচ্ছি, পরিবেশটা আপনার আবাস হিসেবে খুবই মানানসই।'

ক্ষণিকের জন্য মেঘ জমল লেগ্রাঁর চেহারায়, খোঁচাটা বুঝতে পেরেছে। পোকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে, এমন অন্ধকার-আর্দ্র জায়গায় শুধু পোকামাকড়ই বাস করে। এক মুহূর্তের জন্য থমকাল সে, তারপর হাসল। লুনাকে আপাদমস্তক দেখল, যেন ভারী কাপড় ভেদ করে ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে। বলল, 'তুমি পাশে থাকলে সব পরিবেশই সমান।'

চরম বিতৃষ্ণা ফুটল লুনার চেহারায়। 'ফষ্টিনষ্টি বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসুন। কেন আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?'

'নিশ্চয়ই!' বলল লেগ্রাঁ। 'এসো দেখাচ্ছি।'

হাত ধরার চেষ্টা করল সে, কিন্তু সরে গেল লুনা। ড. দ্যুবোয়ার কনুইয়ের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'পথ দেখান।'

ফরাসি বিজ্ঞানী বিস্মিত হয়ে ওদের বাকযুদ্ধ দেখছিলেন, লুনা তার কাছে আশ্রয় নিতেই হেসে ফেললেন। বললেন, 'চলুন, প্রফেসর লেগ্রাঁ। আমরা পেছনে আছি।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল লেগ্রাঁ, তারপর হাঁটতে শুরু করল। দ্যুঁবোয়ার সঙ্গে তার পিছু নিল লুনা। কিছুদূর যেতেই একটা কাঠের সিঁড়ি দেখা গেল। ওটা ধরে বারো ফুট উচ্চতায় নতুন একটা টানেলে ঢুকল ওরা। এটার আকার ছোট, ডায়ামিটার মাত্র দশ ফুট। প্রবেশমুখ থেকে বিশ কদম সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে টানেলটা। ডানদিকের শাখায় ঢুকল ওরা। মেঝেতে একটা নালা রয়েছে এখানে, পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। দেয়াল কেটে বসানো হয়েছে একটা চারফুট ব্যাসের রাবার হোস।

'ওঅটর জেট,' লুনার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বললেন দ্যুঁবোয়া। 'ড্রেনেজের পানি সংগ্রহ করি আমরা, গরম করি, তারপর ওটাই আবার স্প্রে করে বরফ গলাই।'

'কেন?' জানতে চাইল লুনা।

'গবেষণার জন্য ছোট ছোট টানেল তৈরি করে গ্লেসিয়ারের বিভিন্ন অংশে যেতে হয় আমাদেরকে। কাটার চেয়ে বরফ গলানো সহজ। তবে খুব সতর্ক থাকতে হয়, এখানে বরফ খুবই দ্রুত জমাট বাঁধে কিনা! সারাক্ষণ ওঅটর জেট চালু রাখতে হয়, নইলে টানেল বন্ধ হয়ে যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের কবর হয়ে যেতে পারে।'

'বলেন কী!'

'আই অ্যাম সিরিয়াস। দৈনিক দু'তিন ফুট পর্যন্ত বরফ জমে এখানে।'

'মাই গড!'

একটা বরফ ঢালের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেল টানেল। সিঁড়ি লাগানো আছে, ওটা বেয়ে ছোট একটা গুহায় উঠে এল ওরা।

জায়গাটা বেশ ছোট, ঠেলাঠেলি করে দশ-বারোজনের বেশি আঁটবে না ওতে। দেয়াল আর ছাতে নীলচে বরফ, আর আছে নানা রকম ময়লা—গ্লেসিয়ারের মুভমেন্টের কারণে বাইরে থেকে এসে জমা হয়েছে।

'গ্লেসিয়ারের একেবারে তলা এটা,' বললেন দ্যুঁবোয়া। 'মাথার ওপর আটশো ফুট পর্যন্ত বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। আইস-ফ্লো'র সবচেয়ে নোংরা জায়গা। তবে ড্রিল করলে পরিষ্কার বরফ পাওয়া যায়।'

'হুম!' মাথা দোলাল লুনা।

ইতস্তত করলেন দ্যুঁবোয়া। 'মাফ করবেন, মাদমোয়াজেল, আমাকে এখন যেতে হবে। ল্যাবে জরুরি কাজ আছে।'

'নিশ্চয়ই। প্লিজ, যান।'

হাত মিলিয়ে চলে গেলেন বিজ্ঞানী। লুনার দৃষ্টি আটকে গেল গুহার প্রান্তদেশের দেয়ালে। রেইনকোট-পরা একজন মানুষ ওখানে হোসের সাহায্যে গরম পানি দিয়ে বরফ গলাচ্ছে, তাকে সাহায্য করছে আরও দুজন। বাষ্পে ভরে আছে গুহার অভ্যন্তর, শ্বাস নেয়া কষ্টকর। অতিথি দেখতে পেয়ে হোস বন্ধ করল লোকটা, এগিয়ে এল স্বাগত জানাতে।

'আমাদের ছোট্ট অবজারভেটরিতে স্বাগতম, মাদমোয়াজেল পারসেল!' হাসিমুখে বলল সে। 'আশা করি পথে কষ্ট হয়নি? আমি প্রফেসর স্টিভেন ক্যাসিডি, ড. দ্যুঁবোয়ার কলিগ।' দুই সঙ্গীকেও পরিচয় করিয়ে দিল। 'এ হলো জিমি হ্যানসন, আমার রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট, আর... মি. জেফ কলিন্স, *আউটসাইড* ম্যাগাজিনের জার্নালিস্ট, আমাদের প্রজেক্টের উপর ফিচার তৈরি করছেন।'

একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন করল লুনা। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল লেগ্রাঁ। ওখানে বরফের

ভিতর একটি মনুষ্য-আকৃতি আটকে আছে। কুশল-বিনিময় শেষ হতেই বলল, 'এদিকে এসো, লুনা। দেখো।'

এগিয়ে গেল লুনা। গাঢ় আকৃতিটার কিনারে আঙুল বোলাল। 'মনে হচ্ছে অনেকদিন আগেই জমে বরফ হয়ে গেছে লাশটা,' মন্তব্য করল ও।

'হ্যাঁ, আমার পরিচিত একটা মেয়ের মত,' বাঁকা সুরে বলল লেগ্রাঁ।

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল লুনা, মুখে কিছু বলল না।

'গুহাটা বড় করতে গিয়ে লাশটা খুঁজে পেয়েছি আমরা,' হ্যানসন বলল।

ভাল করে লাশটা দেখল লুনা। একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বরফের অবিশ্বাস্য চাপে, যেন একটা পোকাকে জুতোর তলায় মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতেই ক্যাসিডি বলল, 'মানুষ বলে যে বোঝা যাচ্ছে, তা-ই ঢের। গ্লেসিয়ারের তলায় লাখ লাখ টনের প্রেশার কাজ করে। লাশটা দলামোচা পাকিয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু ছিল না।'

মাথা ঘোরাল লুনা। 'কিন্তু এটা এত গভীরে এল কী করে?'

'শুরুতে নিশ্চয়ই গ্লেসিয়ারের উপরেই পড়ে ছিল,' ক্যাসিডি ব্যাখ্যা করল, 'কালের প্রবাহে নেমে এসেছে নীচে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রতিদিনই গ্লেসিয়ারের তলার বরফ ক্ষয় হতে থাকে, আর উপরে জমতে থাকে তুষারের পরত। উপর থেকে একেকটা স্তর নামতে থাকে নীচে।'

'এরকম একটা স্তরের আটশো ফুট নামতে কত সময় লাগে বলে আপনার ধারণা?'

'এই ধরুন, কমবেশি একশো বছর।'

'আর যদি লোকটা কোনও ফাটলের ভিতর পড়ে মারা যায়? তা হলে তো আরও দ্রুত নেমে আসবে নীচে, তাই না?'

'সেটাই ভেবেছিলাম আমরা প্রথমে। ওকে দুর্ভাগা এক ক্লাইম্বার ভেবেছিলাম। কিন্তু লাশটা ভাল করে দেখতেই ভুল ভেঙে গেল।'

'কী দেখেছেন?'

'নিজেই দেখুন, ওর পোশাক-আশাক মোটেই পর্বতারোহীর মত নয়।'

বরফের গায়ে প্রায় মুখ লাগিয়ে ফেলল লুনা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লাশটাকে। গাঢ় রঙের চামড়ার পোশাক ঢেকে রেখেছে দেহটাকে, পায়ে আছে বুট, মাথার টুপিটাও চামড়ার। জ্যাকেটের পশমি লাইনিং বেরিয়ে আছে এখানে-ওখানে, কোমরে ঝুলছে একটা হোলস্টার, তাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে। মুখের দিকে তাকাল লুনা, চেহারার খুঁটিনাটি বোঝার উপায় নেই, কিন্তু রোদে পোড়া ত্বকের রঙটা বোঝা যায় পরিষ্কার। চোখদুটো ঢেকে রেখেছে একজোড়া গগলস্। ঠিকই বলেছে ক্যাসিডি, পর্বতারোহী ছিল না মানুষটা।

'অবিশ্বাস্য!' রুদ্ধশ্বাসে বলল লুনা। তারপর সোজা হয়ে লেগ্রাঁর দিকে ফিরল। 'অদ্ভুত একটা আবিষ্কার, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার এখানে কী ভূমিকা, জানতে পারি?'

মুচকি হেসে দেয়ালের পাশে রাখা একটা প্লাস্টিক কন্টেইনারের দিকে এগিয়ে গেল লেগ্রাঁ, ভিতর থেকে বের করে আনল একটা স্টিলের হেলমেট। বলল, 'লাশের মাথার কাছে এটা পাওয়া গেছে।'

কৌতূহলের সঙ্গে শিরোস্ত্রাণটা হাতে নিল লুনা, ওটার গায়ের খোদাইগুলো স্টাডি করল। ভাইজর-টা অদ্ভুত, ঠিক যেন একটা মানুষের চেহারা। উপর দিকটা নকশা-কাটা, নানা রকম ফুল আর লতাপাতা পেঁচিয়ে ধরেছে পরস্পরকে, আর আছে একটা তিন-মাথা ঈগল, ওটাকে ঘিরে রেখেছে পৌরাণিক কয়েকটা

দানব। চিৎকার করার ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে পাখিটা, ধারালো থাবায় আঁকড়ে ধরে রেখেছে বর্শা আর তীরের একটা গোছা।

'প্রথমে হেলমেটটা পাই আমরা,' বলল হ্যানসন। 'তখুনি পাম্প বন্ধ করে দিয়েছিলাম, নইলে লাশটার ক্ষতি হতো।'

'ভাল করেছেন,' লেগ্রাঁ বলল। 'কোনও ধরনের কন্টামিনেশন হয়নি তাতে।'

শিরোস্ত্রাণের ডানপাশে একটা ফুটো লক্ষ করল লুনা, আঙুল বোলাল ওটার উপরে। 'মনে হচ্ছে বুলেটের আঘাত,' বলল ও।

'বুলেট?' ভুরু কোঁচকাল লেগ্রাঁ। 'বল্লম, বা বর্শা নয় কেন?'

'ওসবের আঘাত অন্যরকম হয়,' ব্যাখ্যা করল লুনা। 'ফুটোটা বড্ড পরিষ্কার, হাই-পাওয়ার অ্যামিউনিশন ছাড়া এমন ফুটো হওয়া সম্ভব নয়। জিনিসটা কত শক্ত, সেটা লক্ষ করেছেন? বরফের লাখ লাখ টন প্রেশারেও একটুও বাঁকা হয়নি। এ-জিনিস তীর-ধনুক, বা বর্শার আঘাতে ফুটো হবার কথা নয়। ভাল কথা, আপনারা কোনও ফরেনসিক এক্সপার্ট ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, ডেকেছি,' বলল লেগ্রাঁ। 'আগামীকাল পৌঁছুবে। না পৌঁছুলেও কিছু যায় আসে না। এটা যে একটা মানুষের লাশ, সেটা কনফার্ম করতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নেই। কাজের কথায় এসো। হেলমেটটা সম্পর্কে আর কী বলতে পারো তুমি?'

'দ্বিধার মধ্যে আছি,' স্বীকার করল লুনা। 'আকৃতিটা পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু নকশাগুলো আগে কোথাও দেখিনি। নির্মাতার কোনও চিহ্ন আছে কি না, খুঁজে দেখতে হবে। পেলে আমার ডেটাবেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আসলে... মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না ব্যাপারটার। লাশের পোশাক-আশাক বিংশ শতকের, ইউনিফর্ম আর গগলস্ বলছে—লোকটা এভিয়েটর। তা হলে ওর কাছে প্রাচীন হেলমেট এল কোত্থেকে?'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল লেগ্রাঁ। 'ধ্যাত্! ভেবেছিলাম

তুমি আরও বেশি কিছু বলতে পারবে।' হেলমেটটা ফিরিয়ে নিয়ে কন্টেইনারে ঢুকিয়ে ফেলল সে। পাশ থেকে একটা ইস্পাতের স্ট্রংবক্স তুলে ধরল।

'কী ওটা?' জানতে চাইল লুনা।

'লাশের পাশে পাওয়া গেছে,' লেগ্রাঁ বলল। 'তালা দেয়া, কিন্তু আশা করছি এটা খুললে লোকটার পরিচয় জানা যাবে। জবাব মিলবে আমাদের সমস্ত প্রশ্নেরও। তার আগে...' ক্যাসিডির দিকে ফিরল সে, 'আমি চাই আপনারা বরফ গলাতে থাকুন। লাশ আইডেন্টিফাই করবার মত আরও নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাসিডি। 'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে।'

'আমার তো আর কোনও কাজ আছে বলে মনে হচ্ছে না,' লুনা বলল। 'শিপে ফিরে যেতে পারি?'

'নো, মাই ডিয়ার,' কুটিল স্বরে বলল লেগ্রাঁ, 'আর কোনও আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাবে না, তা কে বলতে পারে? যতক্ষণ না শিয়োর হচ্ছি, ততক্ষণ তুমি এখানেই থাকছ।'

'আমি কোনও জামাকাপড় আনিনি!' প্রতিবাদ করল লুনা।

'প্রয়োজনে আনিয়ে নেয়া হবে। যাও এখন। জার্নি করে এসেছ, বিশ্রাম নাও।' ক্যাসিডির দিকে ফিরল লেগ্রাঁ। 'কাজ চালিয়ে যান।'

দুপুর পর্যন্ত বরফ গলাল বিজ্ঞানীরা, তবে লাশের আশপাশে নতুন কোনও জিনিস খুঁজে পেল না। শেষে খাওয়াদাওয়ার জন্য বিরতি নেয়া হলো। লাঞ্চ সেরে, আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে সবাই আবার ফিরে এল গুহায়। অবজারভেটরির লোকজন খেটে মরলেও অগাস্টিন লেগ্রাঁ ওদের মোটেই সাহায্য করল না, বরং ল্যাবে চলে গেল। লুনার আর বিশ্রাম নেয়া হলো না, ল্যাবে কিংবা লিভিং কোয়ার্টারে ফিরলে শয়তানটা চড়াও হয় কি না, এই ভয়ে

বিজ্ঞানীদের সঙ্গেই রইল ও। সাহায্য করল গরম পানির হোস অপারেট করতে।

দ্বিতীয় দফা কাজ শুরু করবার একটু পরেই শোনা গেল মানুষের কণ্ঠ। কলকাকলি করতে করতে কয়েক মুহূর্ত পরই তিনজন মানুষ নিয়ে গুহায় উদয় হলো লেগ্রাঁ। ওদের সবার হাতেই নোটবুক, ক্যামেরা কিংবা ক্যামকর্ডার দেখা যাচ্ছে। তালি বাজিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লেগ্রাঁ।

'কাজ থামান আপনারা,' বলল সে। 'মেহমান এসেছে।'

ঠেলাঠেলি করে দুজন নবাগত চলে গেল দেয়ালের সামনে, লাশের ছবি তুলতে শুরু করল। তৃতীয়জনকে ব্যাপারটায় খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না, দেয়ালের দিকে এগোল ঠিকই, কিন্তু দায়সারা ভঙ্গিতে। চোখের সামনে ক্যামেরাও তুলল খুব হেলাফেলায়।

মেহমানদের পরিচয় বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না লুনার, আস্তিন টেনে লেগ্রাঁকে একপাশে নিয়ে এল ও। বলল, 'কী হচ্ছে এসব? এই রিপোর্টাররা এখানে কী করছে?'

'আমিই আমন্ত্রণ জানিয়েছি ওদেরকে,' গর্বের সুরে বলল লেগ্রাঁ। 'এই বিশাল আবিষ্কারের কথা প্রচার করবার জন্য ওদের আনা হয়েছে এখানে।'

'কী যে আবিষ্কার করেছেন, সেটাই তো জানেন না আপনি! সাইটটা এখুনি কন্টামিনেট না করলে কি চলছিল না?'

'দেখো, মাতবরি ফলানোর জন্য আনিনি তোমাকে। যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে যেয়ো না।' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত দিয়ে লুনাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল লেগ্রাঁ। এগিয়ে গেল সাংবাদিকদের দিকে। 'জেন্টলমেন! সমাধি থেকে বের হবার পর আমি এই মমির বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেব।'

'হা যিশু!' বিড় বিড় করল কলিন্স। 'মমি! সমাধি!! লোকটা

তো এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কার করে বসেছে!'

প্রথম দুই সাংবাদিক ঝটপট ছবি তুলে নিল, তারপর বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। কিন্তু তৃতীয়জন তখুনি বেরুল না। ভীষণ লম্বা সে, অন্তত সাড়ে ছ'ফুট। শরীরটাও দশাসই। মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছে। গলায় ক্যামেরা, আর কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলছে, তারপরও তাকে দেখে ঠিক সাংবাদিক মনে হয় না। একদৃষ্টে জমাট বাঁধা লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গীদেরকে অনুসরণ করল।

লুনা তখন ক্যাসিডির সঙ্গে কথা বলছে।

'কন্টামিনেশনের কথা বলছিলেন,' ক্যাসিডি বলল। 'সত্যিই কি সম্ভাবনা আছে?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় বলল লুনা। 'আর্কিয়োলজিকাল সাইট মানেই নাজুক জায়গা। খুব সাবধানে কাজ করতে হয়

'হুম! গুহাটা খুব শীঘ্রি আবার বরফে ভরে যাবে। তাতে হয়তো রক্ষা পাবে এই আবিষ্কার।'

'ভাল। চলুন দেখি, গর্দভটা কী ঘটাচ্ছে।'

সিঁড়ি ধরে মেইন টানেলে ফিরে এল ওরা। লেগ্রাঁ আর সাংবাদিকদেরকে ল্যাবের সামনে খোলা জায়গায় পাওয়া গেল। লাশের কাছাকাছি পাওয়া নিদর্শনদুটো সঙ্গে নিয়ে এসেছে লেগ্রাঁ, প্রথমে স্ট্রংবক্সটা উঁচু করে দেখাচ্ছে সবাইকে, হেলমেট-সহ প্লাস্টিক কন্টেইনারটা পড়ে আছে পায়ের কাছে।

'কী আছে ওর ভিতরে?' জানতে চাইল এক সাংবাদিক।

'এখনও জানি না আমরা,' লেগ্রাঁ বলল। 'নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খুলতে হবে এটা, নইলে ভিতরের জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আশা করছি তখন আপনাদের কৌতূহল মেটাতে পারব।

আপাতত ছবি তুলে নিয়ে যান।'

পোজ দিয়ে দাঁড়াল সে, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে রেখেছে। অন্যরা ছবি তুলতে শুরু করল, কিন্তু বিশালদেহী ক্যামেরা তুলল না। সঙ্গীদেরকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোল সে, কে কী ভাবল, তার পরোয়া করছে না। একেবারে লেগ্রাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলল, 'বাক্সটা আমাকে দাও!'

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল লেগ্রাঁ, পরক্ষণেই ভাবল, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে লোকটা। হাসিমুখে বাক্সটা জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে। বলল, 'জীবন থাকতে দেব না।'

'তা-ই?' হিংস্র একটা হাসি ফুটল বিশালদেহীর ঠোঁটে। পরমুহূর্তে জ্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে আনল একটা পিস্তল, বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল লেগ্রাঁর মুঠির উপরে।

আর্তনাদ করে উঠল লেগ্রাঁ। আঙুল থেঁতলে গেছে তার, বাক্স ছেড়ে দিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে বসে পড়ল মেঝেতে। শান্ত ভঙ্গিতে স্ট্রংবক্সটা তুলে নিল বিশালদেহী, উল্টো ঘুরে পিস্তল তাক করল অন্যদের দিকে, ইশারায় সরে যেতে বলছে।

আতঙ্কিত ভঙ্গিতে পিছাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল দুই সাংবাদিক। বিজ্ঞানীরা হতভম্ব, কলিন্স আর লুনাও ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে। কারও দিকে আর তাকাল না বিশালদেহী, গটমট করে হেঁটে চলে গেল।

কয়েক মিনিট কারও মুখে কথা ফুটল না। তারপরই চেঁচিয়ে উঠল লেগ্রাঁ, 'থামাও ওকে!'

'টেলিফোন! টেলিফোন করুন!' বলে উঠল এক সাংবাদিক।

ল্যাবে ছুটে গেলেন দ্যুঁবোয়া, ফিরে এলেন একটু পরেই। মুখ কালো করে বললেন, 'ডেড! নিশ্চয়ই ফোনের লাইন কেটে দিয়েছে! লিভিং কোয়ার্টারেও কেউ নেই। আমাদেরকে এন্ট্রান্সে

গিয়ে সাহায্য চাইতে হবে।'

লেগ্রাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করল ক্যাসিডি আর হ্যানসন। ল্যাব থেকে ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এল লুনা, ভাঙা আঙুলের উপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। সাংবাদিকরা ততক্ষণে রহস্যময় লোকটার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। জানা গেল, দুজনের কেউই তাকে চেনে না। এয়ারপোর্টেই দেখেছে প্রথমবার। কাগজপত্র ঠিক ছিল, ওদের সঙ্গে একই ফ্লোটপ্লেনে চড়ে এসেছে, পথে কোনও কথা বলেনি। লেকের পাড় থেকে ড. দ্যুঁবোয়া নিয়ে এসেছেন ওদেরকে।

টানেল এন্ট্রান্সের দিকে রওনা হবার প্রস্তাব দিল ক্যাসিডি। লুনা আর ড. দ্যুঁবোয়া রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু রিপোর্টাররা যেতে চাইল না, ওরা এখানেই থাকবে। বোধহয় ভয় পাচ্ছে, অস্ত্রধারী লোকটা টানেলের কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। হ্যানসনকেও থাকতে বলল ক্যাসিডি, লেগ্রাঁর শুশ্রূষার জন্য। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এরপর ওরা তিনজন রওনা হলো।

কয়েক মিনিট নীরবে এগোল ওরা, কেউ কোনও কথা বলছে না। পরিবেশটা ভৌতিক, তিনটে হেডল্যাম্পের আলো বুদবুদের মত ঘিরে রেখেছে ওদেরকে, তার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি বিশালদেহী লোকটা ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে! তার পায়ের আওয়াজ শোনার জন্য কান পেতে থাকল ওরা, নিঃশব্দে হাঁটল, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। টানেলের দেয়াল আর ছাত চুইয়ে পড়তে থাকা পানির টুপটাপ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হলো না।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তিনজনে। সামনে কোথাও থেকে একটা চাপা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এসেছে। পরমুহূর্তে শকওয়েভের ধাক্কায় কেঁপে উঠল মেঝে। তাল হারিয়ে ভেজা টানেলে ধুপধাপ করে পড়ে গেল ওরা। কম্পন থেমে গেলে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে

দাঁড়াল, সবার শরীর ভিজে গেছে ততক্ষণে।

'ক্রাইস্ট!' শঙ্কিত গলায় বললেন দ্যুঁবোয়া। 'কী ছিল ওটা?'

'চলুন এগিয়ে দেখি,' প্রস্তাব দিল ক্যাসিডি।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে সে, এমন সময় চাবুকের মত সপাং করে উঠল লুনার কণ্ঠ। 'দাঁড়ান!'

থেমে গেল ক্যাসিডি। 'কেন, কী হয়েছে?'

মেঝের দিকে আঙুল তাক করে রেখেছে লুনা। 'দেখুন!'

ক্যাসিডি মাথা নামাতেই বহমান স্রোতধারার বুকে হেডল্যাম্পের আলো ঝিকমিকিয়ে উঠল।

'পানি!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

এবার ভেসে এল গুরুগম্ভীর জলপ্রপাতের আওয়াজ। টানেল ধরে ছুটে আসছে পানির উদ্দাম ঢেউ। চোখের পলকে গোড়ালির উপরে পৌঁছে গেল জলধারা। বাড়ছে দ্রুত।

'দৌড়ান!' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরুল দ্যুঁবোয়ার গলা দিয়ে।

উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল তিনজনে।

সাত

বিনকিউলার দিয়ে হ্রদের তীরে লুনাকে পৌঁছুতে দেখল রানা। একটু পর সিত্রোঁয় চড়ে গাছগাছালির আড়ালে হারিয়ে গেল মেয়েটা। রেলিঙে হেলান দিয়ে এবার ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের দিকে

তাকাল ও। দু'পাশে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, মাঝে বরফের বিস্তার... সবমিলিয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য। শুভ্র পটভূমিতে সূর্য প্রতিফলিত হচ্ছে, কিন্তু কোনও তাপ ছড়াতে পারছে না। গোটা এলাকায় হিমেল পরশ ছড়িয়ে চলেছে বরফের পিণ্ডটা।

লুনার থিয়োরি নিয়ে ভাবতে শুরু করল রানা। প্রাচীন ক্যারাভানগুলো যদি সত্যিই অ্যাম্বার রুটে চলাচল করত, তা হলে তাদেরকে নিঃসন্দেহে ডরমেয়ার লেকের পাশ ঘেঁষে যেতে হতো। নিজেকে সেই আমলের সওদাগরের জায়গায় ভাবল রানা, প্রকৃতির এই বিস্ময়—বিশাল বরফখণ্ড দেখে না জানি কেমন লাগত ওদের! নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের ক্ষমতার মহিমা ভেবে আপ্লুত হতো ওরা, একে পুজো করত। পানির তলার সমাধিটার কথা মনে পড়ল, এমন একটা জায়গায় ওটা তৈরি করার পিছনে নিশ্চয়ই গ্লেসিয়ারটার প্রতি অনুরাগের ভূমিকা ছিল। লুনার মত রানাও সমাধির ভিতরটা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ইচ্ছে হলো এখুনি চলে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটা খুব রেগে যাবে, কষ্টও পাবে নিশ্চয়ই। আর যা-ই করুক, লুনার মনে কষ্ট দিতে চায় না ও।

উপলব্ধিটা আসতেই হাসি পেল রানার। কে এই লুনা পারসেল? কেন ওকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? কম মেয়ে তো আসেনি ওর জীবনে, বুকে ঝড়ও তুলেছে অনেকে। শেষ পর্যন্ত কারও সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা হয়নি ওর। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না। সোহানা, মিত্রা সেন, ব্যারনেস লিনা অটারম্যান, রাফেলা বার্ড... কেউ কারও চেয়ে কম ছিল না; তবুও পিছিয়ে যেতে হয়েছে ওকে। ব্যতিক্রম ছিল শুধু রেবেকা সাউল। কিন্তু রেবেকার পরিণতিই রানাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও মেয়েকে নিজের সঙ্গে জড়াবার ঝুঁকি নেয়া চলে না ওর। তাতে শুধু কষ্টই বাড়বে। সেই থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে রানা। এখনও ঘনিষ্ঠ

হয় ও অনেকের, পেশার খাতিরে, মনের টানে... তবে সেসব সম্পর্কের স্থায়িত্ব নেই। মেয়েরাও বোঝে, ওকে কখনও বাঁধনে আটকানো যাবে না, একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওরাও সরে যায় নীরবে। এই লুনাও যাবে। অল্প কয়েকটা দিনের জন্য দু'জনের সম্পর্ক, সেটাকে গাঢ় করে লাভ নেই।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, যতই যুক্তি দেখাক, কিছুতেই লুনাকে ছাড়া সমাধিতে যেতে পারবে না ও, মনের সায় পাবে না। তাই কী আর করা, সময় কাটাবার জন্য জলপরীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবকিছু চেক করে রাখছে, লুনা ফিরলেই যেন সময় নষ্ট না করে ডাইভ দিতে পারে।

ব্যাটারি চেক করল, নতুন এয়ার ট্যাঙ্ক বসাল, প্রতিটা যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কেটে গেল অনেকটা সময়। শেষে যখন স্টারফিশের ডেকে ফিরে এল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

আশি ফুট দীর্ঘ *স্টারফিশ* নুমার সবচেয়ে ছোট রিসার্চ ভেসেলগুলোর একটা। নোনা, বা মিঠা... দু'ধরনের পানিতেই স্বচ্ছন্দে অপারেট করা যায় জাহাজটাকে। নিউ ইংল্যান্ড উপকূলের বিপজ্জনক পানিতে যে-সব জাহাজ চলাচল করে, তারই মডিফায়েড ভার্শান বলা চলে স্টারফিশকে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, দ্রুতগামী; শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিনের কল্যাণে ঘণ্টায় বিশ নট গতিতে ছুটতে পারে। অন্য কোনও জাহাজ হলে আঁকাবাঁকা নদীপথ পেরিয়ে লেক ডরমেয়ারে পৌঁছুতেই পারত না।

গ্যালিতে গিয়ে হালকা লাঞ্চ করল রানা, তারপর এক মগ কফি নিয়ে ঢুকল জাহাজের রিমোট-সেন্সিং ল্যাবে। নামেই ল্যাব, দেখা[illegible] অবজারভেশন পোস্টের মত। ছোট্ট একটা কেবিনের

মধ্যে অনেকগুলো কম্পিউটার মনিটর গায়ে গায়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মুখোমুখি রয়েছে একটা চেয়ার। তবে এই অনাকর্ষণীয় কামরাটাই ডরমেয়ার লেকের তলায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সফিসটিকেটেড সেন্সরের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র।

চেয়ার টেনে বসল রানা, কফিতে আয়েশ করে চুমুক দিল, তারপর চোখ বোলাল সাইড-স্ক্যান সোনার ডিসপ্লে-র রিপোর্টে। সাবমারসিবল নিয়ে লেকের পুরো তলদেশ সার্ভে করা সম্ভব নয়, তাই নানা রকম আণ্ডারওঅটর সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে হ্রদের তীরসংলগ্ন পানিতে—লুনার থিয়োরির সেই অ্যাম্বার রুটের চিহ্ন খুঁজে পাবার জন্য। বিশাল একটা এলাকা স্ক্যান করছে সেন্সরগুলো, সময় লাগছে প্রচুর। রোজ একগাদা স্ক্যান-রিপোর্ট জমে, সময় নিয়ে সেগুলো স্টাডি করতে হয় ওকে। একঘেয়ে কাজ। ডরমেয়ার লেকের তলদেশ একেবারেই সাদামাঠা, কোনও বৈচিত্র্য নেই। কফি শেষ হতেই ঘুম ঘুম ভাব ভর করল রানার চোখে।

হঠাৎ পিঠ খাড়া হয়ে গেল ওর। একটা বৈসাদৃশ্য দেখতে পেয়েছে রিপোর্টে। দ্রুত কয়েকটা বাটন টিপল কি-বোর্ডের; নির্দিষ্ট কো-অর্ডিনেটে তাক করল সেন্সর। স্ক্রিনে একটা অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে, মাউস নেড়ে জুম করল ইমেজটা। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

একটা বিমান ফুটে উঠেছে স্ক্রিনে, ককপিটটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। বাটন চেপে একটা প্রিন্টআউট বের করল রানা, আলোয় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। অনেক পুরনো ডিজাইনের বিমান, বিধ্বস্ত। একটা ডানা নেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, ক্যাপ্টেনকে ছবিটা দেখাবে। আর তখুনি দরজা খুলে হুড়মুড় করে ল্যাবে ঢুকল ফরাসি অবজারভার ফ্রাঁসোয়া অঁরি। সচরাচর একটা হাসি ফুটে থাকে তার মুখে, এখন সেটা অদৃশ্য। চেহারা

কালো হয়ে আছে, যেন কোনও দুর্যোগ ঘটেছে।

'মসিয়ো রানা, প্লিজ, এখুনি ব্রিজে আসুন।'

'কী হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'মাদমোয়াজেল পারসেল... উনি...'

'কী হয়েছে লুনার?'

ফরাসি ভাষায় হড়বড় করে অঁরি যা বলল, তার অর্ধেকও বুঝতে পারল না রানা। সময় নষ্ট করল না ও, লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল ব্রিজের দিকে। এক লাফে পেরুতে শুরু করল ল্যাডারের দু'তিনটে করে ধাপ।

পাইলটহাউসে পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার উলফকে, রেডিও-মাইক্রোফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। মাঝারি গড়নের মানুষ, কানাডায় জন্ম, মা ফরাসি ইমিগ্র্যান্ট। দক্ষ নাবিক, সেইসঙ্গে ফ্রেঞ্চ তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা, তাই এই এক্সপিডিশনের দায়িত্ব পেয়েছেন। রানাকে পাইলটহাউসে ঢুকতে দেখে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখলেন।

বললেন, 'দুঃসংবাদ, মি. রানা।'

'কী হয়েছে লুনার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পাওয়ার প্ল্যান্টের সুপারভাইজরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ও বলল, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'কী দুর্ঘটনা?'

'গ্লেসিয়ারের তলায় পানির প্রবাহ আনার জন্য টানেল নেটওয়ার্ক আছে... আর আছে একটা অবজারভেটরি—একদল বিজ্ঞানী ওখানে আইস-মুভমেন্ট নিয়ে গবেষণা করছেন। ওখানেই গিয়েছিলেন মিস পারসেল। সুপারভাইজর বলছে, আচমকা গোটা টানেল নেটওয়ার্ক পানিতে তলিয়ে গেছে।'

'অবজারভেটরির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে ওরা?'

'না, টেলিফোন লাইন কাজ করছে না।'

'তারমানে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না, অবজারভেটরির লোকজন মারা গেছে কি না। রাইট?'

'হ্যাঁ।'

আশার আলো দেখতে পেল রানা, কয়েক মুহূর্ত নিল কর্তব্য ঠিক করার জন্য। যখন মুখ খুলল, তখন আশ্চর্য এক পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর মধ্যে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে দৃঢ়প্রত্যয়।

'ক্যাপ্টেন,' বলল রানা, 'প্ল্যান্ট সুপারভাইজরকে বলুন, ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছি আমি। টানেল সিস্টেমের ডিটেইলড্ প্ল্যান যেন বের করে রাখে। একটা বোট নামাতে বলুন পানিতে, আমাকে তীরে নিয়ে যাবে।' এটুকু বলে থামল ও। হঠাৎ উপলব্ধি করেছে, শিপের ক্যাপ্টেনের উপর এভাবে হুকুমজারি করা শোভন নয়। লজ্জিত সুরে বলল, 'দুঃখিত, আমি আসলে অর্ডার দিতে চাইছি না। জাহাজটা আপনার। আমি স্রেফ অনুরোধ করছি।'

'অনুরোধ কেন, অর্ডারই করুন!' বললেন উলফ। 'এ-ধরনের সিচুয়েশনে কী করতে হবে, তার কিছুই জানি না আমি। আপনি নিশ্চিন্তে হুকুম দিতে থাকুন।'

'থ্যাঙ্কস্, ক্যাপ্টেন,' হাসল রানা। 'না, আপাতত আর কিছুর দরকার নেই।'

চেঁচিয়ে বোট নামাতে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর রেডিওতে যোগাযোগ করলেন প্ল্যান্ট সুপারভাইজরের সঙ্গে। কথা বলতে শুরু করলেন। পাইলট-হাউস থেকে বেরিয়ে এল রানা, পকেট থেকে বের করল সেলফোন। উদ্ধার-অভিযানে নামতে হবে ওকে, সেটা একা করতে পারবে না। যোগ্য একজন সহকারী দরকার... আর তেমন মানুষ একজনই আছে।

ববি মুরল্যাণ্ড—নুমায় ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। ইতিপূর্বে

এ-ধরনের বহু পরিস্থিতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেছে ওরা দুজনে। রানা জানে, ইমার্জেন্সি কিংবা রেসকিউ অপারেশনের ক্ষেত্রে ববি মুরল্যাণ্ডের সমকক্ষ আর কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওকে হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। এ-মুহূর্তে প্যারিসে আছে মুরল্যাণ্ড, ফরাসি মেরিন রিসার্চ এজেন্সি *ইফ্রেমার*-এর একটি সেমিনারে যোগ দিতে এসেছে। খুব দ্রুত এখানে চলে আসতে পারবে ও।

মুরল্যাণ্ডের নাম্বারে ডায়াল করল রানা, জবাব পেল সঙ্গে সঙ্গে।

'হ্যাল্লো, রানা! কী খবর?'

'তোমার প্যারিস ট্রিপের ইতি ঘটাতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, ববি। এখুনি তোমাকে ডরমেয়ার লেকে আসতে হবে।'

'হায়, হায়! এ কী দুঃসংবাদ শোনাচ্ছ! সুন্দরী এক ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। দুজনে প্যারিস-ভ্রমণ করেছি। তারপর এসেছি চামোয়াঁ মাউন্টেইনসে ওর প্রাইভেট রিসোর্টে। কতকিছু প্ল্যান করে রেখেছি, আর তুমি কিনা...'

'চামোয়াঁ মাউন্টেইনস্?' খুশি হলো রানা, ওটা মাত্র বিশ মাইল দূরে। 'গুড, খুব কাছেই আছ দেখছি! যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে এসো।'

'আরে... হয়েছে কী, সেটা তো বলবে!'

'তোমার আগ্রহ জাগাবার মত ব্যাপার। ওই ডিপ্লোম্যাটের কথা ভুলে যাও, এখানে আরেক সুন্দরী আটকা পড়েছে বরফে, তাকে উদ্ধার করতে হবে।' ঠাট্টা থামিয়ে এবার সিরিয়াস হলো রানা। 'ববি, তাড়াতাড়ি এসো। আই নিড ইউ।'

এবার ববিও বুঝতে পারল তাড়াটা। 'ঠিক আছে, দোস্ত। ধরে নাও, রওনা হয়ে গেছি আমি।'

লাইন কেটে দিয়ে শুভ্র গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা,

ওটাই ওর শত্রু। পাথরের মত নিশ্চল হয়ে আছে, মাপা দৃষ্টিতে বিচার করছে প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য, ঠিক করছে যুদ্ধকৌশল। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা সম্ভব কি না, সেটা নিয়ে ভাবছে না। ভাবছে শুধু লুনার মিষ্টি হাসির কথা। ওই হাসি আবার দেখতে হবে ওকে।

আট

পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে একটা মিনিট্রাক পাঠানো হয়েছে। বোট থেকে নেমে ওটায় চড়ে বসল রানা। ঊর্ধ্বশ্বাসে প্ল্যান্টের দিকে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার, কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ধূসর বিল্ডিংটার সামনে। মাঝারি গড়নের একজন মানুষ বেরিয়ে এল অভ্যর্থনা জানাতে। রানা ট্রাক থেকে নামতেই হাত মেলাল।

'ওয়েলকাম, মসিয়ো রানা। আমি ডমেনেক থিয়োখি—প্ল্যান্ট সুপারভাইজর। খুব ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। আমাকে জানানো হয়েছে, আপনি একজন রেসকিউ স্পেশালিস্ট।'

'নাইস টু মিট ইউ, মসিয়ো থিয়োখি,' দায়সারা ভঙ্গিতে পাল্টা করমর্দন করল রানা। 'দুঃখিত, কুশল বিনিময়ের সময় নেই, পরিস্থিতি খুলে বলুন আমাকে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। ভেতরে আসুন, ড্রয়িং দেখিয়ে সব বুঝিয়ে বলছি আপনাকে।'

'এই আপনাদের পাওয়ার-প্ল্যান্ট?' হাঁটতে হাঁটতে একটু

বিস্ময়ের সুরে বলল রানা। বিল্ডিংটার আকার আরও বড় হবে বলে আশা করেছিল।

'বাইরেটা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না,' থিয়োখি বলল, 'এটা স্রেফ একটা পোর্টাল বিল্ডিং—অফিস স্পেস আর লিভিং কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করি আমরা। মূল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্বতের ভিতরে।'

বিল্ডিঙে ঢুকল দু'জনে। চওড়া একটা করিডোর পেরুল, তারপর আরেকটা দরজা খুলল সুপারভাইজর। ওপাশে দেখা গেল বিশাল এক গুহা, চমৎকারভাবে আলোকিত।

'এই গুহা প্রাকৃতিক,' হাঁটতে হাঁটতে বলল থিয়োখি, 'টানেল নেটওয়ার্ক তৈরির সময় আমরা যদ্দূর পেরেছি, প্রাকৃতিক গুহা আর সুড়ঙ্গগুলোকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। তারপরও পাহাড় আর গ্লেসিয়ারের তলায় প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার টানেল খুঁড়তে হয়েছে আমাদের।'

'বলেন কী! সে তো চাট্টিখানি কথা নয়।' চমকে উঠল রানা।

'হ্যাঁ, বিশাল একটা অ্যাচিভমেন্ট নিঃসন্দেহে,' হাসল থিয়োখি। 'তবে কাজটা যতটা জটিল ভাবছেন, ততটা ছিল না। ইঞ্জিনিয়াররা বিশাল একটা টানেল-বোরিং মেশিন নিয়ে এসেছিল, ত্রিশ ফুট ডায়ামিটারের। ওটা দিয়ে সহজেই মাটি-পাথর খোঁড়া গেছে, বরফ তো আরও সোজা।'

গুহা পেরিয়ে একটা টানেল এন্ট্রান্সের কাছে রানাকে নিয়ে গেল সে। জায়গাটা মৌমাছির মত গুঞ্জনে ভরে আছে।

'জেনারেটরের আওয়াজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' থিয়োখি মাথা ঝাঁকাল। 'আপাতত একটা টারবাইন অপারেট করছি আমরা। আরেকটা বসানোর পরিকল্পনা চলছে।' টানেলের ভিতরে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'এই-ই আমাদের কন্ট্রোল রুম। ভেতরে আসুন।'

কামরাটা বর্গাকার, একেকটা দেয়াল পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ। তিনটে পাশ ভরে আছে নানা রকম যন্ত্রপাতি আর প্যানেলে—সবখানে লাল-নীল-সবুজ বাতি জ্বলছে, পরিমাপ দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় ডায়ালে। ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে একটা ঘোড়ার নাল আকৃতির কনসোল। চেয়ার টেনে ওটার পিছনে বসল থিয়োখি, আরেকটা চেয়ার ঠেলে দিল রানাকে বসার জন্য।

'প্ল্যান্টে কী করি আমরা, তা জানেন?' জিজ্ঞেস করল সুপারভাইজর।

'কিছুটা,' বসতে বসতে বলল রানা। 'বরফগলা পানির স্রোত ব্যবহার করে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি তৈরি করেন। তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল থিয়োখি। 'হ্যাঁ। প্রসেসটা জটিল কিছু নয়। প্রতি বছর তুষারপাত হয় এ-অঞ্চলে, গ্লেসিয়ারের উপরে জমে সেই তুষার। উষ্ণ ঋতুতে সেই বরফ গলে গিয়ে তৈরি হয় নানা রকম আইস-পকেট আর বরফ-নদী। টানেল সিস্টেমের মাধ্যমে ওই পানি আমরা টারবাইন পর্যন্ত আনি। পানির স্রোত টারবাইন ঘোরায়, তৈরি হয় জলবিদ্যুৎ।'

'প্রজেক্টটা তো বেশ বড় বলে মনে হলো,' রানা বলল। 'কতজন স্টাফ আছে আপনাদের?'

'মাত্র তিনজন,' উত্তর দিল থিয়োখি। 'তিন শিফটে ডিউটি করি আমরা। আসলে... পুরো প্রজেক্টই অটোমেটেড, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু। আমরা থাকি স্রেফ মনিটরিঙের জন্য।'

'সিস্টেমের ডায়াগ্রামটা দেখাতে পারেন আমাকে?'

'নিশ্চয়ই!' কি-বোর্ডের উপর নেচে বেড়াল থিয়োখির আঙুল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই নানা রঙের আঁকাবাঁকা রেখায় ভরা একটা ডায়াগ্রাম ভেসে উঠল সামনের স্ক্রিনে। দেখতে অনেকটা মেট্রোপলিটান ট্রাফিক কন্ট্রোলের ম্যাপের মত।

'নীল রঙের লাইনগুলো হচ্ছে পানিভর্তি টানেল,' বুঝিয়ে

দিল থিয়োখি। 'লাল রঙেরগুলো ড্রাই কনড্যুইট। টারবাইনটা... এখানে।' আঙুল তুলে দেখাল সে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডায়াগ্রামটা দেখল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'দুর্ঘটনা ঘটেছে কোন্ টানেলে?'

স্ক্রিনের একটা নীল রেখায় আঙুল ঠেকাল থিয়োখি। 'এটায়। অবজারভেটরির মেইন অ্যাকসেস টানেল।'

'পানির প্রবাহ বন্ধ করবার কোনও উপায় আছে?'

'সে-চেষ্টা আমরা করেছি, মসিয়ো রানা। আসলে... ওঅটর টানেল আর রিসার্চ টানেলের মাঝখানের দেয়ালে ব্রিচ দেখা দিয়েছে, পানি ঢুকেছে ওখান দিয়েই। পানির প্রবাহ অন্যান্য টানেলে ডাইভার্ট করে দিয়ে আমরা নতুন পানি ঢোকা বন্ধ করেছি, কিন্তু তার আগেই রিসার্চ টানেল তলিয়ে গেছে।'

'দেয়ালে ব্রিচ দেখা দিল কীভাবে, ধারণা করতে পারেন?'

'ওটাই রহস্য, মসিয়ো। দেয়ালটাতে একটা দরজা আছে দুই টানেলের সংযোগ ঘটানোর জন্য, কিন্তু বছরের এই সময়ে ওটা আমরা বন্ধ করে রাখি। পানির কয়েক টন প্রেশারেও ওটা ভাঙার কথা নয়।'

'হুম। রিসার্চ টানেল থেকে পানিটা বের করার উপায় কী?'

'আশপাশের কয়েকটা টানেল বন্ধ করে পাম্পের সাহায্যে পানি সেঁচা যায়। কিন্তু তাতে প্রচুর সময় লাগবে।' হতাশা ফুটল থিয়োখির কণ্ঠে।

'কী বলছেন!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'এতবড় নেটওঅর্ক আপনাদের, পানিটাকে অন্য কোনও টানেলে নিয়ে যেতে পারবেন না?'

'আসুন, দেখাচ্ছি আমাদের সমস্যাটা কোথায়।' কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল থিয়োখি। পাশের একটা টানেল ধরে রানাকে নিয়ে চলল সে। জেনারেটরের গুঞ্জন ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ

কানে বাজল ওদের—যেন ঝোড়ো বাতাস বইছে গাছগাছালির মধ্য দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে জোরালো হচ্ছে শব্দটা।

লোহার একটা মই বেয়ে মাঝারি এক অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে উঠে এল দুজনে। জায়গাটা ওঅটরটাইট প্লাস্টিক আর মেটাল ফ্রেমে ঘেরা। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। দেয়ালে লাগানো একটা সুইচ টিপল থিয়োখি, বড় বড় ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল প্ল্যাটফর্মের বাইরের দিকটা। বড় একটা টানেল দেখতে পেল রানা, ওখান দিয়ে প্রবল বেগে বইছে ফেনায়িত পানি—ফুঁসছে, গজরাচ্ছে, ছুঁতে চাইছে নিরাপদ উচ্চতায় বসানো প্ল্যাটফর্মটাকে। প্রকৃতির ভয়াবহ আক্রোশের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

'বছরের এই সময়ে বড় বড় আইস পকেট গলে বেরিয়ে আসে পানি,' গলা চড়িয়ে বলল থিয়োখি। 'স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে মিলে গিয়ে পাহাড়ি ঢলে পরিণত হয়। সমতল এলাকায় এই বাড়তি পানিই বন্যা ঘটায়। নিজের চোখেই দেখুন পরিস্থিতি। পানির এই বিশাল প্রবাহই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। রিসার্চ টানেলের পানি ড্রেইন করতে গেলে আবার নতুন করে পানি ঢুকে পড়বে ওখানে। আমি দুঃখিত।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই, যথেষ্ট করেছেন আপনি ইতিমধ্যে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'চলুন এখন, আমাকে রিসার্চ টানেলের ডিটেইলড্ ডায়াগ্রাম দেখান।'

'নিশ্চয়ই, আসুন।' ফিরতি পথে পা বাড়াল থিয়োখি। বাঙালি যুবকটিকে তার পছন্দ হয়েছে খুব। বিপদের মুহূর্তে শান্ত আর অবিচল থাকার অদ্ভুত একটা গুণ আছে মানুষটার মধ্যে, যা সচরাচর দেখা যায় না।

কন্ট্রোল রুমে ফিরে এল দুজনে। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল রানা, মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। খুব দ্রুত একটা

প্ল্যান খাড়া করতে হবে ওকে, নইলে লুনার কোনও আশা নেই। থিয়োখি তার কেবিনেট থেকে বেশ কয়েকটা ব্লু-প্রিন্ট বের করে বিছিয়ে ফেলেছে কনসোলের উপর, সেদিকে এগিয়ে গেল ও।

'এটা টানেলের মেইন এন্ট্রান্স,' নকশার উপর আঙুল বোলাল থিয়োখি। 'চারকোনা এই বক্সগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানীদের লিভিং কোয়ার্টার। লিভিং এরিয়া থেকে এক মাইল দূরে ওদের ল্যাব।' আরেকটা নকশা দেখাল সে। 'সাইড ভিউতে দেখুন, ল্যাবের ছাত পর্যন্ত একটা সিঁড়ি আছে, ওটা দিয়ে আরেকটা লেভেলে যাওয়া যায়। ওই লেভেল থেকে সাব-গ্লেশ্যাল অবজারভেটরিতে যাবার জন্য আলাদা প্যাসেজ আছে।'

নকশাগুলো মগজের ভিতর গেঁথে নিচ্ছে রানা। জানতে চাইল, 'কতজন আটকা পড়েছে ওখানে, বলতে পারেন?'

'বিজ্ঞানীরা আছেন তিনজন, মাত্র তিনদিন আগে ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, বেড়াতে এসেছিলেন। আপনাদের শিপ থেকে আসা ওই ভদ্রমহিলা আছেন, ফরাসি সরকারের একজন প্রতিনিধি আছেন। দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেক আগে একটা ফ্লোটপ্লেনে চড়ে কয়েকজন অতিথি এসেছিল বলে শুনেছি, তবে কতজন... তা বলতে পারব না। ফ্লোটপ্লেনটা একটু আগে টেকঅফ করে চলে গেছে, হতে পারে অতিথিরা সবাই ফিরে গেছে তাতে।'

ভাল করে ব্লু-প্রিন্ট দেখল রানা, তারপর মন্তব্য করল, 'অবজারভেটরিটার লোকেশন রিসার্চ টানেলের উপরে।'

'হ্যাঁ,' থিয়োখি মাথা ঝাঁকাল।

'তা হলে,' বলল রানা, 'টানেলের লোকজন যদি ওখানে পৌঁছুতে পারে, নিরাপদ আশ্রয় পাবে। রাইট? রিসার্চ টানেলে পানি ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছেন আপনারা, কাজেই অবজারভেটরিটা শুকনো থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।'

'গুড অবজার্ভেশন,' থিয়োখি বলল। 'কিন্তু আপনার মনে

রাখতে হবে, ওখানে অক্সিজেনের পরিমাণ সীমিত, তাজা বাতাস ঢুকছে না। চার-পাঁচজন মানুষ খুব বেশি সময় টিকতে পারবে না ওখানে। এতক্ষণে মরেই গেছে কি না কে জানে!'

আশঙ্কাটা রানার মাথাতেও উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু ও-নিয়ে ভাবতে চাইছে না। এখুনি নেতিবাচক চিন্তাকে ঠাঁই দিতে চায় না। নকশার দিকে মনোযোগ দিল ও। লক্ষ করল, মেইন টানেলটা অবজারভেটরি পেরিয়ে আরও কিছুদূর এগিয়েছে।

'কোথায় গেছে এটা?' রেখাটার উপর আঙুল রেখে জানতে চাইল রানা।

'দেড় কিলোমিটার দূরে, অন্যপাশের পাহাড় পর্যন্ত,' বলল থিয়োখি। 'উঁচু হয়ে বেরিয়ে এসেছে ওপাশের ঢালে।'

'মুখটা কত বড়?'

'মাইন এন্ট্রান্সের মত। ওখান দিয়ে ভিতরে মালামাল নেয়া হয়।'

'ওটা দেখতে চাই আমি,' বলল রানা। মাথার ভিতর একটা প্ল্যান উঁকি দিতে শুরু করেছে ওর। ভাগ্যের সহায়তা প্রয়োজন হবে, তবে একেবারে অসম্ভব মনে হচ্ছে না কাজটা।

'সব টানেল পানিতে ভরে আছে, ওখানে যাওয়া যাবে না। তবে আপনি চাইলে এপাশ থেকে দেখিয়ে দিতে পারি আমি।'

'চলুন।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাওয়ার প্ল্যান্টের পোর্টাল বিল্ডিঙের ছাদে বেরিয়ে এল ওরা। গ্লেসিয়ারের ওপাশে একটা গিরিখাদ দেখাল থিয়োখি। 'মুখটা ওই ছোট্ট উপত্যকার পাশে।'

রানা সেদিকে তাকাতেই কানে ভেসে এল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। একটু পর একটা হেলিকপ্টার উদয় হলো আকাশে, পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে এগিয়ে আসছে।

'থ্যাঙ্ক গড!' বলে উঠল থিয়োখি। 'সাহায্যের আবেদন

জানিয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গায়, মনে হচ্ছে তার জবাব দিতে আসছে কেউ।'

তাড়াহুড়ো করে নীচতলায় নেমে এল দুজনে, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। কয়েক মিনিট পরেই প্ল্যান্টের সামনের ফাঁকা জায়গায় ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার। তিনজন মানুষ বেরুল সেটা থেকে। রানার মুখ দিয়ে একটা হতাশাব্যঞ্জক আওয়াজ বেরুল। রেসকিউ পার্টি নয়, সুট-বুট পরা লোক, কর্পোরেট ব্যবসায়ীর চেহারা।

'আরে, এ দেখছি মসিয়ো ডুরান্ট!' নবাগতদের নেতাকে চিনতে পেরে বিস্মিত কণ্ঠে বলল থিয়োখি।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ইমিডিয়েট বস,' থিয়োখি বলল। 'উনি তো কখনোই আসেন না এখানে!'

'আসার মত কারণ ঘটেছে আজ,' শান্তগলায় বলল রানা।

ডুরান্টের চেহারা-সুরত ঠিক আগাথা ক্রিস্টির বিখ্যাত চরিত্র এরকুল পোয়ারোর মত। বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক... নাকের নীচে পাকানো গোঁফটাও ঝুলছে। ওদের সামনে এসে থামল সে। সৌজন্য প্রকাশের ধার ধারল না, কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে হচ্ছেটা কী, থিয়োখি?'

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল সুপারভাইজর, রানা তাকাল কবজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে। কাঁটাগুলো যেন দামাল ছেলের মত ঘুরছে, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত।

'হুম,' থিয়োখির কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকাল ডুরান্ট। 'এই ঘটনায় প্রোডাকশনের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে?'

'এক্সকিউজ মি,' নাক গলাল রানা। 'প্রোডাকশনের চেয়ে মানুষের উপর প্রভাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কি? ভিতরে বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছে।'

চেহারায় চরম বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল ডুরান্ট। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আবার কে?'

'ইনি মসিয়ো মাসুদ রানা,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল থিয়োখি। 'নুমা-র সঙ্গে আছেন। রেসকিউ স্পেশালিস্ট।'

'নুমা?' বিদ্রূপের সুরে বলল ডুরান্ট। 'এখানে আপনাদের কোনও কাজ নেই, রেসকিউ স্পেশালিস্টেরও অভাব নেই আমাদের। যান, নিজের চরকায় তেল দিন।'

'আপাতত এটাই আমার চরকা, মি. ডুরান্ট,' কোনোমতে রাগ দমিয়ে বলল রানা। 'ওই টানেলে আমার বান্ধবী আছে!'

'সমবেদনা রইল,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল ডুরান্ট। 'কিন্তু উপরমহলের নির্দেশ ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না। ওঁদের অনুমতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হবে, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'তাতে অনেক সময় লেগে যাবে,' বলল রানা। 'আমাদের এখুনি কিছু করা দরকার!'

'আমি নিরুপায়। দুঃখিত। থিয়োখি, চলো।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে বিল্ডিঙের ভিতরে ঢুকে গেল ডুরান্ট। সঙ্গীরা অনুসরণ করল তাকে। রানার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল থিয়োখি, তারপর সে-ও পিছু নিল বসের।

রাগে শরীর কাঁপছে রানার, ইচ্ছে করছে কলার ধরে বের করে আনে বজ্জাত ফরাসিটাকে, মনের সাধ মিটিয়ে উত্তম-মধ্যম দেয়। হয়তো তা-ই করত, বাধা পেল নতুন করে রোটরের আওয়াজ শুনে। আরেকটা হেলিকপ্টার উদয় হয়েছে আকাশে, প্রথমটার চেয়ে ছোট। পাওয়ার প্ল্যান্টের কাছে এসে থামল ওটা, ল্যাণ্ড করল ডুরান্টের কপ্টার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। পাইলট ছাড়া আর কোনও আরোহী নেই ওতে। ইঞ্জিন চালু রেখেই ওটা থেকে লাফিয়ে নামল মানুষটা।

ববি মুরল্যাণ্ড।

ছোটখাট মানুষ সে, বেঁটেই বলা চলে, তবে সৃষ্টিকর্তা উচ্চতার ঘাটতি পুরো করে দিয়েছেন শরীরভর্তি পেশি আর অমানুষিক শক্তি দিয়ে। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্বপুরুষেরা রোমান ছিলেন। নুমায় একসঙ্গে কাজ করার সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এখন পৃথিবীতে রানা তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আর বন্ধুর জন্য পারে না, এমন কোনও কাজ তার অভিধানে নেই। ছোট ছোট কদমে ছুটে এল মুরল্যাণ্ড, বরাবরের মত জাপটে ধরল রানাকে।

'হাই, দোস্ত!'

হাঁসফাঁস করে উঠল রানা। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি মুরল্যাণ্ডের, লম্বা ও চওড়ায় ছোটখাট একটা ভল্লুকের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাবে তার। এত জোরে রানাকে চাপ দিচ্ছে যে মনে হলো, হাড্ডিগুড্ডি ভেঙে যাবে এখুনি।

'আরে... ছাড়ো, ছাড়ো! মেরেই ফেলবে নাকি!'

'কীসের ছাড়াছাড়ি?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আদর করছি ভাবছ নাকি? এটা তোমার শাস্তি... অপরূপা এক মেয়ের বাহুডোর থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছ বলে।'

'কেন?' কোনোমতে বলল রানা। 'তোমার বান্ধবী খুব খেপেছে?'

বন্ধুকে ছেড়ে দিল মুরল্যাণ্ড। 'মোটেই না। সোফি নিজেও একজন পাবলিক সার্ভেন্ট। কাজেই যখন বললাম, দায়িত্বের ডাক পেয়েছি, ও খুব সহজভাবে নিল। সত্যি বলতে কী, কপ্টারও ও-ই ম্যানেজ করে দিয়েছে।'

'তা হলে আমি শাস্তি পেলাম কোন্ দোষে?' গা ডলছে রানা।

'শাস্তি কোথায়? এ তো স্রেফ নমুনা। এখানে যদি সোফির চেয়ে উত্তেজক অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান না পাই, তখন বুঝবে শাস্তি কাকে বলে। অবশ্য তোমার সঙ্গে জুটলে কখনোই হতাশ হতে হয় না, সেটাই সান্ত্বনা।'

হেসে ফেলল রানা। 'এসেছ বলে ধন্যবাদ, ববি।'

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই, তুমি ডাকলে আমি না এসে পারি? কী ঘটেছে এখানে?'

হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে রানা। বলল, 'এসো, যেতে যেতে বলছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে টেকঅফ করল মুরল্যাণ্ডের হেলিকপ্টার। বন্ধুকে সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বলল রানা। কথা শেষ হলে মুরল্যাণ্ড জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল।

'বিশ্রী ব্যাপার,' বলল সে। 'তোমার বান্ধবীর জন্য দুঃখিত, রানা। লুনা পারসেল... নামের মধ্যেই একটা সৌন্দর্য আছে। দেখা হলে মন্দ হতো না।'

'আশা করি সে-সৌভাগ্য তোমার হবে,' বলল রানা। কিন্তু জানে, প্রতি মুহূর্তে কমছে লুনাকে জীবিত উদ্ধার করার সম্ভাবনা।

গ্লেসিয়ার পেরিয়ে এল ওরা, থিয়োখির দেখিয়ে দেয়া উপত্যকাটায় মুরল্যাণ্ডকে ল্যাণ্ড করতে বলল রানা। সমতল একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে কপ্টার নামাল মুরল্যাণ্ড। ইমার্জেন্সি কিট থেকে একটা টর্চলাইট নিয়ে একটু পরেই মাটিতে পা রাখল দু'বন্ধু। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল টানেল এন্ট্রান্সের দিকে। এখানে শীতের প্রকোপ বেশি। ভারী কাপড় ভেদ করে

হাড়ে গিয়ে আঘাত হানছে ঠাণ্ডা বাতাস। ঠকঠক করে কাঁপছে ওরা, শীতে... এবং উত্তেজনায়।

এন্ট্রান্স খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। বিশাল বড় এক গহ্বর হাঁ করে আছে পর্বতের গায়ে, বাইরের অংশটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। প্রবেশমুখে পৌঁছে টর্চ জ্বালল রানা, আলো ফেলল ভিতরে। টানেলটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচে, পর্বতের গভীরে। খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, কারণ প্রবেশমুখে বিশ গজ পর থেকেই দেখা যাচ্ছে পানি। গোটা টানেল পানিতে ভরে আছে।

শিস দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'অন্ধকূপ বোধহয় একেই বলে,' বলল সে। রানার দিকে তাকাল। 'তোমার উর্বর মস্তিষ্কে কোনও আইডিয়া গজাচ্ছে?'

'অনেক আগেই গজিয়েছে,' বলল রানা। 'ওটা কাজে লাগানো যাবে কি না, সেটা দেখার জন্য এখানে এসেছি।'

'কী বুঝলে?'

'সম্ভব, তবে সাহায্য লাগবে। পাওয়ার প্ল্যান্টে চলো। ওদের হেলিকপ্টারটা দরকার। দেখি, কথা বলে রাজি করানো যায় কি না।'

'যদি বলো তো হাইজ্যাক করে আনতে পারি।'

ডুরান্টের রুক্ষ চেহারা ভেসে উঠল রানার চোখে। 'হয়তো তা-ই করতে হবে,' বলল ও।

পাওয়ার প্ল্যান্টের সামনে রানা আর মুরল্যাণ্ড ল্যাণ্ড করতেই শশব্যস্ত ভঙ্গিতে ছুটে এল ডুরান্ট। তার হাবভাবে আমূল পরিবর্তন এসেছে। হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'মাফ করবেন, মসিয়ো রানা, আমার আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি। আসলে... পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ, তা জানা ছিল না আমার...'

'এখন মনে হচ্ছে জানেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ইয়ে... হ্যাঁ। আমার ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছে। অ্যামেরিকান এম্বাসি থেকে অনুরোধ পেয়েছেন তিনি, তাই নুমা-কে সবরকম সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে।'

'শুনে খুশি হলাম,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল রানা। মনে মনে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে। স্টারফিশ থেকে রওনা হবার আগেই নুমা চিফকে দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে এসেছিল ও। তিনি সেই খবর শুনে কলকাঠি নেড়েছেন, ফ্রান্সের মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন পাওয়ার প্ল্যান্টের ডিরেক্টরের সঙ্গে। নইলে এই ত্যাঁদোড় লোকটা সিধে হতো না।

'একটা সুসংবাদও আছে, মসিয়ো,' রানাকে খুশি করতে চাইছে ডুরান্ট। 'ফুল-স্কেল রেসকিউ-র জন্য একটা টিম আসছে প্যারিস থেকে।'

'কতক্ষণ লাগবে ওদের পৌঁছুতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই ধরুন... তিন-চার ঘণ্টা।'

'ততক্ষণে টানেলের ওরা মারা যাবে, মি. ডুরান্ট।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডুরান্ট। 'অন্তত লাশগুলো উদ্ধার করতে পারব আমরা। দুঃখিত, এরচেয়ে বেশি কিছু করার নেই আমাদের।'

'আছে। আমরা ওদেরকে জীবিত বের করে আনব। কিন্তু সেজন্য আপনার সাহায্য দরকার।'

'কী বলছেন এসব!' অবাক হলো ডুরান্ট। 'ওরা বরফের আটশো ফুট গভীরে আটকা পড়ে আছে...' বলতে বলতে থেমে গেল সে। রানার মুখে দৃঢ়সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে, সেটা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। হার মানার ভঙ্গিতে সে বলল, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাক। বলুন কী চাই আপনার?'

'আপনার হেলিকপ্টার আর পাইলটকে ধার নিতে চাই

আমি।'

'শিয়োর! কিন্তু আপনাদের তো কপ্টার আছেই।'

'বড় হেলিকপ্টার দরকার আমার।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। মানুষগুলো বরফে আটকা পড়েছে, আকাশে নয়।'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই, হেলিকপ্টারটা দেবেন কি না বলুন!'

শ্রাগ করল ডুরান্ট। 'ঠিক আছে, আমি পাইলটকে বলে দিচ্ছি।' কপ্টারের দিকে চলে গেল সে।

ইতিমধ্যে রেডিও-তে স্টারফিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মুরল্যাণ্ড। পাওয়ার প্ল্যাণ্টে ফেরার পথে ওকে প্ল্যানটা খুলে বলেছে রানা, সেই মোতাবেক ক্যাপ্টেনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে ও। কথা শেষ করে রানার দিকে তাকাল। জানাল, 'স্টারফিশ স্ট্যাণ্ডবাই আছে, রানা।'

'গুড,' বলে গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। মস্ত এক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও, অথচ জানে না, যার জন্য এতকিছু, সে আদৌ বেঁচে আছে কি না।

নয়

বেঁচে আছে লুনা পারসেল। শুধু তা-ই নয়, এই মুহূর্তে ও রাগে ফুঁসছে। এই রাগ অগাস্টিন লেগ্রাঁর উপর। জীবনের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটার দ্বারপ্রান্ত থেকে ওকে ফিরে আসতে হয়েছে এই

লোকটার জন্য। সঙ্গীদের মরণও ডেকে এনেছে সে উচ্চাভিলাষী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

'গর্দভ কোথাকার!' শেষ পর্যন্ত লেগ্রাঁকে গাল দিয়ে বসল লুনা।

পিট পিট করে ওর দিকে তাকাল লেগ্রাঁ। 'কী বললে?'

'বলছি যে, তুমি একটা গর্দভ, অগাস্টিন!' রাগের চোটে সম্বোধন তুমি-তে নামিয়ে এনেছে লুনা। 'কষে তোমার দু'গালে দুটো চড় বসাতে পারলে মনে শান্তি পেতাম।'

ওর জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল লেগ্রাঁ। বুঝতে পারছে, মেয়েটা সত্যি সত্যি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মান-ইজ্জত আর অবশিষ্ট থাকবে না তাতে। তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা তুলল। বলল, 'প্লিজ, লুনা, আমি আহত!'

'নিজের দোষে!' যোগ করল লুনা। 'ছাগল কোথাকার, পিস্তলঅলা ওই বদমাশটাকে তো তুমিই টানেলে ঢুকতে দিয়েছ।'

'আমি তো ভেবেছি ও রিপোর্টার।'

'রিপোর্টারই বা তোমাকে আনতে বলেছিল কে?' চেঁচিয়ে উঠল লুনা।

'আ... আমি আসলে...' তোতলাচ্ছে লেগ্রাঁ।

'তুমি আসলে হাভাতে কুকুর। সাংবাদিক ডেকে হিরো সাজতে গিয়েছিলে, না? খ্যাতির নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিলে, মাথা কাজ করছিল না। করবে কী করে, মাথাভর্তি গোবর ছাড়া আর কী আছে তোমার? একটা টিকটিকির মাথাতেও তোমার চাইতে বেশি মগজ থাকে।'

'মাদমোয়াজেল, প্লিজ!' নাক গলালেন ড. দ্যুঁবোয়া। 'শান্ত থাকুন। যত চেঁচাবেন, তত দ্রুত অক্সিজেন খরচ হবে। নষ্ট করার মত বাতাস নেই এখানে।'

'অক্সিজেন বাঁচিয়ে লাভ কী, ডক্টর?' সরোষে বলল লুনা। 'বরফের আটশো ফুট গভীরে আটকা পড়েছি আমরা। কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাদের।'

হাতজোড় করার ভঙ্গি করলেন দ্যুঁবোয়া। 'তাও... প্লিজ, বাকিদের কথা ভাবুন।'

সঙ্গীদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আচমকাই রাগ পানি হয়ে গেল লুনার। বুঝতে পারছে, হৈচৈ করে খামোকাই পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলছে ও। বিব্রত হলো, বলল, 'দুঃখিত, আমি আসলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।'

কলিন্সের দিকে এগিয়ে গেল লুনা, প্লাস্টিকের একটা তারপুলিন বিছিয়ে মেঝের উপর বসে আছে রিপোর্টার, নোটবুক খুলে কী যেন লিখছে। তার গা ঘেঁষে বসল ও, বলল, 'অযাচিত ঘনিষ্ঠতায় বিরক্ত হবেন না, আমি আসলে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

হেসে ফেলল কলিন্স, নোটবুক সরিয়ে রেখে লুনাকে জড়িয়ে ধরল এক হাতে, দেহের উত্তাপ ভাগাভাগি করতে দিল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'এতক্ষণ যা গরম দেখালেন, ভাবিনি ঠাণ্ডা আপনাকে কাবু করতে পারে।'

লুনা লজ্জা পেল। 'সরি, খুব বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি, না?'

'আমি কিছু মনে করিনি,' বলল কলিন্স। লেগ্রাঁকে দেখাল ইশারায়। 'লোকটার এই ব্যবহার প্রাপ্য ছিল।'

'আরও খারাপ কিছু হওয়া দরকার ওর,' লুনা বলল। 'আমার কত বড় ক্ষতি করেছে, জানেন?'

'কী করেছে?'

'লাইফটাইম ডিসকভারি করতে যাচ্ছিলাম, সেখান থেকে ফিরিয়ে এনেছে আমাকে। কেন? বরফের তলায় মরার জন্য!'

চারপাশে নজর বোলাল কলিন্স। ভুল বলেনি লুনা, সত্যিই মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। রিসার্চ টানেল পানিতে ভরে যাবার আগেই অবজারভেটরিতে উঠে আসতে পেরেছে ওরা, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। টেলিফোন কাজ করছে না, সারফেসের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই। পাওয়ার সাপ্লাইও কাজ করছে না ঠিকমত। হিটিং সিস্টেম বন্ধ হয়ে গেছে, নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে বাতি, বায়ু-চলাচল নেই। ঠাণ্ডা এবং প্রায়ান্ধকার পরিবেশে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে আটজন মানুষ। এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

মৃত্যুচিন্তা থেকে মনকে দূরে রাখতে চাইল কলিন্স। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য লুনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের ডিসকভারির কথা বলছেন?'

'প্রাচীন একটা সমাধি খুঁজে পেয়েছি আমি ডরমেয়ার লেকের তলায়। আমার ধারণা, ওটার সঙ্গে প্রাচীন অ্যাম্বার রুটের সম্পর্ক আছে...' পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে নিজের স্বপ্নের প্রজেক্টের কথা বলতে শুরু করল লুনা।

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল কলিন্স।

'কোনও সমস্যা হচ্ছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল লুনা।

মলিন একটা হাসি ফুটল কলিন্সের ঠোঁটে। বলল, 'সমস্যার তো অন্ত নেই, মিস পারসেল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কী, জানেন? ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং স্টোরির সন্ধান পেয়েছি—স্যাবগ্লেশ্যাল অবজারভেটরি, বরফে জমে থাকা মমি, লেকের তলায় প্রাচীন সমাধি... কী নেই এতে! অথচ এই কাহিনি আমাকে কবরে নিয়ে যেতে হচ্ছে!'

ওদের কথা শুনছিল পাশে বসা দুই সাংবাদিক। একজন বলে উঠল, 'আরে মসিয়ো, এই দুঃখ কি কেবল আপনার?

আমরাও তো একই পথের পথিক।'

'ইশ্‌শ্‌, একটা ওঅটর জেট থাকলে আমরা টানেল খুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারতাম!' আফসোস করল কলিন্স।

'তাতে সময় লাগত তিন মাস!' ফোড়ন কাটল ক্যাসিডি। 'হিসেবটা আমি অনেকক্ষণ আগেই করে রেখেছি।'

'হিসেবটা কি উইকএণ্ড-সহ, নাকি উইকএণ্ড-ছাড়া?' রসিকতা করল কলিন্স।

দুঃসহ এই পরিস্থিতিতেও হেসে উঠল সবাই। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল বিপদের কথা। হাসল না কেবল লেগ্রাঁ, হাতের ব্যথায় জান বেরিয়ে যাচ্ছে তার, হাসাহাসিতে যোগ দেবার অবস্থায় নেই।

চকিতের জন্য রানার কথা মনে পড়ে গেল লুনার। কী করছে মানুষটা? দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর? রানা কি অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে মেনে নিয়েছে? নাকি ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে? ওকে যতটুকু চিনেছে লুনা, তাতে পরেরটা হবারই সম্ভাবনা বেশি। যদিও তাতে লাভ নেই, এই আঁধার পাতালেই লুনার শেষ শয্যা হতে যাচ্ছে। খারাপ লাগছে খুব, কখন যেন দুঃসাহসী বাঙালি যুবকটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও। আশ্চর্য লোকটার ব্যক্তিত্ব, কোমল-কঠোরে মেশানো হৃদয়টা নিষ্ঠুর সুন্দর! আর চোখ দুটো... সেখানে যেন জাদু আছে। তাকালেই হারিয়ে যেতে হয়—কী অদ্ভুত মায়া মণিদুটোতে, দেখলেই মনে হয় এই লোককে বিশ্বাস করে কখনও কারও ঠকতে হবে না। আবার ভয়ও লাগে, কেমন জানি একটা বেপরোয়া ভাব আছে চেহারায়, যেন চাইলেই ভয়ানক নির্মম হয়ে উঠতে পারবে। প্রিয় সেই মুখটি আর কখনও দেখতে পাবে না ভাবলেই বুক ফেটে যাচ্ছে।

বিষমাখা দৃষ্টিতে লেগ্রাঁর দিকে তাকাল লুনা। এই লোকটাই

সমস্ত নষ্টের গোড়া। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, নরকের এই কীটটার সঙ্গেই মরতে হচ্ছে ওকে। বাঁচার কোনও উপায় নেই। মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে আবার। মনোযোগ ফেরানোর জন্য তাকাল প্রাচীন শিরোস্ত্রাণের কন্টেইনারটার দিকে। অবজারভেটরিতে ওঠার সময় ওটা নিয়ে আসা হয়েছে। হাতের নাগালে পড়ে আছে কন্টেইনার, কাছে টেনে নিল লুনা, ভিতর থেকে বের করে আনল শিরোস্ত্রাণটা। আবছা আলোয় নেড়ে-চেড়ে দেখল।

চমৎকার জিনিস, দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া। নকশাগুলো স্রেফ কারুকাজ বলে মনে হলো না, তাতে ছন্দ আছে, যেন কোনও গূঢ় বক্তব্য লুকিয়ে আছে ওতে। সময় পেলে অর্থ বের করতে পারত ও, কিন্তু এখন আর তা হবার নয়। মাথা দপদপ করছে অক্সিজেন-স্বল্পতার কারণে। বিড়বিড় করে লেগ্রাঁকে অভিশাপ দিল লুনা। তারপর চেতনা হারাল।

জলপরীর রিয়ার ডেকে অনেকগুলো ওঅটরপ্রুফ ব্যাগ বেঁধেছে রানা, কাজ শেষ করে পিছিয়ে এল, তাকিয়ে দেখল অবস্থা। হাইটেক সাবমারসিবল বলে আর মনে হচ্ছে না ওটাকে, দেখাচ্ছে মালবাহী পশুর মত। করার কিছু নেই, বরফের তলায় ঠিক কতজন আটকে আছে, তা জানা নেই ওর, কাজেই হাতের কাছে যত স্কুবা ইকুইপমেন্ট পেয়েছে, সব নিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট সাবমারসিবলে এসব যন্ত্রপাতি নেবার জায়গা নেই, বাইরে বেঁধে নিতে হয়েছে। বাড়তি ওজনে জলপরীর ম্যানুভার বাধাগ্রস্ত হয় কি না, সেটা পানিতে না নামলে বোঝা যাবে না।

ফ্রাঁসোয়া অঁরির দিকে ফিরে ইশারা দিল রানা, সব ঠিক আছে। একটা হ্যাণ্ডহেল্ড রেডিও নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অঁরি, শিপ আর হেলিকপ্টারের মাঝে লিয়াঞ্জো এবং দোভাষী হিসেবে কাজ

করছে। রানার ইশারা পেয়ে রেডিওতে মেসেজ দিল সে, একটু পরেই পাওয়ার প্ল্যান্টের সামনে থেকে টেকঅফ করল বড় কপ্টারটা, উড়ে এল স্টারফিশের দিকে।

জাহাজের উপরে এসে থামল কপ্টার, হোভার করতে করতে কেইবল নামিয়ে দিল। ঘূর্ণায়মান রোটরের কারণে উদ্দাম বাতাস বইছে ডেকের উপর, মাথা নিচু করে এগোল রানা, কেইবলের প্রান্তে লাগানো হুক আঁকড়ে ধরে টানতে শুরু করল। নিরাপদ ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য একটা ট্রেইলারের মধ্যে ওঠানো হয়েছে জলপরীকে, ওটাতে লাগানো হয়েছে ফোর পয়েন্ট হারনেস সিস্টেম, হারনেসের লুপে কেইবলের হুক আটকে দিল ও।

সঙ্কেত পেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল কপ্টার, টানটান হয়ে গেল কেইবল। রোটরের কান-ফাটানো আওয়াজে মগজ পানি হয়ে যাবার জোগাড়। সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে খাটছে ইঞ্জিন, কিন্তু ডেক থেকে কয়েক ইঞ্চির বেশি উঠল না ট্রেইলার। লিফটিং ক্যাপাসিটির চেয়ে বেশি ওজন ওটার।

'পাইলটকে থামতে বলুন,' অঁরির কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাল রানা। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

জাহাজের স্ট্রাকচারের ভিতরে চলে এল ও। রেডিওতে যোগাযোগ করল মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে—অন্য কপ্টারটা নিয়ে সে নিরাপদ দূরত্বে হোভার করছে।

'সমস্যা দেখা দিয়েছে, ববি।'

'দেখেছি। আমাদের আসলে একটা স্কাই-ক্রেইন দরকার,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'তার বোধহয় দরকার হবে না,' রানা বলল। তারপর ব্যাখ্যা করল ওর পরিকল্পনা।

হেসে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ায় তোমার তুলনা নেই, দোস্ত।'

'কী মনে হয়, পারবে?'

'কঠিন, খুবই বিপজ্জনক... তবে ওসব না থাকলে জীবন পানসে হয়ে যেত। পারব, রানা।'

'ভালমত ভেবে দেখো...'

'আরে, তুমি আবার দ্বিধা জাগাতে চাইছ নাকি? বললাম তো পারব।'

মুরল্যাণ্ডের ফ্লাইং স্কিল নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে—হেলিকপ্টার, জেটপ্লেন আর টার্বোপ্রপ এয়ারক্র্যাফটে কয়েক হাজার ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা আছে তার। কিন্তু অযাচিত বিপদ কোন্‌দিক থেকে আসবে, সেটা কেউ বলতে পারে না। বাতাসের সামান্য ধাক্কা, কিংবা ইকুইপমেণ্ট ফেইলিওরে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বন্ধুকে এমন বিপদের মুখে ঠেলতে ইচ্ছে করছে না, পারলে নিজেই যেত। কিন্তু জানা কথা, মুরল্যাণ্ড কিছুতেই জায়গা অদলবদলে রাজি হবে না।

'আমি রেডি আছি, রানা,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে কাজে নেমে পড়ো।' বন্ধুর মনের কথা পড়তে পারছে সে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর অঁরিকে ডেকে বুঝিয়ে দিল ওর পরিকল্পনা। ফরাসি পাইলটের জন্য সেটা অনুবাদ করে শোনাল অঁরি। একটু পরেই সরতে শুরু করল বড় হেলিকপ্টার, হারনেসে বাঁধা কেইবলটা কোনাকুনি হয়ে গেল। জায়গা পেয়ে এগিয়ে এল মুরল্যাণ্ড, আরেকটা কেইবল নামাল ওর কপ্টার থেকে। সেটার হুকও ট্রেইলারের হারনেসে আটকে দিল রানা।

দুটো কেইবলের সাহায্যে এখন তোলা হবে লোড। ওজনের খানিকটা অংশ ভাগ করে নেবে মুরল্যাণ্ডের কপ্টার। শেষবারের মত দুই আকাশযানের পজিশন দেখে নিল রানা, তারপর রেডিওতে নির্দেশ দিল মুভ করবার জন্য।

সিনেমার স্লো-মোশনের মত ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়াল দুই

কপ্টার, একটু যুঝল ট্রেইলারের ওজন সামলাতে, তবে কোনও বিপদ ঘটল না। ধীরে ধীরে লেকের সারফেস থেকে কয়েকশো ফুট উপরে উঠে গেল ট্রেইলার, ওটাকে গ্লেসিয়ারের দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলল মুরল্যাণ্ড আর ফরাসি পাইলট। শ্বাসরুদ্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। একটু পরেই পাহাড়ি ঢালের আড়ালে চলে গেল ওরা।

ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছে মুরল্যাণ্ড। মাঝে মাঝে বিরতি নিচ্ছে কোর্স কারেকশনের জন্য। পনেরো মিনিট পর স্বভাবজাত ভঙ্গিতে রিপোর্ট করল, 'পাখি নীড়ে পৌঁছেছে। দমটা এবার ছাড়তে পারো, রানা।'

হাততালি দিয়ে উঠল স্টারফিশের ডেকে জড়ো হওয়া ক্রু-রা। রানার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে। অঁরির সঙ্গে হাত মেলাল ও, তারপর কয়েকজন ক্রু নিয়ে নেমে পড়ল অপেক্ষমাণ বোটে, রওনা হলো তীরের উদ্দেশে।

হ্রদের পাড় থেকে ওদেরকে হেলিকপ্টারে তুলে নিল মুরল্যাণ্ড আর ফরাসি পাইলট, নিয়ে গেল উপত্যকায়। ট্রেইলারটা দেখতে পেল রানা, একেবারে টানেল এন্ট্রান্সের মুখে ওটাকে নামাতে পেরেছে দুই বৈমানিক।

হেলিকপ্টার থেকে নেমেই ক্রু-দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। ট্রেইলারটা নিয়ে যাওয়া হলো টানেলের ভিতর, একেবারে পানির কিনারায়। ঢাকার পিছনে গোঁজ আটকানো হলো, ট্রেইলার যেন গড়িয়ে পানিতে পড়ে না যায়। ওদেরকে নামিয়ে দিয়েই প্ল্যান্ট সুপারভাইজর থিয়োখিকে নিয়ে এসেছে মুরল্যাণ্ড। অভিযান শুরু করার আগে তার সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনায় বসল রানা।

নতুন কয়েকটা ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে এসেছে থিয়োখি। চ্যাপ্টা

একটা পাথরের উপর বিছিয়ে রাখল ওগুলো। বলল, 'লুক অ্যাট দিজ, মসিয়ে রানা। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, টানেলের এ-প্রান্তের কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। কেভ-ইন ঠেকানোর জন্য অ্যালুমিনিয়ামের সাপোর্ট কলাম বসানো হয়েছে ভিতরে। সাবমারসিবল নিয়ে ঢুকতে হলে ওগুলো কেটে ঢুকতে হবে আপনাকে।'

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কতগুলো কলাম? কোথায়?'

'টানেল এন্ট্রান্স থেকে আড়াইশো গজ দূরে। পাশাপাশি তিনটে করে মোট বারোটা সারি।'

'কলামগুলোর মধ্যে ফাঁক কতটুকু?'

'সিমেট্রিক্যালভাবে বসানো হয়েছে কলামগুলো, প্রতিটার সঙ্গে প্রতিটার দূরত্ব দশ ফুট।'

'আমাদের সাবমারসিবল মাত্র আটফুট চওড়া। কলামগুলোর মাঝ দিয়ে চলে যেতে পারব।'

'তা হলে মাত্র দু'ফুট সিকিউরিটি মার্জিন থাকছে আপনাদের। একটু এদিক-সেদিক হলেই কলামের সঙ্গে বাড়ি খাবেন।'

মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কী মনে হয় তোমার?'

'ওভাবে যাওয়া রিস্কি,' স্বীকার করল মুরল্যাণ্ড। 'কলাম কেটে এগোতে পারি না? আমাদের সঙ্গে আণ্ডারওঅটর কাটিং টর্চ আছে, প্রতি সারিতে একটা কলাম কাটলেই ডাবল জায়গা পাবো প্যাসেজের জন্য।'

থিয়োখির দিকে ফিরল আবার রানা। 'সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকাল প্ল্যান্ট সুপারভাইজর। 'হ্যাঁ, তবে এক লাইনে সবগুলো কলাম কাটতে পারবেন না। তা হলে ছাতের স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। আঁকাবাঁকা রেখায় কাটতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে এগোতেও হবে আঁকাবাঁকা পথে,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'মনে হচ্ছে সাবমারসিবল নিয়ে খেলা দেখাতে হবে, দোস্ত।'

'কে দেখাবে?' ভুরু নাচাল রানা। 'তুমি, না আমি?'

'ট্রান্সপোর্টেশনের দায়িত্বটা এতক্ষণ আমিই সামলেছি,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'এবারও নাহয় সামলাই। জলকেলিতে তুমিই যাও।'

'কিন্তু জলপরীকে চালানোর প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা শুধু আমার আছে।'

'আর আমার আছে ওটাকে বানানোর অভিজ্ঞতা। ওটার প্রতিটা নাটবল্টু চেনা আছে আমার। কাজেই আমার কাছে তুমি নস্যি।'

কথাটা সত্যি। জলপরীকে তৈরির প্রজেক্টে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল মুরল্যাণ্ড। তাই আর আপত্তি করল না রানা। বলল, 'বেশ, তা হলে কলাম কাটার দায়িত্ব আমার কাঁধে থাকছে। চলো কাজে নেমে পড়ি।'

সাবমারসিবলের কেবিনেট থেকে একটা ইনসুলেটেড ওয়ান-পিস ড্রাই সুট বের করে আনল মুরল্যাণ্ড, জিনিসটা চরম শীতল পানির ডুবুরিদের জন্য উপযোগী। রানাকে ওটা পরতে সাহায্য করল সে।

পাশে দাঁড়িয়ে থিয়োখি ইতস্তত করে বলল, 'মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনারা। টানেলটা এমনিতেই স্টেবল নয়, তার ওপর এখন পানিতে ভরে আছে। ফ্লাডিঙের ফলে কাঠামোর কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা বোঝার উপায় নেই।'

'রিল্যাক্স, মসিয়ো,' বলল রানা। 'আমরা খুব সাবধানে এগোব।'

'যাদের জন্য এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন, তারা হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে।'

'আমি এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল থিয়োখি। তারপর বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ওই ভদ্রমহিলাকে খুব ভালবাসেন। নইলে এমন ঝুঁকি...'

'সব মানুষকেই আমি ভালবাসি, মসিয়ো থিয়োখি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ভিতরে আমার বান্ধবী না থাকলেও আমাকে এখানেই পেতেন।'

ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো প্ল্যান্ট সুপারভাইজর। আর কিছু না বলে এক পা পিছিয়ে গেল সে।

ড্রাই-সুট পরা শেষ হয়েছে রানার। এবার মাথায় পরল একটা হেলমেট, ওটার ভিতরে আণ্ডারওঅটর অ্যাকুস্টিক ট্রানসিভার বসানো আছে। ওকে এয়ার-ট্যাঙ্ক আর ওয়েট-বেল্ট পরিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড, তারপর সাহায্য করল জলপরীর পিঠে চড়ে বসতে। এরপর সাবমারসিবলের স্বচ্ছ ককপিটে ঢুকে পড়ল সে।

'রেডিও চেক।' হেলমেটের ট্রানসিভারে মুরল্যাণ্ডের কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'হাউ ডু ইউ রিড মি?'

'লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে আমার পাশেই বসে আছ তুমি।'

'শুনে খুশি হলাম। ঠাণ্ডা পানিতে নাকানি-চোবানি খাবার সময় নিজেকে আর নিঃসঙ্গ মনে হবে না তোমার।'

'ফাজলামি রেখে এগোতে শুরু করো, ববি,' সিরিয়াস হলো রানা। 'হাতে সময় নেই।'

'আই, আই, ক্যাপ্টেন!' নাবিকদের সুরে বলে উঠল মুরল্যাণ্ড, তারপর আঙুল তুলে সঙ্কেত দিল ক্রু-দেরকে।

সমস্ত বাঁধন খুলে দেয়া হলো, পিছলে ট্রেইলার থেকে বেরিয়ে এল জলপরী, ঝপাস করে আছড়ে পড়ল পানিতে। সেফটি লাইন দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছে রানা, নইলে ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যেত সাবমারসিবলের পিঠ থেকে।

'তুমি ঠিক আছ, রানা?' রেডিওতে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ। এগোও।'

থ্রাস্টার চালু করল মুরল্যাণ্ড, ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল জলপরী। ব্যালাস্ট অপারেট করে একই সঙ্গে ওটাকে পানির নীচে নিয়ে যাচ্ছে সে। ড্রাই সুট পরে থাকার পরও সারা শরীর কেঁপে উঠল রানার, পানি অবিশ্বাস্য ঠাণ্ডা। পোশাকের ইনসুলেটেড প্রলেপ ভেদ করে হামলা চালাচ্ছে গায়ের চামড়ায়।

কিছুদূর যেতেই নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। জলপরীর সামনে লাগানো হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বালল মুরল্যাণ্ড। আলোকিত হয়ে উঠল সামনেটা, তবে খুব বেশি নয়। আলোর স্পর্শ পেয়ে পানির রঙ যেন বদলে গেল। পরিবেশটা অদ্ভুত।

'মনে হচ্ছে যেন বালতি-ভর্তি চকলেট সিরাপে ডাইভ দিচ্ছি,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'আমি আরেকটু কাব্যিক ঢঙে চিন্তা করছি,' হালকা গলায় বলল রানা। 'নরক অভিমুখে যাত্রা... শুনতে কেমন লাগছে?'

'বেমানান। নরক তো আগুন আর তাপে ভরা। এখানে ঠিক উল্টো পরিবেশ বিরাজ করছে। যাক গে, চোখ-কান খোলা রাখো। কলামগুলো দেখতে পেলে জানিয়ো।'

একটু উঁচু হয়ে ককপিটের উপর দিয়ে উঁকি দিল রানা। প্রায়ান্ধকার টানেলে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও। আবছায়া পরিবেশটা চোখে সয়ে আসতেই দূরে ধাতব কাঠামো ভেসে উঠল।

ককপিটের গায়ে টোকা দিল রানা। 'স্লো ডাউন, ববি। প্রথম সারিটা দেখতে পাচ্ছি।'

গতি কমাল মুরল্যাণ্ড। ধীরে ধীরে কলামের সারির কয়েক গজ দূরে পৌঁছে থামিয়ে ফেলল জলপরীকে। কাটিং টর্চ আর এয়ার ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে গেল রানা। কাটতে শুরু করল

মাঝখানের কলাম। বেশি সময় লাগল না, কাটিং টর্চের প্রচণ্ড উত্তাপে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ধাতব দণ্ডটা। উল্টো ঘুরে মুরল্যাণ্ডকে এগোতে ইশারা করল রানা। এয়ারপোর্ট ওয়ার্কার যেভাবে বিমানকে গাইড করে, ঠিক সেভাবে জলপরীকে গাইড করল ও। পার করে নিয়ে এল প্রথম সারিটা। এরপর দ্বিতীয় সারির ডানের কলাম কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি করে চলল ওরা, কোনও বিপত্তি ঘটল না। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কলামের বারোটা সারি পেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো জলপরী। সাবমারসিবলের পিঠে আবার উঠে পড়ল রানা, টানেলের গভীরে কোর্স সেট করল মুরল্যাণ্ড। থ্রাস্টার গর্জে উঠল, ছুটে চলল সাবমারসিবল।

খুব শীঘ্রি লুনার দেখা পাবে, ভাবল রানা। কিন্তু ওকে জীবিত পাবে, না মৃত?

দশ

স্বপ্ন দেখছে লুনা—রানার সঙ্গে প্যারিসের এক নামকরা রেস্টুরেন্টে ডিনার করছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আইফেল টাওয়ার। তার পিছনে মস্ত থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ ভেসে আছে আকাশে। চমৎকার পরিবেশ, কিন্তু হঠাৎ বেরসিকের মত রানা বলে উঠল, 'জেগে ওঠো, লুনা!'

'জেগে ওঠো মানে? আমি কি ঘুমাচ্ছি নাকি?' বলতে চাইল

লুনা, কিন্তু পারল না।

'জাগো, লুনা!' আবার বলল রানা।

পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? এভাবে বিরক্ত করছে কেন ওকে?

হঠাৎ সামনে এগিয়ে এল রানা, হাত বাড়িয়ে চাপড় দিতে শুরু করল ওর গালে। 'লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠো বলছি!'

'থামো!' রেগে-মেগে চেঁচিয়ে উঠল লুনা। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ঘুমটা।

'দ্যাটস্ বেটার।' কানের কাছে শোনা গেল রানার কণ্ঠ। স্বপ্নে নয়, বাস্তবে।

চোখ খুলল লুনা, দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেল টর্চের আলোয়। সেটা সয়ে আসতেই রানার ভেজা মুখ দেখতে পেল সামনে, ওর উপর ঝুঁকে রয়েছে। দু'চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। দৃষ্টিবিভ্রম? প্লাস্টিকের একটা স্কুবা রেগুলেটর গুঁজে দিল রানা ওর মুখে। পরমুহূর্তে ফুসফুসে তাজা বাতাসের স্পর্শ পেল লুনা। কেটে যেতে শুরু করল ঘোর ঘোর ভাবটা। এতক্ষণে বুঝতে পারল, চোখের ভুল নয়, সত্যিই রানা হাঁটু গেড়ে বসে আছে ওর পাশে। গায়ে একটা কমলা রঙের ডুবুরির পোশাক, মাথা থেকে হেলমেট খুলে নামিয়ে রেখেছে মেঝেতে।

'একটু জেগে থাকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বিস্ময়ে বাকশক্তি হারিয়েছে লুনা, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, মাথা ঝাঁকাল শুধু।

'ঘুমিয়ে পোড়ো না,' বলল রানা। 'আমি এখুনি আসছি।'

ওকে ফ্ল্যাশলাইট হাতে একটা গর্তে নেমে যেতে দেখল লুনা, কানে ভেসে এল পানির ছলাৎছল। গর্তের বাইরে একটা আণ্ডারওঅটর কাটিং টর্চ আর এয়ারট্যাঙ্ক দেখল ও, রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অবজারভেটরির মেঝে ফুটো

করে রিসার্চ টানেল থেকে উঠে এসেছে রানা। কিন্তু রিসার্চ টানেল পর্যন্তই বা পৌঁছুল কী করে?

চারপাশে নজর বোলাল লুনা। ওর সঙ্গীসাথীরাও রানাকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মেঝের গর্তের দিকে।

একটু পরেই আবার উঠে এল রানা। হাতে একটা দড়ি ধরে রেখেছে। গর্তের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে টানতে শুরু করল ওটা। দড়িতে বাঁধা প্লাস্টিক ব্যাগগুলো উঠে আসছে একে একে। সবগুলো তোলা হলে ভিতর থেকে স্কুবা গিয়ার বের করে নিল ও। অবজারভেটরির সবার মধ্যে এয়ার ট্যাঙ্ক আর রেগুলেটর বিতরণ করল। একটু পরেই দেখা গেল, সুস্থ হয়ে উঠছে মানুষগুলো।

সংবিৎ ফিরে পেয়েছে লুনা। মুখ থেকে রেগুলেটর সরিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, 'রানা... তুমি এখানে? কীভাবে?'

ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। হাসিমুখে বলল, 'ভেবেছ, সামান্য পানি আমাদের ডিনার-ডেটের পথে বাধা হতে পারবে?'

'ধ্যাত্! হেঁয়ালি কোরো না তো!'

'গল্প করার সময় নেই,' বলল রানা। 'এয়ার ট্যাঙ্কে বাতাসের পরিমাণ সীমিত। এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো থেকে ড্রাইসুট আর হেলমেট বের করল দু'জনে, সবাইকে দিল এক সেট করে। ডাইভিং জানে ক্যাসিডি আর কলিন্স, ওদের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলো না, বরং বাকিদেরকে স্কুবা গিয়ারে সজ্জিত হতে সাহায্য করল।

দলটা রেডি হতেই ছোট্ট একটা ভাষণ দিল রানা, বুঝিয়ে দিল কী করতে চাইছে।

'নীচে একটা সাবমারসিবল আছে,' বলল ও। 'আপনারা

সবাই ওটার শরীর আঁকড়ে ঝুলে থাকবেন, আর কিছু না। সাবমারসিবল আপনাদেরকে টানেলের বাইরে নিয়ে যাবে। একটাই পরামর্শ আমার—ভয় পাবেন না, উত্তেজিত হবেন না। এয়ার-ট্যাঙ্ক থেকে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেবেন। কারও কোনও সমস্যা হলে আমাকে হাত তুলে সঙ্কেত দেবেন, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'গুড, তা হলে ফলো করুন আমাকে।'

রানার পিছু নিয়ে সবার আগে নামল লেগ্রাঁ। একটা হাত অকেজো তার। সাবমারসিবলের ককপিটে একটা সিট খালি আছে, ওখানে বসাতে পারলে সবচেয়ে ভাল হতো। কিন্তু পানির নীচে হ্যাচ খোলা যাবে না, জলপরীকে ভাসিয়ে তোলার মত কোনও জায়গাও নেই। অগত্যা সাবমারসিবলের পিঠে তাকে সেফটি লাইন দিয়ে বেঁধে রাখল রানা। খালি হয়ে যাওয়া প্লাস্টিকের ব্যাগগুলোয় যার যার দরকারি জিনিসপত্র... যেমন, ক্যামেরা, নোটবুক, ইত্যাদি নিয়ে বাকিরা নামতে শুরু করল এরপর। জলপরীর গায়ে একটা ফিশিং নেট আটকে নিয়েছে রানা, সেটা ধরে ঝুলে পড়ল ওরা।

লুনার পাশে গিয়ে পজিশন নিল রানা। শরীরে একটা ব্যাগ বেঁধে তাতে প্রাচীন শিরোস্ত্রাণটা নিয়েছে তরুণী আর্কিয়োলজিস্ট। ব্যাপারটা জানা নেই রানার, ব্যাগের বেঢপ আকৃতি দেখে ভুরু কোঁচকাল একটু। তারপর রেডিওতে মুরল্যাণ্ডকে বলল, 'আমরা রেডি, ববি।'

মাথা ঘুরিয়ে যাত্রীদের অবস্থা দেখে নিল মুরল্যাণ্ড। বলল, 'জলপরীকে তো জল-গাধা বানিয়ে ফেলেছ, হে! পিঠভর্তি মাল!'

'ববি!' শাসন করার সুরে বলল রানা। 'মুভ!'

থ্রাস্টার গর্জন করে উঠল, ধীরে ধীরে ফিরতি পথে এগোতে শুরু করল সাবমারসিবল। বাড়তি ওজনের কারণে গতি কমে

গেছে, তবে দক্ষ হাতে কোর্স ধরে রাখল মুরল্যাণ্ড। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেল রানা. ওর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সবাই। নড়ছে না. ফিশিং নেট আঁকড়ে ধরে রেখেছে স্থির হাতে।

সময় যেন কাটছেই না। যেন যুগ-যুগান্ত পর মুরল্যাণ্ডের কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'কলামগুলো দেখতে পাচ্ছি, দোস্ত!'

'থামো,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে গাইড করে নিয়ে যাবো।'

থ্রাস্টার বন্ধ করে দিল মুরল্যাণ্ড। সাঁতার কেটে জলপরীর সামনে চলে গেল রানা। ত্রিশ ফুট দূরে সাপোর্ট কলামের সারি দেখতে পাচ্ছে। প্রথম সারির মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাকে দেখাচ্ছে বিকট এক গহ্বরের মত। ওখান দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, তারপর উল্টো ঘুরে মুরল্যাণ্ডকে এগোবার সঙ্কেত দিল।

প্রথম সারিটা সহজেই পেরিয়ে এল জলপরী। দ্বিতীয় ফাঁকাটা বামে, ওদিকে ঘুরতে গিয়ে বিপত্তি দেখা দিল। বাড়তি ওজনের কারণে নিয়ন্ত্রণ ঠিক রইল না মুরল্যাণ্ডের, একদিকে ভেসে যেতে শুরু করল সাবমারসিবল। ল্যাটারাল থ্রাস্টারের সাহায্যে স্লাইডিং থামাল সে। কিন্তু সামনে এগোতে গিয়ে ঘষা লাগিয়ে দিল একটা অক্ষত কলামের গায়ে। ইস্পাতে ইস্পাতে ঘর্ষণের বিশ্রী আওয়াজ উঠল, আঁতকে উঠল রানা।

কপাল ভাল বলতে হবে, জলপরীকে ব্রেক কষার মত থামিয়ে ফেলা যায়। শব্দ শুনেই স্থির হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড, কলামটা ভেঙে পড়ার আগেই। সাঁতার কেটে সাবমারসিবলের পাশে চলে গেল রানা, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে আনল কলামের শরীর থেকে।

'তোমার ড্রাইভিং স্কিলের দেখি অনেক অবনতি হয়েছে,' মুরল্যাণ্ডকে বলল ও।

'সরি, দোস্ত। বাড়তি ওজনের কারণে ট্রাকের মত আচরণ করছে জলপরী। নড়তে-চড়তে অনেক সময় নিচ্ছে।'

'ওকে রেসিং কার না ভাবলেই হয়!'

'শিক্ষা হয়ে গেছে। আর ভুল হবে না। তুমি দেখে নিয়ো।'

যাত্রীদের দিকে এগিয়ে গেল রানা, তাদেরকে ইশারায় শান্ত থাকতে বলল। তারপর চলে গেল সাবমারসিবলের সামনে। সঙ্কেত দিল মুরল্যাণ্ডের উদ্দেশে। এবার আর গোলমাল হলো না, জলপরীকে দ্বিতীয় সারি পার করে আনল মুরল্যাণ্ড, পর পর পেরিয়ে এল আরও সাতটা সারি।

স্বস্তি অনুভব করতে শুরু করল রানা। আর মাত্র তিনটে সারি পেরুলেই মুক্তি। কিন্তু পরের কলামগুলোর দিকে তাকাতেই শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল ওর।

মাঝখানের কলামটা কেটে ওখান দিয়ে এসেছিল ওরা, এখন বাকি দুটো কলাম ধনুকের মত বেঁকে গেছে। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। সেদিকে মাথা ঘোরাতেই বুদবুদ দেখতে পেল—ছাতে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। ওখানে বুদবুদের সারি।

'ববি, একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' কণ্ঠ যতটা পারে স্বাভাবিক রেখে বলল ও।

'দেখতে পাচ্ছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কলামগুলো তো পোলিও রোগীর পা হয়ে গেছে, রানা! কীভাবে এই মৃত্যুফাঁদ এড়াব, বলতে পারো?'

'ঠিক যেভাবে দুই সজারু প্রেম করে—সাবধানে! আমাকে ফলো করো।'

সাঁতার কেটে সারিটা পেরিয়ে গেল রানা। উল্টো ঘুরে ইশারা দিতে শুরু করল। খুব ধীরগতিতে এগোল মুরল্যাণ্ড, ছাতের দুর্বল অংশটা পেরিয়ে এল হিসেবি ভঙ্গিতে। কিন্তু বিপদ দেখা

দিল অন্যদিক থেকে। ফিশনেটের একটা প্রান্ত জলপরীর পিছনে ঝুলছিল, হঠাৎ ওটা কাটা কলামের খুঁটির মত অংশে আটকে গেল, থামিয়ে দিল অগ্রযাত্রা। উত্তেজনা, কিংবা নার্ভাসনেস... যে কারণেই হোক, মুরল্যাণ্ড আগুপিছু ভাবল না। থ্রাস্টারের পাওয়ার বাড়িয়ে মুক্ত করে নিতে চাইল জলপরীকে। ফলাফল হলো ভয়াবহ।

টান খেয়ে নেটের সুতো ছিঁড়ে গেল আচমকা। আর ছাড়া পেয়েই জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে গেল সাবমারসিবল, মুরল্যাণ্ড কিছু করার আগেই সোজা গিয়ে আঘাত করল পরের সারির কলামে। রানা চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ ঘটে গেছে। বিশ্রী শব্দ তুলে কাত হয়ে পড়ে গেল কলামটা। হুড়মুড় করে ধসে পড়তে শুরু করল ছাত। রানার সামনেটা তুষারকণায় ঘোলা হয়ে গেল।

'শিট!' রেডিওতে গাল দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'রানা, সরে যাও! খেপা ষাঁড় হতে যাচ্ছি আমি।'

ও কী করতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। প্রতিবাদ করল না, জানে—এটাই একমাত্র উপায়। হাত-পা ছুঁড়ে একপাশে সরে গেল, রেডিওতে চেঁচাল, 'গো, ববি... গো!'

লিভার ঠেলে থ্রাস্টারে ফুল পাওয়ার দিল মুরল্যাণ্ড, এক্সপ্রেস ট্রেনের মত সামনে বাড়ল জলপরী। রানার মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল ধাতব দেহটা। নিখুঁত টাইমিঙে ফিশনেট আঁকড়ে ধরল ও, সিনেমার কাউবয় যেভাবে চলন্ত ঘোড়ায় চড়ে বসে, সেভাবে সাবমারসিবলের গায়ে সেঁটে গেল।

শেষ সারির কলামে তুমুল গতিতে আঘাত হানল জলপরী, ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল খোলা পানিতে। পিছনে গগনবিদারী আওয়াজ তুলে ধসে পড়ল টানেলের ছাত। উপর দিকে তাকাতেই রানার বুক খামচে ধরল কী যেন। ওর বিস্ফারিত

চোখের সামনে সৃষ্টি হচ্ছে আঁকাবাঁকা অসংখ্য ফাটলের। পুরো টানেলই ধসে পড়তে যাচ্ছে এবার।

মুরল্যাণ্ড গতি কমাতে শুরু করেছিল, থেমে গেল রানার চিৎকারে।

'না, ববি, স্পিড কমিয়ো না! পুরো ছাতটাই ভেঙে পড়ছে!'

'ঠিক হ্যায়।' দাঁতে দাঁত পিষে থ্রাস্টার-লিভার ঠেলে ধরল মুরল্যাণ্ড। টানেল-ধসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলল জলপরী। পিছনে ভয়ানক আওয়াজ হচ্ছে, সাবমারসিবলের উপর পড়তে শুরু করেছে বরফের ছোট ছোট খণ্ড। বড় চাঁই আছড়ে পড়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

হাল ছাড়ল না মুরল্যাণ্ড, লিভার চেপে এগিয়ে নিয়ে চলল জলযানটাকে। একশ' গজের মত যেতেই ছাতের ফাটলগুলোকে পেরিয়ে এল ওরা, বরফের ধসকে ফেলে দিল পিছনে। রুদ্ধশ্বাস আরও কয়েকটা মিনিট পেরুনোর পর কমে গেল বুক-কাঁপানো গর্জন। জলপরীর ইঞ্জিন ততক্ষণে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। থ্রাস্টার বন্ধ করে দিল মুরল্যাণ্ড, কিন্তু ওদের গতি রুদ্ধ হলো না। ধসের কারণে ছলকে উঠেছে পানি, ঠেলে নিয়ে চলেছে ওদেরকে।

টানেলের মুখ দিয়ে কামানের গোলার মত ছিটকে বেরুল পানির ধারা, সেইসঙ্গে জলপরী। ফিশনেট থেকে হাত ছুটে গেল আরোহীদের, গাছপাকা ফলের মত ঝরে পড়ল সবাই... লেগ্রাঁ বাদে। পাহাড়ি ঢালে আছড়ে পড়ল জলপরী, ড্রপ খেয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল। ফাটল দেখা দিল ককপিটের অ্যাক্রিলিক আচ্ছাদনে, ডানপাশ থেঁতলে গেল। লেগ্রাঁর সৌভাগ্য, একটুর জন্য চ্যাপ্টা হয়ে যায়নি সে।

ঢাল বেয়ে পানির ধারা সরে যেতেই ছুটে এল স্টারফিশের ক্রু-রা। পানির আওয়াজ শুনেই টানেলের মুখ থেকে সরে

গিয়েছিল ওরা, কেউ আহত হয়নি। জলপরীর আরোহীদের সাহায্য করল উঠে দাঁড়াতে।

হ্যাচ খুলে মুরল্যাণ্ডও বেরিয়ে এসেছে। কপালের একটা পাশ কেটে রক্ত ঝরছে তার, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। চঞ্চল চোখে প্রিয় বন্ধুকে খুঁজে বের করল। রানা তখন একটা পাথরের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। হেলমেটটা খুলে পড়ে গেছে মাথা থেকে, কমলা রঙের ড্রাইসুট ছিঁড়ে গেছে এখানে-সেখানে।

ছুটে গিয়ে রানাকে চিৎ করল মুরল্যাণ্ড। চাপড় দিতে শুরু করল গালে। 'রানা! চোখ খোলো! রানা!!'

কয়েক মুহূর্ত সাড়া পাওয়া গেল না, তারপরই কেশে উঠল রানা। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল একরাশ পানি। ধীরে ধীরে চোখ খুলল ও। মলিন হাসি হেসে বলল, 'কী... বলেছিলাম না, তোমার ড্রাইভিঙের অনেক অবনতি ঘটেছে?'

একঘণ্টা পর ফ্রেঞ্চ রেসকিউ পার্টি পৌঁছুল অকুস্থলে, সঙ্গে মেডিক্যাল টিম। উদ্ধারকৃতদের নিয়ে যাওয়া হলো পাওয়ার প্ল্যান্টের পোর্টাল বিল্ডিঙে; শুকনো কাপড়, কম্বল আর প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হলো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সামান্য কেটে-ছড়ে যাওয়া, কিংবা হাত-পা মচকানো ছাড়া বড় ধরনের আঘাত পায়নি কেউ। সুস্থ আছে সবাই। ফলে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সামান্য বিশ্রামের পর উদ্ধারকৃতরা জমায়েত হতে পারল প্ল্যান্টের রিক্রিয়েশন রুমে—ঘটনার বিবরণ শোনানোর জন্য।

ব্র্যাণ্ডি পরিবেশন করা হলো সমাবেশের মধ্যে। উঠে দাঁড়িয়ে রানা আর মুরল্যাণ্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন ড. দ্যুঁবোয়া, প্রশংসা করলেন ওদের সাহসিকতার।

'দয়া করে থামুন, ডক্টর,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'এত প্রশংসা করবেন না, দেখবেন ভাসতে শুরু করেছি, মাটিতে আর পা

পড়ছে না।'

হেসে উঠল সবাই।

'এসব ফর্মালিটি বাদ দিন,' রানা সুর মেলাল। 'তার চেয়ে আপনাদের গল্প শোনান। কী ঘটেছিল, সেটা জানতে চাই আমরা।'

ভাগাভাগি করে উদ্ধারকৃতরা তাদের অভিজ্ঞতা শোনাল। সাংবাদিকরা তাদের অডিও আর ভিডিও টেপ প্লে করে দেখাল। তাতে অবশ্য বিশেষ লাভ হলো না। অডিও টেপে শুধু কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, আলোকস্বল্পতার জন্য ভিডিওতে অচেনা দুষ্কৃতকারীর চেহারা পরিষ্কার ধরা পড়েনি। একটা ব্যাপারে খালি নিশ্চিত হওয়া গেল—দুর্ঘটনার জন্য বিশালদেহী লোকটিই দায়ী। স্ট্রংবক্স নিয়ে পালাবার সময় কেউ যেন তার পিছু নিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে টানেলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে, রিসার্চ টানেল আর ওঅটর টানেলের মাঝখানের অ্যাকসেস ডোর ভেঙে দিয়েছে, ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে তার কৃতকর্মের সাক্ষীদেরকে। ইতিমধ্যে ফ্লোটপ্লেনের পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সে জানিয়েছে—পিস্তল দেখিয়ে ওকে টেকঅফ করতে বাধ্য করেছে বিশালদেহী লোকটা। প্যারিসের নিকটবর্তী একটা পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে তাকে নামিয়ে দিয়েছে সে। তারপর লোকটা কোথায় গেছে, তা জানে না।

'কেসটা পুলিশের,' আলোচনা শেষে বলল ডুরান্ট। 'যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানাবার ব্যবস্থা করছি, ওরা অ্যাকশন নেবে। আশা করি খুব শীঘ্রি ধরা পড়বে লোকটা।'

কেন যেন রানার মনে হলো, পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় থাকাতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক তীক্ষ্ণ ওর, চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়াই অনেক কিছু বুঝতে পারে। মন বলছে, এই রহস্যের জড় অনেক গভীরে লুকিয়ে আছে। সহজে তার

সমাধান মিলবে না।

জটলা ভেঙে গেছে। ডুরান্ট এখুনি প্যারিসে ফিরে যাবে শুনে লেগ্রাঁ তার সঙ্গী হতে চাইল। এমন ভাব দেখাল যেন আঙুল ভাঙেনি, পুরো হাতটাই কাটা পড়েছে। হাসপাতালে না গেলে মারা যাবে। রিপোর্টাররাও চলে যেতে চাইছে। গরম খবর রয়েছে তাদের হাতে, যত দ্রুত পারে, নিজ নিজ পত্রিকায় গিয়ে ছাপতে চায় ডরমেয়ার লেকের রহস্যময় ঘটনাপ্রবাহ।

ডুরান্ট আর রেসকিউ টিমের দুই হেলিকপ্টারে ভাগাভাগি করে তুলে দেয়া হলো বিদায়ী মানুষগুলোকে। হাত নেড়ে ওদেরকে বিদায় জানাল বাকিরা।

'লেগ্রাঁর কাণ্ড দেখেছ?' হেলিকপ্টারদুটো দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেলে বলে উঠল লুনা। 'ভাঙা হাতের অজুহাত দিয়ে কী সুন্দর পালিয়ে গেল?'

'পালিয়েছে ভাবছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানে থাকলে আমি ওর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতাম।'

'তা হলে তো ভালই করেছে,' হাসল রানা। 'কেন, লোকটা তোমার হাত ফসকে গেল বলে দুঃখ হচ্ছে?'

'মাথা খারাপ! গেছে ভালই হয়েছে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।'

লুনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে থিয়োখি। চেহারা দেখে মনে হলো, উত্তেজনাকর ঘটনার ইতি ঘটায় মনে বড্ডো কষ্ট পাচ্ছে সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ইয়ে... মসিয়ো রানা, আমাকে কাজে ফিরে যেতে হবে। আপনাদের ধন্যবাদ—এখানকার একঘেয়ে জীবনে কিছুটা সময়ের জন্য উত্তেজনা এনে দিয়েছেন বলে।'

আন্তরিক ভঙ্গিতে তার সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'ধন্যবাদ তো আমি দেব। আপনার সাহায্য না পেলে উদ্ধার-অভিযানটা

কিছুতেই সফল হতো না।'

'কী যে বলেন...'

'আই মিন ইট! আর... আপনার একঘেয়েমি দূর হয়ে যাবে খুব শীঘ্রি। ঘটনাটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন, এখানে পুলিশ আর সাংবাদিকের মিছিল শুরু হয়ে যাবে।'

'তা হলে তো ভালই। ভাল থাকুন, মসিয়ো রানা। আশা করি আবার দেখা হবে। জাহাজে ফিরবেন তো এখন? আমি আপনাদেরকে লেকের পাড়ে পৌঁছুনোর জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হাত মিলিয়ে চলে গেল থিয়োখি, তার পিছু নিল লুনা। প্ল্যান্টের বিল্ডিঙে ওর ব্যাগ ফেলে এসেছে, সেটা আনতে যাচ্ছে। হাত মিলিয়ে, আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিজ্ঞানীরাও বিদায় নিলেন রানা আর মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে। অবজারভেটরি আর লিভিং কোয়ার্টার পানিতে তলিয়ে গেছে, আপাতত পাওয়ার প্ল্যান্টেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওঁদের।

'চমৎকার সময় কাটল, দোস্ত,' আড়মোড়া ভেঙে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আর কোনও কাজ আছে? নইলে আমি...'

'কেটে পড়তে চাইছ?' ভুরু নাচাল রানা। 'নিশ্চয়ই চামোয়াঁ মাউন্টেইনে তোমার ওই ফরাসি ফুলের কাছে ফিরে যাবে?'

লুনার দিকে চোখের ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'ফরাসি ফুল আমি একাই ওঁকছি না।'

'আমি অনেক পিছিয়ে আছি, বন্ধু,' বলল রানা। 'প্রথম ডেটিঙেই বেরুইনি এখনও আমরা।'

'তা হলে তো কাবাবের হাড্ডি হওয়া উচিত হবে না আমার। অনুমতি দাও, আমি আমার ফুলের কাছে ফিরে যাই; আর তুমি তোমার।'

হেসে ফেলল রানা। 'যাও, ভাগো!'

এগারো

কেইপ কড, ম্যাসাচুসেটস্, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ড. আসিফ রেজা ও তার স্ত্রী তানিয়া রেজাকে দেখে মোটেই বিজ্ঞানী বলে মনে হয় না। অবশ্য দুর্বল দেহ, গম্ভীর চেহারা, ভারিক্কি কথাবার্তা, গোমড়ামুখো এবং অত্যন্ত পুরু লেন্সের ভারি চশমা পরা হতেই হবে বিজ্ঞানীকে, অমন ধারণা অনেকদিন আগেই পাল্টে গেছে।

আসিফ ও তানিয়া দুজনেই সুদর্শন। বয়েস সবে তিরিশে পড়েছে। দুজনেরই মাথায় কালো চুলের গোছা। আসিফের লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। ওদিকে স্বামীর চেয়ে অনেক ছোট তানিয়ার চুল, পুরুষালি কায়দায় ছোট করে ছাঁটা। চুল ছোটই হোক কিংবা বড়, দেখে মনে হয় আঁচড়ানোর সময় করে উঠতে পারে না কেউই। লাইব্রেরিতে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার চাইতে বাইরে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কই বেশি পছন্দ ওদের।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেরিন সায়েন্সের সঙ্গে জড়িত—আসিফ একজন ডিপ-ওশন জিয়োলজিস্ট, তানিয়া পেশায় মেরিন বায়োলজিস্ট। বর্তমানে ওরা তিন বছরের চুক্তিতে ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, মানে নুমা-য় কাজ করছে। মস্ত সুযোগ, আর সেটার জন্য মাসুদ রানার কাছে কৃতজ্ঞ ওরা। রানার কলেজ জীবনের বন্ধু আসিফ রেজা, নিজ নিজ ফিল্ডে

রেজা-দম্পতি কতটা দক্ষ, তা খুব ভাল করেই জানে সে। মেধার জোরেই আমেরিকায় স্কলারশিপ পেয়েছিল ওরা, কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে বিখ্যাত দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ফিল্ড রিসার্চের জন্য ভাল প্রতিষ্ঠান খুঁজে বেড়াচ্ছিল দুজনে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলে নুমা-য় কাজ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে রানা।

এ-মুহূর্তে অবশ্য কাজ করছে না আসিফ-তানিয়া, ছুটি কাটাচ্ছে কেইপ কডের ছোট্ট গ্রাম উডস্ *হোল*-এ। সাগরতীরে চমৎকার এক জায়গা, তবে শুধু এ-কারণেই আসেনি, এসেছে মনের টানে। এই উডস্ হোলেই প্রথম পরিচয় হয় দুজনের, এখানেই পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল ওরা। বিখ্যাত এক ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট আছে গ্রামটাতে, আর আছে একটি মেরিন বায়োলজিকাল ল্যাবরেটরি। কাকতাল, কিংবা নিয়তি... যা-ই হোক না কেন, ছাত্রাবস্থায় ফিল্ড ট্যুরে দুজনে একই সময়ে উপস্থিত হয়েছিল এখানে, দেখা পেয়েছিল পরস্পরের। বাকিটা রূপকথার মত। সেই থেকে উডস্ হোল ওদের খুব পছন্দের এক জায়গা, ছুটিছাটায় প্রায়ই চলে আসে। গ্রামটা ছোট, অধিবাসীর সংখ্যা কম। নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেছে আসিফ-তানিয়ার, স্থানীয় লোকজন ওদেরকে গ্রামেরই সদস্য বলে মনে করে।

সময়টা বিকেল। ওঅটর স্ট্রিট ধরে হাঁটছে স্বামী-স্ত্রী; একপাশে সমুদ্র, অন্যপাশে নোনা জল আটকে তৈরি হওয়া ছোট্ট এক পুকুর। কাছেই এলিজাবেথ আইল্যাণ্ড, সেদিক থেকে বইছে মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়া। পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া সূর্যের কোমল আলোয় স্নান করছে প্রকৃতি। মোহনীয় পরিবেশ।

তানিয়ার কানে কানে দুষ্টু কিছু কথা শোনাচ্ছিল আসিফ, এমন সময় বেরসিকের মত বেজে উঠল মোবাইল ফোন। বিরক্ত

হয়ে সেটটা পকেট থেকে বের করল ও, ডিসপ্লে-র দিকে না তাকিয়েই *রিসিভ* বাটন চাপল, তারপর কানে ঠেকিয়ে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'হ্যালো?'

'আসিফ, মাই ডিয়ার! হ্যারি সলোমন বলছি!' ইয়ারপিসে যেন বিস্ফোরিত হলো কণ্ঠটা। 'পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম, তোমাদের আসার খবর শুনলাম। কেমন আছ?'

অ্যালগালজির রিটায়ার্ড প্রফেসর হ্যারি সলোমন—জলজ উদ্ভিদের উপর দুনিয়ার সেরা বিশেষজ্ঞদের একজন। এখন উডস্ হোলের মেরিন বায়োলজিকাল ল্যাবরেটরিতে যোগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করার ফলে গলার ভলিউম বেড়ে গেছে, সাধারণ মানুষের চেয়ে কয়েক ডেসিবেল উঁচুতে কথা বলেন।

'ভাল আছি, ড. সলোমন,' বলল আসিফ। 'ফোন করেছেন বলে ধন্যবাদ।'

'ইয়ে... আমি আসলে তোমাকে ফোন করিনি, করেছি তোমার বউকে। ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'নিশ্চয়ই। আমার চেয়ে ওর চেহারা, আর কণ্ঠ... দুটোই ভাল। কথা বলতে চাইলে দোষ দিতে পারি না।'

স্বামীর বাহুতে চিমটি কাটল তানিয়া, তারপর ফোন নিয়ে ঠেকাল কানে। 'হ্যালো, ড. সলোমন! কেমন আছেন?'

ওপাশ থেকে হড়বড় করে কিছু বললেন সলোমন, মনোযোগ দিয়ে শুনল ও। বলল, 'ঠিক আছে, আমরা এখুনি আসছি।' লাইন কেটে দিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। 'আমাদেরকে ওঁর অফিসে যেতে বলছেন সলোমন। ব্যাপারটা নাকি খুব জরুরি।'

'ড. সলোমনের কাছে সবকিছুই জরুরি বলে মনে হয়। তুমি রাজি হলে কেন? ছুটি কাটাতে এসেছি আমরা, কাজ করতে নয়।'

একটা ভুরু উঁচু করল তানিয়া। 'ঘটনা কী? ভদ্রলোক

তোমার বদলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন বলে হিংসে হচ্ছে নাকি?'

'হিংসা নামের অনুভূতিটাই নেই আমার মধ্যে,' আসিফ আহত গলায় বলল। 'তুমি সেটা জানো!'

'সেটার অভাব তো মনে হচ্ছে অভিমান দিয়ে পূরণ করছ,' হাসল তানিয়া। 'চলো, চলো, দেখেই আসি ব্যাপারটা কী।'

'বেশ, চলো।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই মেরিন বায়োলজিকাল ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে গেল স্বামী-স্ত্রী। লবিতেই ওদের অপেক্ষায় বসে আছেন ড. সলোমন। ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে বোঝা যায় না। শক্ত-সমর্থ শরীর। চামড়ায়ও বলিরেখা পড়েনি তেমন একটা। মাথার চুলে শুধু পাক ধরেছে। ভারী ফ্রেমের চশমার ওপাশে দু'চোখে বুদ্ধির ঝিলিক।

অতিথিদের দেখে এগিয়ে এলেন সলোমন। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মিলিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্কস ফর কামিং। তোমাদের বিকেলটা আবার মাটি করে দিলাম না তো?'

'মোটেই না,' হাসিমুখে বলল তানিয়া। 'আপনার দেখা পাওয়া তো আনন্দের ব্যাপার।'

'তবে যে-কারণে ডেকেছি, তা শোনার পর হয়তো আর আনন্দ পাবে না,' হেঁয়ালির সুরে বললেন সলোমন।

'কী হয়েছে, ডক্টর?' জানতে চাইল আসিফ।

'আমার অফিসে চলো, সব খুলে বলছি।'

সলোমনকে অনুসরণ করল আসিফ-তানিয়া, করিডোর ধরে এগোল। জায়গাটা বিশেষত্বহীন—বিবর্ণ দেয়াল, পুরনো দরজার সারি, মাথার উপর দিয়ে গেছে নানা আকারের পাইপ আর তারের বাণ্ডিল। পুরনো আমলের বিল্ডিঙের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। প্রথম শ্রেণীর সামুদ্রিক গবেষণাগার বলে মোটেই মনে হয় না।

তবে ড. সলোমনের অফিসটা ব্যতিক্রম। শুচিবায়ু আছে তাঁর, এ-কারণে পুরো কামরা ঝকঝকে-তকতকে করে রেখেছেন। কোনও কিছুই এলোমেলো হয়ে পড়ে নেই, সব পরিপাটি। এমনকী তাঁর ডেস্কেও এক টুকরো কাগজ নেই। সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কম্পিউটারের মনিটর, কি-বোর্ড আর মাউস।

চেয়ার টেনে দম্পতিকে বসতে দিলেন তিনি। কফি-মেকার থেকে দু'মগ কফি এনে আপ্যায়ন করলেন, তারপর অবতারণা করলেন প্রসঙ্গের।

'সময় নষ্ট করতে চাই না,' বললেন তিনি। 'কাজের কথায় চলে আসি, কী বলো?'

'আমাদের কোনও আপত্তি নেই,' বলল আসিফ।

'গুড।' তানিয়ার দিকে তাকালেন সলোমন। 'তুমি তো মেরিন বায়োলজিস্ট। *কলারপা ট্যাক্সিফোলিয়া* সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানো?'

মাথা ঝাঁকাল তানিয়া। 'হ্যাঁ। ট্রপিকাল পানির শৈবাল। শখের অ্যাকুরিয়ামেও রাখে লোকে।'

'কারেক্ট,' বললেন সলোমন। 'অ্যাকুরিয়ামে যে-প্রজাতিটা রাখা হয়, সেটাকে আমরা বলি কোল্ড ওঅটর স্ট্রেইন—মূল শৈবালের একটা মিউটেশন। সাজানোর বস্তু হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু বেশ কিছু উপকূলীয় এলাকায় ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করেছে ওটা... শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'হুঁ। কিলার সি-উইড বলা হচ্ছে ওটাকে। ভূমধ্যসাগরের একটা বড় অংশের সি-বেড নষ্ট করে দিয়েছে, ছড়িয়ে পড়ছে অন্যত্রও। এই শৈবাল সাধারণত ঠাণ্ডা পানিতে বাঁচতে পারে না, কিন্তু মিউটেটেড স্ট্রেইনটা ওই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। দুনিয়ার যে-কোনও সাগরেই ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে ওটার।'

'মিউটেশনটা কি প্রাকৃতিক?' জানতে চাইল আসিফ।

'না, মনুষ্য-নির্মিত,' বলল তানিয়া। 'অ্যাকুরিয়ামের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।'

'তা হলে জিনিসটা সাগরে পৌঁছুল কীভাবে?'

'১৯৮৪ সালে মোনাকোর ওশনোগ্রাফিক মিউজিয়াম থেকে ভুল করে সাগরে ছেড়ে দেয়া হয় ওটা,' বললেন সলোমন। 'তখন অবশ্য *কলারপা*-র ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথা জানা ছিল না কারও। সে যা-ই হোক, সেই থেকে ভূমধ্যসাগরের ছ'টা দেশের উপকূলে প্রায় ত্রিশ হাজার হেক্টর সি-বেড দখল করে নিয়েছে এই শৈবাল, অস্ট্রেলিয়া আর স্যান ডিয়েগো উপকূলেও দেখা পাওয়া গেছে ওর। খুব দ্রুত ছড়ায় জিনিসটা, ঘন-বুনোটের কার্পেটের মত ছেয়ে ফেলে সাগরের তলা, ফলে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণী বঞ্চিত হয় সূর্যের আলো আর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থেকে। সামুদ্রিক খাদ্যচক্রে বিঘ্ন ঘটে, আর তার প্রভাব পড়ে পুরো ইকো-সিস্টেমের উপর।'

'ঠেকানো যায় না এই শৈবালকে?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'স্যান ডিয়েগোতে কিছুটা সাফল্য পাওয়া গেছে। শৈবালের বিস্তারকে তারপুলিনে ঘিরে ঠেকাতে পেরেছে ওরা, সি-বেডের মাটিতে ক্লোরিন ইনজেক্ট করে উর্বরতা নষ্ট করে দিচ্ছে—গজাতে দিচ্ছে না *কলারপা* কলোনি। কিন্তু বড় ধরনের ইনফেস্টেশনে এ-পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। জড় থেকেই সমস্যা দূর করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাই। অ্যাকুরিয়াম-বিক্রেতা আর ব্যবহারকারীদেরকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে বিশেষ এই শৈবাল ব্যবহার না করার জন্য। কিন্তু এর সুফল পেতে বহু সময় লাগবে। ততদিন পর্যন্ত এটা একটা বড় সমস্যা আমাদের জন্য।'

'সমস্যা ভাবছেন কেন? প্রাকৃতিকভাবে সব মেরিন লাইফেরই ইতি ঘটে। আপনার এই শৈবালেরও ঘটবে। শুধু

দরকার বিস্তার ঠেকানো—পুরনো শৈবাল মরে গেলে যেন নতুন শৈবাল তার জায়গা নিতে না পারে।'

'সমস্যাটা এত সহজ নয়, মাই ডিয়ার আসিফ,' মাথা নাড়লেন সলোমন। '*কলারপা*-র লাইফ-সাইকেল অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। জটিল একটা ডিফেন্স মেকানিজমও আছে এর। পোকামাকড় হামলা করতে পারে না, মাছেরাও এই শৈবাল খায় না। এমনকী শীতকালেও মরে না এই শৈবাল।'

'মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কোনও দানবের গল্প শুনছি।'

'দানব কী, মহামারী বলতে পারো! এক টুকরো শৈবালই নতুন কলোনির জন্ম দিতে পারে। কপাল ভাল যে, স্রোতের মাধ্যমে রেণু বা বীজ ছড়ানোর ক্ষমতা নেই এর; নইলে পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ আকার ধারণ করত।'

'এই সমস্যার ব্যাপারে আমার জানা আছে, ডক্টর,' তানিয়া বলল। গলায় খানিকটা হতাশা। 'এজন্যেই কি ডেকে এনেছেন আমাদেরকে?'

জবাব না দিয়ে আসিফের কাছে প্রশ্ন রাখলেন সলোমন, 'তুমি তো ওশন-জিয়োলজিস্ট। *গোস্ট সিটি* সম্পর্কে কী জানো?'

আলোচনার প্রবাহ বায়োলজি ছেড়ে ওর ফিল্ডে চলে আসায় খুশি হলো আসিফ। বলল, 'আটলান্টিক ম্যাসিফের একটা বিশেষ এলাকা—অসংখ্য হাইড্রো-থারমাল ভেন্ট আছে ওখানে। হাজার হাজার বছর ধরে ওগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে নানা রকম মিনারেল, বিশাল বিশাল স্তূপের সৃষ্টি হয়েছে—হঠাৎ দেখায় বড় বড় অট্টালিকার মত লাগে। ঠিক যেন একটা পরিত্যক্ত শহর। ঠাট্টার ছলে তাই *গোস্ট সিটি*, বা ভুতুড়ে নগরী বলে ডাকা হয় জায়গাটাকে। খুবই ইন্টারেস্টিং, সময় পেলে ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে আমার।'

'ইচ্ছেটা খুব শীঘ্রিই পূরণ হতে চলেছে,' রহস্যময় কণ্ঠে

বললেন সলোমন।

বিভ্রান্ত হয়ে চাহনি বিনিময় করল আসিফ-তানিয়া। কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না।

মুচকি হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সলোমন। 'আমার সঙ্গে এসো, একটা জিনিস দেখাচ্ছি।' অফিস থেকে ওদেরকে ছোট্ট এক ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলেন তিনি। স্টোরেজ কেবিনেট খুলে একটা কাঁচের পাত্র বের করলেন, ভিতরটা খয়েরি-সবুজ রঙের থিকথিকে এক ধরনের পদার্থে ভরা।

পাত্রের দিকে মুখ বাড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল তানিয়া, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। তাই জানতে চাইল, 'কী এটা?'

'জবাব দেবার আগে পেছনের কথা জানিয়ে দিই,' সলোমন বললেন। 'কয়েক মাস আগে উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের সঙ্গে যৌথ এক এক্সপিডিশনে অংশ নেয় আমাদের ল্যাব—*গোস্ট সিটি* জরিপ করার জন্য। জায়গাটা নানা ধরনের মাইক্রোব আর কেমিক্যালে ভরপুর। ওগুলো স্টাডি করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।'

'ভাল প্রজেক্ট,' মন্তব্য করল আসিফ। 'ওখানকার উত্তাপ আর কেমিক্যালের কম্বিনেশনকে প্রাণের সূচনাকারী পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়।'

'এনিওয়ে,' বললেন সলোমন, 'ওই এক্সপিডিশনে আমাদের সাবমারসিবল *আলাডিন* কিছু শৈবালের স্যাম্পল তুলে আনে। পাত্রের মধ্যে ওগুলোরই মৃত সংস্করণ দেখতে পাচ্ছ তোমরা।'

পাত্রটা আবার ভাল করে দেখল তানিয়া। বলল, '*কলারপা*-র সঙ্গে কিছুটা মিল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার চেনাজানা কোনও প্রজাতির সঙ্গে মেলাতে পারছি না।'

'কারণ এটা *কলারপা*-র একটা নতুন মিউটেশন,' শীতল গলায় বললেন সলোমন। 'আমি এর নাম দিয়েছি—*কলারপা*

গরগনোসা।'

'গরগন-উইড? শুনতে ভালই লাগছে।'

'ভাল লাগাটা উবে যাবে এখুনি। এই মিউটেশন আগেরটার চেয়ে কয়েক গুণ ভয়ঙ্কর। সেক্সুয়ালি রিপ্রোডাকশন করতে পারে এটা—পানির স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারে রেণু, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে পারে নিজের বংশ।'

'বলেন কী!' আঁতকে উঠল তানিয়া। 'সে তো সাংঘাতিক কথা!'

'পুরোটা শোনো আগে,' তিক্ত গলায় বললেন সলোমন। 'গরগন-উইডের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা কল্পনাতীত। *কলারপা ট্যাক্সিফোলিয়া* নরম কার্পেটের মত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু গরগন-উইড ছড়িয়ে পড়ে শক্ত পাথরের মত! জমাট বেঁধে নিরেট আকৃতি নেয় গরগন-উইডের কলোনি, ওখানে কোনও প্রাণ টিকতে পারে না। *ট্যাক্সিফোলিয়া*-র চেয়ে গ্রোথ রেট-ও কয়েক গুণ বেশি এর। ভয়ের কথা হলো, ছড়াতে শুরু করেছে জিনিসটা। অ্যাজোরেসে দেখা পাওয়া গেছে শৈবালটার, দেখা যাচ্ছে স্পেনের উপকূলেও।'

'হায় খোদা!' বিহ্বল কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'এই গরগন-উইডের কারণে কী ধরনের বিপদ দেখা দিতে পারে বলে ভাবছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

সলোমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ওয়ার্স্ট-কেস সিনারিয়ো শুনতে চাও? প্রথমে দুনিয়ার সমস্ত সি-বেড দখল করবে ওটা। মেরিন লাইফ ধ্বংস করে দেবে। এর প্রভাব পড়বে পুরো গ্রহের ইকো-সিস্টেমের উপর। আবহাওয়া বদলে যাবে, দুর্ভিক্ষ-মহামারী দেখা দেবে...'

'কী!'

'ভুল শুনছ না। ব্যাপারটা খুব শীঘ্রি ঘটবে। যে-ধরনের গ্রোথ

রেট আমি লক্ষ করেছি শৈবালের স্যাম্পলে, তাতে মাস ছয়েকের মধ্যেই বিপর্যয়ের আলামত দেখা যাবার কথা।'

'এত বড় একটা বিপদ... অথচ কেউ কিছু জানে না কেন?'

'গরগন-উইডের নমুনা বিভিন্ন সাগরে দেখা গেলেও এ-নিয়ে সিরিয়াস গবেষণা আমরা মাত্র অল্প ক'জন করছি। সমাধান পাবার আগেই প্যানিক সৃষ্টি করতে চাইছি না আমরা।'

'কাজটা ঠিক করছেন না, ডক্টর,' বলল তানিয়া। 'সবাইকে জানালে সাহায্য পেতেন। শৈবালটাকে ঠেকানোর একটা উপায় বেরিয়ে আসত।'

'আমি কোনও কিছু গোপন করার পক্ষপাতী নই, তানিয়া,' একটু যেন মনঃক্ষুণ্ন হলেন সলোমন। 'বিপদটা সম্পর্কে জানতেই তো পেরেছি মাত্র ক'দিন আগে। প্রাথমিক অ্যানালিসিসটা সেরে নিতে চাইছি লোকের প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে। আশা করছি আগামী সপ্তাহেই জাতিসংঘ... আর নুমার মত বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দিতে পারব। তোমাদেরকে ডেকেছি আগেভাগেই ব্যাপারটার আভাস দেয়ার জন্য, সেইসঙ্গে সাহায্যের আশায়।'

'কী সাহায্য?'

'পুরো ব্যাপারটাই রহস্যজনক, তানিয়া। গরগন-উইডের মিউটেশন খুব সম্প্রতি ঘটেছে, নইলে বহু আগেই দুনিয়ার মেরিন-লাইফ ধ্বংস হয়ে যেত। কোনও একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে এই মিউটেশনের পিছনে। সেটা বের করা দরকার। তাই গোস্ট সিটি-তে আরেকটা এক্সপিডিশনের আয়োজন করা হয়েছে। মিউটেশনের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া গেলে প্রতিষেধকও আবিষ্কার করা যাবে। সেজন্য সাবমারসিবল *আলভিন*-কে নিয়ে ওশনোগ্রাফিক রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস* যাচ্ছে ওখানে। আমাকে নিতে চাইছে ওরা, কিন্তু এদিকে অ্যানালিসিস আর

রিপোর্ট তৈরির কাজ শেষ হয়নি। আমি ভাবছি, তোমরা যদি আমার জায়গায় ওই এক্সপিডিশনে অংশ নাও... খুব উপকার হয় আমার...

'কী যে বলেন! আপনার কাজ কি আমরা করতে পারব?'

হাসলেন সলোমন। 'তোমাদের যোগ্যতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই আমার মনে। দু'জনে মিলে আমার চেয়ে ভাল পারফর্মেন্স দেখাবে—আমি শিয়োর! বলো রাজি আছ কি না।'

চোখাচোখি করল স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেই উত্তেজনা অনুভব করছে। আসিফ বলল, 'যেতে আপত্তি নেই আমাদের, ডক্টর। নুমা থেকে অনুমতি নিতে হবে, তবে সেটা কোনও সমস্যা নয়। কারণটা জানার পর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বরং জোর করেই পাঠাবেন আমাদেরকে।'

'দ্যাটস্ গ্রেট!' টেবিলে চাপড় দিলেন সলোমন। 'আমি তা হলে এখানে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব।'

'*আটলান্টিস* এখন কোথায়?'

'অন্য একটা এক্সপিডিশন শেষ করে ফিরে আসছে। আগামীকাল অ্যাজোরেসে রিফুয়েলিঙের জন্য থামবে। তোমরা ওখানেই চড়তে পারো জাহাজে। আমি ওদেরকে জানিয়ে দেব তোমাদের যাবার খবর।'

'হুম। তা হলে আজ রাতেই ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। কাল সকালে অ্যাজোরেসের ফ্লাইট ধরব।'

'বেস্ট অভ লাক। আশা করি সফল হবে তোমরা।'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে সৌভাগ্যই দরকার আমাদের,' বলল তানিয়া। 'নইলে বিপর্যয় ঠেকানোর কোনও উপায় নেই।'

বারো

'গরগন-উইড?' বলল রানা। 'নতুন উপদ্রব দেখছি! সত্যিই কি জিনিসটা ডেনজারাস?'

'ড. সলোমনের তা-ই ধারণা,' বলল আসিফ। 'ওঁর উপর আস্থা আছে আমাদের।'

'আর তোর ধারণা?'

'গোস্ট সিটিতে যাচ্ছি। সবকিছু নিজ চোখে না দেখে আমি মন্তব্য করতে চাই না।'

সকাল আটটা। স্টারফিশের সঙ্গে স্যাটেলাইট ফোনে যোগাযোগ করেছে আসিফ। এক্সপিডিশনে যাবার আগে রানাকে সবকিছু জানিয়ে রাখা দরকার বলে মনে হয়েছে ওর।

'ফোনের জন্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর মি. রেডক্লিফকে জানিয়ে যাচ্ছিস তো?' নুমার ডিরেক্টর আর তাঁর ডেপুটির কথা বলছে ও।

'অবশ্যই। তানিয়া কথা বলেছে। অ্যাডমিরাল বললেন, ওঁরা নাকি কয়েকদিন আগেই গরগন-উইডের ব্যাপারে রিসার্চ শুরু করেছেন।'

'অবাক হবার কিছু নেই। নুমা সবসময়ই এক কদম এগিয়ে থাকে।'

'এক কদম না, আধ কদম বলতে পারিস। শৈবালের সঙ্গে

গোস্ট সিটির কানেকশনের ব্যাপারে জানতেন না অ্যাডমিরাল। আমাদের এক্সপিডিশনের খবর শুনে খুব খুশি হয়েছেন।'

'আমিও। এতদিনে একটা কাজের কাজ পেয়েছিস! শুভকামনা রইল। কী ঘটে না ঘটে জানাস আমাকে।'

'ঠিক আছে। রাখি, কেমন?'

লাইন কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল রানা। কপালে ভাঁজ। গরগন-উইডের কথা শুনে চিন্তিত বোধ করছে। খানিক পর ফোন করল ঢাকায়, বিসিআই হেডকোয়ার্টারে, চিফের নাম্বারে। মারাত্মক একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আভাস পেয়েছে, সে-ব্যাপারে রিপোর্ট করা দরকার।

রিং হতে না হতে শোনা গেল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনোরকমে নার্ভাসনেস কাটিয়ে বলল, 'রানা, সার।'

'ইয়েস, এমআরনাইন, কী খবর?'

গরগন-উইডের কথা বলতে শুরু করল রানা। কিন্তু মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। বললেন, 'জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে একটু আগে কথা হয়েছে আমার। শৈবালটার ব্যাপারে সবকিছু শুনেছি। বঙ্গোপসাগরে এখনও দেখা যায়নি ওটা, তবু সমস্ত মেরিটাইম এজেন্সিকে সতর্ক করে দিচ্ছি। স্যান ডিয়েগো উপকূলে শৈবালের বিস্তার ঠেকাতে যে-ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তেমনটা এখানেও করবার প্রস্তুতি নিয়ে রাখব আমরা।'

'জী, সার,' ঢোঁক গিলল রানা। 'খুব ভাল।'

'তোমার খবর বলো। জলপরীর কণ্ডিশন কী?' ডরমেয়ার

লেকের ঘটনা আগেই চিফকে জানিয়েছে রানা, ফলোআপ রিপোর্ট চাইছেন।

'অপারেশনাল, সার। খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, স্টারফিশেই মেরামত করে নিতে পেরেছি।'

'শুনে খুশি হলাম। তবে যাদের কারণে সাবমারসিবলটাকে অমন ঝুঁকির মধ্যে নিতে হলো তোমাকে, তাদের একটা শিক্ষা হওয়া দরকার। কিছু জানা গেছে ওদের সম্পর্কে?'

'না, সার। পুলিশ এখনও অন্ধকারে।'

'হুম। সুযোগ পেলে খোঁজ নিয়ে দেখো, তোমার তো ভাল কানেকশন আছে বিভিন্ন জায়গায়। পুলিশ কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না, এখন যদি আমরা কেসটা সলভ করে দিতে পারি, তা হলে ভাল হয়।'

'জী, সার।'

'গুডবাই, এমআরনাইন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। চিফের কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিছুদিন হলো ফরাসি পুলিশের সঙ্গে রানা এজেন্সির সম্পর্ক খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। দুটো কেস নিয়ে ওদের সঙ্গে খিটিমিটি বাধায় এ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভোগান্তিও পোহাতে হচ্ছে এর জন্য। ফ্রান্সে রানা এজেন্সির নতুন একটা শাখা খোলার কাজ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ হেডকোয়ার্টারের আপত্তির কারণে আটকে গেছে। ডরমেয়ার লেকের কেসটা সমাধানে পুলিশকে সাহায্য করলে সম্পর্কটা হয়তো স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সেইসঙ্গে ফরাসি বড়কর্তাদেরও দেখিয়ে দেয়া যাবে, ওদের স্থানীয় আইনরক্ষীদের চেয়ে রানা এজেন্সি অনেক বেশি কার্যকর; নতুন একটা শাখা খোলা হলে ওদেরই লাভ।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই

একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস। ইয়োরোপে অপারেশনের জন্য ফ্রান্সে বাড়তি একটি শাখা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। রাহাত খান তাই এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইছেন। পুলিশি তদন্তে নাক গলাবার নির্দেশ সরাসরি দিতে পারছেন না বলে কৌশলে বুঝিয়ে দিয়েছেন কী চাইছেন তিনি।

দেরি না করে এজেন্সির প্যারিস শাখা-প্রধান অর্জন ফরহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। ফ্লোটপ্লেন থেকে যে-এয়ারফিল্ডে বিশালদেহী দুর্বৃত্ত নেমে গেছে, সেখান থেকে লোকটার কোনও ট্রেইল পাওয়া যায় কি না, দেখতে বলল। কাজে লাগাতে বলল আণ্ডারওয়ার্ল্ডের ইনফর্মারদেরকেও। চেহারার বর্ণনা থেকে ওরা হয়তো চিনতে পারবে লোকটাকে।

অর্জনের সঙ্গে কথা শেষ করে স্টারফিশের ডেকে বেরিয়ে এল রানা। স্টারবোর্ড সাইডে রাজহাঁসের মত গর্বিত ভঙ্গিতে বসে আছে জলপরী। সমস্ত ডেন্টিং মেরামত করা হয়েছে, বদলে ফেলা হয়েছে ককপিটের আচ্ছাদনও। দেখে বোঝার উপায় নেই, দু'দিন আগে কী বিপদ পাড়ি দিয়ে এসেছে। ককপিটে ঢুকে ইনস্ট্রুমেন্ট চেকআপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জলপরীকে নিয়ে আজ পানিতে নামার ইচ্ছে আছে ওর। মেরামতের কাজ কতটা নিখুঁত হয়েছে, সেটা বোঝা দরকার।

চেকআপ শেষে সন্তুষ্ট হলো ও। সাবমারসিবলের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। গ্যালিতে গিয়ে ঢুকল নাশতা সারার জন্য।

লুনাকে পাওয়া গেল ওখানে।

'গুড মর্নিং,' হাসিমুখে বলল রানা। 'কেমন আছ? সুস্থ?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'হ্যাঁ। কিন্তু ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখছি, যেন বরফ চাপা পড়ে মরতে বসেছি।'

'এ-রোগের একটা চমৎকার চিকিৎসা জানি আমি। ডুবো সমাধিতে বেড়াতে যাবে?'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল লুনার। 'এমন লোভনীয় প্রস্তাব কে ফেরাতে পারে?'

'তা হলে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নাও। আমাদের বাহন অপেক্ষা করছে।'

বিশ মিনিট পরেই পানিতে ডুব দিল জলপরী। কো-অর্ডিনেট মিলিয়ে সমাধির প্রবেশপথে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। ভিতরে ঢোকার আগে একটু থামল রানা। হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বালল, ভিডিও ক্যামেরা চালু করল, তারপর থ্রাস্টারে সামান্য চাপ দিয়ে সামনে বাড়াল সাবমারসিবলকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সমাধির ভিতরে ঢুকে পড়ল জলপরী।

বিশাল অভ্যন্তর, বর্গাকার একটা চেম্বারের মত। হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলো বিপরীত প্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারছে না। ডানদিকের দেয়ালে আলো ফেলল রানা—চোখের সামনে ফুটে উঠল খোদাই করা প্রাচীন চিত্রলিপি। পালতোলা নৌকা, ঘরবাড়ি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নৃত্যরত মানুষ... কী নেই সেখানে! সবকিছুই অবশ্য পুরনো আমলের ডিজাইনে আঁকা, মানুষদের পোশাক-আশাক সচ্ছলতার আভাস দিচ্ছে।

ককপিটের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে রেখেছে লুনা, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে ড্রয়িংগুলো। ফিসফিসিয়ে উঠল, 'কী সুন্দর!'

ছবিগুলো চেনা চেনা লাগছে রানার কাছে। বলল, 'এ-জিনিস আমি আগে দেখেছি।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লুনা।

ভাবল রানা, মনে পড়ে যেতেই বলল, 'উত্তর আটলান্টিকে... ফ্যারো আইল্যাণ্ডের একটা গুহায়। স্টাইল আর বিষয়বস্তু ঠিক একই রকম লাগছে আমার কাছে। তোমার কী ধারণা?'

'এখুনি মন্তব্য করা ঠিক না, তাও বলছি, ড্রয়িংগুলো আমার কাছে মিনোয়ান বলে মনে হচ্ছে। স্যান্টোরিনি, বা আধুনিক ক্রিট দ্বীপের অ্যাক্রোটিরি-তে যেসব খোদাই পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে প্রচুর মিল দেখতে পাচ্ছি। মিনোয়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব পনেরো শ' শতকে। আর তার মানে হচ্ছে...' রানার দিকে তাকাল লুনা, চেহারায় উত্তেজনা, 'আমরা যা জানি, তারচেয়েও অনেক বেশি এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল মিনোয়ানরা।'

'ওরা তা হলে তোমার কাল্পনিক ট্রেড রুটের মিসিং লিঙ্ক?'

'ঠিক ধরেছ,' বলল লুনা। 'এই সমাধি প্রমাণ করে দিচ্ছে, পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য কয়েক হাজার বছর আগেও চালু ছিল।' হাততালি দিয়ে উঠল ও। 'প্যারিসে আমার কলিগদের মাথা ঘুরে যাবে এই আবিষ্কার দেখলে।'

ডানদিকের দেয়াল দেখা শেষ করে বাঁয়ের দেয়ালে চলে গেল রানা। এখানে ডরমেয়ার লেক আর গ্লেসিয়ারের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হ্রদের তীরে নানা রকম ঘরবাড়ি আর স্ট্রাকচার দেখা গেল।

'হুম, লেকের ধারে সেটেলমেন্টের ব্যাপারে তুমি ঠিকই অনুমান করেছিলে,' বলল রানা।

'মার্ভেলাস!' আনন্দে প্রায় নাচতে শুরু করেছে লুনা। 'এই ড্রয়িংটাকে ম্যাপ হিসেবে ব্যবহার করে আমরা সেটেলমেন্টের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করতে পারব।'

সময় নিয়ে পুরো চেম্বারে তল্লাশি চালাল ওরা, কিন্তু লাশ

রাখার কোনও সারকোফাগাস দেখতে পেল না। কখনও রাখা হতো বলেও মনে হলো না।

'ভুল করেছি আমরা,' শেষ পর্যন্ত বলল লুনা। 'এটা সমাধি না, মন্দির। উপাসনা করা হতো এখানে।'

'আমার-ও তাই মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে? পানিতে যখন নেমেছি, আমি আরেকটা রহস্যের সমাধান খুঁজতে চাই।'

'কী রহস্য?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

পকেট থেকে সাইড-সোনারের প্রিন্টআউট বের করল রানা, সঙ্গিনীর হাতে তুলে দিল। ভাঁজ খুলে ছবিটা কিছুক্ষণ দেখল লুনা। তারপর বলল, 'বিমানের মত লাগছে। কিন্তু এখানে বিমান এল কোত্থেকে?' পরমুহূর্তে সচকিত হলো। 'দাঁড়াও! গ্লেসিয়ারের ওই লাশটা?'

জবাব না দিয়ে রহস্যময় একটা হাসি উপহার দিল রানা। সাবমারসিবলের নাক ঘুরিয়ে বেরিয়ে এল ডুবো-মন্দিরের ভিতর থেকে। কো-অর্ডিনেট মিলিয়ে এগোতে থাকল ও, চোখ সেঁটে রয়েছে হ্রদের মেঝেতে। হঠাৎ একটা চুরুট আকৃতির বস্তু ভেসে উঠল দৃষ্টিসীমায়।

কাছে যেতেই সিলিণ্ডার আকৃতির কাঠামো দেখতে পেল ওরা, লাল রঙের ফ্যাব্রিক ছিঁড়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। নাকের অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদায়, হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ইঞ্জিনের জটিল যন্ত্রাংশ। প্রপেলারের চিহ্ন নেই, ভেঙেচুরে কোথায় চলে গেছে কে জানে! ঠাণ্ডা পানির কারণে কোনও শ্যাওলা জমেনি কোথাও।

ফিউজলাজ ঘিরে চক্কর দিল রানা। ভাঙা একটা ডানা দেখতে পেল পঞ্চাশ গজ দূরে। লেজ অক্ষত আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একটি প্রতীক—তিন-মাথা এক ঈগল, ধারালো [illegible]

আঁকড়ে ধরে রেখেছে বর্শা আর তীরের একটা গোছা।

'ওই প্রতীক আমি চিনি,' বলে উঠল লুনা। 'গ্লেসিয়ারে পাওয়া হেলমেটের গায়ে দেখেছি।'

'হেলমেটটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'জাহাজে। গ্লেসিয়ার থেকে বের হবার সময় নিয়ে এসেছি।'

ব্যাগে করে তা হলে লুনা শিরোস্ত্রাণটাই এনেছে, বুঝতে পারল রানা। অমন পরিস্থিতিতেও জিনিসটা ফেলে আসেনি... খাঁটি আর্কিয়োলজিস্ট বটে! ঈগলের দিকে চোখ ফেরাল ও, তারপর তাকাল বিমানের খালি ককপিটের দিকে।

'কী ঘটেছে বুঝতে পারছি,' রানা বলল। 'লেকে বিমানটা ক্র্যাশ করার আগে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকটা।'

'কিন্তু তাতে লাভ হয়নি,' যোগ করল লুনা। 'সম্ভবত মারাত্মক আহত হয়েছিল।'

'হুম।'

আরও কয়েকবার চক্কর দিল রানা, জলপরীর ভিডিও আর ডিজিটাল ক্যামেরায় নানা দিক থেকে ছবি তুলল। সন্তুষ্ট হবার পর মুখ ঘোরাল, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল সারফেসে। আজকের মত অভিযান শেষ।

আধঘণ্টার মধ্যে স্টারফিশের ডেকে পা রাখল দু'জনে। লুনা তার আবিষ্কারের কথা ভেবে আনন্দে উচ্ছল হয়ে আছে, কিন্তু গ্লেসিয়ারের দিকে চোখ পড়তেই চুপ হয়ে গেল।

ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'কী হয়েছে, লুনা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুনা। 'সেদিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, রানা। মৃত্যুর কত কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম! গ্লেসিয়ারটা যতবার দেখি, ততবারই ভয়ে হাত-পা সেঁধিয়ে যেতে চায় পেটের ভিতর। মনে হয় যেন ওটা গিলে খেতে চাইছে আমাকে।'

সঙ্গিনীর বিমর্ষ মুখটা কয়েক মুহূর্ত জরিপ করল রানা তারপর বলল, 'আমি সাইকোলজি বুঝি না, তবে অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মনের ভয়কে কাটানোর জন্য ভয়ের উৎসটার মুখোমুখি হওয়া ভাল।' হাসল ও। 'চলো, বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'কোথায়?' লুনা অবাক হলো।

'পিকনিকে,' বলল রানা। 'মেস থেকে হালকা খাবার আর থার্মোসে কফি নিয়ে নাও।'

'তুমি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই! যাও, দেরি কোরো না। আমি বোট নামানোর ব্যবস্থা করছি।'

একটু ইতস্তত করল লুনা, তবে রাজি হয়ে গেল। রানার উপর গত ক'দিনে অগাধ আস্থা সৃষ্টি হয়েছে ওর। দেখাই যাক, দুঃসাহসী লোকটা ওর মনের ভয় দূর করতে পারে কি না। মেসে চলে গেল ও। খাবারের প্যাকেট আর কফি নিয়ে যখন ফিরল, তখন রানা একটা বোট নামিয়ে ফেলেছে পানিতে। সেটায় চড়ে রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

গ্লেসিয়ারের গা ঘেঁষে নৌকা ভিড়াল রানা। পানির কিনার ধরে কয়েক পা এগোলেই বরফের এবড়োথেবড়ো প্রাচীর। অদ্ভুত এক নীল দ্যুতি যেন বেরুচ্ছে সেখান থেকে। লুনাকে প্রাচীরের পাশে নিয়ে গেল রানা। ওর হাত থেকে গ্লাভস্ খুলে নিয়ে বলল, 'যাও, ছুঁয়ে দেখো।'

দু'হাতের নগ্ন তালু প্রাচীরের গায়ে ঠেকাল লুনা, কেঁপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'বড্ড ঠাণ্ডা, রানা।'

'হ্যাঁ, কারণ ওটা স্রেফ একতাল বরফ, আর কিছু না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই ওর। তোমাকে গিলে খাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। চোখ বন্ধ করো, মনকে এ-কথাগুলো শোনাও। এর নাম অটোস্যাজেশন।'

বাধ্য মেয়ের মত চোখ মুদল লুনা। বিড়বিড় করে নিজেকে অটোসাজেশন দিল। অবাক ব্যাপার; হঠাৎ করেই নিজেকে খুব হালকা লাগল ওর। মন ফুরফুরে হয়ে গেছে, বুক ঢিব ঢিব করছে না আর ভয়ে। চোখ খুলে রানার দিকে তাকাল, হাসল।

'কী, বলেছিলাম না?' রানা বলল।

গ্লেসিয়ারের পাশ ছেড়ে চলে এল ওরা। হ্রদের তীরে একটা পরিষ্কার জায়গা খুঁজে বের করল। ওখানে বসে খাবারের প্যাকেট আর কফির থার্মোস-ফ্লাস্ক খুলল।

'ধন্যবাদ, রানা,' মৃদু গলায় বলল লুনা, 'আমার ভয়টা দূর করে দিয়েছ।'

'ও কিছু না,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। 'ভয় পাওয়া, আর তাড়ানো... দুটো বিষয়েই আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।'

'তুমি আবার ভয় পাও নাকি?' একটা ভুরু উঁচু হলো লুনার। 'দেখে তো মনে হয় না।'

'কে বলেছে? সেদিন তোমাকে নিয়ে আমি কত ভয় পেয়েছিলাম, জানো?'

'উঁহুঁ। তবে এ জানি, ওটা ভয় না মশাই, উদ্বেগ। আমি বলছি সত্যিকার ভয়ের কথা। তোমার মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও কখনও লক্ষ করিনি আমি।'

'রহস্যটা জানতে চাও?'

'কী?'

'আমি খুব ভাল অভিনয় জানি, ভয়কে কখনও চেহারায় ফুটতে দিই না।'

'যাহ্!'

'সত্যি বলছি। আমি তো রোবট নই, রক্ত-মাংসের মানুষ। ভয় থাকবে না কেন আমার?'

'ভয় পেলে আমাকে উদ্ধার করলে কীভাবে? যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছ তুমি বরফের তলার ওই টানেলে।'

'সবই আমার ট্রেইনিং আর অভিজ্ঞতার কেরামতি। বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে, কাজেই বাদ দাও প্রসঙ্গটা।'

'বললেই কি বাদ দেয়া যায়? যা ঘটে গেছে এই গ্লেসিয়ারে, তা কোনোদিন মন থেকে মুছতে পারব না। সবচেয়ে বড় কথা... কেন এসব ঘটল, কেন আমি মরতে বসেছিলাম... তা-ই জানি না।'

'এসো ওটা নিয়েই আলোচনা করি,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'কী জানি আমরা? আইস-মুভমেন্ট নিয়ে গবেষণা করছিলেন একদল বিজ্ঞানী, হঠাৎ বরফে জমাট বাঁধা একটা লাশ পাওয়া গেল। কাছাকাছি পাওয়া গেল একটা প্রাচীন হেলমেট আর স্ট্রংবক্স। সাংবাদিক এল, তাদের সঙ্গে এল একজন রহস্যময় লোক। পিস্তল দেখিয়ে স্ট্রংবক্সটা কেড়ে নিল সে, পালাবার পথে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুরো টানেল পানিতে তলিয়ে দিল। রাইট? একটা ব্যাপার এখানে অস্পষ্ট—শুধু স্ট্রংবক্স নিল কেন সে? হেলমেট কেন নিল না? ওটার খবর জানত না? নাকি প্রয়োজনীয় মনে করেনি জিনিসটা?'

'আমাদেরকেই বা খুন করতে চাইল কেন?' বলল লুনা। 'ওকে ঠেকাবার সাধ্য ছিল না আমাদের, এমনিতেই পালাতে পারত।'

'আমার ধারণা, লাশটার কাছে যাতে আর কেউ যেতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে চেয়েছে সে। তোমরা না থাকলেও বিস্ফোরণ ঘটাত।'

'হুঁ, তা অবশ্য হতে পারে...' বলতে বলতে থেমে গেল লুনা।

হালকা একটা শব্দ ভেসে এসেছে কানে। মাথা ঘুরিয়ে

তাকাতেই ধুলোর মেঘ দেখতে পেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ড. দ্যুঁবোয়ার সিত্রোঁ—ফিফি। ওদের কাছে এসে থামল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ফরাসি বিজ্ঞানী, সঙ্গে ক্যাসিডি আর কলিন্স।

'মসিয়ো রানা! আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি,' হাত মিলিয়ে বললেন দ্যুঁবোয়া। 'জাহাজে যোগাযোগ করেছিলাম, ওরা বলল আপনারা এখানে।'

'নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?' জানতে চাইল রানা।

'না, না, আমরা আসলে বিদায় নিতে এসেছি।'

'চলে যাচ্ছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল লুনা।

'হ্যাঁ,' ক্যাসিডি মাথা ঝাঁকাল। 'অবজারভেটরি পানির তলায়, এখানে বসে থেকে কোনও লাভ হচ্ছে না। তাই প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি, ওখান থেকে যে-যার বাড়িতে। পাওয়ার কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছে, ওরা যদি টানেল থেকে পানি বের করতে পারে, তা হলে আগামী মৌসুমে ফিরে আসব।'

'কীভাবে যাচ্ছেন?'

'একটা হেলিকপ্টার আসবে ঘণ্টাখানিকের মধ্যে।'

'হেলিকপ্টার?' চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল লুনার। 'আমাকে নেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

লুনার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তুমিও যেতে চাইছ?'

'এখানে আমার কাজ শেষ, রানা। যেসব ডেটা পেয়েছি, সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে তাড়াতাড়ি সংশ্লিষ্ট মহলের সামনে পেশ করা দরকার। দুঃখিত...'

'ইটস্ ওকে,' হাত তুলে ওকে থামাল রানা। 'দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই। এমন তো নয় যে, জীবনে আর দেখা হবে না

আমাদের। সত্যি বলতে কী, জলপরীর টেস্ট-ট্রায়ালও শেষ হয়ে গেছে; তাই আমারও আর কাজ নেই এখানে। স্টারফিশকে রওনা করিয়ে দিতে পারি।'

'প্যারিসে যাবে আমার সঙ্গে?'

'এখন সম্ভব না। একটা রিপোর্ট লিখতে হবে পুরো অভিযানের উপর। সেটা শেষ করে আসব নাহয়। ডিনার-ডেটের কথা ভুলিনি, তৈরি থেকো।'

'অবশ্যই!' হাসল লুনা। 'তবে একটাই শর্ত, ডিনারের বিল আমি দেব।'

'এমন লোভনীয় প্রস্তাব কে ফেরাতে পারে?' ওকে নকল করে বলল রানা। 'চলো, শিপে যাই। তোমার জিনিসপত্র নিশ্চয়ই আনতে হবে?'

'আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি,' বিজ্ঞানীদের বলল লুনা।

'ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করব,' বলল ক্যাসিডি।

স্টারফিশে ফিরে এল ওরা। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল লুনা। ওকে বোটে তুলে দিতে ডেক পর্যন্ত এল রানা। যাবার আগে ওকে জড়িয়ে ধরল লুনা। ঠোঁটে হালকা চুমু খেয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ, রানা।'

'প্রাণ বাঁচিয়েছি বলে?'

'উহুঁ, সবকিছুর জন্য। প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদান তোমাকে আমি প্যারিসে দেব।'

'টোপ দিচ্ছ, যাতে যেতে বাধ্য হই?'

'তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই, মাসুদ রানা। টোপ না দিলে আর তোমার দেখা পাবো না।'

রানা চোখ টিপল। 'টোপের প্রয়োজন নেই। আমি এমনিতেই আসব।'

'মনে থাকে যেন।'

বোটে উঠে গেল লুনা। হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল রানা। তারপর ঢুকল শিপের রিমোট-সেন্সিং ল্যাবে। জলপরী থেকে ভিডিও ক্যামেরার ক্যাসেট আর ডিজিটাল ডিস্ক নিয়ে এসেছে। কম্পিউটারে ঢোকাল সবকিছু। তারপর ছবি আর ভিডিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। একটু পর বুঝতে পারল, ওর ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই বিমানের রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। সাহায্য দরকার।

স্যাটেলাইট টেলিফোনের অ্যান্টেনা টেনে লম্বা করল ও, তারপর মেমোরিতে রাখা একটা সংখ্যা টিপল।

দশবার রিং হবার পর গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বলছি।'

'হ্যালো, পচা আবর্জনা।'

'রানা!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বিউ মরটন, গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছে। 'তুমি রিং করেছ জানলে আরও আগে ধরতাম।'

'আর নিজের চরিত্র ভেঙে বেরিয়ে আসতে? বিশ্বাস করি না।'

ছবিটা পরিষ্কার ভাসছে রানার চোখের সামনে—সিল্ক পা'জামায় মোড়া পুরো চারশো পাউণ্ড ওজনের প্রকাণ্ড একটা শরীর নিয়ে পাহাড়ের মত উঁচু বই-পুস্তকের মাঝখানে ডুবে আছে মানুষটা। প্রাচীন নৌ-পথ আর নৌ-যান সম্পর্কে এত পড়াশোনা দুনিয়ার আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। মানুষ, সাগর আর ইতিহাস সম্পর্কে সচল এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায় তাকে।

'কোত্থেকে বলছ?' জানতে চাইল মরটন।

'ফ্রেঞ্চ আল্পসের মাঝখানে একটা হ্রদ থেকে।'

'নতুন প্রজেক্ট? থাক, বলতে হবে না। তোমার সব

অ্যাসাইনমেন্টই তো টপ সিক্রেট। অধমকে স্মরণ করেছ কেন, সেটা বলো।'

'পুরনো একটা বিমান সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার।'

'ভুল নাম্বারে ডায়াল করে ফেলেছ নাকি?' দ্বিধান্বিত গলায় বলল মরটন। 'আমি সাগরের বিশেষজ্ঞ, আকাশের নই।'

'এই বিমানটা পানির তলায় শুয়ে আছে।'

'ইন্টারেস্টিং! কী বিমান?'

'সেটাই জানা দরকার। তোমার কম্পিউটার অন্ করো, আমি ই-মেইলে একটা ছবি পাঠাচ্ছি।'

'পাঠাও, তবে কতটুকু সাহায্য করতে পারব, জানি না। অ্যান্টিক এয়ারক্র্যাফটের ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই কম।'

'আমার চেয়ে তো বেশি। পুরনো বইপত্র ঘাঁটো, বিমান সম্পর্কেও নিশ্চয়ই পড়াশোনা আছে?'

'কিছুটা। দেখি তোমার কাজে আসে কি না।'

ভাল একটা ছবি ই-মেইলে পাঠাল রানা। সেটা দেখে নিয়ে মরটন বলল, 'হুম, আন্দাজে তীর ছুঁড়তে হবে, তবে ইঞ্জিন হাউজিং দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা *মোরান-সলনিয়ের*। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মনো-উইংড্ ফাইটার বিমান। সে-আমলের আর কোনও বিমান এটার ধারেকাছে ছিল না। গান আর প্রপেলারের সিংক্রোনাইজেশন সিস্টেমটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। কপাল ভাল তোমার, যে-ক'টা অ্যান্টিক বিমান সম্পর্কে ভাল করে জানি আমি, তার মধ্যে এটা একটা।'

'এমন কোনও বিমান আল্পসে ক্র্যাশ করেছিল কি না, জানা আছে তোমার?'

'উঁহুঁ। বিমান-দুর্ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। তবে আমার পরিচিত একজন এয়ার-হিস্টোরিয়ান আছে... ফ্রান্সেই থাকে, প্যারিসের কাছে। তার নাম্বার দেব?'

'দাও।'

মরটনের কাছ থেকে নাম্বারটা নিল রানা। তারপর ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল। একটু পরেই নতুন নাম্বারটায় ডায়াল করতে শুরু করল। জটিল এক রহস্যের খোঁজ পেয়েছে, এ-রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

তেরো

একরাশ হতাশা নিয়ে মোটা বইটা সশব্দে বন্ধ করল লুনা, সরিয়ে রাখল সামনে থেকে। টেবিলের উপর একই রকম আরও কয়েকটা বই আছে, কোনোটাই ওর কাজে আসেনি। মাঝখান থেকে কোমর-ব্যথা হয়ে গেছে বসে থাকতে থাকতে। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল ও, তাকাল টেবিলের উপর রাখা শিরোস্ত্রাণটার দিকে। জড় এক বস্তু, যুদ্ধের হাতিয়ার, তারপরও ওটার কালচে শরীরের দিকে তাকালে গা শিরশির করে ওঠে। যেন প্রাণ আছে, মানুষের মুখের আদলে তৈরি করা ভাইজরটা কথা বলে উঠবে এখুনি।

তিনদিন কেটে গেছে আল্পস্ থেকে ফিরে আসার পর। ইতিমধ্যে ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল সোসাইটিতে অ্যাম্বার রুট সংক্রান্ত সব তথ্য-প্রমাণ জমা দিয়েছে লুনা। সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য কয়েকদিন সময় চাওয়া হয়েছে সোসাইটি থেকে। হাতে আপাতত কাজ নেই, তাই উঠে পড়ে

লেগেছিল শিরোস্ত্রাণ নিয়ে, ওটার পরিচয় আর উৎস জানার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কাজে নেমে বুঝতে পারছে, কাজটা অত সহজ নয়। দুর্জ্ঞেয় এক রহস্য ঘিরে আছে ওটাকে।

জানাশোনা শিরোস্ত্রাণগুলোর সঙ্গে ওটাকে মেলানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শুরুতে ফ্রান্স, তারপর ইটালি আর জার্মানির ইতিহাস ঘেঁটেছে লুনা; মধ্যযুগে বর্ম তৈরিতে এ-তিনটে দেশ শীর্ষে ছিল। কিন্তু ফরাসি, ইতালীয়, বা জার্মান শিরোস্ত্রাণের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়নি। এরপর ক্রমান্বয়ে পুরো ইয়োরোপ, এশিয়া, আর বাকি পৃথিবীর আর্কাইভ দেখেছে ও; গবেষণা করেছে ব্রোঞ্জ সভ্যতার সময় পর্যন্ত। ফলাফল লবডঙ্কা।

শিরোস্ত্রাণটার সবকিছুই পরস্পরবিরোধী। শৈল্পিক দিক থেকে অতুলনীয়, কিন্তু নকশা দেখে মনে হয় না ওটা যুদ্ধে ব্যবহার হতো। সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবেই ওটা বেশি মানানসই। ডিজাইন বলছে অন্তত এগারো শতকের জিনিস, ওজনও তেমন, অথচ এমন সব খুঁটিনাটি আছে, যা ষোড়শ শতকের আগে দেখা যায়নি। যেমন: উপরিভাগের একটা মুকুট-সদৃশ অংশ—বল্লম বা তলোয়ারের আঘাত সরাসরি হেলমেটের গায়ে না লাগার জন্য ওটা রাখা হতো। তবে সেটা মধ্যযুগের শেষাংশে। ভাইজরটাও অদ্ভুত, ওটার জন্য দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে যায়। মধ্যযুগের যোদ্ধাদের কখনোই এমন ভাইজর-অলা হেলমেট ব্যবহার করার কথা নয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিরোস্ত্রাণের ইস্পাত। অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম ইস্পাত তৈরি শুরু হয়, তবে সেটার মানগত উন্নয়ন ঘটতে প্রচুর সময় লেগেছে। হেলমেটের ইস্পাতটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। নির্মাণশৈলী প্রমাণ করে, অত্যন্ত দক্ষ কোনও কারিগরের হাতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই কারিগরের কোনও চিহ্ন বা স্বাক্ষর নেই কোথাও। থাকার কথা ছিল।

একটাই উপায় আছে এখন। কোনও মেটালারজিস্ট... মানে ধাতু-বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে জিনিসটা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে হয়তো বলতে পারবে—কবে, কোথায়, বা কার হাতে তৈরি হয়েছে এই শিরোস্ত্রাণ। পুরনো আমলের কারিগরদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, ধাতু-বিশেষজ্ঞই শুধু খুঁজে বের করতে পারবে সেই বৈশিষ্ট্য। কার কাছে নেবে, তা ভাবতেই একটা মাত্র নাম মনে পড়ল। দিদিয়ের দেশম।

ফোন করল লুনা। ওপাশ থেকে ভেসে এল ভরাট, মার্জিত কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো, দেশম অ্যান্টিকুইটিস।'

'দিদিয়ের, লুনা পারসেল বলছি।'

'আহ্, লুনা!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল দেশম। 'কেমন আছ তুমি? আল্পসের ওই দুর্ঘটনায় নাকি তুমিও ছিলে?'

'হ্যাঁ, ওটার কারণেই যোগাযোগ করছি তোমার সঙ্গে। একটা হেলমেট পেয়েছি আল্পসের অভিযানে। অদ্ভুত... কোনও আগামাথা পাচ্ছি না। তুমি একটু চোখ বোলাবে?'

'কেন? কম্পিউটার বুঝি হার মেনেছে?' টিটকিরির সুরে বলল দেশম। প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে দুজনের মধ্যে অম্লমধুর বিতর্ক রয়েছে—দেশমের ধারণা, প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত না। হাতেকলমেই সবকিছু করা উচিত, তাতে অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান... দুটোই বাড়ে। কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য লুনা কম্পিউটারের ডেটাবেজ ব্যবহারের পক্ষপাতী।

'কম্পিউটারের কোনও দোষ নেই,' বিরক্ত গলায় বলল লুনা। 'আমি আমার লাইব্রেরির বইপত্রও ঘেঁটে দেখেছি, কিন্তু জিনিসটা কিছুতেই আইডেন্টিফাই করতে পারছি না।'

'কী বলছ!' একটু অবাক হলো দেশম। লুনার রেফারেন্স

লাইব্রেরি দেখেছে সে, অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেখান থেকে দুনিয়ার যে-কোনও প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র বা বর্মের পরিচয় জানা যাবার কথা।

'আমি সিরিয়াস, দিদিয়ের। হেলমেটটা আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'কৌতূহল তো বাড়িয়ে দিলে, মেয়ে! হাতে তেমন কাজ নেই, চাইলে এখুনি নিয়ে আসতে পারো।'

'ঠিক আছে, আসছি।'

ফোনাযোগ রেখে দিল লুনা। বালিশের একটা কাভারে মোড়াল শিরোস্ত্রাণটা, প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে ভরল। তারপর মেট্রো ট্রেন ধরে চলে গেল *ল্য রিভ দোয়াত*-এ। ওখানেই দেশমের অ্যান্টিক শপ।

প্রথম দেখায় দোকানটা কারও মনেই আকর্ষণ সৃষ্টি করবে না। ছোট্ট, ধুলো-বালিতে ঢাকা, সাইনবোর্ড পড়া যায় কি যায় না। ডিসপ্লে-তেও সস্তা দরের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তবে এ-সবই হচ্ছে এক ধরনের ছদ্মবেশ... কৌতূহলী লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার কৌশল। ট্যুরিস্টরা দেশমের দু'চোখের বিষ, সিরিয়াস ক্রেতা ছাড়া আর কারও সঙ্গে ব্যবসা করায় আগ্রহ নেই ওর। সে-ধরনের ক্রেতারা দোকানের জাঁকজমক নিয়ে মাথা ঘামায় না, দেশমের নামডাক শুনে তবেই আসে।

লুনা দোকানে ঢুকতেই দরজায় বাঁধা ঘণ্টা টুনটুন করে বেজে উঠল। ভিতরে কাউকে দেখা গেল না, কাউন্টার শূন্য পড়ে আছে। তবে কয়েক মুহূর্ত পরই পিছনের পর্দা ঠেলে এক লোক উদয় হলো—কালো রঙের পোশাক পরা, ইঁদুরমুখো চেহারা। লুনার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর গলুই সিগারেট টানতে টানতে হাজির হলো দেশম। মাঝবয়েসী, মাথার সব চুল ইতিমধ্যে সাদা হয়ে গেছে,

ঝুঁটির মত বেঁধে রেখেছে পিছনে। চোখের তারায় বরাবরের মত বুদ্ধির ঝিলিক

'লুনা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দেশম। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে জড়িয়ে ধরল অতিথিকে, গালে চুমো খেল। 'খুব তাড়াতাড়ি এসেছ। দেখছি। নিশ্চয়ই হেলমেটটা বিশাল কোনও আবিষ্কার!'

'সেটা তুমি কনফার্ম করবে। এইমাত্র বেরুল... লোকটা কে?'

'ও? আমার এক সাপ্লায়ার।'

'দেখে তো চোরের মত লাগল।'

হাসল দেশম। 'আমার অনেক সাপ্লায়ার-ই চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। তাই বলে নাক সিঁটকাতে পারি না। আফটার অল, ওরাই আমার রুটি-রুজির উৎস।'

দোকানের দরজার ছিটকিনি তুলে দিল সে, *ক্লোজড্* সাইন ঝুলিয়ে দিল। তারপর পর্দা সরিয়ে লুনাকে নিয়ে গেল তার ব্যক্তিগত কামরায়। ওঅর্কশপের আদলে সাজানো হয়েছে কক্ষটা। প্রশস্ত, সুন্দরভাবে আলোকিত। চারপাশের দেয়ালে শো-কেস, সেখানে নানা ধরনের আর্টিফ্যাক্ট শোভা পাচ্ছে। মাঝখানে রয়েছে ওঅর্ক-টেবিল, এক পাশে অফিস ডেস্ক। ডেস্কের উপর কম্পিউটার। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কম্পিউটারের ব্যবহার নিয়ে লুনাকে খোঁটা দিলেও দেশমের বেশিরভাগ বেচাকেনাই চলে ইন্টারনেটে। ই-মেইলের মাধ্যমে বাছাই করা একদল প্রথম শ্রেণীর ক্রেতার কাছে ক্যাটালগ পাঠায় সে, ওরাও একই পদ্ধতিতে নিজেদের পছন্দ জানায়। টাকা-পয়সার লেনদেন হয় ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্কিঙের মাধ্যমে। শুধুমাত্র বিক্রিত দ্রব্যটিই প্যাকেজিং করে পাঠানো হয়, বাকি সবকিছু সারা হয় কম্পিউটারে।

দেশমের সঙ্গে লুনার প্রথম পরিচয় হয় কয়েক বছর আগে, একটা জাল আর্টিফ্যাক্ট শনাক্ত করার জন্য সাহায্য নিতে হয়েছিল দেশমের। অল্পদিনেই ও আবিষ্কার করে, পুরনো আমলের যুদ্ধাস্ত্রের বিষয়ে লোকটার গভীর জ্ঞান রয়েছে: বেশিরভাগ অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতই তার ধারে-কাছেও লাগে না। অগত্যা বিভিন্ন সময়ে দেশমের সাহায্য নিতে শুরু করে লুনা, ধীরে ধীরে বন্ধু হয়ে ওঠে ওরা। অ্যান্টিক এবং আর্টিফ্যাক্টের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ আছে দেশমের, এ-কথা অজানা নয়; কিন্তু এ-ও সত্যি, ওই যোগাযোগের ফলেই গোপন অনেক তথ্য তার নাগালের মধ্যে থাকে। লুনা তাই বন্ধুত্বটা অটুট রেখেছে।

'দেখাও তোমার হেলমেট,' ওঅর্কশপে ঢুকে বলল দেশম।

ব্যাগ থেকে শিরোস্ত্রাণটা বের করল লুনা, ওঅর্কটেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

চারপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে জিনিসটা দেখল দেশম। ঘন ঘন টান দিচ্ছে সিগারেটে, একটা শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ধরাচ্ছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, চমৎকৃত হয়েছে সে। দূর থেকে দেখল হেলমেটটা, কাছে গিয়ে প্রায় নাক ঠেকিয়ে দেখল, তারপর তুলে নিল হাতে। ওজন পরখ করল, শেষে পরল নিজের মাথায়। কিছু বলল না, হেলমেট পরেই গটমট করে চলে গেল একটা শো'কেসের সামনে, নীচের শেলফের ঢাকনা খুলে একটা পেটমোটা বোতল বের করল।

'ব্র্যাণ্ডি?' অবশেষে মুখ খুলল সে।

শিরোস্ত্রাণে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে দেশমকে, হাসি চাপতে পারল না লুনা। খিলখিল করে উঠে বলল, 'দাও। তবে তোমার হাতে ব্র্যাণ্ডির বোতল না, একটা গদা দেয়া দরকার। সার্কাসের জোকার হিসেবে খুব মানিয়ে যাবে।'

দেশমও হাসল। মাথা থেকে শিরোস্ত্রাণ খুলে টেবিলে

নামিয়ে রাখল, তারপর দুটো গ্লাসে ঢালল ব্র্যাণ্ডি। একটা বাড়িয়ে ধরল লুনার দিকে।

'তারপর?' ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে ভুরু নাচাল আর্কিয়োলজিস্ট। 'কী বুঝলে?'

'চমৎকার জিনিস, তাতে সন্দেহ নেই,' বলল দেশম। 'কোত্থেকে উদ্ধার করেছ, জানতে পারি?'

'ল্য ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার থেকে। বরফের আটশো ফুট গভীরে পেয়েছি।'

'গ্লেসিয়ার? ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো!'

'পুরোটা শোনোই না! জিনিসটা পাওয়া গেছে বরফে জমাট বাঁধা একটা লাশের পাশে। অথচ লোকটা মারা গেছে বড়জোর একশো বছর আগে। আমাদের ধারণা, লোকটা পাইলট... প্যারাশুট নিয়ে লাফ দিয়েছিল একটা প্লেন থেকে। প্লেনটাকে ডরমেয়ার লেকের তলায় স্পট করতে পেরেছি আমরা।'

হেলমেটের গায়ের ফুটোটাতে আঙুল বোলাল দেশম। 'এটা?'

'সম্ভবত বুলেটের গর্ত।'

অবাক হলো না দেশম। বলল, 'তারমানে এটা ওই পাইলটের মাথায় পরা ছিল?'

'বোধহয়।'

'অমনটা ভাবছ কেন?'

'হেলমেটের ইস্পাত-টা দেখো। ভীষণ শক্ত। পুরনো আমলের মাস্কেট বল এ-জিনিস ফুটো করতে পারবে না। সেজন্য চাই আধুনিক যুগের বুলেট... হাই ক্যালিবারের বুলেট।'

'কী বলছ, বুঝতে পারছ?' ভুরু কোঁচকাল দেশম। 'প্রাচীন এক শিরোস্ত্রাণ পরে একটা মানুষ উড়ে যাচ্ছিল গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে। তাকে গুলি করা হয়েছে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের

সাহায্যে!'

'জানি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে। কিন্তু আর কোনও ব্যাখ্যা তো পাচ্ছি না।'

'হুম, আমাকে গোড়া থেকে সব শোনাও। দেখি কিছু বুঝতে পারি কি না।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল লুনা। বলতে শুরু করল ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে ওর অভিজ্ঞতার কাহিনি--কীভাবে হেলমেট আর স্ট্রংবক্স পাওয়া গেল, কীভাবে বিশালদেহী এক লোক হামলা চালাল, কীভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করা হলো ওদেরকে।

সব শোনার পর মাথা ঝাঁকাল দেশম। বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। মসিয়ো মাসুদ রানা মনে হচ্ছে খুবই দুঃসাহসী লোক।'

'শুধু দুঃসাহসী নয়; নিঃস্বার্থ, পরোপকারী...' বলতে বলতে থেমে গেল লুনা। গাল আরক্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে, প্রশংসা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে নিজের দুর্বলতা।

মুচকি হাসল দেশম। 'যা-ই হোক, ভদ্রলোকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত দেখি, লুনা। কিছু হয়ে গেলে খুব কষ্ট পেতাম।'

'মার্সি, দিদিয়ের,' বলল লুনা। 'এখন বলো, কী বুঝলে তুমি আমার গল্প থেকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল দেশম। 'জটিল রহস্য, তাতে সন্দেহ নেই। তবে শিয়োরাণটাদ ব্যাপারে নির্দ্বিধায় দু-একটা মন্তব্য করতে পারি।'

'যেমন?'

'যতটা দেখাচ্ছে, তার চেয়েও প্রাচীন এটা। তোমার কথা

ঠিক, ইস্পাতটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। এ-ধরনের নমুনা আগে কখনও দেখিনি আমি, তুমিও তোমার লাইব্রেরি তছনছ করে জিনিসটার রেফারেন্স পাচ্ছ না। কাজেই ধরে নিতে দোষ নেই, এটা একটা প্রোটোটাইপ।'

'কোনও খুঁত দেখতে পাচ্ছি না এতে,' লুনার কণ্ঠে ক্ষীণ প্রতিবাদ ফুটল। 'যদি প্রোটোটাইপ-ই হবে, তা হলে পরবর্তীতে এই মডেলের মাস-প্রোডাকশন করা হয়নি কেন?'

'মানুষের স্বভাব তো জানো। ভাল জিনিস সবসময় হালে পানি পায় না। পোলিশরা প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান ট্যাঙ্ক ডিভিশনের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী নামিয়েছিল। এরিয়াল বম্বিঙের গুরুত্ব বোঝাতে বিলি মিচেলকে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এই হেলমেটের ব্যাপারেও হয়তো তেমন কিছু ঘটেছে। কেউ হয়তো বলেছে, নতুন হেলমেটের দরকার কী? পুরনোগুলোই তো ভাল সার্ভিস দিচ্ছে!'

'হতে পারে,' স্বীকার করল লুনা। 'আর ঈগলের প্রতীকটা? ওটার ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?'

'অচেনা প্রতীক,' দেশম বলল। 'কী বোঝাতে চাইছে, তা জানি না। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে পারি, তবে সেটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হবে না।'

'অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই শুনি না।'

চোখে একটা চশমা লাগাল দেশম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রতীকটা। তারপর বলল, 'তিন-মাথা ঈগল... আমি বলব, এটা একটা জোটের চিহ্ন—তিনটে পক্ষ একত্রিত হয়েছে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য। থাবায় অস্ত্রশস্ত্র ধরা আছে... কাজেই যুদ্ধ বা লড়াইয়ের সঙ্গে এই জোটের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি।'

'অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে মন্দ বলোনি,' প্রশংসা করল লুনা।

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

'তা তো বটেই, সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের কোনও উপায় নেই যখন!' দেশম হাসল। তারপর তাকাল হাতঘড়ির দিকে। 'কিছু মনে কোরো না, লুনা। লণ্ডনের এক ডিলারের সঙ্গে এখন আমার ই-কনফারেন্সে বসতে হবে। হেলমেটটা চাইলে রেখে যেতে পারো, আমি সময় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখব।'

'ঠিক আছে, থাকুক।' বলে উঠে দাঁড়াল লুনা। 'তোমার কাজ শেষ হলে আমাকে রিং দিয়ো। অফিসে কিংবা বাসায় থাকব।'

'সাবধানে থেকো,' গম্ভীর গলায় বলল দেশম। 'বিপদ হতে পারে। স্ট্রংবক্স তো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, হেলমেটের উপরও চোখ পড়তে পারে ওদের। এটা যে তোমার কাছে, তা কে কে জানে?'

'রানা জানে... আর টানেলে যারা আটকা পড়েছিলাম।'

'লেগ্রাঁ ছিল ওদের মধ্যে, তাই না? ওকে নিয়েই ভয়।'

'লেগ্রাঁকে আমি থোড়াই পরোয়া করি,' সরোষে বলল লুনা। 'হেলমেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখুক, বাকি আঙুলগুলোও ভেঙে দেব।'

'আমি সিরিয়াস, লুনা,' বলল দেশম। 'ও যদি জিনিসটা চেয়ে বসে, কী করবে তুমি? আফটার অল, এটা একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ... আর লেগ্রাঁ সরকারের লোক।'

'চেয়েছে তো! এরই মধ্যে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে আমার সঙ্গে, আমি পাত্তা দিইনি। ঘোরাচ্ছি। যদি বেশি জোরাজুরি করে, বলব হেলমেটটা পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি। রিল্যাক্স, ওকে সামলাতে পারব। কিচ্ছু ভেবো না।'

ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতে তুলতে দেশম বলল, 'ফোন এসে গেছে। এখন তা হলে এসো। পরে কথা হবে।'

দোকান থেকে বেরিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের পথে রওনা হলো লুনা, ফোনের অ্যান্সারিং মেশিন চেক করে দেখবে—রানা

যোগাযোগ করেছে কি না। দেশমের সামনে ড্যামকেয়ার ভাব দেখিয়ে এলেও গা শিরশির করছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, বিপদের কালো মেঘ ঝুলছে মাথার উপর। কেন যেন মনে হচ্ছে, রানার কণ্ঠ শুনলে ভয়টা দূর হয়ে যাবে।

ল্যাটিন কোয়ার্টারের *মুফেতার*-এ লুনার অ্যাপার্টমেন্ট। ব্যস্ত এলাকা। দালানটা পুরনো, এককালে টাউন হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হতো; এখন অ্যাপার্টমেন্টে রূপান্তর করা হয়েছে। তিনতলায় থাকে লুনা, লাগোয়া ব্যালকনি থেকে প্যারিসের প্রাচীন অংশের সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। মনেই হয় না, সময়টা একবিংশ শতক। বাড়িতে ফিরেই প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা ব্যালকনিতে কাটায় লুনা, কফি কিংবা চা খেতে খেতে ঐতিহাসিক ইমারতগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করে। নিজেকে তখন মধ্যযুগের নিঃসঙ্গ রাজকন্যার মত মনে হয়।

আজ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটল। ব্যালকনিতে গেল না, বাসায় ঢুকে প্রথমেই আন্সারিং মেশিনের টেপ বাজিয়ে দেখল লুনা। রানার কোনও মেসেজ নেই তাতে। কোথায় গেল লোকটা? এখনও যোগাযোগ করছে না কেন?

ক্লান্তি অনুভব করছে লুনা। সোফায় আধশোয়া হয়ে টিভি ছাড়ল। এখন আর কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, স্নায়ুর বিশ্রাম দরকার। টিভির পর্দায় রঙের ঝিলিমিলি দেখতে দেখতে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে অগাস্টিন লেগ্রাঁ কী করছে, তা জানলে ঘুমাতে পারত না লুনা। নিজের অফিসে বসে আছে লোকটা, রাগে ফুঁসছে। ডেস্কের উপর ঝুঁকে মোটাসোটা একটা ফাইল সাজাচ্ছে, তাতে লুনা পারসেলের বিরুদ্ধে অসংখ্য নালিশ রয়েছে। বেয়াদব, বেয়াড়া মেয়েটাকে শায়েস্তা না করে তার শান্তি নেই।

ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে চরম অপমান করেছে তাকে সবার সামনে, এখনও অগ্রাহ্য করে চলেছে। প্রাচীন হেলমেটটার জন্য কয়েকবার লুনাকে ফোন করেছে লেগ্রাঁ, মেয়েটা কথাই বলতে রাজি হয়নি। একই বিল্ডিঙে অফিস দুজনের, আজ সকালে এলিভেটরে দেখা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কথা বলেনি লুনা, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, সাধারণ ভদ্রতাটুকু দেখায়নি!

সেই থেকে মাথায় আগুন জ্বলছে লেগ্রাঁর। যথেষ্ট হয়েছে, আর না। এবার প্রতিশোধ নেবে সে। চরম প্রতিশোধ! ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে লুনার। জীবনে যেন কোথাও আর্কিয়োলজিস্টের পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করে ছাড়বে। এ-জন্য যত জায়গায় ধরনা দিতে হয়, দেবে। যত সুতো টানতে হয়, টানবে। নিজের সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে মেয়েটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে সে। লুনা পারসেল তখন টের পাবে, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিল। আজ সারাদিন ধরে সে নালিশ জড়ো করেছে, রিপোর্ট লিখেছে। এখন সব সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে ফাইলে। এই ফাইল আগামীকাল আর্কিয়োলজিকাল বোর্ডের সামনে পেশ করবে। বোর্ডে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের সময় সাহায্য করেছিল সে, সেই উপকারের প্রতিদান চাইবে।

লুনা পারসেলের অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনার সাগরে ভাসছিল লেগ্রাঁ, সচকিত হয়ে উঠল দরজা খোলার শব্দ পেয়ে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই বুকের রক্ত ছলকে উঠল।

বিশালদেহী একজন মানুষ এসে ঢুকেছে তার অফিসে। গ্লেসিয়ারে দেখা সেই ভুয়া সাংবাদিক! এই লোকই স্ট্রংবক্স ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, থেঁতলে দিয়েছিল ওর হাতের আঙুল।

ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল লেগ্রাঁর। না চেনার ভান করল লোকটাকে। গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'ইয়েস? কী

করতে পারি আপনার জন্য?'

কয়েক পা এগিয়ে এল লোকটা। থমথমে গলায় বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'ইয়ে... জী না। এই অফিসে কাজ করেন?'

'কানের লতি যখন কেটে নেব, তখন বুঝবে আমি কোথায় কাজ করি।'

'প্লিজ,' অনুনয় করল লেগ্রাঁ, অভিনয়ে ক্ষান্ত দিয়েছে, 'আমি কোনও ঝামেলা চাই না। কী চান আপনি আমার কাছে?'

'টিভিতে দেখেছি তোমাকে,' বলল লোকটা। 'গ্লেসিয়ারের তলায় অনেককিছু পেয়েছ বলে জানিয়েছ। আমি তো শুধু বাক্সটা নিয়েছি। আর কী ছিল ওখানে?'

নিচু গলায় নিজেকে শাপশাপান্ত করল লেগ্রাঁ। আল্পস্ থেকে ফেরার পর টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছে সে, গলাবাজি করে নিজেকে হিরো প্রমাণের চেষ্টা করেছে। একার চেষ্টায় বহু আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করেছে, সাহসিকতার সঙ্গে সঙ্গীদের উদ্ধার করে এনেছে... এসব বলেছে। ব্যাপারটা যে গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে, কে জানত!

'কথা বলো!' ধমকে উঠল বিশালদেহী।

'ইয়ে... আমি আসলে বাড়িয়ে বলেছি। মাত্র দুটো জিনিস পাওয়া গেছে ওখানে—বাক্স আর পুরনো একটা হেলমেট। আর কিছু না।'

'হেলমেটটা এখন কোথায়?'

'আমাদের সঙ্গের একটা মেয়ে ওটা বের করে নিয়ে এসেছে। ওর কাছেই আছে।'

'কে এই মেয়ে?'

নিষ্ঠুর এক আনন্দে লাফিয়ে উঠল লেগ্রাঁর হৃৎপিণ্ড। ভয়ঙ্কর বদমাশটাকে লুনার পিছনে লেলিয়ে দেয়ার সুযোগ দেখতে

পাচ্ছে। মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বলল, 'ওর নাম লুনা পারসেল। আর্কিয়োলজিস্ট। এই বিল্ডিঙেই অফিস... তিনতলায়। রুম নাম্বার ২১৬।' গলার স্বর খাদে নামিয়ে আনল। 'যা খুশি করতে পারেন ওকে নিয়ে। আমি কাউকে কিছু বলব না।'

উল্টো ঘুরল বিশালদেহী। দরজার দিকে চলে যাচ্ছে। স্বস্তি অনুভব করল লেগ্রাঁ। যাক, ব্যাটার মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়া গেছে।

ওর ধারণা ভুল। ডোরনবে হাত দিতে গিয়ে থেমে গেল লোকটা, লেগ্রাঁর দিকে ফিরল আবার।

'আর কিছু?' জানতে চাইল লেগ্রাঁ।

'হ্যাঁ... ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমাকে মরতে হবে।'

পরমুহূর্তে জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করে আনল বিশালদেহী। মৃদু শব্দ হলো, লেগ্রাঁর কপালে সৃষ্টি হলো তৃতীয় নয়ন। হুড়মুড় করে ডেস্কের উপর পড়ে গেল সে, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এখন শুধু খিঁচুনি দিচ্ছে দেহটা।

লাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না আততায়ী, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

চোদ্দ

রানার মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে একটা অ্যান্টিক বিমান,

পদার্থবিদ্যা আর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মনীতিকে অগ্রাহ্য করে ব্যালে নর্তকীর মত নেচে চলেছে আকাশের বুকে। প্যারিসের দক্ষিণে, এক টুকরো ঘেসো জমিতে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মুগ্ধ চোখে দেখছে যান্ত্রিক পাখিটার কসরত। এরিয়াল স্পাইরাল করল বিমান, তারপর হাফ-আপওয়ার্ড লুপ, সবশেষে হাফ রোল... নিখুঁত *ইমেলম্যান ম্যানুভার*-এর মাধ্যমে দিক পাল্টাল। নিজের অজান্তে হাততালি দিয়ে উঠল রানা।

একটু পরেই সজোরে ভূমির দিকে ছুটে এল বিমান। বাইসাইকেল-স্টাইল ল্যাণ্ডিং গিয়ার চুমো খেল মাটিকে। গোটা কাঠামো পিংপং বলের মত ড্রপ খেল কয়েকটা, তারপর গতি কমিয়ে হ্যাঙারের সামনে এসে থেমে গেল।

দুই ব্লেডের কাঠের প্রপেলারের ঘূর্ণন শেষ হতেই মাঝবয়েসী একজন রোগা-পাতলা মানুষ নেমে এলেন ছোট্ট ককপিট থেকে। গগলস্ খুলে হনহনিয়ে এগোলেন রানার দিকে। মুখভর্তি হাসি, যেন এইমাত্র বিশ্বজয় করে এসেছেন।

'প্লেনে একটাই মাত্র সিট বলে দুঃখিত, মসিয়ো রানা,' বললেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনতে পারলে খুব ভাল হতো।'

ছোট্ট বিমানটার দিকে তাকাল রানা। চোখ বোলাল বুলেট-আকৃতির ইঞ্জিন কাভার, কাঠ আর ফ্যাব্রিকের ফিউজলাজ, ত্রিকোণ টেইল ফিনের উপর। লেজের গায়ে কঙ্কালের খুলি আর হাড় আঁকা—জলদস্যুদের প্রতীক। ইংরেজি *এ* বর্ণের মত একটা ফ্রেম রয়েছে ককপিটের সামনে, ওয়ায়্যারের মাধ্যমে সেখান থেকে সাপোর্ট পাচ্ছে নড়বড়ে দুই ডানা।

'সম্মান জানিয়ে বলতে চাই, মসিয়ো ফাঁনু,' রানা বলল, 'আপনার বিমান যে একজনকে বহন করতে পারছে, সে-ই বেশি।'

সশব্দে অট্টহাসি করে উঠলেন ফরাসি এয়ার-হিস্টোরিয়ান। 'ভাল বলেছেন! যদিও কথাটা একেবারেই ভুল। অবশ্য এই মনোভাবের জন্য আপনাকে দোষ দেয়া যাবে না, *মোরান-সলনিয়ের* দেখে সত্যিই মনে হয়, কোনও স্কুলছাত্র তার বেজমেন্টে বসে ডিজাইনটা তৈরি করেছে। মাত্র বাইশ ফুট লম্বা, ডানার দৈর্ঘ্য সাতাশ ফুট। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই ছোট্ট পতঙ্গই তার যুগের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিমান ছিল। ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটতে পারে, নড়তে পারে অত্যন্ত দ্রুত। দক্ষ পাইলট এই বিমান নিয়ে জাদু দেখাত সেইকালে।'

এগিয়ে গিয়ে মোরানের গায়ে হাত রাখল রানা। বলল, 'ফিউজলাজ আর সিঙ্গেল উইং ডিজাইন দেখে খুব অবাক হয়েছি, জানেন? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা ভাবলে চোখের সামনে শুধু ভোঁতা নাক-অলা বাইপ্লেনের ছবি ভাসে।'

'তা অবশ্য ঠিক,' বললেন ফাঁনু। 'সে-আমলে বেশিরভাগ বিমানে জোড়া-ডানা থাকত। তবে ফরাসিরা মনোপ্লেন তৈরির ক্ষেত্রে বাকি পৃথিবীর চেয়ে এগিয়ে ছিল। মোরান-সলনিয়ের এককালে অ্যারো-ডাইনামিক্সের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ বলে খ্যাতি পেয়েছিল।'

'অবাক হচ্ছি না, আপনার ইমেলম্যান ম্যানুভার-টা একেবারে নিখুঁত হয়েছে। যে-সে বিমানে এই খেলা দেখানো সম্ভব নয়।'

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। এই ছোট্ট বিমানটার ওজন হাজার পাউণ্ডের কাছাকাছি, একশো ষোলো হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন দিয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। ওড়ানোর চেয়ে নামানো কঠিন। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ল্যাণ্ডিঙের সময় আমার স্পিড অনেক বেশি ছিল।'

'ভয় পাচ্ছিলাম মুখ থুবড়ে পড়েন কি না।'

'অতীতে অনেকেই পড়েছে,' বললেন ফাঁনু। 'আমার জন্য তো কাজটা কঠিন ছিল না, অক্ষত একটা বিমান ল্যাণ্ড করিয়েছি। কিন্তু পুরনো আমলের পাইলটদের কথা ভাবুন... গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত বিমান নিয়ে ল্যাণ্ড করতে হতো ওদেরকে। চ্যালেঞ্জ ছিল বটে সেটা!'

নস্টালজিয়ার ছোঁয়া পাওয়া গেল ভদ্রলোকের কণ্ঠে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ফরাসি এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট ছিলেন জাভোয়া ফাঁনু, সারাটা জীবন কাটিয়েছেন আকাশে। রিটায়ার করার পরও সেই আসক্তি কাটাতে পারেননি, একটা এয়ার-মিউজিয়াম খুলেছেন, সেখানে রাজ্যের বিমান। বর্তমানে দুনিয়ার সেরা এয়ার-হিস্টোরিয়ানদের একজন তিনি, এঁর কথাই বলেছিল বিউ মরটন। ফোনে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে রানা, নুমার জাহাজ *স্টারফিশ* ভূমধ্যসাগরে পৌঁছুনোর পর চলে এসেছে প্যারিসে, মসিয়ো ফাঁনুর সঙ্গে দেখা করতে।

ডরমেয়ার লেকের তলায় পড়ে থাকা বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনিও একমত হয়েছেন বিউ মরটনের সঙ্গে—ওটা একটা *মোরান-সলনিয়ের*। বিমানটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে রানা, তাই ওকে এয়ার-মিউজিয়ামের হ্যাঙারে নিয়ে এসেছেন ফাঁনু, ওঁর সংগ্রহে একটা অক্ষত মোরান আছে। সেটাই উড়িয়ে দেখালেন ওকে।

ডেমোনস্ট্রেশন শেষ হয়েছে, রানাকে নিজের অফিসে নিয়ে গেলেন এয়ার-হিস্টোরিয়ান। কফি খেতে খেতে আলোচনায় বসল ওরা। টেবিলের উপর রানার তোলা ছবিগুলো বিছিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ফাঁনু। যেগুলো দরকারি মনে হচ্ছে, স্ক্যান করে ঢোকাচ্ছেন কম্পিউটারে।

একটা ছবি হাতে নিল রানা, ভাঙাচোরা প্লেনটা দেখল, তারপর বলল, 'এই জঞ্জাল দেখে বিমানটাকে ঠিকমত

আইডেন্টিফাই করতে পারবে কেউ, তা ভাবতে পারিনি।'

কফির কাপ নামিয়ে রাখলেন ফাঁনু। 'ভেঙেচুরে জঞ্জালই হয়ে গেছে বটে, প্রথম দর্শনে আইডেন্টিফিকেশনের অযোগ্য মনে হয়েছিল। হচকিস মেশিনগান চেনা যাচ্ছে, তবে ওটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশিরভাগ বিমানেই থাকত। আমার হাতে একমাত্র ক্লু ছিল ইঞ্জিন হাউজিঙের চোখা আকৃতিটা; তবে শেষ পর্যন্ত আরও ভাল একটা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলাম।' একটা ছবি বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'এটা দেখুন।'

চ্যাপ্টা, ভোঁতা একটা দণ্ড দেখা যাচ্ছে ওটায়, ডগাটা গোল। রানা বলল, 'প্রপেলার ব্লেড?'

'হ্যাঁ, তবে যে-সে প্রপেলার ব্লেড নয়। ভাল করে দেখুন—জিনিসটা কাঠের, কিন্তু একটা মেটাল প্লেট লাগানো আছে ওটার সঙ্গে।'

'কেন?'

'ডিফ্লেক্টর হিসেবে কাজ করার জন্য। ১৯১৪ সালে রেমণ্ড সলনিয়ের এক বৈপ্লবিক সিংক্রোনাইজিং গিয়ার আবিষ্কার করেন, ওটার কারণে ঘুরতে থাকা প্রপেলারের মাঝ দিয়েও হচকিস মেশিনগান ফায়ার করা যেত। পদ্ধতিটা চমৎকার, তারপরও বিপদ এড়াবার জন্য মেটাল ডিফ্লেক্টর বসিয়ে দেয়া হতো প্রপেলার ব্লেডের ভিতর দিকে—যাতে মিসফায়ার হওয়া অ্যামিউনিশন ব্লেডকে দু'টুকরো করতে না পারে।'

'গুড আইডিয়া।'

'নট রিয়েলি। রিকোশেট হওয়া বুলেটে কয়েকজন পাইলট মারা পড়ায় পুরো প্রজেক্টই বাতিল হতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত রোঁলা গাঁরো নামে এক বৈমানিক যোগ দেন সলনিয়েরের সঙ্গে। দু'জনে মিলে স্টিলের ডিফ্লেক্টর বসান মোরান-সলনিয়ের বিমানে—নতুন সেটআপে, যাতে রিকোশেটের বুলেট ককপিটের

দিকে না যায়। কৌশলটা কাজে লেগেছিল, কোনও রকম দুর্ঘটনা ছাড়া রোঁলা গাঁরো তাঁর বিমান নিয়ে জার্মানদের বহু ক্ষতি করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওটা ক্র্যাশ করে শত্রুপক্ষের এলাকায়, তবে তাতে সিংক্রোইনাইজিং গিয়ারের দোষ ছিল না। জার্মানরা সেই নমুনা হাতে পেয়ে পরবর্তী সময়ে ফকারের সিংক্রোনাইজিং সিস্টেম ডেভেলপ করে।'

আরেকটা ছবি তুলে নিল রানা। 'এটা কী?' জানতে চাইল ও। ছবিতে মোরানের ভাঙা ককপিটের গায়ে একটা কমলা রঙের আয়তক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে। 'মেটাল প্লাক?'

'আপনার নজর খুব চোখা,' তারিফ করলেন ফাঁনু। 'প্লাক-ই বটে... ম্যানুফ্যাকচারারের কোড খোদাই করা। ওটা ইতিমধ্যে এনলার্জ করেছি আমি কম্পিউটারে, নাম্বারটা মিলিয়ে দেখেছি আমাদের মিউজিয়ামের ওউনারশিপ রেকর্ডের সঙ্গে।'

'মালিকের খোঁজ পেয়েছেন?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন ফাঁনু। 'মোট উনপঞ্চাশ-টা মোরান-সলনিয়ের তৈরি করা হয়েছিল। গাঁরো-র সাফল্য দেখে অন্যান্য ফরাসি পাইলটও আগ্রহী হয়ে উঠেছিল বিমানটার প্রতি। ব্রিটেন কিনেছিল কয়েকটা, রাশিয়াও। ফকারের চেয়ে ভাল পারফর্মেন্স ছিল ওটার। আপনি এই ধ্বংসাবশেষ আল্পসে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের লেকে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন ফাঁনু। 'অদ্ভুত ব্যাপার, কয়েক বছর আগে ওখানে যেতে হয়েছিল আমাকে—কয়েকটা পুরনো বিমানের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করতে। এভিয়াটাক মডেলের বিমান ছিল ওগুলো, রিকনিসান্স আর স্কাউটিঙের কাজে ব্যবহার হতো। কীভাবে ওগুলো ওখানে পৌঁছুল, তা জিজ্ঞেস করেছিলাম স্থানীয় লোকজনের কাছে। ওরা

বলল. বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছে বিমানে-বিমানে যুদ্ধ হয়েছিল বহু বছর আগে, এভিয়াটাকগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সম্ভবত ঘটেছে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে, সঠিক তারিখ পিনপয়েন্ট করতে পারিনি।'

'আমাদের মোরানের সঙ্গে সেই লড়াইয়ের সম্পর্ক আছে ভাবছেন?'

'সম্ভাবনা খুবই বেশি। একশো বছরের পুরনো এক রহস্য জড়িয়ে আছে এতে—থিয়োডর বুভারি-র রহস্যময় অন্তর্ধান! লোকটা আপনার ওই মোরানের মালিক।'

'থিয়োডর বুভারি? নাম শুনিনি কখনও।'

'ইয়োরোপের সবচেয়ে ধনী মানুষদের একজন ছিল থিয়োডর। যদ্দূর মনে পড়ে, ১৯১৪ সালে লোকটা তার মোরান-সলনিয়ের সহ হারিয়ে যায়। শৌখিন পাইলট ছিল সে, বিমান নিয়ে নিজের এস্টেট আর আঙুর-বাগানের উপর ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত। সেটা করতে গিয়েই একদিন আর ফিরে আসেনি। প্রচুর তল্লাশি চালানো হয়েছে, কিন্তু লোকটার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। পরে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল, ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময় পায়নি কেউ।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আঙুর-বাগানের মালিক যুদ্ধবিমান ওড়াত কেন?'

'ওটা সাইড-বিজনেস। থিয়োডর বুভারি আসলে ছিল একজন আর্মস-ম্যানুফ্যাকচারার। যুদ্ধবিমানের শখ পূরণ করা তার জন্য কোনও ব্যাপারই না, ফরাসি মিলিটারির বেশিরভাগ অস্ত্র তার কোম্পানি সাপ্লাই দিত। কথা হচ্ছে, সে আল্পসে পৌঁছুল কীভাবে?'

'পথ হারিয়েছিল?'

'উঁহুঁ। মোরানের ট্যাঙ্কে যে-পরিমাণ ফুয়েল ধরে, তাতে

আল্পস্ পর্যন্ত পৌঁছুনো সম্ভব নয়। রিফুয়েলিং করতে হয়েছে। তার জন্য পূর্ব-নির্ধারিত প্ল্যান-প্রোগ্রাম প্রয়োজন।'

'তা হলে যাচ্ছিল কোথায়?'

'লেকটা সুইস বর্ডারের কাছে...'

'...আর গোপন ব্যাঙ্কিঙের জন্য সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে আদর্শ জায়গা আর হতে পারে না। হয়তো টাকাপয়সার লেনদেনের জন্য জুরিখে যাচ্ছিল।'

মাথা নাড়লেন ফাঁনু। 'থিয়োডর বুভারির মত লোক সশরীরে ওসব লেনদেন করে না। অন্য কোনও কারণ ছিল নিশ্চয়ই। গ্লেসিয়ারের ওই লাশটা দেখেছেন আপনি?'

'না, তবে দেখেছে, এমন একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলল, পুরনো আমলের এভিয়েটরদের মত পোশাক ছিল গায়ে।'

'তা হলে একটাই ব্যাখ্যা—সুইটজারজ্যাণ্ড যাবার পথে এক গ্রুপ এভিয়াটাকের হামলার শিকার হয় সে, প্লেনটা ক্র্যাশ করে। মুমূর্ষু অবস্থায় প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দেয় থিয়োডর, লাশটা আছড়ে পড়ে গ্লেসিয়ারে। ইশ্‌শ্... ওটা যদি পরীক্ষা করে দেখা যেত!'

'সম্ভব না,' হতাশ গলায় বলল রানা। 'টানেলটা রি-ওপেন করতে গেলে রীতিমত মহাযজ্ঞ দরকার।'

'বুভারিদের জন্য সেটা কোনও সমস্যা না। টাকার অভাব নেই ওদের।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'পরিবারটা এখনও আছে?'

'হ্যাঁ, তবে বোঝার উপায় নেই। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে, ভুলেও কোথাও দেখা দেয় না।'

'তাতে কোনও দোষ দেখছি না। অনেক ধনী পরিবারই প্রচারণা এড়িয়ে চলে।'

'ওদেরকে শুধু ধনী বললে অপমান করা হয়, মসিয়ো রানা,'

তিক্ত গলায় বললেন ফাঁনু। 'বুভারি পরিবারকে লোকে বলে মার্চেন্ট অভ ডেথ... মানে মৃত্যুর সওদাগর! শত শত বছর ধরে বিশাল স্কেলে অস্ত্রের ব্যবসা করছে ওরা... বংশ পরম্পরায়। টাকার চেয়েও বেশি ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার জোর।'

'শুনে মনে হচ্ছে জার্মানির বিখ্যাত ক্রুপ-পরিবারের ফরাসি ভার্শান।'

'ক্রুপ-দের সঙ্গে তুলনা করা হয় ওদেরকে, তবে আইরিন বুভারি তাতে বেজায় নাখোশ।'

'আইরিন?'

'থিয়োডর বুভারির বোন আইরিনের নাতনি। দাদীর নামেই নাম রাখা হয়েছে বলে শুনেছি। ড্রেনজারাস মহিলা... শক্ত হাতে ব্যবসা সামলাচ্ছেন। বিশ্বস্ত দু'চারজন ছাড়া আর কেউ কখনও দেখেনি তাঁকে।'

'কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া যায় না?'

'অসম্ভব! লইয়ার, পাবলিক রিলেশন্স একজিকিউটিভ আর বডিগার্ডদের বলয় পেরিয়ে তাঁর নাগাল পাওয়া খুবই কঠিন।'

'আমার হাতে গোপন অস্ত্র আছে। মাদাম বুভারি নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বপুরুষের পরিণতির খবর জানতে চাইবেন।'

'হুম, সেটা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, দেখি কী করা যায়। ওই কোম্পানিতে আমার পরিচিত একজন ডিরেক্টর আছেন, তাঁকে বলে দেখব। আপনাকে পাবো কোথায়?'

'প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি, কয়েকদিন ওখানেই থাকব। আমার সেলফোন নম্বর দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

'ঠিক আছে। কোনও খবর পেলে আপনাকে জানাব।'

একটা চিরকুটে নিজের নম্বর লিখে দিল রানা, তারপর উঠে

দাঁড়াল। ফাঁনু ওকে মিউজিয়ামের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। যাবার আগে হাত মেলাচ্ছে রানা, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, পুরো ব্যাপারটায় নুমা-র আগ্রহ কেন, সেটা জানতে পারি?'

'নুমার কোনও আগ্রহ নেই, আগ্রহটা আমার,' বলল রানা 'আসলে... ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের ঘটনা একগাদা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে আমার মনে, সেগুলোর জবাব খুঁজছি।'

'তারমানে বুভারিদের সঙ্গে আপনি সরাসরি যোগাযোগ করবেন? কোনও অফিশিয়াল চ্যানেলে এগোবেন না?'

'তাতে অসুবিধে আছে?'

সরাসরি জবাব দিলেন না ফাঁনু। বললেন, 'আমি বহুদিন মিলিটারিতে ছিলাম, মসিয়ো রানা; শক্ত লোক দেখলেই চিনতে পারি। সন্দেহ নেই, নিজেকে রক্ষা করতে জানেন আপনি, তবু অনুরোধ করব—বুভারি পরিবারের দিকে একটু বুঝেশুনে পা বাড়াবেন।'

'কেন? আমি তো ওদের ক্ষতি করতে যাচ্ছি না।'

'ওদের অতীত অন্ধকারে ঢাকা, মসিয়ো। সেই অতীত খোঁচাখুঁচি করতে চাইছেন... না চাইতেই হয়তো ক্ষতিকর কিছু বেরিয়ে আসবে। তাই বলছি, সাবধানে থাকবেন।'

'ধন্যবাদ, কথাটা মাথায় রাখব আমি।' বলে বিদায় নিল রানা।

প্যারিসের পথে ড্রাইভ করতে করতে ফাঁনুর সতর্কবাণী নিয়ে ভাবল রানা। দুনিয়ার সমস্ত ধনী পরিবারেরই অন্ধকার ইতিহাস রয়েছে। বিত্ত-বৈভবের প্রাচুর্য আসে নারী-ব্যবসা, চোরাচালান, কিংবা সংঘবদ্ধ অপরাধের ভিত্তিমূল থেকে। বুভারিদেরও যে তেমন কোনও ইতিহাস আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কথা হচ্ছে, সেটা কতখানি গুরুতর? অতীতকে ঢেকে রাখার জন্য ওরা

কতখানি মরিয়া হয়ে উঠতে পারে?

ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের ঘটনা কি বুভারিদের অতীত লুকানোর অপচেষ্টা? সেটা যথাসময়ে জানা যাবে। রানা শুধু এটুকু বুঝতে পারছে—রহস্যটা সমাধানের পথে বেশ খানিকটা এগোনো গেছে।

পনেরো

প্যান্থিয়নের দক্ষিণে, সরবোন সায়েন্স সেন্টারে লুনার অফিস। জায়গাটা নির্জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গোনা কিছু ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া বিল্ডিঙের আশপাশে চোখে পড়ে না কাউকে। কিন্তু আজ মোড় ঘুরতেই ভিড় দেখতে পেল ও। দুটো পুলিশ কার আড়াআড়িভাবে আটকে রেখেছে রাস্তা, বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েকটা। ইউনিফর্ম আর সাদা পোশাকে আইনরক্ষীরা গিজগিজ করছে সবখানে।

গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল লুনা। কয়েক পা এগোতেই দশাসই চেহারার এক সার্জেন্ট পথরোধ করল। নেমটালিতে নাম লেখা—পিয়েরে।

'দুঃখিত, মাদমোয়াজেল। আর এগোতে পারবেন না।'

'কী হয়েছে এখানে?'

'দুর্ঘটনা,' সংক্ষেপে জানাল সার্জেন্ট পিয়েরে।

'কী দুর্ঘটনা?'

কাঁধ ঝাঁকাল সার্জেন্ট। 'আমি ঠিক জানি না।'

ব্যাগ থেকে নিজের আইডি কার্ড বের করল লুনা। লোকটার মুখের সামনে তুলে বলল, 'আমি এই বিল্ডিঙে কাজ করি, মসিয়ো। কী ঘটেছে, সেটা জানার অধিকার আছে আমার।'

আইডি-র সঙ্গে লুনার চেহারা মিলিয়ে দেখল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'আপনি বরং আমাদের ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলুন।'

সাদা পোশাকে রয়েছেন ইন্সপেক্টর—মোটাসোটা, মাঝবয়েসী মানুষ। গায়ে একটা ওভারসাইজ ট্রেঞ্চকোট। একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দুজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর সামনে লুনাকে নিয়ে গেল পিয়েরে।

'এক্সকিউজ মি, সার। এই ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'কে আপনি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর।

আইডি বাড়িয়ে ধরল লুনা, নিজের পরিচয় দিল। 'লুনা পারসেল... আর্কিয়োলজিস্ট। এ-বিল্ডিঙেই আমার অফিস।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কার্ডটা দেখলেন ইন্সপেক্টর। লুনার নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন নোটবুকে। তারপর কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে খুলে ধরলেন গাড়ির পিছনের দরজা। বললেন, 'আসুন, গাড়িতে বসে কথা বলি।'

নড়ল না লুনা। 'কী ঘটেছে, সেটা আগে বলুন।'

'বলব, মাদমোয়াজেল। গাড়িতে বসুন।'

আর আপত্তি করল না লুনা, গাড়িতে উঠে পড়ল। ইন্সপেক্টরও উঠলেন, ওর পাশে বসে বন্ধ করে দিলেন দরজা। বললেন, 'আমি ইন্সপেক্টর জাঁ লুই, মাদমোয়াজেল পারসেল্। কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবেন না। অফিস-বিল্ডিঙে শেষ কখন এসেছিলেন আপনি?'

'সকালে। সারাদিনই ছিলাম। দুপুরের দিকে বেরিয়েছি।'

'কখন?'

ঘড়ি দেখল লুনা। 'তিন-চার ঘণ্টা আগে। বেশিও হতে পারে। কেন?'

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'একজন অ্যান্টিক-বিশেষজ্ঞের কাছে, পুরনো একটা আর্টিফ্যাক্ট দেখাতে। তারপর অ্যাপার্টমেন্টে... বিশ্রাম নিতে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

নোট নিচ্ছেন ইন্সপেক্টর। লেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে যখন ছিলেন, অস্বাভাবিক কোনও কিছু চোখে পড়েছে?'

'না তো! কেন? কী হয়েছে?'

'একজন মানুষ খুন হয়েছে এখানে, মাদমোয়াজেল। গুলি করা হয়েছে তাকে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল লুনা। 'কে খুন হয়েছে?'

'ড. অগাস্টিন লেগ্রাঁ। আপনি তাঁকে চেনেন?'

'অবশ্যই! ভার্সিটিতে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমার ওপরতলাতেই ওঁর অফিস। লেগ্রাঁ... লেগ্রাঁ খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে। শেষ কবে মসিয়ো লেগ্রাঁকে দেখেছেন আপনি?'

'আজ সকালে... এলিভেটরে। কথা হয়নি অবশ্য। আমি একটু তাড়ায় ছিলাম।'

নার্ভাস বোধ করল লুনা। চেহারায় কি লেগ্রাঁর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে?

'মসিয়ো লেগ্রাঁর কোনও শত্রু ছিল কি না, জানেন? মানে... তাঁর ক্ষতি করতে চায়?'

একটু ইতস্তত করে সত্যি কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিল লুনা। খামোকা মিথ্যে বলার মানে হয় না, লেগ্রাঁর যে শত্রুর অভাব ছিল

না, সেটা পুলিশ হয়তো ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে। বিশেষ করে ওর সঙ্গে দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা।

'মসিয়ো লেগ্রাঁ ছিলেন একজন বিতর্কিত মানুষ, ইন্সপেক্টর,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল লুনা। 'ওঁর কাজকর্ম বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করত না।'

'আর আপনি?'

'আমার কোনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নেই। তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি—যে-পদে কাজ করতেন মসিয়ো লেগ্রাঁ, তার জন্য তিনি যোগ্য ছিলেন না।'

প্রথমবারের মত হাসি ফুটল ইন্সপেক্টর জাঁ লুইয়ের ঠোঁটে। 'খুব ডিপ্লোমেটিক উত্তর দিলেন, মাদমোয়াজেল! যা হোক, আপনার অ্যালিবাই চেক করে দেখব আমরা। কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, তার ঠিকানা দিন।'

দেশমের দোকান আর নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা বলল লুনা, ইন্সপেক্টর সেগুলো লিখে নিলেন নোটবুকে। তারপর লুনাকে নিয়ে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। ভিজিটিং কার্ড দিলেন ওকে।

'ধন্যবাদ, মাদমোয়াজেল পারসেল। কিছু মনে পড়লে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না। আপনি এখন যেতে পারেন।'

লুনা নিচু গলায় বলল, 'ইয়ে... যদি কিছু মনে না করেন, ইন্সপেক্টর, আমি কি আমার অফিসে যেতে পারি? জরুরি কিছু কাগজপত্র রয়ে গেছে, ওগুলো না আনলেই নয়।'

'ঠিক আছে, তবে আমার লোক থাকবে সঙ্গে।'

গলা চড়িয়ে সার্জেন্ট পিয়েরেকে ডাকলেন ইন্সপেক্টর। লুনার সঙ্গে যেতে বললেন তাকে।

হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে তাকাল লুনা। প্যারিসের সমস্ত পুলিশ যেন জড়ো হয়েছে এখানে। লেগ্রাঁ একটা তৃতীয় শ্রেণীর

লম্পট হলেও উপরমহলে বেশ দহরম-মহরম ছিল। ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের ঘটনার পর টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েও মোটামুটি নাম করে ফেলেছিল। সন্দেহ নেই, তার হত্যাকাণ্ড নিয়ে মাতামাতি করবে মিডিয়া; তাই কর্মতৎপরতা দেখানোয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পুলিশ।

বিল্ডিঙের ভিতরেও চলছে এলাহী কারবার। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোকজন ফিঙ্গারপ্রিন্টের খোঁজে ডাস্টিং করছে, পুলিশ ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে সব কামরার, ডিটেকটিভরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিল্ডিঙের লোকজনকে। এলিভেটর বন্ধ, সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে এল লুনা, নিজের অফিসে ঢুকল। সবকিছু ঠিকঠাক আছে ভিতরে, কিন্তু কেন যেন খটকা লেগে উঠল ওর।

ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল লুনা, কাগজপত্র দেখল। তারপর গেল বুকশেলফের কাছে। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, ওর অনুপস্থিতিতে এখানে ঢুকেছিল কেউ। দক্ষ হাতে তল্লাশি চালিয়েছে পুরো কামরায়, তারপর আবার সবকিছু গুছিয়ে রেখেছে আগের জায়গাতে। নিখুঁত কাজ; ভুল করেছে শুধু বুকশেলফে এসে, কয়েকটা বইয়ের সিরিয়াল ঠিক রাখতে পারেনি, এলোমেলো হয়ে গেছে লুনার কালেকশন। ওটা দেখেই অচেনা অনুপ্রবেশকারীর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে ও।

'কোনও সমস্যা, মাদমোয়াজেল?' পিছন থেকে বলে উঠল সার্জেন্ট পিয়েরে।

সংবিৎ ফিরে পেল লুনা। 'কী... না। কিছু না।' বুক ধক ধক করছে ওর। তাড়াতাড়ি ডেস্ক থেকে কয়েকটা ফাইল তুলে নিল, তারপর বেরিয়ে এল অফিস থেকে। এসকর্ট করে ওকে বিল্ডিং থেকে বের করে আনল সার্জেন্ট পিয়েরে, পুলিশ কর্ডন পেরিয়ে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার্জেন্ট,' মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে গাড়িতে চড়ল লুনা। স্টার্ট দিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওর, ইচ্ছে করছে অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে উড়ে চলে যায়। অফিসের সীমানা থেকে যত দ্রুত সরে যেতে পারে, ততই মঙ্গল। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, ওর রুমে কে ঢুকেছিল। লেগ্রাঁর খুনি! হেলমেটের খোঁজে! এখনও হয়তো লোকটা বিল্ডিঙের আশপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। একবার ভাবল পুলিশের কাছে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কিছু বলতে গেলে হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, পুলিশ ওকে লেগ্রাঁর হত্যাকারী বলেও সন্দেহ করে বসতে পারে। তা যদি না-ও করে, হেলমেটটা নিশ্চয়ই এভিডেন্স হিসেবে চেয়ে বসবে। ওটার রহস্য আর ভেদ করা হবে না। কাজেই... পুলিশের চিন্তা বাদ! রিয়ারভিউ মিররে চোখ বোলাল লুনা, খুনি ওর পিছু নেয়নি তো!

আয়না দেখে কিছু বোঝা গেল না, তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে প্যারিসের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ঘুরল ও। অনুসরণকারীকে ধোঁকা দেয়ার যে-সব কৌশল টিভি-সিনেমাতে দেখেছে, সব খাটাল। কাজে লাগল কি না কে জানে, তবে মনে খানিকটা শান্তি পেল। শেষ পর্যন্ত যখন বাড়ি ফিরল, তখন সূর্য পাটে বসেছে।

সন্ত্রস্ত হরিণীর মত বিল্ডিঙে ঢুকল লুনা, সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল তিনতলায়। চাবি বের করে অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে যেতেই থমকে গেল, পাল্লাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। বুকের ধুকপুকানি ফিরে এল প্রবল প্রতাপে, লুনা বুঝতে পারল—অফিসের মত এখানেও কেউ হানা দিয়েছে। লোকটা এখনও আছে কি না কে জানে, লুনার উচিত উল্টো ঘুরে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কেন যেন নড়তে পারল না ও, ভয়ের পাশাপাশি

এক ধরনের ক্রোধ অনুভব করতে শুরু করেছে। হচ্ছেটা কী? কেন ওরা ওর পিছু নিয়েছে এভাবে? এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

সন্তর্পণে পাল্লাটা আরেকটু ফাঁক করল ও, পা টিপে ঢুকে পড়ল অ্যাপার্টমেন্টে। লিভিংরুমের দোরগোড়ায় গিয়ে থামল। এবার আর গোছানোর ঝামেলায় যায়নি অচেনা শত্রু, পুরো বাড়ি ওলট-পালট করে ওভাবেই ফেলে রেখেছে। লিভিংরুম তছনছ করা হয়েছে—এমনকী কার্পেট গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, দেয়াল থেকে নামানো হয়েছে সব ক'টা পেইন্টিং। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ভাঙাচোরা ফার্নিচার আর ছড়ানো-ছিটানো অর্নামেন্টের ভেতর দিয়ে হাঁটছে লুনা। সাবধানে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে পোকার-রড তুলে নিল হাতে—অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। তারপর অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াল।

বেডরুমটাও বাদ দেয়া হয়নি। ওর সমস্ত কাপড়চোপড় মেঝেতে পড়ে আছে, কাবার্ডের দরজাগুলো খোলা। একটা কাবার্ডের দরজা কব্জা সহ খুলে ফেলা হয়েছে। বিছানাটা ওল্টানো, চাদর আর বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিল খালি করে ফেলা হয়েছে, কসমেটিকস আর পারফিউমের বোতল সবক'টা ভাঙা। প্যাসেজ ধরে বড় কামরাটার দিকে এগোল লুনা। ওটাই ওর স্টাডি আর ওঅর্কশপ।

এখানেও সব ভেঙেচুরে তছনছ করা হয়েছে, তবে প্রথমেই লুনার চোখ পড়ল ওর শখের চিনামাটির অ্যান্টিক মূর্তিগুলোর উপর। ওগুলোর উপর যেন মনের ঝাল মেটানো হয়েছে। কাঠের স্ট্যাণ্ডটা ভেঙে দু'টুকরো করা হয়েছে, মূর্তিগুলো অকারণে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে কামরার চারদিকে। ঝুঁকে একটা মূর্তি তুলে নিল লুনা। মোচড় দিয়ে ওটার ঘাড় ভাঙা হয়েছে। কী নির্মম! কষ্ট চাপা দিয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ও। সম্ভবত হাতুড়ি

দিয়ে বাড়ি মেরে চুরমার করা হয়েছে ওর পি.সি। মনিটরের স্ক্রিন ফেটে চৌচির, মেইনফ্রেম চিঁড়ে-চ্যাপ্টা। দেখে বোঝা যায়, আর মেরামত করা যাবে না। দেরাজগুলো খোলা, ভিতরের সব জিনিস মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

পিছনে কাঠের মেঝে মড়মড় করে উঠল, কেউ পা ফেলছে তাতে। পাঁই করে উল্টো ঘুরল লুনা, আঘাত করার ভঙ্গিতে উঁচু করে ফেলেছে হাতের পোকারটা। আঁতকে উঠল আগন্তুক, সভয়ে বলল, 'অ্যাই, অ্যাই... মাথা ফাটিয়ে দেবে নাকি!'

হাত থেকে পোকার ফেলে দিল লুনা। 'রানা! থ্যাঙ্ক গড ইউ আর হিয়ার!'

স্বভাবজাত হাসিতে উদ্ভাসিত হলো রানার মুখ। 'খুশি হয়েছ? তা হলে মাথা ফাটাতে গেলে কেন?'

'তুমিই বা চোরের মত ঢুকেছ কেন? আমি আরেকটু হলে হার্টফেল করতাম!'

'অনুপ্রবেশের জন্য দুঃখিত। কিন্তু দরজা খোলা পেয়েছি, ভিতরের দশা দেখা যাচ্ছিল করিডোর থেকে, তাই কৌতূহল সামলাতে পারলাম না।' কামরার দিকে ইশারা করল রানা। 'আমার জানা ছিল না, প্যারিসে টর্নেডো হয়।'

'ঠাট্টা করছ?' উল্টে থাকা একটা চেয়ার সোজা করে বসে পড়ল লুনা। 'দিস ইজ সিরিয়াস, রানা!'

'সরি, তুমি ঠিক আছ?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'আমার ধারণা, লেগ্রাঁকে যে-লোক খুন করেছে, সে-ই হানা দিয়েছিল এখানে। আমার অফিসেও তল্লাশি চালিয়েছে।'

'লেগ্রাঁ? মানে... গ্লেসিয়ারে তোমার সঙ্গে আটকা পড়া সেই ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ। অফিসে ঢুকে গুলি করা হয়েছে ওকে।'

রানার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। চকিতে চারপাশে নজর বোলাল। 'সবগুলো রুম চেক করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ... বাথরুম বাদে।'

'এখানেই থাকো,' বলল রানা। 'আমি দেখে আসছি।'

পিস্তল নেই ওর সঙ্গে। আজকাল অস্ত্র নিয়ে এয়ারপোর্ট পেরুনোয় হাজারটা ঝামেলা—লাইসেন্স থাকুক, বা না থাকুক। কাস্টমসে অকারণ হেনস্থা এড়াবার জন্য পিস্তল আনেনি ও ফ্রান্সে ঢোকার সময়, ভেবেছিল রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা-প্রধান অর্জনের কাছ থেকে একটা চেয়ে নেবে। সময়ের অভাবে সেটা করা হয়নি, দরকার হবে বলেও ভাবেনি। এখন রানা নিরস্ত্র। কী আর করা, আত্মরক্ষার জন্য মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল পোকারটা।

পা টিপে টিপে বাথরুমে গেল ও, ফিরে এল দু'মিনিট পরে। মুখ থমথম করছে। বলল, 'ধরে নিচ্ছি তুমি সিগারেট খাও না।'

'ঠিকই ধরেছ,' লুনা ভুরু কোঁচকাল। 'কেন?'

'বাথটাবে অনেকগুলো পোড়া সিগারেট পড়ে আছে। কেউ তোমার অপেক্ষায় বসে ছিল ওখানে।'

'চলে গেল কেন?'

'কে জানে?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল।'

'খুব বেশি সময় তো বাইরে ছিলাম না আমি। বড়জোর দু-আড়াই ঘণ্টা।'

'হোয়াটএভার! চলে গেছে, সেটাই বড় কথা।' আরেকটা চেয়ার সোজা করল রানা, বসল ওতে। 'লেগ্রাঁ সম্পর্কে বলো। কী জেনেছ ওর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে?'

সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল লুনা। সবশেষে যোগ করল, 'আমার মনে হচ্ছে, ওই হেলমেটটাই সব নষ্টের

গোড়া। ওটার জন্য ঘটছে এতকিছু। নাকি ভুল করছি কোথাও?'

'উঁহুঁ, আর কোনও ব্যাখ্যা নেই এর পিছনে,' রানা একমত হলো। 'তোমার এখান থেকে কোনও কিছু হারিয়েছে?'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্রের দিকে তাকাল লুনা। 'বলা মুশকিল।'

রানাও চোখ বোলাচ্ছে কামরার ভিতর। হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে ঢোকার পর আন্সারিং মেশিন চেক করেছ তুমি?' জিনিসটার উপর দৃষ্টি আটকে গেছে ওর।

'না... সময় পেলাম কোথায়? কেন, কী হয়েছে?'

'বাতি জ্বলছে না ওটায়।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আসার পথে গাড়ি থেকে ফোন করেছিলাম আমি। তুমি ছিলে না, মেশিনে রেকর্ড হয়েছে কলটা। যদি ওটা চেক করে না থাকো, তা হলে নতুন মেসেজের বাতি জ্বলছে না কেন?'

দু'জনে এগিয়ে গেল মাটিতে পড়ে থাকা যন্ত্রটার দিকে। ডিসপ্লের দিকে তাকাল লুনা। হিস্ট্রিতে চারটা মেসেজ দেখতে পেল। বাড়ি ছেড়ে বেরুনোর সময় ছিল দুটো। মানে দুটো কল এসেছে ওর অনুপস্থিতিতে।

'শুধু তোমারটা না, আরও একটা কল এসেছিল। দুটোই চেক করা হয়েছে।' বলল ও।

'কে করেছে আরেকটা কল?'

প্লে বাটন চাপল লুনা। স্পিকারে ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'লুনা, দিদিয়ের দেশম বলছি। ইয়ে... একটা কথা... হেলমেটটা আমি আমার ভিলায় নিয়ে যেতে চাই। কোনও অসুবিধে নেই তো? জিনিসটা রীতিমত চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে আমার কাছে, রাত জেগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব ভাবছি। আপত্তি থাকলে ফোন কোরো আমাকে। গুডবাই!'

'হা যিশু!' লুনার মুখ ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। 'আমার জন্য যে অপেক্ষা করছিল, সে শুনতে পেয়েছে মেসেজটা। সেজন্যই লোকটা চলে গেছে, রানা। আমাকে আর দরকার ছিল না তার, হেলমেটের খোঁজ পেয়ে গেছে!'

'এই দিদিয়ের দেশমের কাছেই ওটা দিয়ে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। ওর দোকানে।'

মেঝেতে স্তূপ হয়ে থাকা কাগজপত্র ঘেঁটে নিজের টেলিফোন বুক বের করল লুনা। দেশমের ঠিকানা আর ফোন নম্বর যে-পাতায় লিখে রেখেছিল, সেটা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। আতঙ্কিত গলায় বলল, 'ঠিকানা পেয়ে গেছে বদমাশটা, ওখানেই গেছে!'

'দেশমকে সতর্ক করে দাও। বলো গা-ঢাকা দিতে।'

টেলিফোন তুলে ডায়াল করল লুনা। ওপাশে রিং হচ্ছে, কিন্তু জবাব দিচ্ছে না কেউ।

'আমার মনে হয় পুলিশে খবর দেয়া ভাল,' বলল রানা।

'দিদিয়ের সেটা পছন্দ করবে না। আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে নানা রকম কাজ করে ও, পুলিশ গিয়ে ওর দোকানে নাক গলাক... এটা কখনোই চাইবে না।'

'জান নিয়ে টানাটানি... তাও তুমি এ-কথা বলছ?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল লুনা। 'হয়তো খামোকা ভয় পাচ্ছি। দিদিয়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, এমনটাও তো হতে পারে।'

'আমি অতটা আশাবাদী হতে পারছি না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'দোকানটা কোথায়?'

'*ল্য রিভ দোয়াত*-এ। ট্যাক্সিতে দশ মিনিটের পথ।'

'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। দশ মিনিট না, পাঁচ মিনিটে পৌঁছুতে পারব ওখানে। চলো!'

ছুটল রানা-লুনা।

ষোলো

দেশমের অ্যান্টিক শপের ভিতরে কোনও আলো জ্বলছে না, দরজা তালাবন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারল লুনা। রানাকে বলল, 'দিদিয়েরের ওঅর্কশপে বাতি জ্বলছে, পর্দার তলা দিয়ে আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি।'

'হুম, কেউ আছে ওখানে,' বলল রানা। 'ভিতরে চলো।'

'কীভাবে? দরজার চাবি নেই আমাদের কাছে।'

'কে বলল নেই?' হাসল রানা। 'একটা হেয়ারপিন দাও।'

চুল থেকে একটা হেয়ারপিন খুলে দিল লুনা। সেটা চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। একটু পর খুট করে শব্দ হলো—দরজা খুলে গেছে।

'ইয়াল্লা!' বিস্মিত গলায় বলল লুনা। 'তুমি দেখি তালার জাদুকর।'

'তা-ও ভাল। ভয় পাচ্ছিলাম সিঁধেল চোর ভেবে বসো কি না।'

পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল লুনা।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটের সামনে আঙুল তুলল রানা। 'শব্দ কোরো না।'

সন্তর্পণে দোকানে ঢুকল দু'জনে। নিঃশব্দে পেরুল সামনের অংশ, তারপর পর্দা সরিয়ে পা রাখল দেশমের ওঅর্কশপে...

এবং থমকে গেল। দৃশ্যটা থমকে যাবার মতই বটে।

নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে বসানো হয়েছে মাঝবয়েসী অ্যান্টিক ডিলারকে, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, সেজদার ভঙ্গিতে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে একটা কাঠের বাক্সের উপরে—মধ্যযুগে গর্দান দেয়ার সময় এভাবেই চপিং ব্লকের উপর মাথা রাখতে হতো দণ্ডিত মানুষদের। দৃশ্যটা আরও বাস্তব করে তুলেছে বিশালদেহী এক লোক... অনায়াসে মানব-দৈত্য বলা যায় তাকে। জল্লাদের ভঙ্গিতে দেশমের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সে—হাতে তলোয়ার, কোপ দিতে উদ্যত। শুধুমাত্র মোমের জাদুঘরে এমন দৃশ্য দেখা যায়।

আচমকা রানা আর লুনাকে উদয় হতে দেখে একটুও চমকাল না দৈত্য, কাঁপল না একটা পেশিও। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল কেবল। বলল, 'স্বাগতম! যেখানে আছ, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, বাছারা। খবরদার, কোনও চালাকি করতে যেয়ো না, তা হলে তোমাদের বন্ধু গর্দান হারাবে।'

অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরুল লুনার গলা থেকে। রানা নির্বিকার রইল, তাকাল দেশমের দিকে। ভালই মার খেয়েছে বেচারা। জামা-কাপড় শতচ্ছিন্ন, শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। ঠোঁট ফুলে ঢোল হয়ে আছে, বুজে গেছে একটা চোখ। প্রতিপক্ষকেও যাচাই করল ও—অন্তত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির কম হবে না, সারা গায়ে কিলবিল করছে পেশি, চোখের তারায় নিষ্ঠুরতা। এক নজরেই বোঝা গেল, কঠিন মাল। লুনার কাছে বর্ণনা শুনেছে, তাই বুঝতে অসুবিধে হলো না, এই লোকই ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে হানা দিয়েছিল।

'আমরা বোকা-সোকা মানুষ,' হালকা গলায় বলল রানা। 'চালাকি কাকে বলে, সেটাই জানি না।'

ওকেও ইতিমধ্যে যাচাই করে ফেলেছে দৈত্য। ঠাট্টা-মশকরায় তাই প্রভাবিত হলো না। তলোয়ারটা ধীরে ধীরে দেশমের ঘাড়ের পিছনে ঠেকাল সে। বলল, 'নিজেকে খুব স্মার্ট ভাবছ, না?'

'উঁহুঁ। ভাবছি তুমি কেন হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছ। মাঝবয়েসী একজন মানুষকে খালি হাতে ট্যাকেল করতে কষ্ট হচ্ছে?'

'ওকে একটু সবক দেয়া দরকার,' বলল দৈত্য, তলোয়ারের হালকা খোঁচা দিল দেশমকে। 'কিছুতেই বলছে না, আমি যে-হেলমেটটা চাইছি, সেটা কোন্‌টা।'

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেয়ালে লাগানো শো-কেসের দিকে তাকাল রানা। অনেকগুলো শিরোস্ত্রাণ সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। দৈত্য জানে না, এর মধ্যে কোন্‌টা ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দেশমের তারিফ করল রানা মনে মনে। বুদ্ধিমান লোক... বুঝতে পেরেছে, হেলমেটটা চিনিয়ে দেয়ামাত্র তাকে খুন করবে শয়তানটা। তাই মার খেয়েও মুখ বন্ধ রেখেছে।

'অ! এই ব্যাপার?' বলল রানা। 'একটাও ফিট হচ্ছে না? তোমার মাথা বুঝি বড্ড বেশি মোটা?'

কথাটা শুনে বিশালদেহীর দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল। 'মুখ সামলে কথা বলো, মসিয়ো।'

'ঠিক আছে, সামলেই বলছি। ভাল চাও তো এখান থেকে চুপচাপ কেটে পড়ো। হেলমেটটা পাচ্ছ না তুমি।'

মুখে টিটকিরি মেরে চলেছে রানা, কিন্তু মনে মনে কপাল চাপড়াচ্ছে পিস্তল আনেনি বলে। খালি হাতে এই দানবকে মোকাবেলা করা এককথায় সম্ভব নয়। চঞ্চল চোখে কামরার উপর নজর বোলাল—যদি একটা অস্ত্র পাওয়া যায়!

রানার অসহায়ত্ব দৈত্যও সম্ভবত আঁচ করতে পারছে, তাই ওকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল। লুনাকে বলল, 'এই যে মিস আর্কিয়োলজিস্ট! তুমিই হেলমেটটা গ্লেসিয়ার থেকে এনেছ, তাই না? তুমি এখন ওটা চিনিয়ে দেবে আমাকে।'

রানা পাশে থাকায় কিছুটা সাহস পাচ্ছে লুনা, সরোষে বলল, 'কক্ষনো না! তুমি একটা খুনি... লেগ্রাঁকে খুন করেছ...'

'ওই শুঁয়োপোকার জন্য মায়াকান্না কেঁদো না। তোমার খবর তো আমাকে ও-ই দিয়েছে।' তলোয়ারটা একটু তুলল দৈত্য। 'এখন ভালয় ভালয় হেলমেটটা দেখিয়ে দাও আমাকে। তা হলে তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।'

'জ্যান্ত, না মৃত অবস্থায়?' বাঁকা সুরে বলল রানা। কয়েক ফুট দূরে... দেয়ালে ঝোলানো একটা ব্যাটল-অ্যাক্সের উপর দৃষ্টি সেঁটে আছে ওর। লঘু পায়ে হেঁটে ওদিকে গেল ও, প্রতিপক্ষ মুখ খোলার আগেই কুঠারটা এক ঝটকায় নিজের হাতে তুলে নিল।

'ফেলো ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য।

'না,' শান্ত গলায় বলল রানা, লোকটার দিকে ফিরল। 'ফেলবে তো তুমি! তলোয়ারটা!'

'আমাকে ফেলতে বলছ?' তলোয়ার উঁচু করে ধরল দৈত্য। 'তা হলে তো মসিয়ো দেশমের মাথাটাই ফেলে দিতে হয়!'

'ফেলতে পারো,' কাটা কাটা স্বরে বলল রানা। 'কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তোমার মাথাও ওটার পাশে গড়াগড়ি খাবে।'

হুমকিটা জোরালো করার জন্য কুঠারটা সামনে বাগিয়ে ধরল ও। আদ্দিকালের অস্ত্র, কিন্তু ভয় জাগানো চেহারা। কার্বন-স্টিলে তৈরি ফলাটা চওড়া, ডগা ছুঁচালো—বর্শার মতও ব্যবহার করা যায়। ফলার পিছনদিকে একটা চোখা গজাল বেরিয়ে আছে। কাঠের হ্যাণ্ডেলটা খাঁজ কাটা, হাতের তালু ঘামে ভেজা থাকলেও

যেন মুঠো না পিছলায়।

দ্বিধায় ভুগতে শুরু করল দৈত্য। রানার অবিচল কণ্ঠ বলে দিচ্ছে, ও বেঁচে থাকতে দেশম বা লুনার ক্ষতি হতে দেবে না। তারমানে তিনজনের মধ্যে আগে রানাকেই খতম করতে হবে তাকে, পরে বাকিরা। রানাও তা-ই চাইছে, মনে মনে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো ও।

দেশমের পিছন থেকে সরে এল দৈত্য, আচমকা ছুটে এসে তলোয়ার চালাল রানাকে লক্ষ্য করে। এতবড় দেহ নিয়ে লোকটা এমন দ্রুততায় নড়তে পারে, সেটা কল্পনাই করতে পারেনি ও। কোনোমতে কুঠারটা মাথার উপর তুলে আঘাত ঠেকাল।

লোহার সঙ্গে লোহার সংঘর্ষে ফুলকি উঠল। কেঁপে উঠল রানা—আঘাতের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে ওর হাতের পেশিতে। আরেকটু হলে খসে পড়ছিল কুঠারটা।

তৈরি হবার সময় পেল না, আবার তলোয়ার চালাল দৈত্য। আগের মতই সেটা ঠেকাতে বাধ্য হলো রানা, তবে হাতের কাঁপুনি থামার অপেক্ষা না করে দ্রুত পিছিয়ে গেল দু'পা। হিংস্র হাসি ফুটল দৈত্যের ঠোঁটে। মাথার উপর বনবন করে তলোয়ার দু'পাক ঘুরিয়ে আচমকা সামনে বাড়ল। তবে এবার তৈরি আছে রানা, ঠেকাবার চেষ্টা করল না, পাশ থেকে কোপ মারার ভঙ্গিতে ঘোরাল কুঠার, সেটার গায়ে বাড়ি খেয়ে সরে গেল তলোয়ারটা। বেসামাল হয়ে গেল দৈত্য। লোকটার পেট লক্ষ্য করে কোপ মারল রানা। ক্ষিপ্র গতিতে কোমর দুলিয়ে ফলার সামনে থেকে সরে গেল দৈত্য, নইলে পেট দু'ফাঁক হয়ে যেত।

ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে রানা। বুঝতে পারছে, মধ্যযুগের লড়াইয়ে পেশিশক্তি কতটা জরুরি ছিল। কুঠারটা ভীষণ ভারী, হাতে ধরে রাখাই মুশকিল। দু'টো মাত্র কোপ মেরেছে ও, তাতেই শক্তি ফুরিয়ে গেছে, টনটন করছে বাইসেপ।

কুঠারের ওজনে আরেকটু হলে হাত থেকে ছিটকে যাচ্ছিল। টলমল পায়ে কোনোমতে ব্যালান্স রক্ষা করেছে।

রানার বেসামাল অবস্থা দেখে দেরি করল না দৈত্য, আবার আক্রমণ করল—ঠাণ্ডা মাথায়, নিখুঁতভাবে। পিছু হটল রানা, তবে এবার জায়গা ছাড়ছে থেমে থেমে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে। ঠেকানোর পরপর পাল্টা আঘাত খুবই কম করল, যা-ও বা করল তা শুধু এক্সপেরিমেন্টের জন্যে, ঠিক ক্ষতি করার জন্যে নয়। কুঠারের ওজনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিতে চাইছে। বুঝতে পারছে, ছুটে গিয়ে হামলা করাটা হবে পাগলামি... স্রেফ আত্মহত্যা।

পরের পর্বটা দীর্ঘ ও দর্শনীয় হলো, মেপে মেপে তলোয়ার চালাল দৈত্য, ফেন্সিঙে তার দক্ষতার প্রমাণ রাখল। সাড়া দিল রানা, উৎসাহিত করতে চাইছে, জানে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে পেয়ে গর্ববোধ করছে প্রতিপক্ষ। দু'বার তার ডগা টার্গেট স্পর্শ করল। অবশেষে রানা যখন লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে চলে এল, দেখা গেল ওর বুকের উপরে লাল একটা ফুল ফুটেছে, আর কুৎসিত একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে পাঁজর বরাবর।

চোখ সরু করে রানাকে এক মুহূর্ত দেখল দৈত্য, কর্কশ চেহারায় আক্রোশ, সেইসঙ্গে মেশানো রয়েছে ক্ষীণ শ্রদ্ধার ভাব। এত আঘাতের পরও হালকা-পাতলা লোকটা টিকে থাকবে, সেটা আশা করেনি। প্রতিপক্ষের এই বিস্ময়টুকু কাজে লাগাল রানা, এবং এই প্রথম আক্রমণে গেল। কুঠারটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে বুঝে গেছে। ছোট ছোট কোপ আর গুঁতোই সবচেয়ে ভাল মুভ ওর জন্য—তাতে বেশি শক্তি খরচ হয় না।

সামান্য বিস্মিত হলো দৈত্য। হামলা প্রতিহত করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অল্প পরিসরে রানার হাতে ঘুরন্ত কুঠারের উপরের অংশ আঘাত হানল... আঘাত হানল প্রতিপক্ষের অস্ত্রের সবচেয়ে

দুর্বল অংশে, ডগা থেকে খানিক নীচে। ব্যাটল-অ্যাক্সের ডগা আর ফলার মাঝখানের খাঁজে তলোয়ারটা আটকে ফেলল রানা, আটকে নিয়ে টান দিল, ঝাপটা খেয়ে আরেকদিকে ঘুরে গেল তলোয়ারের ডগা। দ্রুতই প্রতিক্রিয়া দেখাল দৈত্য। এখন পিছু হটলে অরক্ষিত হয়ে পড়বে সে, ফলে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়বে না রানা। তার বদলে সামনে বাড়ল সে, দুটো শরীর প্রায় এক হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকল ওরা, দুটো মুখের মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান, শরীরের মাঝখানে আটকে আছে অস্ত্রদুটো। ঠিক এই সময় একটা হাঁটু ভাঁজ করে ওপরে তুলল রানা, সমস্ত শক্তি দিয়ে গুঁতো মারল প্রতিপক্ষের দুই উরুর সন্ধিতে।

জান্তব এক গোঙানি বেরিয়ে এল বিশালদেহী লোকটার গলা চিরে। পিছিয়ে গেল, স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের ফলে দু'হাত চলে গেল আহত জায়গাটার দিকে, হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিয়েছে। পরমুহূর্তে টের পেল, কতবড় ভুল করে ফেলেছে। রানার কুঠার এখন মুক্ত, সজোরে ছুটে আসছে তার বুক লক্ষ্য করে। খপ্ করে কুঠারের ফলা আর হাতল ধরে ফেলল সে, নিজের প্রাণ বাঁচাল।

লোকটার শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল রানা। শুধু গায়ের জোরে ওর ফুল-সুইং ঠেকিয়ে দিয়েছে ব্যাটা, বজ্রমুঠিতে আটকে পড়া কুঠারটা কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। যেন কুস্তিতে মেতে উঠল দুজনে—ব্যাটল-অ্যাক্স নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হার মানতে বাধ্য হলো রানা, দানবের সঙ্গে পেরে উঠল না শক্তিতে। এক ঝটকায় কুঠারটা কেড়ে নিল সে ওর হাত থেকে, পরমুহূর্তে বুক বরাবর জোর ধাক্কা খেয়ে

ছিটকে পড়ল রানা মেঝেতে। মাথা ঠুকে যাওয়ায়, চকিতের জন্য আঁধার দেখল চোখে। যখন দৃষ্টি ফিরে পেল, আঁতকে উঠল ও। মেইল-ট্রেনের মত ছুটে আসছে দৈত্য, দু'হাতে মাথার উপর ধরে রেখেছে কুঠার... এক কোপে রানাকে ফেড়ে ফেলবে চেলা কাঠের মত।

অস্থির হলো না রানা, দুই হাঁটু ভাঁজ করে ফেলল, যেন ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। লোকটা নাগালের মধ্যে পৌঁছুতেই সজোরে ছুঁড়ল জোড়া-পা। দৈত্যের বুকের নিম্নাংশে হাতুড়ির মত আঘাত করল ওর জুতোর তলা। মড়মড় করে মৃদু শব্দ হলো, সম্ভবত পাঁজরের হাড় ভাঙল কয়েকটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল দৈত্য, উড়ে গিয়ে পড়ল হেলমেট-ভর্তি শো-কেসের গায়ে। কাঠ আর কাঁচ ভাঙল বিকট শব্দে, হুড়মুড় করে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শিরোস্ত্রাণ... সঙ্গে বিশালদেহী লোকটা। কাশল সে, তাজা রক্ত উঠে এল মুখে। তার একটা ফুসফুস পাংচার করে দিয়েছে পাঁজরের ভাঙা হাড়।

চরম অবিশ্বাসে রানার দিকে তাকাল দৈত্য। এতক্ষণে টের পেয়েছে, অর্ধেক-সাইজের যুবকটিকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে বিরাট ভুল করে ফেলেছে সে। হাতের কুঠারটা ফেলে দিল তাই, কোটের ভিতর থেকে বের করে আনল নিজের সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। আর কোনও ঝুঁকি নেবে না।

অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ দেখতে পেল রানা—গুলি খেয়ে এখুনি মারা যাবে ও। কিছু করার নেই। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, শরীর শক্ত করে ফেলল বুলেটের আঘাত সহ্য করার জন্য।

কিন্তু গুলি করল না দৈত্য। তার বদলে বাতাসে শিস কাটার একটা শব্দ ভেসে এল কানে। বিস্মিত চোখে লোকটার পিস্তল ধরা হাত এঁফোড়-ওফোঁড় হয়ে যেতে দেখল রানা - কোত্থেকে যেন একটা তীর ছুটে এসেছে! আর্তনাদ করে

আগ্নেয়াস্ত্রটা ফেলে দিল দৈত্য। মাথা ঘোরাতেই লুনাকে দেখতে পেল রানা—হাতে একটা প্রাচীন ক্রসবো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ডিসপ্লে থেকে বের করে নিয়েছে অস্ত্রটা। বিশালদেহীও তাকিয়েছে ওদিকে। প্রবল আক্রোশে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রসবো-তে আরেকটা তীর লোড করল লুনা।

বেকায়দা পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হলো না দৈত্যের। উল্টো ঘুরেই ছুট লাগাল। রানা ডাইভ দিল লোকটার পা লক্ষ্য করে—আটকে ফেলতে চায়। কিন্তু লাভ হলো না, ভয়ঙ্কর এক লাথি খেয়ে ছিটকে গেল ও কয়েক হাত দূরে। দৌড়ের গতি কমাল না দৈত্য, ছোঁ মেরে পড়ে থাকা একটা হেলমেট তুলে নিল, তারপর দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল অ্যান্টিক শপ থেকে। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে উঠল দোকানের দরজা।

লাথির ব্যথাটা সয়ে আসতেই উঠে দাঁড়াল রানা, মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল পিস্তলটা, তারপর বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে দৈত্য, মিনিটদশেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। অগত্যা ভিতরে ফিরে এল ও।

দেশমের বাঁধন কেটে দিয়েছে লুনা। একটা চেয়ারে বসিয়ে পরিচর্যা করছে ক্ষতস্থানগুলোর। রানাকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'সরি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাটা পগার পার হয়ে গেছে।' দেশমের দিকে ইশারা করল। 'কী অবস্থা ওঁর।'

'সারা শরীরে কাটাছেঁড়া,' লুনা বলল। 'তবে সিরিয়াস কোনও আঘাত পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ,' মুখ খুলল দেশম, রানাকে সম্মান দেখিয়ে নড় করল। 'একেবারে সময়মত হাজির হয়েছেন, নইলে খুন হয়ে যেতাম। অনেক-অনেক ধন্যবাদ। যদিও,

রক্ষাকর্তার নামটা এখনও জানি না আমি।'

'মাসুদ রানা, সার,' সবিনয়ে বলল রানা। 'তবে খামোকাই আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। দৈত্যটার সঙ্গে ঠোকাঠুকি ছাড়া কী-ই বা এমন করতে পেরেছি? খেল্ তো দেখাল লুনা।' অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকাল ও তরুণী আর্কিয়োলজিস্টের দিকে। 'এত ভাল তীর ছুঁড়তে জানো, সেটা আগে কখনও বলোনি কেন?'

'দূর ছাই! আগে কোনোদিন তীর ছুঁড়েছি নাকি?' মুখ ঝামটা দিল লুনা।

'ছোঁড়োনি? তা হলে হাতের টিপ এত ভাল হলো কী করে?'

'টিপ না ঘোড়ার ডিম! আমি তো ব্যাটার বুক সই করে মেরেছিলাম, লাগল গিয়ে হাতে। তোমার গায়ে লাগলেও অবাক হবার কিছু ছিল না।'

'অ্যাঁ!'

হাসতে গিয়ে ঠোঁটের ব্যথায় ককিয়ে উঠল দেশম।

রানার শার্ট রক্তে ভিজে গেছে। লুনা বলল, 'তুমি আহত।'

পাঁজর আর বুকের ক্ষত পরীক্ষা করল রানা। বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, সামান্য কেটেছে। তবে শখের শার্টটার সর্বনাশ হয়ে গেল।'

'অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত,' বলল দেশম, 'আপনার হাতে যদি *বুভারিয়া*-টা না থাকত।'

'কী বললেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ব্যাটল অ্যাক্স-টার কথা বলছি। একসেলেন্ট অস্ত্র... মানে যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায় আর কী! আপনি চমৎকারভাবে সামলেছেন ওটাকে।'

'কুঠারটার নাম বুভারিয়া?'

'হ্যাঁ। পঞ্চদশ শতাব্দীর অস্ত্র... ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র-নির্মাতা

বুভারির আবিষ্কার। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে।'

'বুভারি? ইন্টারেস্টিং! নামটা শুনেছি আমি।'

'অবাক হচ্ছি না। দুনিয়ার সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র-নির্মাতা ওরা। আজও টিকে আছে।'

'অস্ত্র নিয়ে আলোচনায় একটু ক্ষান্ত দিতে পারো?' বিরক্ত গলায় বলল লুনা। 'একটু আগে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। এখন কী করা উচিত আমাদের?'

রানা বলল, 'আমি পুলিশে খবর দেয়ার পক্ষে।'

'না, না!' প্রতিবাদ করল দেশম। 'আমি এখানে পুলিশ চাই না। সমস্যা আছে।'

'আপনার সমস্যার কথা জানি আমি,' বলল রানা। 'তবু পুলিশে খবর দেয়া উচিত। খুন হতে বসেছিলেন, সেটা ভুলে যাবেন না। বিপদ কাটেনি এখনও।'

'আর ওদেরকে ডাকলেই বুঝি সব বিপদ কেটে যাবে? তলোয়ার-অলা দানবের কথা ওরা বিশ্বাস করবে ভেবেছেন?'

অসিযুদ্ধের গল্পটা যে আজগুবি শোনাবে, তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। বলল, 'মানলাম। তবু...'

'আচমকা ঢুকে কাবু করে ফেলেছিল বটে, তবে ভবিষ্যতে আর পারবে না। ফ্রম নাউ অন, আই শ্যাল টেক কেয়ার অভ মাইসেলফ, মসিয়ো রানা।'

পড়ে থাকা হেলমেটের স্তূপ পরীক্ষা করছে লুনা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে নেই হেলমেটটা।'

'দৈত্যটা নিয়ে গেছে?' শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ,' মুচকি হাসল দেশম। চেয়ার থেকে উঠে দেয়ালের কাছে চলে গেল। গোপন একটা বোতাম চাপতেই উন্মুক্ত হলো প্যানেল, পিছনে চোরা খোপ আছে। সেখান থেকে চকচকে শিরোস্ত্রাণটা বের করে আনল। 'গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি কখনও

বাইরে সাজিয়ে রাখি না।'

'তা হলে ওই ব্যাটা কোন্‌টা নিল?'

'হাতের কাছে যেটা পেয়েছে। খালি হাতে ফিরতে চায়নি আর কী!' গম্ভীর হয়ে হাতের শিরোস্ত্রাণটা দেখল দেশম। 'যা ভেবেছিলাম, তারচেয়েও অনেক মূল্যবান এটা।'

'দুঃখিত, দিদিয়ের,' বলল লুনা। 'ব্যাটা আমার অ্যাপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছিল। তোমার মেসেজ শুনতে পেয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি এমন কিছু ঘটতে পারে...'

'ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। তোমার কোনও দোষ নেই এতে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেশম। 'যা বলছিলাম... হেলমেটটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তোমার আপত্তি আছে?'

'কীসের আপত্তি? দেখো পরীক্ষা করে... যত সময়ই লাগুক না কেন। লেগ্রাঁ মারা গেছে, হেলমেট নিয়ে মাথা ঘামাবার আর কেউ নেই এখন।'

'লেগ্রাঁ মারা গেছে?' চমকে উঠল দেশম।

অফিসের ঘটনা খুলে বলল লুনা। শেষে যোগ করল, 'এর পরেও জিনিসটা রাখবে কি না, ভেবে দেখো। রানা ঠিক বলেছে, বিপদ সত্যিই কাটেনি।'

'বিল্যাঙ্ক, আমি গা ঢাকা দেব,' বলল দেশম। 'প্রোভেন্সে একটা ভিলা আছে আমার, কেউ জানে না। দোকান বন্ধ করে দিয়ে ওখানে চলে যাব। চাইলে তুমিও আসতে পারো। তোমার উপরও তো নজর আছে ওদের!'

'ধন্যবাদ, কিন্তু এদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। তা ছাড়া হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলে পুলিশ সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে।'

'ছুটি নাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'ফ্যামিলি ইমার্জেন্সির কথা বললে কেউ মানা করতে পারবে না। মসিয়ো দেশম ঠিক

বলেছেন। তুমিও বিপদের মধ্যে আছ। আমার তো মনে হয়, গা-ঢাকা দেয়াই উচিত।'

'যেতে বলছ তা হলে?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে তো জামাকাপড় নেই। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সব গুছিয়ে নিতে হবে, অফিসে ছুটির দরখাস্ত পৌঁছাতে হবে...'

'চলো, আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আর আমি?' জিজ্ঞেস করল দেশম।

'হেলমেট নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ঠিক হবে না,' বলল রানা। 'আপনি ভিলায় চলে যান। ঠিকানা দিন, লুনাকে আমি পৌঁছে দেব ওখানে।'

এক টুকরো চিরকুটে ভিলার ঠিকানা লিখে দিল দেশম। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লুনার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল দুজনে। বাড়িতে ঢোকার একটু পরেই বেজে উঠল রানার সেলফোন। কল রিসিভ করে কিছুক্ষণ কথা বলল রানা।

গোছগাছ শেষ হয়েছে লুনার। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কার ফোন?'

'মেঘ না চাইতেই জল বলতে পারো,' হাসল রানা। 'মাদাম আইরিন বুভারির সেক্রেটারি... গদগদ ভাষায় জানাল, ওর মহীয়সী মালকিন আগামীকাল আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হয়েছেন।'

'বুভারি? দিদিয়েরের মুখেও নামটা শুনে অদ্ভুত আচরণ করেছ তুমি। কী ব্যাপার বলো তো!'

গ্লেসিয়ারে পাওয়া লাশ আর লেকের তলার বিমানের সঙ্গে বুভারিদের কানেকশনের কথা খুলে বলল রানা। পিঠ খাড়া হয়ে গেল লুনার। বলল, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সেটা ঠিক হবে না। বিপদ দেখা দিতে পারে।'

'বুড়ি এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাব, এতে বিপদ কোথায়?'

'আমি সিরিয়াস, লুনা। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে বুভারিদের সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস আমার। এতে তোমাকে জড়াতে চাই না।'

'আমি অলরেডি জড়িয়ে গেছি, রানা। গ্লেসিয়ারের তলায় আমাকে মারতে চেয়েছে ওরা, বাড়ি-অফিস তছনছ করেছে, দেশমের উপরও হামলা করেছে শুধুমাত্র আমারই কারণে! এখন চাইলেও আমার পক্ষে পিছু হটা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু...' ভাবছে রানা।

'কোনও কিন্তু নয়, রানা। পুরনো অস্ত্র-শস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ আমি, বুভারিদের সম্পর্কেও অনেক কিছু জানি। আমার সাহায্য কাজে লাগবে তোমার।'

'কঠিন যুক্তি দাঁড় করিয়ে দিলে দেখছি!' বলল রানা। ভাল করে লক্ষ করল লুনার মুখ। বুঝতে পারল, মানা করে ঠেকানো যাবে না ওকে। তাই কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, নেব তোমাকে... কিন্তু ছদ্ম-পরিচয়ে। বলব তুমি আমার অ্যাসিসটেন্ট। রাজি?'

'রাজি।'

'গুড। চলো এখন।'

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল রানা-লুনা। সরাসরি সায়েন্স সেন্টারে যাচ্ছে, ওখানে লুনার ছুটির দরখাস্ত পৌঁছে দিয়ে প্রোভেন্সের পথ ধরবে। রাতটা দেশমের ভিলায় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা, কাল ওখান থেকেই মাদাম বুভারির সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

কী অপেক্ষা করছে বুভারি এস্টেটে? সেটা সময়ই বলে দেবে।

সতেরো

নির্জন মেঠোপথ ধরে চলেছে একটা মিনিট্রাক। ড্রাইভারের চেহারা হাবাগোবা, উদাস নয়নে তাকিয়ে আছে সামনে, গুনগুন করে পল্লীগীতির সুর ভাঁজছে। আচমকা লালচে একটা ছায়া উড়ে গেল তার গাড়ির উপর দিয়ে, প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা চেসিস। আঁতকে উঠে স্টিয়ারিং ঘোরাল ড্রাইভার, পথ ছেড়ে পাশের নালায় আছড়ে পড়ল ট্রাক। ঝাঁকি খেয়ে পিছন থেকে ছিটকে পড়ল কয়েকটা কাঠের খাঁচা, ভেঙে গেল। সেখান থেকে চেঁচামেচি করে বেরিয়ে এল অনেকগুলো মুরগী, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল চারদিকে।

দৃশ্যটা দেখে হাসিতে ভেঙে পড়ল লাল-রঙা বিমানের পাইলট। ড্রাইভারকে ভয় দেখানোর জন্য ট্রাকের উপর দিয়ে আরেক দফা উড়ে গেল সে, তারপর কোর্স বদলাল। নীচে দিগন্তবিস্তৃত জমি দখল করে রেখেছে আঙুরের খেত। প্যানেলের একটা সুইচ টিপল সে—বিমানের ডানার তলায় লাগানো টুইন পড থেকে কীটনাশকের মেঘ সৃষ্টি হলো, ইলশেগুঁড়ির মত ছড়িয়ে পড়ল খেতের উপর। দিক বদলাল পাইলট, আঙুরের

খেত পেরিয়ে এল। নীচে এখন ঘন অরণ্যের ভিতর সুনীল জলাশয়। ছবির মত দৃশ্য।

ধীরে ধীরে উচ্চতা কমল বিমানের। সামনে উদয় হলো একটা শ্যাতো, মানে প্রাসাদ—উঁচু প্রাচীরে ঘেরা, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর রয়েছে গার্ড টাওয়ার। প্রাচীরের বাইরে, গোটা সীমানা ঘিরে রেখেছে গভীর পরিখা, ড্র-ব্রিজ ছাড়া পেরুনোর উপায় নেই। মধ্যযুগের স্থাপত্যশৈলীর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

শ্যাতোর ছাদ ছুঁই ছুঁই করে উড়ে গেল বিমান, কিছুক্ষণ পর মাইলখানেক দূরে বুক চিতিয়ে থাকা এয়ারস্ট্রিপে ল্যাণ্ড করল। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই ককপিট থেকে নেমে এল পাইলট, এগিয়ে গেল স্ট্রিপের একপ্রান্তে পার্ক করে রাখা তার জাগুয়ার সেডানের দিকে। পিছনে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে উদয় হলো গ্রাউণ্ড ক্রু-র দল, বিমানটাকে টেনে নিয়ে গেল নিঃসঙ্গভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা পাথুরে হ্যাঙারের ভিতর।

ক্রু-দের দিকে ফিরেও তাকাল না ফিলিপ বুভারি, গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটছে সে গাড়ির উদ্দেশে। চোখ থেকে ফ্লাইং গগলস্ খুলে ছুঁড়ে দিল শোফারের দিকে, তারপর দরজা খুলে উঠে পড়ল জাগুয়ারের পিছনের সিটে। গাড়ি চলতে শুরু করলে বিল্ট-ইন বার থেকে কনিয়াকের বোতল আর গ্লাস বের করল। ট্রাক ড্রাইভারের ভয়ার্ত চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে, ড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে হেসে উঠল সে আনমনে।

রীতিমত সুপুরুষ বলা চলে ফিলিপকে। লম্বা, ঋজু দেহ, চোখে দেখায় অ্যাথলিট বলে ভ্রম হতে পারে। প্রাচীন রোমান মূর্তির মত চেহারা, যেন পাথর কুঁদে তৈরি করা হয়েছে, একবিন্দু খুঁত নেই কোথাও। খুঁত রয়েছে কেবল চোখের তারায়—বড্ড শীতল... বড্ড নিষ্ঠুর। ওদিকে তাকালেই আঁচ করা যায়, দয়ামায়া বলে কোনও অনুভূতি নেই তার ভিতরে।

বিষাক্ত সাপের চেয়েও ভয়াবহ সে। স্থানীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা তাকে শয়তানের দূত বলে মনে করে। ফিলিপকে দেখলেই বুকে ক্রুশ আঁকে তারা। আঁকবে না-ই বা কেন? মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় ফিলিপ, কারণে-অকারণে অত্যাচারের খড়গ নামিয়ে আনে অসহায় লোকজনের উপর।

অরণ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে জাগুয়ার, গাছের ডাল আর পাতার আচ্ছাদনে সেখানে ন্যাচারাল এক টানেলের সৃষ্টি হয়েছে। ওখান থেকে বেরুলেই ঘাসে ঢাকা খোলা মাঠ, তারপর রয়েছে পরিখা আর শ্যাতোর ফটক। মাঠ পেরিয়ে এন্ট্রান্সের সামনে থামল গাড়ি। হর্ন বাজাতেই ধীরে ধীরে নেমে এল ড্র-ব্রিজ, উঠে গেল প্রবেশপথে স্থাপন করা লোহার গ্রিল। প্রাসাদের নুড়ি-বিছানো উঠোনে ঢুকে গেল জাগুয়ার।

বুভারি শ্যাতোর অবয়ব যে-কোনও ইতিহাসের বইয়ে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখে। রেনেসাঁ যুগের পর এ-ধরনের আর কোনও প্রাসাদ তৈরি হয়নি ফ্রান্সে। ভীমদর্শন এক ইমারত, মোটা আর ভারী পাথরে গড়া। চারকোনায় চারটে টাওয়ার আছে; জানালাগুলো ছোট, সংকীর্ণ—আলো-বাতাস ঢোকার জন্য নয়, ওখান থেকে শত্রুর উদ্দেশে তীর ছোঁড়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে ফোকর। এক দর্শনেই যে-কেউ বলতে পারবে, আবাস হিসেবে নয়, যুদ্ধশিবির হিসেবে বানানো হয়েছে ওটা।

স্থূলকায় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে শ্যাতোর নকশা-কাটা ভারী ডাবল-ডোরের সামনে—মাথা-কামানো, পরনে বাটলারের পোশাক। রুক্ষ চেহারার সঙ্গে বেশভূষা মোটেই মানাচ্ছে না। গাড়ি থেকে ফিলিপকে নামতে দেখে এগিয়ে এল। খসখসে গলায় বলল, 'আর্মারি-তে আপনার মা অপেক্ষা করছেন। আপনি পৌঁছুনোমাত্র দেখা করতে বলেছেন।'

'শুনে খুশি হলাম, ভ্যাসিলি,' কাঠখোট্টা স্বরে বলল ফিলিপ,

বাটলারকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ব্রিটেনের রানীকে যেভাবে রয়্যাল গার্ড পাহারা দেয়, সেভাবে ওর মা-কেও দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আগলে রাখে ছোটখাট এক বাহিনী—সদস্যরা ফ্রেঞ্চ লিজিয়ন, কিংবা আণ্ডারওয়ার্ল্ডের প্রাক্তন সদস্য। ভ্যাসিলি সেটার প্রধান। ভয়ঙ্করদর্শন রক্ষীদের বাধা না পেরিয়ে এমনকী ফিলিপও নিজের মায়ের কাছে পৌঁছুতে পারে না। লোকগুলো ওর দু'চোখের বিষ। নিজের বাড়িতে নিজেকেই বহিরাগত বলে মনে হয় ওর... শুধুমাত্র মায়ের এই বডিগার্ডদের কারণে।

বাড়ির ভিতর ঢুকল ফিলিপ। পোরট্রেট গ্যালারির দীর্ঘ করিডর ধরে হনহন করে হেঁটে চলল। দু'পাশের দেয়ালে বুভারি পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের সদস্যদের তৈলচিত্র ঝুলছে, সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না। পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে ফিলিপের মোটেই আগ্রহ নেই; তাদের অনেকেই এই প্রাসাদে নির্মম মৃত্যু বরণ করেছে, মাথা ঘামায় না সে-ইতিহাস নিয়েও। ঘামাবেই বা কেন? সহস্র বছর ধরে এখানে বাস করছে ওদের পরিবার; খুঁজলে এমন একটা কামরাও পাওয়া যাবে না, যেখানে কোনও না কোনও বুভারি ছুরিকাঘাত, বিষপ্রয়োগ কিংবা গুলিবর্ষণের শিকার না হয়েছে। সত্যি বলতে কী, অতৃপ্ত আত্মা বলে যদি কিছু থাকত, তা হলে বুভারি-শ্যাতোয় জ্যান্ত মানুষের চেয়ে ভূত-প্রেতের সংখ্যা অনেক বেশি হতো।

গ্যালারি পেরিয়ে আর্মারিতে পৌঁছুল ফিলিপ। বিশাল, ব্যাঙ্ক ভল্টের মত এক কামরা—ভিতরে হরেক রকম অস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাচীন আর্মামেন্টের মিউজিয়াম বলা চলে, ব্রোঞ্জ যুগের তলোয়ার থেকে শুরু করে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত সবকিছু আছে। আর আছে মধ্যযুগীয় নাইটদের বর্ম—স্টেইনড্-গ্লাসের ডিসপ্লে কেসে শোভা পাচ্ছে সব, সময়কাল অনুসারে রক্ষিত।

একদর্শনে বোঝা যায়, এই আর্মারি আসলে যুদ্ধ আর ধ্বংসের ইতিহাসের এক নীরব প্রদর্শনী।

আর্মারির এক অংশে রয়েছে মিলিটারি হিস্ট্রির লাইব্রেরি, দরজা ঠেলে ওখানে ঢুকল ফিলিপ। চারদিকে বইভর্তি শেলফ, মাঝখানে একটি মেহগনি কাঠের ডেস্ক। উপরে নকশাদার ঝাড়বাতি ঝুলছে, তার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো ঘর। ডেস্কের পিছনে একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে আছে বিজনেস-সুট পরা এক মহিলা, মাথা নিচু করে একগাদা কাগজপত্র ঘাঁটছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফিলিপ, গলা খাঁকারি দিল।

মুখ তুলে তাকাল আইরিন বুভারি। যৌবন পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, তারপরও রূপের ছটা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি চেহারা থেকে। ফ্যাশন মডেলদের মত একহারা দেহ, বয়সের ভারে মোটেই ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি, বরং বয়স তার ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। চোখের তারায় আগুন জ্বলে আজও। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু গায়ের রঙ আজও পোর্সেলিনের মত ধবধবে সাদা। মাথার চুল ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু স্বাস্থ্য হারায়নি। ঢেউ খেলে ঘন কেশরাজি নেমে গেছে কোমর পর্যন্ত। এই মুহূর্তে অবশ্য খোঁপা বেঁধে রাখা হয়েছে।

শীতল চোখে ছেলেকে দেখল মাদাম বুভারি। বলল, 'বসো তোমার জন্য অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি আমি।'

একটা চেয়ার টেনে মায়ের মুখোমুখি বসল ফিলিপ। 'দেরির জন্য দুঃখিত। ফকার নিয়ে আঙুর-খেতে ওষুধ ছিটাতে গিয়েছিলাম।'

'ছাতের টালিগুলোর কাঁপুনি শুনেছি আমি,' গম্ভীর গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'আজ কয় শ' গরু-ছাগলকে ভয় পাইয়ে

দিয়ে এসেছ, জানতে পারি?'

'একটাও না,' হাসল ফিলিপ। 'তবে একটা কনভয়ের উপর হামলা চালিয়ে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্ত করেছি।'

'কনভয়? বন্দি?' ভুরু কোঁচকাল মাদাম বুভারি।

'মুরগীভর্তি একটা ট্রাক। ভয় দেখিয়ে ওটাকে নালায় ফেলে দিয়েছি।' মুখের হাসি বিস্তৃত হলো ফিলিপের। 'ছাড়া পেয়ে মুরগীগুলোর আনন্দ যদি দেখতে!'

'তোমার এসব ছেলেমানুষি কবে বন্ধ হবে, বলতে পারো?' ছেলের রসিকতায় প্রভাবিত হলো না মাদাম বুভারি। 'চাষাভুষোদের ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি আমি। বিমান নিয়ে খেলাধুলার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে তোমার জন্য...

'যেমন?'

'বুভারি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ। নাকি সেটার কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে?'

মায়ের কণ্ঠের পরিবর্তন টের পেয়ে পিঠ সোজা হয়ে গেল ফিলিপের। যেন দুষ্টু স্কুলছাত্রের পিঠে বেতের বাড়ি পড়েছে। মিনমিন করে বলল, 'অবশ্যই আছে, মা। বিমান ওড়ানো স্রেফ আমার শখ... নার্ভ শান্ত করার একটা উপায়। আর কিছু না।'

'আমাদের ব্যবসা আর জীবনযাত্রার উপর অনেক হুমকির সৃষ্টি হয়েছে, ফিলিপ। সেগুলো দূর করার ব্যাপারে কতদূর কী করেছ, জানতে পারি? সহস্র বছর ধরে বুভারিরা যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, তুমি তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ-দায়িত্ব হালকাভাবে নিয়ো না।'

'নিচ্ছি না তো। ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই, বিব্রতকর একটা ঝামেলাকে হাজার হাজার টন বরফের তলায় কবর দিয়েছি আমি!'

সুন্দর ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল মাদাম বুভারির। 'থিয়োডর বুভারিকে *বিব্রতকর ঝামেলা* বললে কম বলা হয়। হ্যাঁ, ওটা সামলেছ তুমি। কিন্তু কাজটা নিখুঁত হয়নি। গ্যাস্টন একটা গর্দভ, ওর বোকামির জন্য মহামূল্য রেলিক-টা চিরদিনের জন্য হারাতে বসেছিলাম আমরা।'

'ওর কী দোষ? হেলমেটটা যে বরফের তলায় আছে, তা আমরা কেউই জানতাম না। ওকে শুধু স্ট্রংবক্স আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল।'

'হাহ্, গুরুত্বহীন একটা জিনিস! পানি ঢুকে ভিতরের কাগজপত্র বহুদিন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। বাক্সটা এখন কেজি দরে বিক্রির বস্তু ছাড়া আর কোনও কাজের না।'

'হাতে পাবার আগে তো সেটা বোঝার উপায় ছিল না।'

অজুহাতটা কানে তুলল না মাদাম বুভারি। 'ওই আর্কিয়োলজিস্ট মেয়েটা যে আমাদের রেলিক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তা-ও তো জানতে না তুমি। না, এভাবে আর চলে না। হেলমেটটা যে-কোনও মূল্যে উদ্ধার করতে হবে আমাদেরকে। বুভারিদের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে ওটার উপর। গ্যাস্টনের উপর আর নির্ভর করা যায় না, সরবোনে আরেক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে এসেছে গাধাটা। পুলিশ এখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ওই অ্যান্টিক ডিলারের কাছ থেকেও আসল জিনিস আদায় করতে পারেনি তোমার পা-চাটা কুকুর, ফালতু এক নমুনা উঠিয়ে এনেছে!'

'হ্যাঁ, ব্যর্থ হয়েছে গ্যাস্টন,' স্বীকার করল ফিলিপ। 'আমি ব্যাপারটা দেখছি।'

'দেখাদেখি বাদ দিয়ে কাজে নামো, ফিলিপ!' গমগম করে উঠল মাদাম বুভারির গলা। 'আমাদের পরিবারে ব্যর্থতার কোনও স্থান নেই। দুর্বলতা দেখালে বহু আগেই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে

যেতাম। গ্যাস্টন এখন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরবোনে ওকে কেউ দেখে ফেলেছে কি না, কে জানে। ওই অ্যান্টিক ডিলারও পুলিশের কাছে ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারে। আমার মনে হয়, বোঝাটা ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেললেই ভাল করবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকাল ফিলিপ। 'গ্যাস্টনকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি ওর ব্যবস্থা নেব।'

ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল মাদাম বুভারি, সে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। গ্যাস্টন একটা প্রভুভক্ত শিকারি কুকুর, শুধু ফিলিপের কথায় ওঠে-বসে। এমন একটা অস্ত্র সে কখনোই হাতছাড়া করবে না। পারিবারিক মূল্যবোধ বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই বুভারি পরিবারে, সদস্যদের মধ্যে সংঘাত লেগে থাকে, একে অন্যের পিঠে ছুরি বসানোয় ওরা অভ্যস্ত। সে-ধরনের পরিস্থিতিতে গ্যাস্টনের মত খুনি খুব কাজে আসে।

'ব্যবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ো,' শান্ত গলায় বলল মাদাম বুভারি।

'নেব,' ফিলিপও নির্বিকার। 'কিচ্ছু ভেবো না। গ্যাস্টনের কপালে যা ই ঘটুক, আমাদের গোমর কখনও ফাঁস হবে না।'

'গ্যারান্টি দিতে পারো? আরেকটু হলে তো ডরমেয়ারেই সর্বনাশ ঘটে গেত। এখনও সে-বিপদ কাটেনি। আমাদের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি চলে গেছে অচেনা এক মানুষের হাতে। আসল কাজ উদ্ধার হয়নি, মাঝখান থেকে হৈচৈ বেধে গেছে। ব্যাপারটা হালকাভাবে নিয়ো না। আমার উদাহরণ অনুসরণ করো। ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসনের কথাই ধরো, ওকে ফিরিয়ে এনেছি আমি, কিন্তু কাকপক্ষীও টের পায়নি কিছু।'

বিদ্রূপের হাসি ফুটল ফিলিপের ঠোঁটে। 'তুমি শুধু

হেণ্ডারসনকেই ফিরিয়ে এনেছ, মা। কিন্তু প্রজেক্টের বাকি সব বিজ্ঞানীকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছ... ওদের কাজ শেষ হবার আগেই!'

ছেলের দিকে বিষমাখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মাদাম বুভারি। শান্ত গলায় বলল, 'সামান্য মিসক্যালকুলেশন। নিজেকে নিখুঁত বলে দাবি করছি না আমি। ভুল স্বীকার করা, এবং সেই ভুলের সংশোধন করাই সত্যিকার ম্যাচিউরিটির লক্ষণ। ড. হেণ্ডারসনকে আবার গবেষণায় লাগিয়ে দিয়েছি আমি। ও কাজ করতে থাকুক, এই ফাঁকে হেলমেটটা উদ্ধার করতে হবে আমাদেরকে। তুমি কদ্দূর এগোলে?'

'দিদিয়ের দেশম... অ্যান্টিকুইটিজ ডিলার... গায়েব হয়ে গেছে। ওকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি।'

'আর আর্কিয়োলজিস্ট মেয়েটা?'

'ওকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'খুঁজতে থাকো। আমিও নিজস্ব কিছু লোক লাগিয়েছি ওর পিছনে। গোপনে কাজ করতে হবে আমাদেরকে। এবার আর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। আর হ্যাঁ, নতুন একটা ঝামেলা দেখা দিয়েছে। গোস্ট সিটিতে একটা এক্সপিডিশনের আয়োজন করেছে উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট। নুমা সাহায্য করছে ওদেরকে।'

'মাসুদ রানা... মানে ডরমেয়ারের উদ্ধার অভিযানের নায়ক... ও-ও নুমার সঙ্গে জড়িত। কোনও কানেকশন আছে ভাবছ?'

'মনে হয় না,' মাদাম বুভারি মাথা নাড়ল। 'রানা ব্যাপারটায় জড়াবার বহু আগেই ওই এক্সপিডিশনের কাজ শুরু হয়েছে। ওকে নিয়ে ভাবছি না আমি, অভিযানটার ব্যাপারে ভাবছি। আমরা কী করছি, সেটা আবিষ্কৃত হলে বাজে একটা পরিস্থিতির

মুখোমুখি হতে হবে।'

'তা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।'

'ঠিক বলেছ। সেজন্যেই একটা প্ল্যান খাড়া করেছি আমি। গোস্ট সিটিতে প্রথম ডাইভেই গায়েব হয়ে যাবে এক্সপিডিশনের ডিপ-সি ভেহিকল *আলভিন।*'

'সেটা কি উচিত হবে? বড় মাপের সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশন চালানো হবে ওটার জন্য। একটার জায়গায় দশটা সাবমারসিবল ডাইভ দেবে ওখানে।'

'কোথায় গায়েব হয়েছে, সেটা জানলে তো! আলভিনের পাশাপাশি ওটার সাপোর্ট শিপও গায়েব হয়ে যাবে, ডিয়ার। হাজার হাজার বর্গমাইল সাগরের কোথায় ওরা হারিয়ে গেছে, তা কেউ জানতে পারবে না।'

'গোটা একটা জাহাজ গায়েব করে দেবে? কীভাবে?'

'ভুলকে সাফল্যের সিঁড়ি বানাতে শেখো, ফিলিপ। গোস্ট সিটির উদ্দেশে দুটো জাহাজ পাঠিয়েছি আমি, একটায় রয়েছে আমাদের ভুলের ফসল... রিমোট কণ্ট্রোলের মাধ্যমে ওটাকে চালাবে দ্বিতীয় জাহাজটা। ডাইভ সাইটের কাছাকাছি নোঙর ফেলবে প্রথম জাহাজ। আলভিন পানিতে ডাইভ দেয়া মাত্র মে-ডে সিগনাল পাঠানো হবে। রিসার্চ শিপ থেকে রেসকিউ পার্টি আসবে, তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে একদল ক্ষুধার্ত পশু। তারপর স্যালভেজ করার ভঙ্গিতে জাহাজটা রিসার্চ শিপের পাশে গিয়ে ভিড়বে, ভিতরে রাখা বোমা ফাটানো হবে দূর থেকে। ফলে দুটো জাহাজই ডুবে যাবে। কোনও সাক্ষী থাকবে না। রেসকিউ ক্রু-দের ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না আমি।'

'এখানে মাত্র একজন বেঁচেছে,' বলল ফিলিপ। 'তাকে পাগল ভাবছে সবাই। ও নিয়ে ভাবনার কিছু দেখছি না।'

'ভালই ভাল ছিল আমাদের, তাই মেয়েটার কথা বিশ্বাস

করেনি কেউ,' চাঁছাছোলা গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'বার বার ভাগ্যের সহায়তা পাবে, এ-কথা ভাবতে যেয়ো না। আর হ্যাঁ, মাসুদ রানা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। গ্লেসিয়ারে পাওয়া লাশের ব্যাপারে তথ্য জানাতে চায়।'

'ও থিয়োডরের কথা জানে?' অবাক হলো ফিলিপ।

'বুঝতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'ওকে এখানে আসতে বলেছি আমি, কথা বলে দেখি। যদি মনে হয় লোকটা বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে, তা হলে ওকে তোমার হাতে তুলে দেব।'

'ঠিক আছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফিলিপ, মায়ের কাছে গিয়ে গালে চুমু খেলো, তারপর বেরিয়ে গেল লাইব্রেরি থেকে।

ছেলের গমনপথের দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকল মাদাম বুভারি, পারিবারিক বৈশিষ্ট্যগুলো ভালমতই রপ্ত করেছে সে। পিতার মত ফিলিপও মেধাবী, নিষ্ঠুর, উচ্চাভিলাষী এবং লোভী। খুঁত বলতে রয়েছে কেবল উপস্থিতবুদ্ধির অভাব, আর জেদ। এই দুটো দুর্বলতার কারণেই বহু বছর আগে স্বামীকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল মাদাম বুভারি, নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল পারিবারিক সাম্রাজ্যের লাগাম।

ফিলিপ ওর উত্তরসূরি হিসেবে সবকিছু পাবার আশা করছে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে না পেলে মায়ের পেটে ছুরিও বসাতে পারে। কিন্তু কারও হাতেই কিছু তুলে দেবার ইচ্ছে নেই মাদাম বুভারির। মস্ত বড় একটা পরিকল্পনা রয়েছে ওর, সেটার কথা ফিলিপকে জানায়নি। জানায়নি হেলমেটের সত্যিকার গুরুত্বটাও। আনমনে মাথা নাড়ল মাদাম বুভারি—আপন সন্তানকে হত্যা করতে ভাল লাগবে না তার, কিন্তু বিষধর সাপকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। বিশেষ করে সেই সাপ যদি ওর

মতো পরিকল্পনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে। মুরগীঅলাকে খুঁজে বের করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অভিজাত পরিবারে সেটাই নিয়ম। কোনও কেলেঙ্কারি বাধতে দেয়া যাবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাদাম বুভারি—মায়ের দায়িত্ব কখনও শেষ হয় না।

আঠারো

শান্ত সমুদ্র আর চমৎকার আবহাওয়ার কল্যাণে খুব দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে গেছে রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*। মিড-আটলান্টিক রিজের উত্তরে, আটলান্টিক ম্যাসিফ নামে এক ডুবো-পাহাড়ের গায়ে নোঙর ফেলেছে। জায়গাটা অ্যাজোরেস দ্বীপের দক্ষিণে, বারমুডা থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে। এককালে সাগর থেকে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে ছিল এই পাহাড়ের চূড়া, এখন আড়াই হাজার ফুট গভীরে তলিয়ে গেছে।

আগামীকাল সকালে প্রথম ডাইভ দেবে আলভিন। তাই ডিনারশেষে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিটিঙে বসল ড. আসিফ রেজা আর ডানিয়া রেজা। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, গোস্ট সিটি এবং আশপাশের এলাকা থেকে পাথর, খনিজ পদার্থ আর জৈব স্যাম্পল সংগ্রহ করা হবে। এ-ছাড়া যতটা সম্ভব ভিডিয়োর অবজার্ভেশন রেকর্ড করা হবে। মোট সাতজন বিজ্ঞানী

এসেছেন আটলান্টিসে, তবে আলভিনে চেপে ডাইভ দেবে শুধুমাত্র তিনজন—সাবমারসিবলের পাইলট, আর রেজা দম্পতি। বাকিরা সারফেস থেকে মনিটরিং এবং অ্যানালিসিসের কাজ করবেন।

পরদিন ভোর ছ'টায় বিছানা ছাড়ল আসিফ আর তানিয়া, সাবমারসিবলের চেকলিস্ট মেলানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাতটা নাগাদ ইকুইপমেন্ট আর ব্যাটারির চেকআপ সম্পন্ন হয়ে গেল। এরপর ক্যামেরা, খাবার-দাবার আর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র তোলা হলো আলভিনে। সবশেষে ডুবোযানটার গায়ে বাঁধা হলো বাড়তি ওজন, যাতে ওটা দ্রুত তলিয়ে যেতে পারে পানিতে। ওঠার সময় সেগুলো খুলে ফেলে দেয়া যাবে। ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে ম্যানিপুলেটর আর্মও খুলে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা আছে; চাইলে শুধু ফাইবারগ্লাসের কেবিনটাও আলাদা করা যায়। তারপরও যদি ওরা পানির তলায় আটকা পড়ে, অন্তত বাহাত্তর ঘণ্টা লাইফ সাপোর্ট দিতে পারবে আলভিন।

রওনা হবার আগে ওয়েদার রিপোর্ট চেক করল আসিফ, ডেকে দাঁড়িয়ে আকাশ আর সাগর দেখল। পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ ভাসছে, নীচে নিস্তরঙ্গ জলরাশি। ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সব মিলিয়ে ডাইভ দেবার জন্য আদর্শ পরিবেশ। সন্তুষ্ট হয়ে পানিতে দুটো ট্রান্সপণ্ডার ফেলার নির্দেশ দিল ও—পাতালের অন্ধকার জগতে ওগুলো ওদের নেভিগেশন মার্কার হিসেবে কাজ করবে।

ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়ে স্যাটেলাইট ফোনে ড. সলোমনের সঙ্গে কথা বলছে তানিয়া—গরগন-উইড ইনফেস্টেশনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে।

'আমাদের ক্যালকুলেশনের চেয়ে দ্রুত ছড়াচ্ছে শৈবালটা,' বললেন সলোমন। 'আমেরিকার ইস্ট কোস্টের কাছাকাছি পৌঁছে

গেছে, প্যাসিফিকেও দেখা দিয়েছে ওটা।'

'আলভিনকে নামাতে যাচ্ছি আমরা,' জানাল তানিয়া। 'আবহাওয়া ভাল, পানি স্বচ্ছ থাকবে বলে আশা করছি।'

'চোখকান খোলা রেখো,' সতর্ক করলেন সলোমন। 'ইনফেস্টেশনের উৎসটা হয়তো এক দেখায় চিনতে পারবে না।'

'ক্যামেরায় পুরো ডাইভের রেকর্ডিং করব আমরা। নীচে কিছু বোঝা না গেলেও যাতে শিপে ফিরে স্টাডি করতে পারি। উল্লেখযোগ্য কিছু পেলেই আপনাকে ই-মেইলে পাঠিয়ে দেব।'

'ওকে। বেস্ট অভ লাক।'

আটলান্টিসের আফট ডেকে জড়ো হয়েছে ক্রু-রা। ড. সলোমনের সঙ্গে কথা শেষ করে ওখানে হাজির হলো তানিয়া। আসিফ তখন বডিবিল্ডার গোছের এক যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। লেফটেন্যান্ট অ্যারন বেকার... মার্কিন নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার, সিল-কমাণ্ডো; বর্তমানে একটি সিকিউরিটি ফার্মের সঙ্গে জড়িত। ছোট একটা টিম নিয়ে আটলান্টিসে এসেছে সে, এক্সপিডিশনের নিরাপত্তার জন্য।

'আপনাদের সাহস আছে বলতে হবে,' আলভিনের দিকে তাকিয়ে বলল লে. বেকার। 'এইটুকু একটা সাবমারসিবল নিয়ে অথৈ সাগরে নামছেন! আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসত!'

হাসল আসিফ। 'হ্যাঁ, একটু চাপাচাপি হবে। কিন্তু দু-চার ঘণ্টার তো ব্যাপার, সহ্য করে নেব।'

ছোট একটা হ্যাঙার আছে সাবমারসিবল রাখার জন্য। সেটার দরজা খুলে গেছে। রেইলের উপর পিছলে বেরিয়ে এসেছে আলভিন। বড় একটা ক্রেনের তলায় এসে থামল। প্ল্যাটফর্ম ধরে সাত অভিযাত্রী উঠে গেল উপরে, তারপর হ্যাচ খুলে ভিতরে ঢুকল। দু'জন এসকর্ট ডাইভার আলভিনের গা ঘেঁষে উঠল, ক্রেনের কেইবল আটকে দিল দু'প্রান্তে।

শক্তিশালী মোটর একটু পরেই শূন্যে তুলে ফেলল ডুবোজাহাজটাকে, ডেক পেরিয়ে ধীরে ধীরে পানিতে নামাল। ডাইভাররা এবার খুলে দিল কেইবলের বাঁধন, বিদায় নিয়ে সাঁতার শুরু করল আটলান্টিসের দিকে।

আলভিনের ককপিট কাম কেবিনে ঠাসাঠাসি করে আসন গ্রহণ করেছে অভিযাত্রীরা, টাইটেনিয়ামে তৈরি প্রেশার স্ফিয়ারটার ডায়ামিটার মাত্র বিরাশি ইঞ্চি। যে-দিকেই তাকানো হোক, শুধু কন্ট্রোল প্যানেল চোখে পড়বে। পাওয়ার অ্যাকটিভেশন, ব্যালাস্ট কন্ট্রোল, অক্সিজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নিরূপণ, ইত্যাদি সারা হয় ওগুলোর সাহায্যে। পাইলটের সিটটা একদম সামনে, নেভিগেশন সিস্টেম আর প্রপালশন কন্ট্রোলের কনসোল রয়েছে ওখানে, তার উপর স্বচ্ছ ভিউপোর্ট।

পাইলটের স্টেশনের দু'পাশে জড়সড় হয়ে বসেছে রেজা-দম্পতি। অস্বস্তিকর অবস্থা, তবু উত্তেজনা অনুভব করছে আসিফ। একজন ডিপ-সি জিয়োলজিস্টের জন্য আলভিনের খুপরির মত কেবিন যে-কোনও পাঁচ-তারা হোটেলের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়। রীতিমত বিখ্যাত এক সাবমারসিবল এটা, ১৯৬৪ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পানিতে নামার পর থেকেই সাফল্য দেখিয়ে চলেছে আলভিন, নাম করেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। স্পেনের উপকূলে একটি হারানো হাইড্রোজেন বোমা খুঁজে বের করা হয়েছে এই ডুবোজাহাজের সাহায্যে, এমনকী *টাইটানিক*-এর সমাধিতেও প্রথমবারের মত মানুষ নিয়ে যাওয়ার ইতিহাস রয়েছে এর। উত্তেজনা অনুভব না করে উপায় কী?

এ-যাত্রায় আলভিনকে চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে এক মহিলা মেরিন বায়োলজিস্ট—জয়েস কোর্ট। সাউথ ক্যারেলাইনায় জন্ম,

বয়স বত্রিশ, মায়াবী মুখশ্রী। পরনে জিন্স আর উলের সোয়েটার, মাথায় বেসবল ক্যাপ। দেখে মনে হতে পারে, সমুদ্রে ডুব দিতে নয়, হাওয়া খেতে বেরিয়েছে সে। একই ধরনের পোশাক আসিফেরও গায়ে। লেদারের জ্যাকেট, সুতি শার্ট, জিন্সের প্যান্ট আর রেক্সিনের কেডস্। তানিয়া ওসবের মধ্যে যায়নি, সত্যিকার গবেষকের মত একপ্রস্থ জাম্পসুট পরেছে।

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কে পানি ঢোকানো হচ্ছে, ধীরে ধীরে আড়াই হাজার ফুট গভীরতার ডাইভ শুরু করল আলভিন। রিপোর্ট করার ভঙ্গিতে জয়েস জানাল, 'আমরা নামতে শুরু করেছি।'

'কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'আলভিন মিনিটে একশো ফুট নামতে পারে,' বলল জয়েস। 'তারমানে আধঘণ্টার মধ্যেই সাগরের মেঝে স্পর্শ করব আমরা। মিউজিক দেব? গান শুনলে সময়টা ভাল কাটবে।'

'হালকা কিছু থাকলে চালাতে পারেন। ধুম-ধাড়াক্কা গান মানাবে না এখানে।'

'বেশ।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মোৎজার্টের সিম্ফনিতে ভরে গেল কেবিনের অভ্যন্তর।

'অর্ধেক পথ নেমে এসেছি,' পনেরো মিনিট পর ঘোষণা করল জয়েস।

আসিফ বলল, 'মাত্র! আমার তো আর তর সইছে না।'

হাসল জয়েস। 'একটু সবুর করুন, ডক্টর।'

ডাইভ এরিয়ার উপরে, সারফেসে বৃত্তাকারে চক্কর দিচ্ছে আটলান্টিস। ব্রিজের নীচে রয়েছে টপ-ল্যাব, সেখানে সাপোর্ট ক্রু আর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা জড়ো হয়েছে ডাইভ মনিটর করার জন্য। অ্যাকুস্টিক টেলিফোনে তাদের সঙ্গে আলভিনের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট করছে জয়েস। খানিক পরে বাঙালি দম্পতির

দিকে ফিরল।

বলল, 'গোস্ট সিটি সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনারা?'

'২০০৪ সালে কাকতালীয়ভাবে জায়গাটা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে শুনেছি,' বলল তানিয়া। 'ওটার খোঁজ পেয়ে সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল... এমন জায়গা থাকতে পারে, তা আগে ভাবা যায়নি।'

'ওই অভিযানে আমিও ছিলাম,' বলল জয়েস। 'অবাক না, বলতে পারেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। মূল অভিযান শেষ করে বাড়ির পথে ফিরছিলাম, আণ্ডারওঅটর ড্রোন *আরগো*-কে পানিতে ডুবিয়ে টো করা হচ্ছিল ভলকানিক অ্যাকটিভিটি মনিটর করার জন্য। মাঝরাতের দিকে আমাদের শিফট লিডার দেখল, মনিটরে ক্রিসমাস ট্রি-র মত সাদা অবয়ব ফুটে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, হাইড্রো-থারমাল ভেন্টের খোঁজ পেয়েছি আমরা। একটা না, শত শত! ...এবং অন্যান্য ভেন্টের চেয়ে ব্যতিক্রম! এখানে টিউব ওয়ার্ম বা শামুকের অস্তিত্ব নেই। খবর পেয়ে আমরা সবাই জড়ো হলাম কন্ট্রোল কেবিনে, প্রথমবারের মত দেখতে পেলাম বিশাল বিশাল সব টাওয়ার... ওফ্, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

'আমি শুনেছি, গোস্ট সিটির আকার মাঝারি সাইজের বনের চেয়েও বড়,' বলল আসিফ।

'আকারের চেয়ে ওটার লোকেশন বেশি ইন্টারেস্টিং, ড. রেজা,' জয়েস বলল। 'অতীতে বেশ কিছু ভেন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলো টেকটোনিক প্লেটের খাঁজে অবস্থিত। অমন জায়গায় ভেন্ট সৃষ্টি হতেই পারে। অথচ গোস্ট সিটির ধারেকাছে কোনও ভলকানিক সেন্টার নেই। কীভাবে ওগুলো তৈরি হলো, সেটা এক মস্ত বড় রহস্য।'

'কোনও কোনও কলাম নাকি বিশতলা উঁচু?'

আলভিনের ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিল জয়েস। 'নিজের চোখেই দেখুন।'

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল আসিফ আর তানিয়া। গোস্ট সিটির ছবি দেখেছে ওরা আগে, কিন্তু বাস্তব দৃশ্য দুজনেরই বাক্‌রোধ করল। মাটি-পাথর আর পানিতে গড়া অপার্থিব এক অরণ্যে যেন প্রবেশ করেছে ওরা—যেদিকে তাকায়, শুধু সুউচ্চ কলামের সারি। কোনোটা গাঢ়, কোনোটা হালকা। চুড়ো দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্প-ভরা গরম পানি, সাদাটে মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রাচীন কলামগুলোর গায়ে বাসা বেঁধেছে শ্যাওলা আর নাম-না-জানা জলজ আগাছা... পরিত্যক্ত, ভৌতিক রূপ দিয়েছে পরিবেশটাকে।

আলভিনের গতি কমাল জয়েস, একটা কলামের উপর হোভার করতে শুরু করল। ভেন্টটা মৃত, বাষ্প বেরুচ্ছে না, তাই সমতল চূড়াটা ভালমত দেখা গেল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ত্রিশ ফুটের কম হবে না। চিমনির মত ফুটো আছে মাঝখানে, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে জলজ উদ্ভিদে।

'মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি,' ফিসফিস করে বলল তানিয়া।

'হ্যাঁ, স্বপ্নের মতই বটে,' একমত হলো জয়েস। 'কিছুতেই পুরনো হয় না। যতবার দেখি, ততবার বুক কাঁপে।'

উঁচু একটা কলামের ডগায় আলভিনকে নিয়ে গেল সে। বলল, 'ব্যাপারটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে এখানে। মাটির তলা থেকে উঠে আসা গরম পানি আর বাষ্প আটকে যায় শ্যাওলা আর আগাছার জালে। ঘন আচ্ছাদনের মত যেগুলো দেখছেন, সেগুলো আসলে মাইক্রোব বা অণুজীবের কলোনি। ভেন্টের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর গভীর থেকে উঠে আসা মিথেন, হাইড্রোজেন আর নানা ধরনের খনিজ পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া

ঘটে ওগুলোর, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। তারপর যখন পানির প্রেশার বেড়ে যায়, তখন ছিটকে যায় চারপাশে... ছড়িয়ে পড়ে স্রোতের সঙ্গে। কারও কারও ধারণা, এভাবেই বহুকোষী জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল পৃথিবীতে।'

বায়োলজিস্ট স্ত্রীর দিকে তাকাল আসিফ। 'আমি মাটি-পাথর নিয়ে কাজ করি, এই থিয়োরির মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। তোমার কী ধারণা?'

'ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব নয়,' বলল তানিয়া। 'এখানে যে-পরিবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে পৃথিবীর সৃষ্টিকালের পরিবেশের মিল আছে। বহু নামি-দামি বিজ্ঞানীই মনে করেন, জমিতে নয়, সমুদ্রেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল। এখানকার মাইক্রোবগুলো আমাদের গ্রহের সেই প্রথম প্রাণ হতে পারে। উত্তপ্ত থারমাল ভেন্ট ওগুলোর ইনকিউবেটর হিসেবে কাজ করছে... মাইক্রোবকে পরিবর্তিত করে নতুন প্রাণের জন্ম দিচ্ছে... তারপর আবার ছড়িয়ে দিচ্ছে দূর-দূরান্তে। তাই কেউ যদি গোস্ট সিটিকে প্রাণের উৎস বলে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

'বাপ রে!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল আসিফ। 'বলো কী!'

জয়েসের দিকে ফিরল তানিয়া। 'গরগন-উইড দেখা গেছে কোথায়?'

'এখান থেকে একটু পুবে,' বলল জয়েস। 'আলভিনের টপ স্পিড মাত্র দুই নট, কাজেই পৌঁছুতে কিছুটা সময় লাগবে। ততক্ষণ বাইরের সৌন্দর্য উপভোগ করুন।'

সাবমারসিবলের মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই থারমাল ভেন্টের আরও ঘন এক অরণ্যে প্রবেশ করল ওরা, এখানকার কলামগুলো অনেক বেশি উঁচু।

'এটাকে সিটি না বলে মেগাসিটি বলা উচিত,' মন্তব্য করল

আসিফ। 'অন্তত শ'খানেক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি।'

'ভাল বলেছ,' বলল তানিয়া। 'বড় বড় শহরের মত এখানেও পরিবেশ দূষণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ভিউপোর্ট দিয়ে সামনে তাকাল আসিফ। পানির স্বচ্ছতা কমে এসেছে, গাঢ় সবুজ একটা পর্দা যেন ঝুলছে কলামগুলোর মাঝে। শৈবালের স্তর।

'ওই যে আমাদের গরগন-উইড,' বলল জয়েস। 'থামব?'

'না, এগোতে থাকুন,' বলল তানিয়া। 'দেখি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে জিনিসটা।'

চল্লিশ ফুট উচ্চতা বাড়াল জয়েস, শৈবালের স্তরের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল সাবমারসিবল। যেন মেঘের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে উড়োজাহাজ। মিনিট পাঁচেক পর আবার পরিষ্কার পানি পাওয়া গেল, আলভিনকে নীচে নামাল সে।

'পানির এত গভীরে আবর্জনা দেখতে পাব, আশা করিনি,' বলল তানিয়া।

'ওটা আশা করেছ?' আঙুল তুলে সাবমারসিবলের ডানদিকে দেখাল আসিফ। 'অদ্ভুত না?'

ওদিকে ঘোরাল জয়েস। ফ্লাডলাইটের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল সাগরের মেঝে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ওরা। চওড়া দুটো সমান্তরাল ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে সি-ফ্লোরে, মাঝে ত্রিশ ফুটের ব্যবধান, সমান করে দিয়েছে মাটি।

তানিয়ার চোখে পলক পড়ছে না। 'এত নিখুঁত, এত পরিষ্কার, এ মানুষের তৈরি না হয়েই যায় না।' গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'আমাদের আগেও কেউ এসেছে এখানে।'

'দেখে তো বুলডোজারের ট্র্যাক মনে হচ্ছে,' হতভম্ব গলায় বলল জয়েস। 'কিন্তু তা কী করে হয়? এত গভীরে বুলডোজার

আসে কোত্থেকে?'

'যেখান থেকেই আসুক, খুব বেশিদিন হয়নি,' বলল আসিফ। 'ট্র্যাকগুলো বড্ড পরিষ্কার। চলুন ফলো করি।'

তিনশো গজের মত এগোতেই ট্র্যাকের মাহাত্ম্য টের পাওয়া গেল। সরলরেখায় এগিয়েছে অচেনা যন্ত্রটা, পথে যত টাওয়ার পেয়েছে, ভেঙেচুরে দিয়েছে। সি-ফ্লোরে পড়ে আছে সেগুলোর ধ্বংসস্তূপ—কোনোটা আস্ত, কোনোটা ভাঙাচোরা, কোনোটা আবার গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে।

'আণ্ডারওঅটর ক্লিয়ার-কাটিং অপারেশনের মত লাগছে ব্যাপারটা,' বলল আসিফ। 'এমন কাজ করা সম্ভব, সেটা জানা ছিল না আমার।'

'এগোতে থাকুন,' জয়েসকে বলল তানিয়া। 'কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বোঝা দরকার।'

আলভিনের সবক'টা ক্যামেরা চালু করা হলো। স্থিরচিত্র আর ভিডিওতে সাগরতলের ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুলে নেয়া হচ্ছে। মাইলখানেক এগোল ওরা। গোস্ট সিটির সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশ এটা। টাওয়ারের সংখ্যা এখানে অনেক বেশি, আকারেও প্রথমে দেখাগুলোর চেয়ে অনেক বড়। কোনও কোনোটা এত উঁচু যে চূড়াই দেখা যাচ্ছে না।

অদ্ভুত ট্র্যাকজোড়া অনুসরণ করছে জয়েস। কয়েকবার দিক পাল্টাল ভেসে থাকা শৈবালের স্তর এড়াবার জন্য, তারপর আবার ফিরে এল কোর্সে।

'ভাগ্যিস ক্যামেরা আছে আমাদের সঙ্গে,' বলল ও। 'নইলে এখানে যা দেখছি, তা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারতাম না উপরের ওদেরকে।'

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আসিফ। 'আমার তো চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না...' বলতে বলতে থমকে গেল

ও। দৃষ্টিসীমার প্রান্তে চকিতের জন্য কী যেন দেখল। 'আরে! কী ওটা?'

তানিয়াও দেখেছে। বলল, 'কী জানি! মনে হলো একটা ছায়া উড়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে।'

'তিমি?'

'এত গভীরে তিমি থাকে না।'

'জায়ান্ট স্কুইড? শুনেছি ওরা তিমির চেয়ে গভীরে নামতে পারে।'

'স্কুইডের মত তো লাগল না।' কাঁধ ঝাঁকাল তানিয়া। 'জয়েস, আলভিনকে উল্টো ঘোরাবে? কী গেল বোঝা দরকার।'

'নো প্রবলেম।' কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জয়েস।

ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল সাবমারসিবল। তবে জায়গাটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে—ট্র্যাকের দু'পাশে পুরো দৃষ্টিসীমা জুড়ে বিশাল বিশাল টাওয়ার দাঁড়ানো। গুঁতো না খাবার জন্য রীতিমত কসরত দেখাতে হচ্ছে জয়েসকে। অর্ধেকের মত ঘুরতেই চমকে গেল ও। ঠিক চোখের সামনে, ভিউপোর্টের ওপাশে দাঁড়ানো টাওয়ারটা কাঁপতে শুরু করেছে। ভূমিকম্পের মত প্রতিক্রিয়া হলো। ফাটল ধরল কলামের গায়ে। প্রথমে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ল ছোট-বড় চাঁই, পিছু পিছু পুরো কাঠামোই ধসে পড়ল। মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো মাটি-পাথরের তাল, কাদা আর ময়লার মেঘে পরিণত হয়ে ঢেকে ফেলতে লাগল চারপাশ।

এরপর... যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত কাদার মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে এল বিশাল এক কালো আকৃতি; ছুটে আসছে সোজা ওদের সাবমারসিবল লক্ষ্য করে। ওটার মাথায় লাগানো উজ্জ্বল বাতির আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

চেঁচিয়ে উঠল আসিফ, জয়েসকে পিছিয়ে আসতে বলছে; যদিও তাতে খুব একটা লাভ নেই। রিভার্স প্রপালশনে

আলভিনের গতি একটা জেলিফিশের চেয়েও কম। জয়েস শুনতে পেল না ওর কথা, সম্মোহিতের মত সে তাকিয়ে আছে অগ্রসরমান দানবটির দিকে। যখন সংবিৎ ফিরে পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ হলো। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল সাবমারসিবলের প্রেশার হাল। সিটবেল্ট বাঁধা আছে, নইলে ছিটকে পড়ত আরোহীরা। পাগলের মত কণ্ট্রোল প্যানেলের বোতাম আর জয়স্টিক নাড়ল জয়েস, কিন্তু আলভিনের তরফ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

ভিউপোর্ট দিয়ে সামনে তাকাল আসিফ আর তানিয়া। হাঁ হয়ে বিশাল এক মুখ খুলে যেতে দেখল। সেখান দিয়ে দানবের উদরে ঢুকতে শুরু করল আলভিন।

উনিশ

সাবমারসিবলের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ঝড় বয়ে গেল রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এ। তবে আলভিনের সেফটি রেকর্ডের কথা ভেবে কিছুটা সময় অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যাপ্টেন—যে-কোনও ধরনের ইমার্জেন্সি সামলাবার ক্ষমতা আছে ছোট্ট ডুবোযানটার। তা ছাড়া কমিউনিকেশনের সমস্যা অনেক কারণেই হতে পারে... হয়তো বা সি-বেডের প্রাকৃতিক কাঠামোর

কারণে আলভিনের সিগনাল বাধা পাচ্ছে। অপেক্ষা করে দেখা যাক কী ঘটে।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে যেতেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চরমে উঠল। নীচে যে সমস্যা হয়েছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকল না কারও। বিজ্ঞানীদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন ক্যাপ্টেন—করণীয় ঠিক করছেন।

লেফটেন্যান্ট অ্যারন বেকার চলে এল আপার ডেকে। গার্ড রেইলে ভর দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে শুরু করল।

হঠাৎ দিগন্তে ছোট একটি বিন্দু উদয় হলো—ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। একটু পর জাহাজের আকৃতি পেল। কপালে ভাঁজ পড়ল বেকারের। বিনকিউলার এনে ভাল করে দেখল ওটাকে।

ছোট একটা ফ্রেইটার... পুরনো, দিন ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। সারা শরীরে মরিচার করাল থাবা পড়েছে, কতদিন রঙ করা হয়নি কে জানে! অযত্ন আর অবহেলার ছাপ প্রকট হয়ে আছে। স্টার্নের নীচে জাহাজের নাম অস্পষ্ট, শুধু বোঝা যাচ্ছে বন্দরের নাম—মাল্টা। তবে অভিজ্ঞতা থেকে বেকার আন্দাজ করতে পারছে, আদপে ওটা মাল্টিজ ফ্রেইটার না হবারই সম্ভাবনা বেশি। এ-ধরনের জাহাজ সাধারণত জলদস্যুরা ব্যবহার করে, তারা সত্যিকার নাম-পরিচয় লিখে রাখে না খোলের গায়ে।

পেশাদার যোদ্ধা হিসেবে লে. অ্যারন বেকারের দুনিয়াটা খুবই সরল। টাকার বিনিময়ে কাজ করে সে, আর কোনও গোলপাল বোঝে না। স্বপ্ন দেখে, প্রাচীন আমলের কুখ্যাত জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের একটা মূর্তি তৈরি করাবে কোনও একদিন, কারণ ব্ল্যাকবিয়ার্ড আর রক্তপিপাসু উত্তরসূরিদের কর্মকাণ্ড বেকারের জীবনে সাফল্য এনে দিয়েছে। নইলে পেন্টাগনের কোনও এক ডেস্কে কেরানি হিসেবে দিনপাত করতে হতো তাকে, বিষণ্ণ হৃদয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবতে হতো।

সি সিকিউরিটি সার্ভিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তিন কর্ণধারের একজন লে. অ্যারন বেকার। জাহাজ-মালিকরা জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভাড়া করে ওদেরকে। পুরোদস্তুর সিকিউরিটি টিম দেয় ওরা, জাহাজের ক্রু-দেরকেও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়। রমরমা ব্যবসা করছে গত ক'বছর ধরে; তবে শুরুটা উজ্জ্বল ছিল না।

দশ বছর আগে ট্রেইনিং এক্সারসাইজে আহত হয়ে নৌবাহিনী থেকে অবসর নিতে হয়েছিল বেকারকে। ডেস্ক জবের সুযোগ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ও সেটা গ্রহণ করেনি। মনেপ্রাণে একজন যোদ্ধা ও, কলম পেষার কথা ভাবতেও পারে না। কিছুদিন পর একই মনোভাবের আরও দুজন অবসরপ্রাপ্ত সিল-কমাণ্ডোর সঙ্গে পরিচয় হয় ওর। তিনজনে মিলে গড়ে তোলে *সি সিকিউরিটি সার্ভিস*। ব্যবসার জন্য নয়, নিজেদের লড়াকু জীবনের নস্টালজিয়া হিসেবে। তবে সারা পৃথিবীতে জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় হঠাৎ করে ওদের ব্যবসাও ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। শুরুতে বড় বড় মার্চেন্ট শিপের নিরাপত্তা দিত ওরা, ইদানীং সায়েন্টিক কমিউনিটিও তাদের রিসার্চ শিপে সিকিউরিটির ব্যাপারে অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠেছে, তাই ব্যবসার নতুন মক্কেল পেয়ে গেছে বেকার। অবশ্য বিজ্ঞানীদের দোষ দেয়া যায় না। প্রতিটি রিসার্চ শিপে লাখ লাখ ডলারের ইকুইপমেন্ট থাকে, তা ছাড়া শিপের ইঞ্জিন-জেনারেটর, খুচরা যন্ত্রাংশ, এমনকী লোহার শরীরটারও দাম আছে। জলদস্যুরা তাই রিসার্চ শিপকেও লোভনীয় টার্গেট মনে করে।

উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে গত একমাস ধরে চারজনের একটি টিম নিয়ে আটলান্টিসে থাকছে বেকার। জাহাজের বিজ্ঞানী ও নাবিকদেরকে আত্মরক্ষার নিয়মকানুন শেখাচ্ছে, নিজেরাও পালা করে পাহারা

দিকে ব্রিজে। গোস্ট সিটিতে আসার আগে দক্ষিণ সাগরে ছিল আটলান্টিস, ওখানে জলদস্যুর উপদ্রব খুবই বেশি। সারাক্ষণ সাবধান থাকতে হতো। আটলান্টিক ম্যাসিফে আসার কথা শুনে তাই খুশি হয়েছিল বেকার, এই এলাকায় পাইরেসির কোনও ইতিহাস নেই, ভেবেছিল শান্তিতে কয়েকটা দিন কাটাতে পারবে। কিন্তু আচমকা আলভিনের গায়েব হয়ে যাওয়া, এবং তার পর পরই রহস্যময় এক জাহাজ উদয় হওয়ায় মন খুঁতখুঁত করছে ওর। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। দুটোর মধ্যে সম্পর্ক আছে।

ফ্রেইটারটা থেমে যাওয়া পর্যন্ত বিনকিউলারে চোখ লাগিয়ে রাখল বেকার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জাহাজের দৃশ্যমান প্রতিটি অংশ। বিস্মিত হলো একবারও কোনও মানুষের চেহারা দেখতে না পেয়ে। ক্রু-রা সব কোথায়? একজনও বাইরে নেই কেন? মনের খুঁতখুঁতানি বেড়ে গেল বেকারের। ল্যাডার বেয়ে ব্রিজে উঠে এল সে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

হুইলহাউসে ঢুকতেই রেডিওতে একটা আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'মে ডে! মে-ডে!!'

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে ক্যাপ্টেন ফিরে এসেছেন, মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'মে-ডে রিসিভড্। দিস ইজ রিসার্চ ভেসেল আটলান্টিস। কী ধরনের বিপদে পড়েছেন, জানান।'

'মে-ডে! মে-ডে!!' আবার বলা হলো রেডিওতে। প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না।

'ক্যাপ্টেন!' বলে উঠল ব্রিজ-উইঙের ওয়াচার। 'আগুন!'

পোর্টহোলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। ফ্রেইটারের ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে আসছে। চোখে

বিনকিউলার লাগালেন তিনি। ধারণা করলেন, হোল্ডে লেগেছে আগুন।

'নোঙর তোলো,' ফার্স্ট অফিসারকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'জাহাজটার কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলতে শুরু করল আটলান্টিস। ফ্রেইটারের দুইশ' গজ দূরে পৌঁছে থামল। তীক্ষ্ণ চোখে ডেকের দিকে তাকাল বেকার, জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে। খুবই অস্বাভাবিক। এতক্ষণে সমস্ত ক্রু-র বেরিয়ে আসার কথা, রেইলের কাছে এসে চেঁচামেচি করবে তারা উদ্ধার পাবার আশায়।

'কিছু বুঝতে পারছেন, ক্যাপ্টেন?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামালেন ক্যাপ্টেন। বিভ্রান্ত গলায় বললেন, 'না। কী যেন মিলছে না। আগুনে সবাই নিশ্চয়ই একসঙ্গে মারা পড়েনি? কয়েক মিনিট আগেও জাহাজটা চলছিল। ব্রিজ থেকে কেউ একজন ডিসট্রেস কল পাঠাচ্ছে। তা হলে বাইরে কেউ নেই কেন?'

'ঠিকই ধরেছেন, ব্যাপারটা রহস্যজনক।'

'তদন্ত করে দেখা দরকার। একটা টিম পাঠাই, কী বলেন? ক্রু-রা হয়তো নীচের ডেকে আটকা পড়েছে। ওদেরকে উদ্ধার করতে হতে পারে।'

'আমার টিমকেই পাঠান,' বলল বেকার। 'বোর্ডিং এবং মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের ট্রেইনিং আছে আমাদের। ঝামেলা দেখা দিলেও ট্যাকেল করতে পারব।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আপনারা গেলে তো খুবই ভাল হয়। আলভিন নিয়ে এমনিতেই আমার মাথা খারাপ হবার দশা।'

ছোট একটা শাটল বোট নামানো হলো পানিতে। নিজের টিমকে ডেকের উপর জড়ো করল বেকার। বলল, 'যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছ তোমরা, এবার কাজে নামার পালা। আমরা অ্যামিউনিশন আর ক্যামোফ্লাজ গিয়ার পরে রেডি হয়ে নাও।' ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ফ্রেইটারটা দেখাল। 'ওখানে যাচ্ছি আমরা।'

ঝটপট তৈরি হয়ে নিল টিমের সদস্যরা। বেকারের মতই আগে-যোদ্ধা ওরা, ট্রেইনড্ কমাণ্ডো। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখা থেকে অবসর নেবার পর ওরা যোগ দিয়েছে *সি সিকিউরিটি সার্ভিস*-এ। লড়াইয়ের সম্ভাবনা উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়েছে ওদের মধ্যে।

সৈনিক নয়, সাধারণ নাবিকের মত সাজ নিল কমাণ্ডোরা। জিন্স পরল, সঙ্গে নোংরা ওঅর্ক-শার্ট। হাত-মুখে মাখল তেল-কালি। আগ্নেয়াস্ত্র মুড়ে নিল কাপড় দিয়ে, দূর থেকে যাতে বোঝা না যায়। সংখ্যায় মাত্র চারজন হলেও ফায়ারপাওয়ারে যে-কোনও দস্যুদলের চেয়ে এগিয়ে আছে ওরা। বারো গেইজের একটা শটগান নিয়েছে বেকার, এক গুলিতে ওটা একটা মানুষকে দু'টুকরো করে দিতে পারে। ওর সঙ্গীদের হাতে রয়েছে কালো রঙের *কার-১৫* সাবমেশিনগান... *এম-১৬*-এর কম্প্যাক্ট সংস্করণ। অ্যামিউনিশনের কোনও অভাব নেই। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের কাছে ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, কমাণ্ডো নাইফ, আর একটা করে পিস্তল আছে।

বোটে চড়ল কমাণ্ডো দল, আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালিয়ে অল্প সময়েই পৌঁছে গেল ফ্রেইটারের কাছাকাছি। হেলমে রয়েছে বেকার, সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল। স্মল আর্মসের ফায়ারিং রেঞ্জের ভিতরে পৌঁছে থামিয়ে ফেলল বোট, যাতে গোলাগুলি শুরু হলে দ্রুত পরে আসতে পারে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল, কিন্তু

কেউ গুলি ছুঁড়ল না ওদেরকে লক্ষ্য করে। এবার একটা লাউডহেইলার তুলে নিল সে পায়ের কাছ থেকে, জাহাজের আরোহীদের উদ্দেশে ডাকাডাকি শুরু করল। ওদিক থেকে জবাব এল না কোনও।

এগোবার সিদ্ধান্ত নিল বেকার। ঢেউয়ের দোলায় ফ্রেইটারের বো একবার উঁচু, একবার নিচু হচ্ছে। অনেক কষ্টে অ্যালুমিনিয়াম গ্র্যাপলিং হুক সহ একটা নাইলন বোর্ডিং ল্যাডার বো-র একপাশে, রেইলিঙে আটকানো গেল... তিনবার চেষ্টা করার পর। গ্যাস-মাস্ক পরে নিল ওরা, কাঁধে অস্ত্র ঝোলাল। তারপর রশির মই বেয়ে প্রথমে উঠে গেল বেকার। তার পিছু নিল বাকি সবাই। প্রকাণ্ড অ্যাঙ্কর উইঞ্চ-এর সামনে জড়ো হলো কমাণ্ডোরা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পুরো ডেক, মাস্ক না থাকলে দম নেয়াই কষ্টকর হয়ে পড়ত। চারপাশে নজর বোলাল বেকার, কিন্তু প্রাণের সাড়া পেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দলকে দু'ভাগ করল সে। ডেপুটিকে নিয়ে সে থাকবে সামনে, বাকি দু'জন পিছন থেকে কাভার দেবে ওদেরকে। পালা করে এই পদ্ধতিতে পুরো জাহাজে তল্লাশি চালানো হবে।

দলকে নিয়ে একটা সিঁড়ির দিকে এগোল বেকার, সিঁড়িটা দেখতে অনেকটা ফায়ার এস্কেপ-এর মত, জানালাবিহীন ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের গায়ে লেগে আছে। তিন ডেক উপরে ওঠার পর ব্রিজে পৌঁছুল ওরা। ভিতরে কোন মানুষ নেই; তবে চার্ট, সেক্সট্যান্ট ও অন্যান্য নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। মনে হলো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কেবিনেটের ভিতর থেকে বের করে তছনছ করা হয়েছে ওগুলো। একটা উৎকট দুর্গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

বিস্মিত হলো বেকার, আগে কখনও এমন ব্রিজ দেখেনি সে। যন্ত্রপাতিতে বোঝাই, বাল্কহেডগুলোর গায়ে নানা রকম

ইলেকট্রনিক কনসোল শোভা পাচ্ছে। বাইরের চেহারা দেখে কল্পনাই করার উপায় নেই, জং-ধরা জাহাজটার ভিতর এমন আধুনিক সিস্টেম থাকতে পারে।

মেইন কনসোলটা পরীক্ষা করল কমাণ্ডো দলের ডেপুটি। 'জাহাজটা পুরোপুরি অটোমেটেড,' দলনেতাকে বলল সে। 'কোনও লিভার ধরে টানা-হেঁচড়া করতে হয় না, হেলমসম্যানকে দিতে হয় না কোর্স ইন্সট্রাকশন। খেলনার মত রিমোট কণ্ট্রোলের সাহায্যে চালানো যায়।'

'বলতে চাইছ, এখানে কোনও ক্রু নেই?' অবিশ্বাসের সুরে বলল বেকার।

'কনসোলে রিমোট অপারেশনের সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছি,' বলল ডেপুটি। 'তা ছাড়া এখন পর্যন্ত কাউকে দেখতে পাইনি আমরা।'

'তা হলে রেডিওতে সাহায্য চাইছে কে?'

ঝট্ করে কমিউনিকেশন রুমের দিকে ফিরল সবাই। দরজাটা বন্ধ। কাছে গিয়ে কান পাতল ওরা, আবছা একটা কণ্ঠ শোনা গেল ওপাশে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল বেকার, তারপর দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল কমিউনিকেশন রুমে। হাতের অস্ত্র সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে, সেফটি ক্যাচ অফ্ করা, গুলি ছুঁড়তে প্রস্তুত।

এই কামরাটাও খালি। তবে জ্যান্ত হয়ে আছে রেডিও ট্রান্সমিটার, আলো জ্বলছে ওতে। মাইক্রোফোনের সামনে খাড়া করে রাখা হয়েছে একটি টেপ-রেকর্ডার, স্পিকারে বেরিয়ে আসছে পরিচিত কণ্ঠ... 'মে- ডে! মে-ডে!!'

'হোয়াট দ্য...' গাল দিয়ে উঠল এক কমাণ্ডো।

'তামাশা করছে কেউ আমাদের সঙ্গে!' বলল ডেপুটি।

বেকারের মাথার ভিতরে ততক্ষণে এগারো নম্বর

মহাবিপদসঙ্কেত বাজতে শুরু করেছে। 'না!' ফিসফিসাল সে। 'ঠাট্টা না... এটা একটা ফাঁদ।'

'ফাঁদ!'

'কুইক!' চেঁচিয়ে উঠল বেকার। 'গেট ব্যাক, এভরিবডি! জাহাজে ফিরে চলো এখুনি!'

কমিউনিকেশন রুম থেকে বের হতে না হতে শোনা গেল ভয়ঙ্কর হুঙ্কার... অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল সবার। পরমুহূর্তে ব্রিজের দু'পাশের দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে অনেকগুলো ছায়ামূর্তি ঢুকে পড়ল হুইলহাউসে। পাঁই করে ঘুরল বেকার, ভাবনা-চিন্তা করল না, রিফ্লেক্সের বশে শটগান তুলে ট্রিগার চাপল। আর্তনাদ করে একটা মূর্তি আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে হামলা করল বাকি শত্রুরা। সংখ্যায় তারা অগণিত। কমাণ্ডোদের চিৎকার আর গুলির আওয়াজ চাপা পড়ে গেল তাণ্ডবের মাঝখানে। ঘোলাটে দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল বেকার, ঘটনার আকস্মিকতায় তার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়েছে। চকিতের জন্য কেবল লম্বা-সাদা চুল, হলুদ শ্বদন্ত, রক্তলাল চোখ আর লোমশ দেহের ঢল দেখতে পেল।

হাত থেকে শটগান কেড়ে নেয়া হলো, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কমাণ্ডো-নেতা। ওর বুকের উপর লাফ দিয়ে চড়ে বসল বিশাল একটা দেহ। পচা, বোটকা গন্ধে দম আটকে এল বেকারের। খসখসে, লোমশ, শক্তিশালী দুটো হাত চেপে ধরল তার গলা। দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল তার চোখের সামনে।

বিশ

কাঁচা রাস্তায় ধুলো ওড়াচ্ছে একটি অ্যান্টিক গাড়ি—*রোলস রয়েস সিলভার ক্লাউড*। ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে। সামনে ফরাসি সীমান্তের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রকৃতি। ছোট-খাট বেশ কিছু পাহাড় আছে, জনবসতি কম, শহর-টহর তো নেই বললেই চলে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোবার সময় মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ফার্মহাউস, পুকুর, আবাদী জমি, আর পশুচারণ ক্ষেত্র। এলাকাটা কৃষিপ্রধান। ড্রাইভ করছে, আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে রানা—জায়গাটা অপূর্ব। দিদিয়ের দেশমের কাছ থেকে ধার করে আনা গাড়িটাও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে গেছে খুব। ছবির মত এই দৃশ্যে আধুনিক যানবাহন বিসদৃশ ঠেকত।

রানার পাশে বসে আছে লুনা। খোলা জানালা দিয়ে ছুটে আসা উদ্দাম বাতাসে ওর সুন্দর চুল উড়ছে। দুর্ধর্ষ সঙ্গীর ঠোঁটে ঝলকা হাসি দেখে জানতে চাইল, 'হাসছ যে?'

'আমি কত ভাগ্যবান, তাই ভেবে,' বলল রানা। 'তাকিয়ে দেখো, কত সুন্দর জায়গা! ভ্যান গগের পেইন্টিঙেও এমন দৃশ্য দেখা যায় না। এর মাঝ দিয়ে দামি, অ্যান্টিক একটা গাড়ি চালাচ্ছি; পাশে অপরূপা এক সঙ্গিনী... ভাগ্য আর কাকে বলে!'

'ভাগ্য না, বলো নিয়তি,' ঠোঁট বাঁকাল লুনা। 'বেড়াতে আসিনি এখানে, কাজে এসেছি। যদি দু'জনে এখানে হারিয়ে

যেতে পারতাম, তা হলে নাহয় নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবতাম।'

'হারিয়ে যেতে কে মানা করছে?' রানা ভুরু নাচাল। 'একটু আগে চমৎকার একটা সরাইখানা পেরিয়ে এলাম। হাতের কাজ শেষ করে ওখানে ফিরে আসতে পারি আমরা। শুধু তুমি আর আমি... কয়েকটা দিন...

'লোভ দেখিয়ো না,' কপট মিনতি করল লুনা। 'পরিচয়ের পর থেকে এমনিতেই ডিনারের লোভ দেখিয়ে ঘোরাচ্ছ আমাকে। কই, এখনও তো নিলে না!'

'আরে... সেটাই তো বলছি। ওই সরাইখানায় ডিনার, লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট... সবকিছুই সারা যাবে।'

'ভাবার সময় দাও আমাকে,' হাসল লুনা। কোলের উপর রাখা ম্যাপে চোখ বোলাল। 'সামনে একটা চৌরাস্তা পড়বে, ওখানে ডানে মোড় নিয়ো।'

'জী, ম্যাডাম।'

একটু পরেই সরু একটা সাইডরোডে নেমে গেল সিলভার ক্লাউড। কিছুদূর এগোতেই দু'পাশে আঙুরের বাগান চোখে পড়ল—দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, যেন শেষ নেই। মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তা। মিনিট পনেরো চলার পর একটা চেইন-লিঙ্ক ফেন্সের দেখা পাওয়া গেল। সাইনবোর্ড ঝুলছে ফেন্সের গায়ে:

প্রাইভেট প্রপার্টি।

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

কয়েকটা ভাষায় লেখা আছে কথাটা। ভুল বোঝাবুঝির কোনও অবকাশ নেই।

গেট রয়েছে একটা, সেটা হাট করে খোলা। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল রানা। দু'পাশ থেকে আঙুরের বাগান অদৃশ্য হলো, সেখানে উদয় হলো ঘন অরণ্য। জানা-অজানা নানা জাতের গাছ

শোভা পাচ্ছে, ঘন পাতার আচ্ছাদন পেরিয়ে সূর্যের আলো ঠিকমত ঢুকতে পারছে না। তাপমাত্রা কমে গেল ঝপ্ করে। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল লুনা।

'শীত লাগছে?' ব্যাপারটা লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'জানালার কাঁচ তুলে দিই?'

'না, থাক,' মাথা নাড়ল লুনা। 'সবুজ প্রান্তর আর খেত-খামার দেখতে খুব ভাল লাগছিল। আচমকা জঙ্গলে এসে ঢুকব, তা ভাবতে পারিনি। কেমন যেন ভুতুড়ে পরিবেশ!'

একমত হলো রানা। সামনে গাছগাছালির ভাঁজে ভাঁজে আঁধারের রাজত্ব... অজানা কোনও বিপদ যেন ওঁৎ পেতে আছে। শান্তির আশায় হেডলাইট জ্বেলে দিল, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। কিছুদূর যেতেই আলোকরশ্মিকে যেন গিলে খাচ্ছে অন্ধকার। দিনে-দুপুরে এমন ঘটতে পারে, তা ভাবাই যায় না।

কিছুক্ষণ পর দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করল। রাস্তা চওড়া হয়ে এল, দু'পাশে বুনো গাছপালার বদলে সযত্নে লাগানো ওক গাছের সারি। শাখা-প্রশাখাগুলো একে-অন্যের ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে গেছে অনেকদূর উপরে গিয়ে—প্রাকৃতিক এক টানেলের সৃষ্টি করেছে। এ পথে মাইলটাক যাবার পর রাস্তা উঁচু হতে থাকল, এক পর্যায়ে গাড়ি বেরিয়ে এল গাছপালার আড়াল থেকে। সামনে ভেসে উঠল বিশাল এক প্রাসাদের অবয়ব—খোলা মাঠের মাঝখানে নিছু এক টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন রূপকথার বইয়ে আঁকা কোনও ছবি!

'মন মাত!' মাতৃভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করল লুনা।

উঁচু প্রাচীর, গার্ড টাওয়ার আর টারেটের গায়ে আটকে গেছে রানার দৃষ্টি। বলল, 'মনে হচ্ছে টাইম মেশিনে চেপে মধ্যযুগের ফ্রান্সিলভ্যানিয়ায় পৌঁছে গেছি।'

'যা ই বলো, প্রাসাদটা অদ্ভুত সুন্দর! দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই

আভিজাত্যের ছটা আছে।'

'ক্যাসল ড্রাকুলা সম্পর্কেও লোকে একই কথা বলত।' ঠাট্টা করল রানা।

মাঠ পেরিয়ে শ্যাতোর সীমানায় পৌঁছুল সিলভার ক্লাউড। অতিথিদের গাড়ি নিয়ে ভিতরে যাবার নিয়ম নেই, তাই বাইরে পার্কিঙের জায়গা রাখা হয়েছে। বৃত্তাকার একটা ড্রাইভওয়ে, নুড়িপাথর বিছানো, মাঝখানে একটা ভাস্কর্য—ঢাল-বর্ম পরা একদল যোদ্ধা মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত। নিখুঁত শিল্প—নিষ্প্রাণ মূর্তির মুখে হিংসা, ক্রোধ আর বেদনার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গাড়ি পার্ক করল রানা। ইঞ্জিন বন্ধ করে বেরিয়ে এল, তাকাল ভাস্কর্যের দিকে। 'চমৎকার!'

'চমৎকারের কী দেখলে?' প্রতিবাদ করল লুনা। 'জঘন্য! অতিথিদের এমন ভাস্কর্য দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানায় কেউ?'

'ক্যাসল ড্রাকুলা কি আর এমনি এমনি বলেছি?'

হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। ওদের জন্য ড্র-ব্রিজ নামিয়ে রাখা হয়েছে, ওটা ধরে পার হলো পরিখা। চকিতের জন্য নীচে তাকাল রানা। গাঢ়-সবুজ পানিতে ভরে আছে পরিখা, জলাভূমিতে যে-ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়, তেমন একটা গন্ধ ভাসছে।

গেটে কাউকে দেখা গেল না। হেঁটে আঙিনা পেরুল ওরা, তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল সদর দরজার সামনে। পাল্লার গায়ে একটা ভারী লোহার কড়া ঝুলছে—কলিং বেলের বিকল্প। ভিতরে সঙ্কেত দেবার আগে নকশাকাটা দরজাটা ভাল করে দেখল রানা। মাঝখানে পারিবারিক প্রতীক খোদাই করা হয়েছে। ওটার দিকে ইঙ্গিত করে লুনাকে বলল, 'চিনতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল আর্কিয়োলজিস্ট। 'তিন-মাথা ঈগল। হেলমেট

আর বিমানের গায়ে আমরা যেমন দেখেছি।'

কড়া নাড়ল রানা। গুরুগম্ভীর একটা শব্দ ভেসে গেল বাড়ির ভিতরে। ও বলল, 'পিঠে কুঁজঅলা একজন বামন যদি দরজা খোলে, তা হলে খুব মানানসই হবে।'

'অমন কিছু ঘটলে আমি উল্টো ঘুরে দৌড় দেব,' বলল লুনা।

'দিয়ো, তবে আমার পথ আটকিয়ো না,' হাসল রানা।

ওদের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে সুস্থ-সবল এবং লম্বা-চওড়া এক যুবক দরজা খুলল। মাথা-ভর্তি সোনালি চুল, পরনে সাদা রঙের টেনিস পোশাক। সম্ভবত খেলতে যাচ্ছিল।

'আপনি নিশ্চয়ই মসিয়ো মাসুদ রানা,' হাত বাড়িয়ে দিল যুবক।

'জী,' হ্যাণ্ডশেক করল রানা। লুনাকে পরিচয় করিয়ে দিল। 'আমার অ্যাসিসটেন্ট... ইসাবেলা দুঁমো।'

'আমি ফিলিপ বুভারি,' নিজের নাম বলল যুবক। 'নাইস টু মিট ইউ। শ্যাতো বুভারিতে স্বাগতম। কষ্ট করে প্যারিস থেকে এসেছেন বলে ধন্যবাদ। আমার মা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আসুন, প্লিজ।'

প্রাসাদের ভিতরে ঢুকল রানা আর লুনা। কার্পেটে মোড়া একটা হলওয়ে ধরে ওদেরকে নিয়ে চলল ফিলিপ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আশপাশ দেখল দুই অতিথি। হলওয়ের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে নানা রকম পেইন্টিং আর অ্যান্টিক শো-পিস। ছাত থেকে নেমে আসা শেকলের হুকে ঝুলছে বহুমূল্য ঝাড়বাতি। পায়ের নীচের গালিচা যেন নরম দূর্বাঘাস, তাতে নানা ধরনের নকশা উঁকি দিচ্ছে।

বড় একটা দরজার সামনে গিয়ে থামল ফিলিপ। নক করে ভিতরে ঢুকল, সঙ্গে রানা-লুনা। বিশাল এক কামরায় ঢুকল

ওরা। সাজসজ্জায় প্রাইভেট স্টাডির মত দেখাচ্ছে। এক প্রান্তে, ঘষা কাঁচের জানালার পাশে চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধা, বই পড়ছেন।

'মা,' কাছে গিয়ে বলল ফিলিপ, 'তোমার অতিথিরা এসেছেন। মসিয়ো রানা, আর ওঁর অ্যাসিসটেন্ট... মাদমোয়াজেল দুঁমো।'

মাথা ঘুরিয়ে হাসল আইরিন বুভারি, হাতের বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। লম্বা, একহারা দেহটা অবাক করল রানাকে—বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না। পঞ্চাশ হতে পারে, ষাট-সত্তর হওয়াও বিচিত্র নয়। ধূসর চুল, আর মুখের চামড়ায় সামান্য বলিরেখা ছাড়া বয়সের কোনও ছাপ নেই শরীরে। পরনে বিজনেস সুট আর স্কার্ফ, চলনে-বলনে আভিজাত্য ঠিকরে বেরুচ্ছে। ব্যালেরিনার মত স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে এল দুই অতিথির দিকে, হাত মেলাল। অবাক হয়ে রানা লক্ষ করল, মহিলার মুঠো অত্যন্ত শক্তিশালী।

'প্লিজ, বসুন,' সোফা দেখিয়ে বলল মাদাম বুভারি। ছেলের দিকে ফিরল। 'অনেকদূর থেকে এসেছেন ওঁরা। আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো।'

'নিশ্চয়ই, আমি বলে দিচ্ছি,' বলল ফিলিপ।

কয়েক মিনিট পরই ট্রলি-ভর্তি নাশতা আর পানীয় নিয়ে হাজির হলো এক ভৃত্য। খেতে রাজি হলো না রানা-লুনা, শুধু কফি নিল।

'আপনারা এখানে এসেছেন বলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মসিয়ো রানা,' ভৃত্যকে বিদায় করে দিয়ে বলল মাদাম বুভারি।

শান্ত চোখে এখনও মহিলাকে জরিপ করে চলেছে রানা। চোখদুটোর দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর—তাতে অদ্ভুত এক প্রাণশক্তির আভাস পাওয়া যায়। টের পাওয়া যায়, চোখের মালিক অত্যন্ত

বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠুর। মিষ্টি করে হাসে মাদাম বুভারি, কিন্তু হাসিতে মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ পায় না; এক ধরনের রহস্য খেলা করে। বয়সের তুলনায় কণ্ঠস্বর যথেষ্ট ভরাট। কথা বলে শুদ্ধ ইংরেজিতে, কোনও আঞ্চলিক টান নেই।

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু নেই, মাদাম,' বলল ও। 'বরং এত অল্প সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন বলে আমরাই কৃতজ্ঞ। আপনি তো খুব ব্যস্ত মানুষ।'

'কী যে বলেন! যে-বিষয়ে আপনি দেখা করতে চেয়েছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু আছে নাকি? সত্যি বলতে কী, ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে পাওয়া লাশটা আমার গ্রেট-আঙ্কল থিয়োডর বুভারির হতে পারে... এ-খবর শোনার পর আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আল্পসের উপর দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি আমি, কখনও ভাবতে পারিনি, নীচের বরফে আমার পূর্বপুরুষের কবর থাকতে পারে। ইয়ে... লাশটা যে থিয়োডরের, সে ব্যাপারে আপনি কতটুকু নিশ্চিত?'

'লাশ আমি দেখিনি, তাই নিশ্চয়তা দিতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'তবে গ্লেশ্যাল লেকে পাওয়া বিমানের সিরিয়াল নাম্বার ট্রেস করে মসিয়ো বুভারির খোঁজ পেয়েছি। অবস্থাদৃষ্টে লাশটা ওঁরই বলে মনে হচ্ছে।'

'জ্বি, হতে পারে,' চেয়ারে হেলান দিল মাদাম বুভারি। যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে গেছে সে। আপনমনে কথা বলতে থাকল। 'থিয়োডর হবারই সম্ভাবনা বেশি। ১৯১৪ সালে নিজের বিমান নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। উড়তে ভালবাসতেন, ফ্রেঞ্চ মিলিটারি ফ্লাইং স্কুল থেকে ট্রেইনিং নিয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ পাইলট... অথচ কী দুর্ভাগ্য দেখুন! নিশ্চয়ই ফুয়েল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিংবা খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়েছিল বিমানটা।'

'এখান থেকে ডরমেয়ার গ্লেসিয়ার তো অনেক দূরে,' বলে

উঠল লুনা। 'ভদ্রলোক আল্পসে কী করছিলেন বলে মনে হয় আপনার?'

রহস্যময় হাসিটা ফিরে এল মাদাম বুভারির ঠোঁটে। 'থিয়োডর একটু পাগলাটে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর সব কাজের ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনার ব্যাপারে কিছুটা খোঁজখবর নিয়েছি আমি। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট, নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর... রিয়েলি ইম্প্রেসিভ! বিশেষ করে সাবমেরিনের সাহায্যে যেভাবে উদ্ধার-অভিযান চালিয়েছেন ডরমেয়ারে, সেটার প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে।'

'আমার একার কোনও কৃতিত্ব নেই,' রানা বলল। 'বহু লোক সাহায্য করেছে ওখানে।'

'হুম, আরেকটা বিশেষণ যোগ করতে হবে দেখছি—বিনয়ী! যা হোক, ওখানকার ঘটনা পত্রিকায় পড়েছি আমি। বিজ্ঞানীদের উপর কে যেন হামলা করেছিল, তাই না? কে ওই লোক, কিছু জানা গেছে?'

'জী না। এখনও ওটা রহস্য। শুধু এটুকু বোঝা গেছে, লাশের রিকভারি ঠেকাতে গিয়েছিল সে। একটা স্ট্রংবক্সও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওখান থেকে।'

'স্ট্রংবক্স? কীসের?'

'খোলার সময় পাওয়া যায়নি। ভিতরে কী ছিল, কে জানে!'

'ইশ্‌শ্‌... ওটা পেলে হয়তো জানা যেত, থিয়োডর বুভারি আল্পসে কী করছিলেন।'

'আপনাদের পরিবারে কেউ কিছু জানত না?'

'উঁহুঁ,' একটু যেন বিব্রত হলো মাদাম বুভারি। 'আসলে... ওঁর সঙ্গে অদৃশ্য একটা দূরত্ব ছিল সবার। মানুষ হিসেবে থিয়োডর বুভারি ছিলেন... ইয়ে... ডিস্টার্বড্।'

'অসুস্থ?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

'মনের টানাপড়েনকে যদি অসুখ বলা যায় আর কী!' কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম রুচির মানুষ—শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী। অন্য কোনও পরিবারে জন্ম নেয়া উচিত ছিল ওঁর। *মৃত্যুর সওদাগর* নামে পরিচিত পরিবারে কখনোই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি থিয়োডর।'

'সমস্যাটা বুঝতে পারছি,' বলল রানা।

'এরচেয়েও খারাপ নামে ডাকা হয়েছে আমাদেরকে, বিলিভ মি! নিয়তির সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস কী, জানেন? সূক্ষ্ম রুচির পাশাপাশি থিয়োডর বুভারি ছিলেন একজন জাত-ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধির সঙ্গে শুধুমাত্র একজন জাত-শিল্পীর তুলনা করা চলে। ওঁর হাতে আমাদের পারিবারিক ব্যবসার প্রচুর প্রসার ঘটেছে।'

'ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল না? মননশীল ও বিবেকবান একজন মানুষ কেন অস্ত্রের ব্যবসার প্রসার ঘটাবে?'

'ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করতেন থিয়োডর, অস্ত্রকে নয়। তা ছাড়া একটা সমঝোতা করে নিয়েছিলেন নিজের সঙ্গে। অস্ত্র যদি তিনি তৈরি না করেন, তা হলে অন্য কেউ করবে... ঠেকাবার উপায় নেই। তাই ব্যবসা চালিয়ে গেছেন, পাশাপাশি ব্যবসা থেকে আয় করা টাকা ঢেলেছেন শান্তিবাদী আন্দোলনে। ওঁর ভাষায়... এটা ছিল ব্যালান্স অভ ন্যাচারাল ফোর্স।'

'এভাবে নিজেকে কতদিন ধোঁকা দেয়া সম্ভব?'

'খুব বেশিদিন নয়। এক পর্যায়ে পাগলামি দেখা দেয় ওঁর মধ্যে... নিখোঁজ হবার অল্প কিছুদিন আগে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছে। মাথামোটা গোঁয়ার রাজনৈতিক নেতারা সেই যুদ্ধ বাধাবার জন্য দায়ী; তবে হয়তো শুনেছেন, ওদেরকে উসকে দিয়েছিল অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা। টাকা কামানোর

সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পাচ্ছিল ওরা।'

'কাদের কথা বলছেন? বুভারি আর ক্রুপ পরিবার?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল রানা।

যেন পচা জিনিসের গন্ধ পেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে নাক কুঁচকে ফেলল মাদাম বুভারি। 'ক্রুপ-দের সঙ্গে এক কাতারে ফেলে দয়া করে অপমান করবেন না আমাদেরকে। ওরা হলো সুযোগসন্ধানী ছোটলোক, অন্যের ঘাম আর রক্তের উপর নিজেদের সাম্রাজ্য গড়েছে। সত্যিকার অর্থে ঐতিহ্য বা বংশের মর্যাদা বলে কিছু নেই ওদের। অথচ বুভারি পরিবার ওদের চেয়ে কয়েকশ' বছরের পুরনো। অনাদিকাল থেকে হাতিয়ার তৈরির ব্যবসা করছে। আমাদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি, মসিয়ো রানা?'

'খুব বেশি না। শুনেছি নিজেদেরকে শামুকের মত গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করেন আপনারা।'

হাসল মাদাম বুভারি। 'যে-ধরনের ব্যবসা করি আমরা, সেখানে গোপনীয়তা অত্যাবশ্যকীয়।' উঠে দাঁড়াল সে। 'আসুন, আপনাদের একটা জিনিস দেখাই। বুভারি পরিবার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যাবেন... হাজার কথা বলা ছাড়াই!'

পথ দেখিয়ে আরেকটা কামরায় দুই অতিথিকে নিয়ে গেল মহিলা—দরজায় যথারীতি তিন-মাথা ঈগলের প্রতীক।

'এটা শ্যাতোর আর্মারি, বা অস্ত্রাগার,' ভিতরে ঢুকে বলল মাদাম বুভারি। 'বুভারি সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড।'

বিস্মিত চোখে বিশাল কামরাটার ভিতর নজর বোলাল রানা আর লুনা। ক্যাথেড্রালের মত করে সাজানো হয়েছে অভ্যন্তর। সারি বেঁধে বসানো হয়েছে নিচু টেবিল, তাতে রাখা হয়েছে নানা ধরনের অস্ত্র। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে আইল। দেয়ালে প্রমাণ সাইজের খোপ আছে, সেখানে সেইন্টদের মূর্তির বদলে শোভা

[illegible] ধরনের বর্ম। একেবারে সামনে, যেখানে বেদি থাকার কথা, সেখানে রয়েছে চারটে লাইফ-সাইজ ম্যানিকিন। ঘোড়ার পিঠে বর্ম পরা চারজন অকুতোভয় নাইট। হাতে ঝকঝকে ঢাল-তলোয়ার... হামলা করার ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে। এমনকী ঘোড়াগুলোর মাথা-ঘাড় আর দেহের [illegible] বর্মে ঢাকা। অদ্ভুত সুন্দর!

প্রফেশনাল ভঙ্গিতে পুরো কালেকশন দেখছে লুনা। প্রশংসার সুরে বলল, 'আপনার এই সংগ্রহ তুলনাহীন। দুনিয়ার যে-কোনও [illegible] মিউজিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।'

ঘোড়ায় চড়া নাইটদের সামনে গিয়ে থামল মাদাম বুভারি। বলল, 'এরা হচ্ছে সে-আমলের আর্মি-ট্যাঙ্ক। নিজেকে প্রাচীন যুগের পদাতিক সৈন্যের জায়গায় কল্পনা করে দেখুন। কোমরে [illegible] টুকরো নেংটি, আর হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে [illegible]। হঠাৎ যদি এই ভদ্রলোকদের ছুটে আসতে দেখেন, তা হলে কী অবস্থা হবে? উল্টো ঘুরে দৌড় দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন না?'

'ও, নিঃসন্দেহে চমৎকার জিনিস,' বলল লুনা। 'তবে অপরাজেয় বলা যাবে না। প্রযুক্তি আর রণকৌশলের উন্নতির সঙ্গে বর্মের কার্যকারিতা কমে গিয়েছিল। শক্তিশালী তীর দিয়ে যে-কোনও আর্মার ফুটো করা যেত। ডাবল ব্লেডের তলোয়ার দিয়ে পর্যাপ্ত কোপ বসালেও বর্ম-শিরোস্ত্রাণ কোনও কাজে আসে না। সবচেয়ে বড় কথা, ফায়ার-আর্মসের বিরুদ্ধে এই লোহার পোশাক একেবারেই অচল।'

'আমাদের ব্যবসার চাহিদাটাই ধরতে পেরেছেন আপনি, মাদমোয়াজেল,' হাসল মাদাম বুভারি। 'উন্নতি এবং উন্নয়ন। আলটিমেট প্রোপার বলে কিছু নেই। প্রতিদিনই নিত্যনতুন প্রযুক্তি কিংবা কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে... আগের প্রযুক্তিকে টেক্কা

দেয়ার জন্য! কাজেই আমাদের ব্যবসা কখনও থেমে থাকে না।' বাঁকা চাহনি নিক্ষেপ করল সে লুনার দিকে। 'আপনি তো দেখছি অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে অনেককিছু জানেন।'

'ও কিছু না,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লুনা। মিথ্যে অজুহাত দেখাল, 'আমার ভাই এসবের পাগল। ওর কাছ থেকে শিখেছি অল্প-স্বল্প।'

'অল্প বলে তো মনে হচ্ছে না। এনিওয়ে, এখানে যা দেখছেন, সবই বুভারি পরিবারের সৃষ্টি। এই-ই আমাদের ঐতিহ্য... আমাদের লিগেসি। বলুন, কেমন লাগছে?'

পাশের একটা টেবিলে রাখা হেলমেটের সারি দেখল লুনা। বলল, 'ক্র্যাফটস্‌ম্যানশিপে কোনও ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ডিজাইন তো অনেক পুরনো। মনে হচ্ছে দু'হাজার বছর...'

'ব্রাভো, মাদমোয়াজেল!' প্রশংসা করল মাদাম বুভারি। 'ঠিক আন্দাজ করেছেন। হেলমেটগুলো প্রি-রোমান যুগের।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনাদের পরিবার সে-আমলেও ছিল? কই... কেউ বলেনি তো!'

'এতেই অবাক হচ্ছেন?' ঠোঁট বাঁকাল মাদাম বুভারি। 'কেউ যদি প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে আমাদের বানানো ছুরি-বর্শার ছবি আবিষ্কার করে, তাতেও চমকাবার কিছু নেই।'

'প্রাগৈতিহাসিক গুহা থেকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছুলেন কী করে, জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রাচীন সাইপ্রাসের কামার। মেডিটারেনিয়ানের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ওখানে। আউটপোস্ট তৈরির জন্য ক্রুসেডার-বাহিনী পৌঁছায় সাইপ্রাস দ্বীপে, স্থানীয় কামারদের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়। নানা ধরনের অস্ত্র বানাতে দেয় ওদেরকে। শেষ পর্যন্ত সেরা কামারদেরকে নিয়ে আসে তাদের সঙ্গে। ওভাবেই সাইপ্রাস

থেকে ফোলে আসি আমরা। এখানে আসার পর অস্ত্র-নির্মাতাদের একটা সংগঠন গড়ে তোলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। সংগঠনের পরিবারগুলো পরস্পরের মধ্যে বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে একত্র হয়ে যায়, পরে জোট বাঁধে আরও দুটো সংগঠনের সাথে।'

'এ কারণেই আপনাদের প্রতীকে তিন-মাথা ঈগল?'

'আপনার নজর বেশ চোখা, মসিয়ো রানা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। তবে এখন আর তিন সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। বুভারি পরিবার বাকিদেরকে পিছনে ফেলে সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, লাঞ্ছনটা শুধু বদলানো হয়নি ঐতিহ্যের কথা ভেবে।'

'হুম। তিন সংগঠন এক হবার পর কী ঘটল?'

'সারা ইয়োরোপের সেরা অস্ত্র-নির্মাতারা একত্র হলে কী ঘটে? একচেটিয়া ব্যবসা। চাহিদার শেষ ছিল না। ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকায় কখনোই মন্দায় পড়তে হয়নি আমাদেরকে। নেপোলিয়নের ত্রিশ বছরের লড়াই, ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ, তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ... লটারির টিকেটেও এমন কপাল খোলে না কারও।'

'থিয়োডর বুভারিও কী একই ধারায় চিন্তা করতেন?'

'না। আগেই বলেছি, যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন আমার গ্রেট আঙ্কল। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। চেয়েছিলেন অস্ত্রের ব্যবসা থেকে পরিবারকে সরিয়ে আনতে। ততদিনে অনেকদূর এগিয়ে গেছি আমরা, *স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ* নামে সারা দুনিয়ায় শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ফেলেছি। এমন একটা ব্যবসা মুখের কথায় বন্ধ করে দেয়া যায় না, কেউ তাতে রাজিও ছিল না। তা ছাড়া আমরা সরে এলেই যে যুদ্ধ থেমে যেত—এমনও তো নয়। লেনিনের ভাষায় ইয়োরোপ তখন বারুদভর্তি পিপেয় পরিণত হয়েছিল।'

ইতিহাস স্মরণ করল রানা। 'গ্র্যাণ্ড ডিউক ফার্দিনান্দের

হত্যাকাণ্ড ফুলকির মত সেই বারুদে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাই না?'

'ফার্দিনান্দের মৃত্যুকে ফুলকি না বলে অজুহাত বলাই ভাল। যুদ্ধটা যে করেই হোক, বাধানো হতো। ইন্টারন্যাশনাল আর্মস ইণ্ডাস্ট্রির মধ্যে গোপন চুক্তি হয়েছিল তখন—প্রতিটি গুলিবর্ষণ, কিংবা বোমা বিস্ফোরণের ফলে লাভবান হতো তারা। জার্মানদের লড়াইয়ে লাভ হয়েছে ক্রুপ-দের; আর মিত্রবাহিনীর লড়াইয়ে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রি-র। সজ্ঞানে এ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাননি থিয়োডর। কে জানে, ওঁর পরিণতির পিছনে হয়তো আত্মগ্লানি দায়ী।'

'বলতে চাইছেন, আত্মহত্যা করেছেন থিয়োডর বুভারি?'

'প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তো বটেই,' চেহারায় কাঠিন্য ভর করল মাদাম বুভারির। 'আমার গ্রেট-আঙ্কল ছিলেন একজন অপরিণামদর্শী আদর্শবাদী, মসিয়ো রানা। তার বিনিময়ে অকালমৃত্যু জুটেছে তাঁর কপালে। এতে কী লাভ হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাওয়া লক্ষ লক্ষ সৈনিকের? একটা মৃত্যুও কি ঠেকাতে পেরেছেন তিনি? পর পর দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, অর্থনীতির উত্থান-পতন ঘটেছে। আমরা যদি থিয়োডরের আমলে ব্যবসা গুটিয়ে নিতাম, তা হলে পথে পথে ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরতে হতো এখন।'

'মৃত্যুর ব্যবসাকে এভাবেই জায়েজ করে নিচ্ছেন?' খোঁটা দিল রানা।

'এই দুনিয়া একটা কুরুক্ষেত্র, মসিয়ো রানা,' উত্তেজিত গলায় বলল মাদাম বুভারি। '...আর যুদ্ধের ময়দানে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। যার শক্তি বেশি, সে-ই টিকে থাকবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। আর শক্তির জন্য অস্ত্রের চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। আমাদেরকে অপমান করার চেষ্টা

করে লাভ নেই কোনও। পরিবারের এই ব্যবসার জন্য আমরা লজ্জিত নই, গর্বিত! পৃথিবীতে যতদিন হানাহানি আর হিংসা-বিদ্বেষ টিকে থাকবে, ততদিন আমরাও মাথা উঁচু করে থাকব।'

'মানে অনন্তকাল,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কেয়ামতের আগে হানাহানি থামবে না মানুষের মাঝে।'

'একজ্যাক্টলি,' হাসল মাদাম বুভারি। 'বুঝতেই পারছেন, চমৎকার একটা বাণিজ্যিক সেক্টর বেছেছি আমরা। সহজে যার পতন ঘটবে না। প্লিজ, ওভাবে তাকাবেন না। আমরা শুধু অস্ত্র তৈরি করি, কারও উপর সেগুলো ব্যবহার করি না। সত্যি বলতে কী, থিয়োডর বুভারির আদর্শ এখনও ধরে রেখেছি আমরা। চ্যারিটি আর মানবকল্যাণে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ যে-পরিমাণ টাকা খরচ করে, তা ছোটখাট অনেক রাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেটের চেয়ে বেশি।'

'রূঢ় আচরণ করে থাকলে দুঃখিত,' ভদ্রতা রক্ষার সুরে বলল রানা। 'কাউকে অপমান করার ইচ্ছে নেই আমার। বরং নিঃসংকোচে পরিবারের ইতিহাস প্রকাশ করার সৎসাহস দেখানোয় আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ো রানা,' মাথা নোয়াল মাদাম বুভারি। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। লেকের তলা থেকে থিয়োডর বুভারির বিমানটা কি উদ্ধার করা যাবে?'

'একটু কঠিন, তবে যোগ্য একজন স্যালভেজারের জন্য অসম্ভব নয়। আপনি চাইলে আমি কয়েকজনের নাম দিতে পারি।'

'জী, অবশ্যই। অমন একটা পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন পানিতে ফেলে রাখা যায় না। আপনারা কি আজই প্যারিসে ফিরে যাবেন?'

'তেমনটাই ইচ্ছে।'

'ঠিক আছে, চলুন আপনাদের এগিয়ে দিই।'

ভিন্ন একটা দরজা দিয়ে রানা-লুনাকে বের করে আনল মাদাম বুভারি। পোর্ট্রেট-গ্যালারির ভিতর দিয়ে নিয়ে চলল সদর দরজার দিকে। পথিমধ্যে হঠাৎ থেমে গেল সে, শান্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল একটি তৈলচিত্রের দিকে। লম্বা লেদার-কোট পরা একজন ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে ওতে।

'আমার গ্রেট-আঙ্কল... থিয়োডর বুভারি,' বলল মহিলা।

পেইন্টিঙের মানুষটি অত্যন্ত সুদর্শন, এয়ার-মিউজিয়ামে দেখা একটা বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় প্রাচীন শিরোস্ত্রাণ—যেটা ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে পাওয়া গেছে!

বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল লুনার মুখ দিয়ে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। জানতে চাইল, 'কোনও সমস্যা, মাদমোয়াজেল?'

'না।' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল লুনা। 'আমি হেলমেটটা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছি। ওটা আপনার কালেকশনে আছে?'

শীতল দৃষ্টি ফুটল মাদাম বুভারির চোখে। 'না, নেই।'

তাড়াতাড়ির প্রসঙ্গটা ঘোরাবার চেষ্টা করল রানা। বলল, 'ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে আপনার, বা আপনার ছেলের খুব একটা মিল দেখছি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'কারণ আমরা পূর্ণাঙ্গ বুভারি নই। আমার পিতামহ বাইরের মানুষ ছিলেন, থিয়োডরের বোনকে বিয়ে করে ওদের পদবী নেন। থিয়োডর গায়েব হয়ে যাবার পর পারিবারিক সাম্রাজ্যের হাল ধরতে হয় তাঁকে।'

'ইন্টারেস্টিং!' বলল লুনা।

গম্ভীরভাবে ওকে দেখল মাদাম বুভারি। তারপর বলল, 'চমৎকার একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। আপনারা

ডিনার পর্যন্ত থেকে যান না কেন? এমনিতেই কয়েকজন গেস্ট আসার কথা, পুরনো দিনের মত একটা কস্টিউম পার্টি হবে আজ রাতে। আপনারা তাতে যোগ দিলে খুব খুশি হব।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করল রানা। 'আমাদের সঙ্গে কোনও কস্টিউম নেই। তা ছাড়া ডিনারের পর রওনা দিলে প্যারিসে পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'তা হলে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান... আমার অতিথি হয়ে! কস্টিউম নিয়ে ভাববেন না, বাড়িতে দু'চার সেট বাড়তি পোশাক এমনিতেই রাখি আমরা। প্লিজ, অমত করবেন না। করলেও আমি শুনতে রাজি নই। আপনাদের সঙ্গ খুব ভাল লেগেছে আমার।'

'আপনার অনেক দয়া,' বলল লুনা। 'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নয়,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল মাদাম ধুভারি। 'আপনারা থাকছেন, দ্যাটস্ ফাইনাল। আমি যাই, রাতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করি গে। নীচতলায় যত খুশি ঘুরে বেড়ান, মজার মজার অনেক কিছু দেখতে পাবেন। উপরে আমাদের লিভিং কোয়ার্টার। বিশ্রাম নিতে চাইলে কাউকে বলবেন, আপনাদের গেস্ট রুমে নিয়ে যাবে। গুড বাই।'

দুই অতিথিকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না মহিলা, দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল। গ্যালারিতে দু'জনে একা হয়ে যেতেই সঙ্গীর দিকে ফিরল রানা। বলল, 'কী ঘটল ব্যাপারটা, বলতে পারো?'

''আমার প্ল্যান কাজে লেগেছে, মিস্টার!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল লুনা।

'প্ল্যান! কীসের প্ল্যান?'

'এখানকার আনাচে-কানাচে ঢুঁ মারার প্ল্যান। আর্মারিতে ঢুকে কারেই প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রের উপর নিজের এক্সপার্টিজ

দেখিয়েছি আমি। কৌতূহলী করে তুলেছি মহিলাকে। ফলাফল দেখতেই পাচ্ছ। আমাদেরকে থাকতে বলল সে। তদন্ত করার জন্য সময় পেলাম।'

'এই-ই তোমার প্ল্যান? বাঘের গুহায় ঢুকে নিজেকে টোপ বানানো?'

'কেন? অসুবিধে কী? তুমিই তো বলেছিলে, গ্লেসিয়ারের লাশ আর হেলমেট নিয়ে যতকিছু ঘটেছে, তার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে বুভারি পরিবারে। খালি হাতে ফিরে যেতে পারি না আমরা! অন্তত কাজে লাগার মত কোনও সূত্র তো পেতে হবে।'

'তুমি নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছ, সেটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধে। পোর্ট্রেট দেখে যেভাবে চমকে উঠলে, তাতে মাদাম বুভারি বুঝে ফেলেছে—হেলমেটটা তুমি দেখেছ আগে।'

'ওটা ভুল হয়েছে, স্বীকার করছি। কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে আসা চলে না। ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার, তা ছাড়া কস্টিউম পার্টিতে কী এমন ঘটবে? বাইরের লোকের সামনে আমাদের কোনও ক্ষতি করার সাহস পাবে না ওরা।'

'পার্টির পরেও ফিরতে পারছি না আমরা। সারারাত থাকতে হবে... সেটা ভুলে গেছ?'

'ওফ্! খালি নেগেটিভ কথাবার্তা! পরিস্থিতি খারাপ মনে হলে বাকি গেস্টদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব আমরা। কে বাধা দেবে? মাদাম বুভারিকে মোটেই ভয়ানক মানুষ বলে মনে হয়নি আমার। অন্তত সবার সামনে জোর খাটাতে পারবেন না আমাদের উপর।'

কনভিন্স হলো না রানা। অভিজ্ঞতা কম নয় ওর, মানুষ চিনতে জানে। বুঝতে পারছে, আইরিন বুভারির নম্র-ভদ্র খোলসের তলায় ধূর্ত ও নিষ্ঠুর আরেকটি সত্তা লুকিয়ে আছে। থিয়োডর বুভারির পোর্ট্রেটের সামনে লুনার প্রতিক্রিয়া দেখে

মালিকের জন্য সেই সত্তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। কোনও সন্দেহ নেই, ভয়ঙ্কর মহিলাটির মাথায় কোনও একটা পরিকল্পনা রয়েছে ওদেরকে নিয়ে, সেজন্যেই ওদেরকে যেতে দেয়নি। মাদাম বুভারিকে লুনা ফাঁদে ফেলতে পারেনি, উল্টো নিজেই আটকা পড়েছে ফাঁদে।

মেয়েটাকে এ-মুহূর্তে আতঙ্কিত করতে চাইল না রানা। আরেকটু নিশ্চিত হওয়া দরকার। তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো শ্যাতোটা ঘুরে-ফিরে দেখি।'

পুরো নীচতলা দেখতে ঘণ্টাখানেক লাগল। নামেই দেখা, কারণ অর্ধেকের বেশি কামরার দরজা তালাবদ্ধ, ওরা খুলতে পারেনি। হতাশ না হয়ে প্রতিটি করিডোরে ঢুঁ মারল রানা, মনে মনে শ্যাতোর ম্যাপ তৈরি করবার চেষ্টা করল। পরে সেটা কাজে লাগতে পারে।

এক ঘণ্টা পর ওরা যখন সদর দরজার সামনে ফিরে এল, তখন রানার মনে খটকা লেগে গেছে। লুনাকে বলল, 'ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। এতবড় একটা প্রাসাদ... মেইনটেন করার জন্য অনেক স্টাফ থাকার কথা। অথচ দুই বুভারি, আর আমাদের নাশতা দিয়ে যাওয়া এক চাকর ছাড়া কাউকে দেখলাম না। অস্বাভাবিক লাগেনি তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, লেগেছে,' স্বীকার করল লুনা। 'কিন্তু দুশ্চিন্তার কিছু দেখছি না। বন্ধ কামরাগুলোর ভিতরে হয়তো কাজ করছে ওরা।'

'ওটা আরেকটা অসঙ্গতি। দরজাগুলো বন্ধ কেন? বন্ধ কামরায় কী এমন কাজ করতে পারে ওরা, যা আমাদের দেখা বারণ? পরিবারের কালো ইতিহাসের বেশিরভাগটাই ফাঁস করে দিয়েছেন মাদাম বুভারি, সেটাও পছন্দ হয়নি আমার। আগ বাড়িয়ে ওসব বলে না লোকে।'

'আমরা সেই ইতিহাস বাইরে আর ফাঁস করতে পারব না, এমনটাই আশঙ্কা করছ তুমি?'

'আমার ভাবাভাবিতে কিছু যায়-আসে না। ওই মহিলা কী ভাবছে, সেটাই আসল কথা।'

'তোমার ধারণা ভুল না ঠিক, সেটা দেখতে হয় তা হলে।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল লুনা। হাতল ঘোরাতেই পাল্লা খুলে গেল। 'দেখলে? দরজায় তালা নেই, চাইলেই আমরা চলে যেতে পারি।'

'চলো দেখি, আসলেই পারি কি না দেখা যাক।'

শ্যাতো থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। আঙিনা পেরিয়ে মূল ফটকের সামনে গিয়ে থামল। ড্র-ব্রিজটা এখনও পরিখার উপর, কিন্তু আঙিনার প্রবেশপথে নামিয়ে রাখা হয়েছে মোটা গ্রিলের পাল্লা। বেরুনোর পথ রুদ্ধ। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা, ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা।

'কোথাও যাওয়া হচ্ছে না আমাদের,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ও। আঙুল তুলল ড্রাইভওয়ের দিকে।

ওদের গাড়িটা গায়েব।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পরিস্থিতি বড়ই নাজুক।
শ্যাতো বুভারির দুর্ভেদ্য পাতালে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা,
সেইসঙ্গে, জানা কথা, আছেন আপনিও।
ওকে যমের বাড়ি পাঠানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন।
ওদিকে বন্দি হয়েছে বিজ্ঞানী দম্পতি
আসিফ আর তানিয়া রেজাও। স্কটিশ উপকূলের
এক নির্জন দ্বীপে পুরো রহস্যের জড় খুঁজে পেয়েছে ওরা।
দেখা পেয়েছে মনুষ্য আকৃতির জলজ্যান্ত একদল পিশাচের।
নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।
কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, পাঠক, আপনি রানার সঙ্গে আছেন।
আপনি জানেন, চুপচাপ মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি নয় ও,
রাজি নয় প্রিয় বন্ধুদেরকে মরতে দিতেও।
তাই এবার তৈরি হোন রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের জন্য।
কথা দিচ্ছি, দম ফেলবার ফুরসত পাবেন না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পরিস্থিতি বড়ই নাজুক।
শ্যাতো বুভারির দুর্ভেদ্য পাতালে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা, সেইসঙ্গে আপনিও।
ওকে যমের বাড়ি পাঠানোর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন।
ওদিকে বন্দি হয়েছে বিজ্ঞানী দম্পতি
আসিফ আর তানিয়া রেজাও। স্কটিশ উপকূলের
এক নির্জন দ্বীপে পুরো রহস্যের জড় খুঁজে পেয়েছে ওরা।
দেখা পেয়েছে মনুষ্য আকৃতির জলজ্যান্ত একদল পিশাচের।
নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।
কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, পাঠক, আপনি রানার সঙ্গে আছেন।
আপনি জানেন, চুপচাপ মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি নয় ও,
রাজি নয় প্রিয় বন্ধুদেরকে মরতে দিতেও।
তাই এবার তৈরি হোন রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের জন্য।
কথা দিচ্ছি, দম ফেলবার ফুরসত পাবেন না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৪০৭

কুরুক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7407-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-১৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-407
KURUKSHETRA
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

ষাট টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

উথাল-পাথাল জলরাশির মাঝখানে ডলফিনের মত ভেসে উঠল সাবমারসিবল *আলভিন,* পানি সরে যেতেই সবেগে আছড়ে পড়ল ধাতব মেঝের উপর। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে সিট থেকে ছিটকে পড়ে গেল ভিতরের তিন আরোহী, আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

বাল্কহেডের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেছে ড. আসিফ রেজার, চোখের সামনে লাল-নীল ফুল দেখতে পাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে স্বামীর কাছে এল ড. তানিয়া। উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল, 'বেশি লেগেছে?'

'মাথায় একটা আলু গজাবে, আর কিছু না,' হালকা গলায় বলল আসিফ। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল।

'কী ঘটল?' হতভম্বের মত বলল সাবমারসিবলের পাইলট জয়েস কোর্ট। 'কোথায় আমরা?'

'এখুনি জানা যাবে।' বলে হামাগুড়ি দিয়ে ভিউপোর্টের কাছে গেল আসিফ, বাইরে তাকাল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

নিষ্ঠুর, রুক্ষ চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে কাঁচের ওপাশে। তাকিয়ে আছে আসিফের চোখে চোখ রেখে। প্রথমে মনে হলো দৃষ্টিবিভ্রম—মাথায় আঘাত পেয়ে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। কিন্তু ভুলটা ভেঙে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। টুক টুক করে রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ভিউপোর্টের গায়ে টোকা দিল লোকটা,

আঙুল তুলে উপরদিক দেখাল। হ্যাচ খুলতে বলছে।

তানিয়াও অন্যপাশের ভিউপোর্টে মুখ ঠেকিয়ে রেখেছে। বলল, 'বিচ্ছিরি চেহারার একটা লোক দেখতে পাচ্ছি। হাতে রাইফেল।'

'এদিকেও,' বলল আসিফ। 'আমাদেরকে বেরুতে বলছে।'

ঠং ঠং করে বাড়ি পড়তে শুরু করল আলভিনের খোলে।

'অভ্যর্থনা জানাতে অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা,' বলল তানিয়া। স্বামীর দিকে তাকাল। 'কী করতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল আসিফ। 'আলভিনকে যেহেতু অ্যাটাক সাবমেরিনে পরিণত করতে পারছি না, ওদের কথা মেনে নেয়াই ভাল।'

উঠে গিয়ে হ্যাচ খুলে দিল ও। উষ্ণ... আর্দ্র বাতাস ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতর। ভিউপোর্টের লোকটার চেহারা দেখা গেল হ্যাচের মাথায়, ওদেরকে বেরিয়ে আসার ইশারা করে সরে গেল। মই ধরে উপরে উঠল আসিফ, হ্যাচের ফুটো দিয়ে মাথা আর কাঁধ বের করতেই লক্ষ করল, ছোট্ট সাবমারসিবলটাকে ছ'জন সশস্ত্র লোক ঘিরে রেখেছে।

শান্ত ভঙ্গিতে আলভিন থেকে নেমে এল ও। এরপর হ্যাচ দিয়ে মাথা বের করল জয়েস। অভ্যর্থনাকারীদের দেখতে পেয়ে মুখের রক্ত সরে গেল তার, জমে গেল মূর্তির মত। নীচ থেকে ঠেলা-গুঁতো দিয়ে ওকে উপরে ওঠাল তানিয়া, আসিফ সাহায্য করল নেমে আসতে। খানিক পর তানিয়াও এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।

চারপাশে নজর বোলাল রেজা দম্পতি। উজ্জ্বলভাবে আলোকিত বিশাল একটা কম্পার্টমেন্ট—আকারে ওটা তিনটে গাড়ি রাখার উপযোগী গ্যারাজের সমান। বাতাসে সাগরের নোনা গন্ধ ভাসছে। আলভিনের গা থেকে ঝরতে থাকা পানি গড়িয়ে

যাচ্ছে মেঝের ড্রেন দিয়ে। দূরে কোথাও গুঞ্জন করছে ইঞ্জিন। দেয়াল ভেজা, একপ্রান্তে রয়েছে প্রকাণ্ড দুটো প্রেশার ডোর—চোয়ালের মত খোলা এবং বন্ধ করা যায়। বোঝা গেল, অতিকায় কোনও সাবমেরিনের এয়ার-লক চেম্বারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। প্রেশার ডোরের ওপেনিং দিয়ে ছোট্ট আলভিনকে গিলে নিয়েছে ডুবোজাহাজটি।

অস্ত্রধারী এক গার্ড দেয়ালের গায়ে বোতাম চাপল। পরমুহূর্তে মেকানিক্যাল মাউথের উল্টোপাশের দেয়ালে একটা দরজা খুলে গেল। পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে সেদিকে এগোল বন্দিরা, দরজা পেরিয়ে ছোট একটা কামরায় ঢুকল। দেয়ালে অন্তত এক ডজন *মুন-সুট* ঝোলানো আছে। ওগুলো আসলে মনুষ্য-আকৃতির সাবমারসিবল—চরম গভীরতায় ডাইভ দেবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এসকর্ট করে বন্দিদের একটা সংকীর্ণ করিডোর ধরে নিয়ে চলল গার্ডরা—তিনজন সামনে, তিনজন পিছনে। উদ্বিগ্ন চোখে লোকগুলোকে জরিপ করল আসিফ। নেভি ব্লু জাম্পসুট পরেছে সবাই, তাতে কোনও ধরনের আইডেন্টিফিকেশন মার্ক নেই। প্রত্যেকে শক্ত ধাঁচের, লড়াকু গড়নের মানুষ; হাঁটাচলায় সামরিক প্রশিক্ষণের ছাপ দেখা যাচ্ছে। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, মিশ্র জাতীয়তা। প্রাক্তন সৈনিক বলে আন্দাজ করল আসিফ—মার্সেনারি। সম্ভবত টাকার বিনিময়ে কাজ করছে।

ঘোরানো-প্যাঁচানো করিডোর পেরিয়ে ছোট একটা কেবিনে ঢোকানো হলো তিন বন্দিকে, বাইরে থেকে আটকে দেয়া হলো দরজা। ভিতরে দুটো বাঙ্ক, একটা চেয়ার, ক্লজিট আর অ্যাটাচড্ বাথরুম ছাড়া আর কিছু নেই।

'মনে হচ্ছে থার্ড ক্লাসের কামরা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে,'

কেবিনের ভিতর চোখ বুলিয়ে বলল তানিয়া।

মাথা টনটন করছে আসিফের, ব্যথা পাওয়া জায়গাটা বেঢপভাবে ফুলে উঠেছে। ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

'খারাপ লাগছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল তানিয়া।

মাথা ঝাঁকাল আসিফ। 'আলুটা টনটন করছে।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করল তানিয়া। বাথরুমে গিয়ে ভিজিয়ে নিল পানিতে। ভেজা রুমাল দিয়ে মুছে দিতে লাগল স্বামীর ফুলে ওঠা কপাল। জয়েস সাহায্য করল ওকে।

খানিক পর ফোলা কিছুটা কমে গেল। সোজা হয়ে বসল আসিফ। পোশাক ঠিকঠাক করল। আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল।

'এখন কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'এমন সেবাযত্ন পেলে ভাল না লেগে উপায় আছে?' হাসল আসিফ।

তানিয়াও হাসল।

'আপনারা হাসছেন?' বিস্মিত গলায় বলল জয়েস। 'কীসের মধ্যে পড়েছি, সে খেয়াল আছে? ভয় করছে না?'

'ভয় পেয়ে লাভ নেই কোনও,' বলল আসিফ। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন। তা হলে হয়তো মুক্তির একটা পথ বেরিয়ে যাবে।'

রেজা দম্পতির এই সাহসী চরিত্র দেখে অবাক হবার কিছু নেই। ব্যক্তিগতভাবে দুজনেই ওরা দুঃসাহসী, রোমাঞ্চপ্রিয়। অ্যাডভেঞ্চারে বেরুতে ভালবাসে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আগে পড়েনি বটে, কিন্তু বিপদ-আপদ ওদের জন্য নতুন কিছু নয়। পর্বতারোহণ, কিংবা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে অতীতেও বহুবার বিপদ মোকাবেলা করেছে। তা ছাড়া নুমার স্টাফ হিসেবে সার্ভাইভালের উপর ছোটখাট একটা কোর্সও করতে হয়েছে ওদেরকে।

'আমরা আসলে বাস্তবকে মেনে নিয়েছি,' জয়েসকে বলল তানিয়া। 'পছন্দ করুন বা না-ই করুন, আপাতত এখানে আটকা পড়েছি আমরা। হাতে যেহেতু করার কিছু নেই, আসুন ভেবেচিন্তে বোঝার চেষ্টা করি—এখানে আসলে কী ঘটছে।'

'তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কল্পনার সাগরে ভেসে লাভ কী?' জয়েস বলল। 'আমরা তো কিছুই জানি না।'

'সায়েন্টিফিক মেথডের কথা বলছেন আপনি,' বলল আসিফ। 'এ-মুহূর্তে সেটা অচল। আপাতত যুক্তি-তর্কই আমাদের ভরসা। প্রথমেই যেটা জানি, সেটা দিয়ে শুরু করা যাক। অদ্ভুত ডিজাইনের একটা সাবমেরিনে আটকা পড়েছি আমরা, কারেক্ট?'

'হুঁ,' সায় দিল জয়েস। 'সি-বেডে সম্ভবত এটারই ট্র্যাক দেখেছি আমরা।'

'এই তো ঠিক পথে ভাবতে শুরু করেছেন। হাতে তথ্য-প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু আমরা জানি, সাগরের তলায় হামাগুড়ি দেবার মত সাবমেরিন তৈরি করা সম্ভব। এই ধরনের ডুবোযান নুমা-তেই আছে... তবে সেটা এত বড় নয়।'

'বেশ, মানলাম আপনার কথা। কিন্তু এখানে কী করছে জাহাজটা? ভিতরের মানুষগুলো কারা? কী চায় আমাদের কাছে?'

'আমার বিশ্বাস, খুব শীঘ্রি প্রশ্নগুলোর জবাব পাবো আমরা।'

'এবার কিন্তু জ্যোতিষীর মত ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।'

'উঁহুঁ, বুঝেশুনেই করছি। ওই দেখুন।'

দরজার হাতল ঘুরতে শুরু করেছে। পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকল নতুন একজন মানুষ। বেশ লম্বা, মাথায় সোনালি চুল। বয়স চল্লিশের কোঠায়। গার্ডদের মত জাম্পসুট পরে আছে, রঙ ভিন্ন... সবুজ। তবে চেহারাসুরতে মোটেই মার্সেনারি বলে মনে হচ্ছে না। হাতেও কোনও অস্ত্র নেই।

ভিতরে ঢুকে বন্দিদের দেখল নবাগত, তারপর আশ্বাসের

ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'রিল্যাক্স, ভয়ের কিছু নেই। আমি আপনাদের ক্ষতি করব না।' উচ্চারণে স্কটিশ টান।

'সত্যি?' সন্দিহান কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'অবশ্যই। আমি ভাল মানুষ...'

বাঁকা সুরে আসিফ বলল, 'এ-কথা বলবেন না যে, আপনি ক্যাপ্টেন নিমো, আর আমরা এ-মুহূর্তে *নটিলাস*-এ আছি।'

বিস্ময়ে চোখ পিটপিট করল লোকটা। বন্দিরা ভয়ে আধমরা হয়ে থাকবে বলে ভেবেছিল, এরা তো ঠাট্টা-মশকরা করছে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, 'না, তা বলব না। আমার নাম ওয়েসলি হেণ্ডারসন... ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন। কেমিস্ট। তবে হ্যাঁ... এই সাবমেরিন জুল ভার্নের নটিলাসের মতই অনবদ্য একটা ভেসেল।'

'ধারণা করছি সাবমেরিনের চমক দেখানোর জন্য ধরে আনা হয়নি আমাদের?'

'না, ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস,' গাম্ভীর্য ফুটল হেণ্ডারসনের চেহারায়। 'কয়েকটা প্রশ্ন করব, তার উপর আপনাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। দয়া করে সত্যি কথা বলবেন। এখানে কাউকে বন্দি করে রাখার ব্যবস্থা নেই। মিথ্যে বললে আপনাদের খুন করে পানিতে ফেলে দেবে ওরা।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বিশ্বাস করল আসিফ-তানিয়া। সেই সঙ্গে এটাও বুঝল, হেণ্ডারসন ওদের শত্রু নয়।

'ঠিক আছে, বলুন কী জানতে চান,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আসিফ।

'প্রথমেই আপনাদের পরিচয়।'

'আমি ড. আসিফ রেজা। ইনি আমার স্ত্রী... ড. তানিয়া রেজা। উনি হচ্ছেন ড. জয়েস কোর্ট... আলভিনের পাইলট।'

'আপনাদের সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউণ্ড?'

'আমি ওশন জিয়োলজিস্ট। তানিয়া আর জয়েস... দুজনেই মেরিন বায়োলজিস্ট।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'থ্যাঙ্ক গড! তা হলে আশা আছে।'

'আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?' বলল আসিফ। 'আমাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে কেন?'

'ওসবের কিছুই আমি জানি না। আপনাদের মত আমিও এখানে একরকম বন্দি।'

'মানে!' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া।

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই এখন। শুধু এটুকু জানুন, প্রফেশনাল এক্সপার্টিজের কারণে আপাতত বেঁচে গেলেন আপনারা। তবে কতক্ষণ বাঁচবেন, সেটা নির্ভর করবে ওরা আপনাদের কতটা কাজে লাগাতে পারবে, তার ওপর। নইলে...'

'ওরা কারা?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথার চুলে হাত বোলাল হেণ্ডারসন। 'ওদের পরিচয় না জানাটাই মঙ্গল আপনাদের জন্য।'

'হোয়াটএভার, ড. হেণ্ডারসন,' বলল তানিয়া। 'আপনার বসদের গিয়ে বলুন, আমাদেরকে কিডন্যাপ করে মস্ত ভুল করেছে ওরা। আলভিন গায়েব হয়ে যাওয়া মাত্র সাপোর্ট শিপ থেকে সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশন শুরু করা হবে। আপনাদের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যাওয়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার এখন।'

শ্রাগ করল হেণ্ডারসন। 'আমাকে বলা হয়েছে, তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। ওদের কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখছি না।'

'কী বলতে চাইছেন? কেন ঝুঁকি থাকবে না?'

'আমি সত্যিই জানি না, ড. তানিয়া। শুধু জানি, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ওরা যে-কোনও কিছু করতে পারে। আপনাদের

সাপোর্ট শিপকে যদি বাধা বলে মনে করে, সেটাকে সরাবার আয়োজনও করে রেখেছে।'

'কী চায় ওরা?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন কিংবা উত্তর... দুটোই আমাদের জন্য বিপজ্জনক। কাজেই প্রসঙ্গটা ভুলে যান।' ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিল হেণ্ডারসন, চোখের ইশারায় বোঝাল—কামরায় লুকানো মাইক্রোফোন আছে। 'আমাকে যেতে হয়। আপনাদের কাছ থেকে কী জানতে পারলাম, তা রিপোর্ট করতে হবে। খাবার আর পানি নিয়ে আসব একটু পরে। আপনারা বিশ্রাম নিন।'

উল্টো ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

'কী মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল জয়েস। 'ওর কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না,' বলল আসিফ।

'আমারও তা-ই ধারণা,' একমত হলো তানিয়া।

'আমরা এখন কী করব?' জয়েস জানতে চাইল।

'করার তো কিছু দেখছি না,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ। 'আপাতত ওর কথামত বিশ্রাম নেব। তোমাদের আপত্তি না থাকলে নীচের বাঙ্কটা দখল করছি আমি।'

শুয়ে পড়ল ও।

আধঘণ্টা পর ফিরে এল হেণ্ডারসন। হাতে খাবারের ট্রে—তাতে পনিরের স্যাণ্ডউইচ, কফির ফ্লাস্ক আর তিনটে মগ। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'সুসংবাদ! আপনাদেরকে অফিশিয়ালি আমাদের প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে।'

স্যাণ্ডউইচের মোড়ক খুলে কামড় বসাল তানিয়া। 'কীসের প্রজেক্ট?'

'সবকিছু খুলে বলতে পারব না। তবে জানিয়ে রাখছি, একটা রিসার্চ টিমে জায়গা পেয়েছেন আপনারা। নিড-টু-নো বেসিসে

কাজ করবেন। কাজের ব্যাপারে ধারণা পাবার জন্য সাবমেরিনের ভিতরটা ঘুরিয়ে দেখাব আপনাদের। খাওয়া শেষ করুন, আমাদের বেবিসিটার অপেক্ষা করছে।'

কফি-স্যাণ্ডউইচ শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। বন্দিরা হাত-মুখ ধুয়ে নিলে দরজায় টোকা দিল হেণ্ডারসন, বাইরে থেকে তালা খুলল ষণ্ডামার্কা এক গার্ড, হাতের অস্ত্র তৈরি রেখেছে। তিন বিজ্ঞানীকে নিয়ে বেরিয়ে এল হেণ্ডারসন, করিডোর ধরে এগিয়ে চলল। পিছন থেকে ওদেরকে অনুসরণ করল লোকটা।

একটু পর বড় একটা কামরায় প্রবেশ করল ওরা। চারদিকের দেয়াল টিভি মনিটর আর ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেণ্ট প্যানেলে ঢাকা পড়ে গেছে। ভিতরে কোনও মানুষ নেই।

'এটা আমাদের কণ্ট্রোল রুম,' বলল হেণ্ডারসন।

'কোনও ক্রু বা টেকনিশিয়ান দেখছি না কেন?' প্রশ্ন করল আসিফ।

'ভেসেলটা পুরোপুরি অটোমেটেড,' ব্যাখ্যা করল হেণ্ডারসন। 'অল্প ক'জন ক্রু, একদল গার্ড ও ডাইভার ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।'

'ডাইভার? হুম, এয়ারলকের বাইরে অনেকগুলো মুন-সুট দেখেছি। ওগুলো তা হলে ওদের জন্য।'

'আপনার নজর বেশ চোখা,' হাসল হেণ্ডারসন। 'স্ক্রিনের দিকে তাকান, ডাইভারদের কাজ দেখতে পাবেন।'

মাঝখানের বড় পর্দায় গোস্ট সিটির একটা কলাম ফুটে উঠেছে। নীচের দিকে আলোড়ন উঠল, পরমুহূর্তে মুন-সুট পরা একজন ডুবুরিকে উপরদিকে উঠে আসতে দেখা গেল—পায়ের তলার ভার্টিক্যাল থ্রাস্টার ব্যবহার করছে। পিছু পিছু আরও কয়েকজন উঠে এল। সবার হাতে মোটা রাবারের হোস আর মেকানিক্যাল ম্যানিপুলেটর শোভা পাচ্ছে।

কলামের একদম মাথায় গিয়ে নামল ডুবুরি-দল। মৌমাছি যেভাবে মধু সংগ্রহ করে, সেভাবে কী যেন তুলতে শুরু করেছে হোসের সাহায্যে।

'কী করছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'আমি জানি,' বলে উঠল জয়েস। 'ভেন্টের মাথার মাইক্রোব কলোনি থেকে বায়ো-অর্গানিজম সংগ্রহ করছে।'

'ঠিক ধরেছেন,' সায় দিল হেণ্ডারসন। 'পুরো কলোনিই তুলে আনছে ওরা। হোসের মাধ্যমে লিভিং অর্গানিজম আর ওখানকার লিকুইড টেনে আনা হচ্ছে আমাদের হোল্ডিং ট্যাঙ্কে।'

'বলতে চাইছেন, এটা একটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন?' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া।

'নট এগজ্যাক্টলি। দেখতে থাকুন।'

দু'জন ডুবুরিকে রেখে বাকিরা নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। ওরা নীচে নেমে পুরো কলামটাই কেটে ফেলতে শুরু করল বৈদ্যুতিক করাতের সাহায্যে।

'মাই গড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জয়েস। 'কলামটা ধ্বংস করছেন আপনারা! কেন?'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে গার্ডের দিকে তাকাল হেণ্ডারসন, মেরিন বায়োলজিস্টের প্রতিক্রিয়া দেখে না জানি ব্যাটা কী করে বসে! কিন্তু লোকটা অলস ভঙ্গিতে এককোণে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়েছে। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। স্বস্তি অনুভব করল হেণ্ডারসন। ইশারায় পাশের একটা দরজা দেখাল গার্ডকে, ওখানে যেতে চায়। হাত নেড়ে অনুমতি দিল লোকটা, চেয়ার ছেড়ে উঠল না।

দরজা পেরিয়ে নতুন একটা কামরায় তিন বন্দিকে নিয়ে এল হেণ্ডারসন। বেশ বড়, ভিতরে অনেকগুলো বৃত্তাকার চৌবাচ্চা দেখা যাচ্ছে।

'এখানে কথা বলতে পারি আমরা,' বলল সে। 'ওগুলো আমাদের স্টোরেজ ভ্যাট—বায়োলজিক্যাল ম্যাটেরিয়েল রাখা হয়।'

'হোল্ডিং ক্যাপাসিটি তো বিশাল!' মন্তব্য করল তানিয়া।

'ন্যাচারাল হ্যাবিটাট থেকে সরিয়ে আনার পর অর্গানিজমগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন,' বলল হেণ্ডারসন। 'সেজন্যেই কলাম কেটে আনছি আমরা, পরিবেশটা অক্ষত রাখার জন্য। তারপরও যা সংগ্রহ করি, তার খুব সামান্য পরিমাণ পৌঁছাতে পারি মেইনল্যাণ্ডে।'

'কোথায় সেটা?'

'একটা দ্বীপে। ওখানে একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে। আমাদের সংগ্রহ করা স্পেসিমেনগুলো প্রসেস করা হয়। কিছুদিন পর পর গিয়ে সবকিছু আনলোড করে আসি আমরা।'

'দ্বীপটার লোকেশন জানেন?'

'উঁহুঁ। সেটা গোপন রাখা হয়েছে আমাদের কাছ থেকে।' খোলা দরজা দিয়ে গার্ডকে উঠে দাঁড়াতে দেখল হেণ্ডারসন। 'দুঃখিত, আলোচনার সমাপ্তি এখানেই টানতে হচ্ছে। আমাদের বেবিসিটার অধৈর্য হয়ে উঠেছে কিনা! চলুন ফিরি।'

'দাঁড়ান!' খপ্ করে তার হাত ধরল আসিফ। 'দ্বীপটা সম্পর্কে যা জানেন, বলুন। ওটাই হয়তো আমাদের পালানোর একমাত্র সুযোগ।'

'পালাবেন?' মুখ বাঁকাল হেণ্ডারসন। 'অসম্ভব! কোনও আশা নেই।'

'আমি এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই।'

'দ্বীপটা দেখলে হাল-বৈঠা... সবকিছুই ছেড়ে দেবেন আপনারা।'

'কেন? কী আছে ওখানে?'

তিক্ত হাসি ফুটল হেণ্ডারসনের ঠোঁটে। 'জীবন্ত দুঃস্বপ্ন... যা পৃথিবীর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।'

দুই

শ্যাতো বুভারির দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখতে দেখতে নির্মাতাদের প্রতি আশ্চর্য এক শ্রদ্ধা অনুভব করল মাসুদ রানা। কতশত বছর আগে বানানো হয়েছে কে জানে, কিন্তু একবিন্দু খুঁত নেই কোথাও। রক্তপিপাসু শত্রুদেরকে তো ঠেকাবেই, সেই সঙ্গে ভিতরের কাউকেও বাইরে যেতে দেবে না এ-প্রাচীর।

'কী বুঝছ?' পাশ থেকে প্রশ্ন করল লুনা পারসেল।

'অ্যালকাট্রায কারাগার যদি দ্বীপের বদলে মেইনল্যাণ্ডে বানানো হতো, তা হলে বোধহয় এমনই দেখাত।'

'আমরা তা হলে কী করব?'

লুনার কনুইয়ের ভাঁজে নিজের হাত ঢোকাল রানা। 'যেভাবে বেড়াচ্ছিলাম, বেড়াব।'

বেরুনোর পথ বন্ধ, সেইসঙ্গে নিজেদের গাড়িটা গায়েব হয়ে যেতে দেখে আঙিনার চারধারে ঘুরতে শুরু করেছে ওরা। মনের ভিতরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চেহারায় ফুটতে দিচ্ছে না, আচরণ করছে বেড়াতে আসা একজোড়া কপোত-কপোতীর মতই। মাঝে মাঝে থামছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, ফেটে পড়ছে উচ্ছ্বাসে। শত্রুরা বুঝুক, বন্দিদশা নিয়ে ওরা মোটেই ঘাবড়াচ্ছে না।

অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীরের উপর নজর বোলাচ্ছে রানা—কোথাও যদি একটু দুর্বলতা পাওয়া যায়... যদি পালাবার একটা উপায় পাওয়া যায়! কিন্তু অল্পক্ষণেই ও বুঝতে পেরেছে, পুরনো আমলের কারিগরদের খাটো করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। শত শত বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের কীর্তি অম্লান হয়ে আছে উঁচু, ভীমদর্শন দেয়ালের চেহারা নিয়ে। কিছুতেই তা পেরুনো সম্ভব নয়।

প্রাচীরের উপরের ব্যাটলমেন্টে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে কয়েক জায়গায়। কিন্তু সবগুলোর মুখই গ্রিলের দরজা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা টের পেয়ে মুখ কালো হয়ে গেল লুনার। বলল, 'মনে হচ্ছে ডানা ছাড়া দেয়াল টপকানো যাবে না।'

'আমার ডানাদুটো বাড়িতে ফেলে এসেছি,' রসিকতার সুরে বলল রানা। 'কাজেই ওড়ার চিন্তা বাদ দিতে হচ্ছে।'

'ঠাট্টা করছ?'

'হ্যাঁ। যা সম্ভব নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? অন্য কোনও বুদ্ধি বের করতে হবে। চলো, ভিতরে ফিরে যাই।'

সদর দরজার সামনে ফিলিপ বুভারির দেখা পাওয়া গেল। এক গাল হাসি দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন আমাদের শ্যাতো?'

'চমৎকার! আজকাল তো এমন জিনিস চোখেই পড়ে না,' প্রশংসা করল রানা। 'একটা কথা... আমাদের গাড়িটা দেখলাম না কোথাও। ব্যাপার কী?'

'ওহ্, দুঃখিত। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। অন্যান্য গেস্টদের গাড়ি রাখার জন্য জায়গাটা খালি করতে হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো রানার—গাড়ির চাবি পেয়েছ কোথায়? কিন্তু করল না। এখুনি সংঘাতে জড়ানো ঠিক হবে না। ও শুধু বলল, 'আশা করি ফেরার সময় ফেরত পাবো ওটা?'

'ছি! ছি! এ কেমন কথা? আপনার গাড়ি... যখন যাবেন, অবশ্যই নিয়ে যাবেন ওটা। ট্যাঙ্কে ফুয়েলও ভরে দেয়া হবে। ইয়ে... বিনা অনুমতিতে গাড়ি সরানোয় আপনি কিছু মনে করেননি তো?'

'উঁহুঁ, আপনারা না সরালে তো আমাকেই সরাতে হতো।'

'শুনে খুশি হলাম। আসুন ভিতরে। গেস্টরা একটু পরেই এসে যাবে। আপনারা ফ্রেশ হয়ে পোশাক পাল্টে নিন।'

শ্যাতোর পিছনের অংশে, চওড়া একটা সিঁড়ি ধরে ওদেরকে দোতলায় নিয়ে গেল ফিলিপ। বিশাল এক বারান্দা আছে ওখানে, লাগোয়া দুটো গেস্ট রুম। নামে রুম হলেও আসলে ওগুলো স্যুইট—বেডরুম আর সিটিং এরিয়া রয়েছে আলাদাভাবে। এ ছাড়া আছে অ্যাটাচড্ বাথ। পুরো অভ্যন্তর মার্বেল পাথর আর দামি কার্পেট দিয়ে মোড়ানো। দেয়ালে গিল্টি করা সোনালি কারুকাজ। পছন্দ হলো না রানার, সৌন্দর্যের চেয়ে অতিথিদের সামনে বাড়ির মালিকের টাকার গরম দেখাতেই এতসব করা হয়েছে।

বিছানার উপর পার্টির কস্টিউম বিছিয়ে রাখা হয়েছে। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে নিল রানা, তারপর গায়ে চড়াল পোশাকটা। ফিটিং মন্দ হয়নি, শুধু কাঁধের কাছটা একটু টান টান হয়ে আছে। আয়নায় নিজেকে দেখল ও, তারপর রুম থেকে বেরিয়ে লুনার দরজায় টোকা দিল।

পাল্লা ফাঁক করে শুধু মাথা বের করল লুনা। রানাকে দেখেই ফেটে পড়ল হাসিতে। বলল, 'মাদাম বুভারির সেন্স অভ হিউমারকে ছোট করে দেখেছি। অত্যন্ত রসিক মানুষ তিনি!'

সাদা-কালো চেক-কাটা একটা ভাঁড়ের পোশাক দেয়া হয়েছে রানাকে। মাথায় চোঙার মত টুপি, তাও একই রকম। খুবই হাস্যকর দেখাচ্ছে ওকে।

লুনার মন্তব্যে বিব্রত হলো না রানা। বলল, 'স্কুলের টিচাররা সবসময় আমাকে ক্লাসের ভাঁড় বলতেন। মনে হচ্ছে ওঁদের কথা এতদিনে হাতেনাতে ফলে গেছে।'

'এক্কেবারে!'

'তোমার কী দশা, দেখতে পারি?'

দরজা খুলে ধরল লুনা, রানা ভিতরে ঢুকতেই মোহনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল ওর সামনে। জিমন্যাস্ট এবং ব্যালে নর্তকীদের মত একটা কালো রঙের ওয়ান-পিস স্কিনটাইট পোশাক পরেছে ও—শরীরের প্রতিটা বাঁক... প্রতিটা উত্থান-পতন বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। পায়ে পশমি স্লিপার, হাতে পশমি গ্লাভস্। মাথায় রয়েছে একটা হেডব্যাণ্ড, তাতে ছুঁচালো দুটো কান উঁচু হয়ে আছে।

'কেমন দেখাচ্ছে?' জানতে চাইল লুনা।

'মিঁয়াও!' নাকি সুরে বেড়ালের ডাক নকল করল রানা।

হেসে উঠল লুনা।

ঠিক তখুনি দরজায় উদয় হলো বাটলার ভ্যাসিলি। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। মাদাম বুভারি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদেরকে ককটেল আর ডিনারের জন্য আর্মারিতে নিয়ে যেতে।'

কথা বলার ফাঁকে লুনার উপর লোভী দৃষ্টি বোলাচ্ছে লোকটা। চকিতের জন্য রানার দিকে তাকাল, পরমুহূর্তে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁটদুটো। ভ্যাসিলিকে পছন্দ হলো না রানার। বাটলারসুলভ কোনও গুণই দেখতে পাচ্ছে না ওর মধ্যে, তারচেয়ে ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবেই ব্যাটা বেশি মানানসই।

ভেলভেটের দুটো মুখোশ পরে নিল রানা-লুনা। তারপর অনুসরণ করল ভ্যাসিলিকে। একটু পরেই কোলাহলে মুখর আর্মারিতে প্রবেশ করল ওরা। রঙ-বেরঙের কস্টিউম পরে

বিশ-পঁচিশজন নারী-পুরুষ জমায়েত হয়েছে ওখানে। এককোণে বার স্থাপন করা হয়েছে, সেখান থেকে ক্যাভিয়ার আর শ্যাম্পেন নিয়ে ভিড়ের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে টাক্সিডো-পরা কয়েকজন ওয়েইটার—চেহারা-সুরতে ভ্যাসিলির ক্লোন বলা যায় ওদেরকে। ইঁদুরের সাজ নিয়ে একদল মিউজিশিয়ান হালকা সঙ্গীত পরিবেশন করছে।

ড্রিঙ্কের দুটো গ্লাস নিল রানা—নিজে একটা রেখে লুনার হাতে তুলে দিল অন্যটা, তারপর ভাল একটা জায়গা বেছে অবস্থান নিল। সবার উপর নজর রাখার ইচ্ছে। পুরুষ আর মহিলার সঠিক সংখ্যা বোঝা গেল না, কস্টিউমের কারণে তাদের চেহারা আর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়ে গেছে।

পার্টির থিম অনুমান করার চেষ্টা করছিল রানা, এমন সময় কালো পাখির বেশে লম্বা-চওড়া একজন মানুষ এগিয়ে এল। মদ্যপানে মাতাল, সারা শরীর দুলছে। জড়ানো গলায় ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, 'ওয়ানস্ আপন আ মিডনাইট ড্রিয়ারি... ধ্যাত্, এরপর যেন কী?'

লাইনটা চিনতে পারল রানা। দ্রুত বলে দিল পরেরটুকু। 'হোয়াইল-আই পণ্ডারড্, উইক অ্যাণ্ড ওয়্যারি...'

ডানা-সদৃশ দু'হাতে তালি দিয়ে উঠল কালো পাখি। পাশ দিয়ে একজন ওয়েইটারকে যেতে দেখে ছোঁ মেরে তুলে নিল মদের গ্লাস। তাতে চুমুক দেয়ার জন্য সরিয়ে ফেলল পাখির মুখোশ। থলথলে একটা চেহারা বেরিয়ে এলো। মাঝবয়েসী।

'কাব্যমনা আরেকজনের দেখা পেয়ে খুশি হলাম,' জড়ানো গলায় বলল আগন্তুক। 'আপনার পরিচয়?'

নাম বলল রানা, লুনাকেও পরিচয় করিয়ে দিল।

হাত মিলিয়ে লোকটা বলল, 'আজকের অনুষ্ঠানের জন্য আমার নাম *নেভারমোর*। তবে অন্য সময়ে... মানে যখন অ্যালান

পো-র বিষণ্ণ পাখি সেজে থাকি না, তখন লোকে আমাকে ওয়ালটন বলে ডাকে। লর্ড ওয়ালটন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুরবস্থা বুঝতেই পারছেন, আমার মত একটা মানুষকে নাইট বানিয়ে দিয়েছে!' মাতলামির তোড়ে এলোমেলো কথা বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। 'মাফ করবেন, আমার গ্লাস খালি হয়ে গেছে। আরেকটা ড্রিঙ্ক দরকার।'

শব্দ করে ঢেঁকুর তুলে বারের দিকে চলে গেল ওয়ালটন। পার্টির থিম পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। এডগার অ্যালান পো! বিখ্যাত লেখকটির বিভিন্ন চরিত্রের সাজ নিয়েছে সবাই। লুনাকে বানানো হয়েছে *দ্য ব্ল্যাক ক্যাট*-এর কালো বেড়াল, ও হয়েছে *দ্য কাস্ক অভ অ্যামণ্টিলাডো*-র হতভাগ্য ভাঁড়।

অন্যান্য অতিথিদের উপর নজর বোলাল রানা। লাশের মত সাজ নিয়েছে এক মহিলা—পরনে ময়লা, রক্তমাখা বিয়ের পোশাক। *দ্য ফল অভ দ্য হাউস অভ আশার।* আরেক মহিলার পোশাকে হাজারো পিতলের ঘণ্টা। *দ্য বেল।* বনমানুষের সাজে বারে হেলান দিয়ে মার্টিনি খাচ্ছে এক লোক। *দ্য মার্ডারস্ ইন দ্য রু মর্গ।* পাশে দাঁড়ানো লোকটির বুকে শোভা পাচ্ছে একটা বিশাল পোকা। *দ্য গোল্ড বাগ।*

অ্যালান পো-র প্রতিটি লেখাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভায়োলেন্স আর বীভৎসতার উপকরণ। মাদাম বুভারি মনে হচ্ছে দুটোরই ভক্ত। কিন্তু কোথায় সে?

হঠাৎ থেমে গেল সঙ্গীত। ঝট্ করে খুলে গেল আর্মারির দরজা। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কলরব। দীর্ঘাঙ্গিনী একটা মূর্তি উদয় হয়েছে প্রবেশপথের সামনে। লর্ড ওয়ালটনের হাত থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাস পড়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল সে, 'মাই গড!' নিজের অজান্তেই সবাই পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

ভয়ঙ্কর দৃশ্য। দরজায় দাঁড়ানো মহিলাটিকে দেখে মনে হচ্ছে,

এইমাত্র কবর থেকে উঠে এসেছে সে। জিন্দালাশ! গায়ের গাউনে কাদামাটির আস্তর, মুখোশটা প্রায়-নিখুঁত, যেন খুলির গায়ে সেঁটে আছে চামড়া, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। অক্ষিকোটরের গভীরে বসে গেছে চোখদুটো।

যেন বাতাসে ভেসে রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল জিন্দালাশ। থামল, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সবার দিকে। তারপর হাততালি দিয়ে খনখনে গলায় বলল, '*মাস্ক অভ রেড ডেথ*-এ স্বাগতম! প্লিজ, উপভোগ করুন সময়টা। কারণ লাল মৃত্যু যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অত্যন্ত মূল্যবান।'

নার্ভাস হাসি ফুটল অতিথিদের মুখে। আইরিন বুভারিকে চিনতে পেরেছে। বাজনা শুরু হয়ে গেল আবার। ওয়েইটাররা ঘুরতে শুরু করল খাবার আর ড্রিঙ্কের ট্রে নিয়ে।

রানা ভেবেছিল অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবে মাদাম বুভারি, কিন্তু তা না করে সোজা ওর দিকেই এগিয়ে এল মহিলা। মুখ থেকে মুখোশ খুলে হাসল। বলল, 'ভাঁড়ের পোশাকে আপনাকে দেখি চমৎকার মানিয়েছে, মসিয়ো রানা!' কণ্ঠে বিদ্রূপের ছোঁয়া।

'ধন্যবাদ, মাদাম বুভারি,' বলল রানা। পাল্টা খোঁচা মারল। 'কোনও মহামারীর এমন জীবন্ত রূপ আমিও আগে দেখিনি।'

ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল মাদাম বুভারির। 'কথার মারপ্যাঁচ ভাল জানেন আপনি।' লুনার দিকে তাকাল। 'কালো বেড়াল হিসেবে আপনাকেও দারুণ লাগছে, মাদমোয়াজেল দুঁমো।'

'ধন্যবাদ, মাদাম,' হাসল লুনা। 'কথা দিচ্ছি, আপনার মিউজিশিয়ানদের খেয়ে ফেলব না। ইঁদুর আমার যতই পছন্দ হোক না কেন।'

ঈর্ষার দৃষ্টিতে লুনাকে দেখছে মাদাম বুভারি। নিজের ফেলে আসা যৌবনের সঙ্গে তুলনা করছে যেন। বলল, 'চাইলেও

পারবেন না। ওরা রাক্ষুসে ইঁদুর।' রানার দিকে ফিরল। 'পোশাক বাছাই করার সুযোগ দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। ভাঁড় সাজতে আপনার খারাপ লাগছে না তো?'

'মোটেই না,' মাথা নাড়ল রানা। 'রাজসভার ভাঁড়েরা এককালে যথেষ্ট খাতির পেত। রাজাকে পরামর্শ দিত ওরাই। হাসির পাত্র সাজতে আপত্তি নেই আমার, সত্যি সত্যি না বানালেই চলে।'

'বিয়েন,' হেসে বলল মাদাম বুভারি। চোখ চলে গেল প্রবেশপথের দিকে। 'এই তো, আমার *প্রিন্স প্রসপেরো* এসে পড়েছে।'

আঁটোসাঁটো পাজামা আর বেগুনি ভেলভেটের টিউনিক পরা একজনকে ঢুকতে দেখা গেল আর্মারিতে। কাছে এসে টুপি আর মুখোশ খুলে ফেলল। ফিলিপ বুভারি। বাউ করে বলল, 'তোমার এন্ট্রান্সের তারিফ শুনছি সবখানে, মা। অতিথিদের নাকি বুকে কাঁপন তুলে দিয়েছ?'

'ঠিকই শুনেছ,' বলল মাদাম বুভারি। 'এ-পার্টির কথা ভুলতে পারবে না ওরা। তুমি যাও, ওদের সবার সঙ্গে কথা বলো। আমি আসছি একটু পরে।'

আবার বাউ করে চলে গেল ফিলিপ।

'ইন্টারেস্টিং লোকজন দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা, ভিড়ের উপর দৃষ্টি বোলাচ্ছে। 'সবাই কি আপনার প্রতিবেশী?'

'উঁহুঁ,' মাদাম বুভারি মাথা দোলাল। 'এদের বেশিরভাগই বিভিন্ন অস্ত্র-ব্যবসায়ী পরিবারের অংশ। অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ আর বিত্তের প্রতিনিধিত্ব করছে এরা, যার পুরোটাই গড়ে উঠেছে মৃত্যু আর ধ্বংসের উপর ভর করে। ওদের পূর্বপুরুষরা তীর-ধনুক আর বর্শা থেকে শুরু করে কামান আর বোমা পর্যন্ত সব ধরনের অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, ওদের অস্ত্রেই খুন হয়েছে

লক্ষ-কোটি মানুষ, তছনছ হয়ে গেছে পৃথিবীর অনেক দেশ-জাতি। এমন একটা সমাবেশে অংশ নিতে পারা যে-কারও জন্য ভাগ্যের ব্যাপার।'

'উল্টো মনোভাব পোষণ করলে আশা করি আপনি অপমানিত হবেন না।'

তাচ্ছিল্য ফুটল মাদাম বুভারির ঠোঁটে। 'আপনাকে দোষ দিই না। নাচ-গানে মশগুল এই গর্দভগুলোকে দেখে শ্রদ্ধা অনুভব করা সত্যি কঠিন। বাপ-দাদাদের রক্ত আর ঘাম ঝরানো টাকায় ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে ওরা। এককালের মহা-পরাক্রমশালী কোম্পানি আর কার্টেলগুলো এখন স্টক একচেঞ্জের নামমাত্র কর্পোরেশন ছাড়া আর কিছু নয়। কেন ভয় করবেন ওদের? কেন সম্মান দেখাবেন?'

'লর্ড ওয়ালটনও কি ওদের দলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আরও খারাপ অবস্থা। পরিবারের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর। বিশ্বাস করা কঠিন, এককালে ফর্জড্ স্টিলের রহস্য ওরা ছাড়া আর কেউ জানত না। একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ওদের। পরে অবশ্য ফর্মুলাটা চুরি করে আনি আমরা।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুভারিদের ক্ষয় নেই,' মন্তব্য করল রানা।

'তা বলছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'সামাজিক এবং পারিবারিক অবক্ষয় হলো চিরন্তন সত্য, কেউ তা এড়াতে পারে না। কিন্তু চোখের সামনে পরিবারের অধঃপতনও সহ্য করতে পারব না। তাই যতদিন বেঁচে আছি, *স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ*-এর নিয়ন্ত্রণ ছাড়ছি না আমি।'

'চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না,' বলে উঠল লুনা।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। চোখের তারায় আগুন জ্বলছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বললেন

আপনি?'

থতমত খেয়ে গেল লুনা। কথাচ্ছলে যা বলেছে, তার জন্য এমন প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। কোনোমতে বলল, 'না... মানে... বলছিলাম যে, কেউই অমর নয়। কতদিনই বা আর পরিবারকে রক্ষা করতে পারবেন আপনি?'

'মানুষ মরণশীল, তা আমি জানি, মাদমোয়াজেল দুঁমো,' বলল মাদাম বুভারি। 'তবে কথা হলো, কেউ তাড়াতাড়ি মরে, কেউ বেঁচে থাকে বহুদিন। নিশ্চিত থাকুন, খুব শীঘ্রি বুভারিদের পতন ঘটছে না। শৌর্য-বীর্য নিয়ে আরও শত শত বছর টিকে থাকব আমরা।' কথাটা বলে একটু যেন শান্ত হলো সে। 'মাফ করবেন, বাকি গেস্টদের কাছে যেতে হয় এবার। অপেক্ষা করুন আপনারা, একটু পরেই ডিনার সার্ভ করা হবে।'

বীভৎস মুখোশটা পরে চলে গেল মহিলা। রানাকে জিজ্ঞেস করল লুনা, 'কী ঘটল, বলো তো? আমার কথায় উনি এমন খেপে গেলেন কেন?'

'স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছ হয়তো,' বলল রানা। 'বুড়িয়ে যাবার কথা শুনতে চান না ভদ্রমহিলা। বয়সকালে নিশ্চয়ই অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। আমিও হয়তো প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'অনুভূতিহীন একটা লাশকে ভালবাসতে পারতে?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

হাসল রানা। 'ওরে বাবা! বেড়াল দেখি নখের আঁচড় কাটে!'

'আমার নখ যে কত ধারালো, তা এখনও টের পাওনি তুমি।' শ্রাগ করল লুনা। 'যাক গে... তোমার খবর জানি না, তবে আমি ভীষণ বোর ফিল করছি।'

নতুন একদল ভৃত্যকে কামরায় ঢুকতে দেখল রানা। ডজনখানেক রুক্ষ চেহারার লোক... নিঃশব্দে অবস্থান নিল

আর্মারির প্রতিটি প্রবেশপথের সামনে।

'ধৈর্য ধরো,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'আমার ধারণা, পার্টির আসল মজা শুরু হতে যাচ্ছে এবার।'

তিন

পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেছে লর্ড ওয়ালটন। কাকের মুখোশটা তুলে রেখেছে মাথার উপর, যাতে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে অসুবিধে না হয়। মধ্যযুগীয় স্টাইলে আয়োজন করা ডিনারের পুরো সময় ধরে সে পানির মত মদ গিলেছে। খাবার-দাবার চিবোয়নি বলতে গেলে, মদের স্রোতের সঙ্গে ঢুকিয়েছে পেটের ভিতর। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। রানা আর লুনা খেয়েছে খুব কম, ভদ্রতা বজায় রেখে। ড্রিঙ্ক করেছে খুব সামান্য, যাতে নেশা না হয়।

ডেজার্টের ডিশ সরিয়ে নেয়া হতেই উঠে দাঁড়াল ওয়ালটন। হাতের গ্লাসে টুনটুন করে টোকা দিল চামচ দিয়ে, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। জড়ানো গলায় বলল, 'একটা টোস্ট অফার করতে চাই আমাদের মেজবানের উদ্দেশে।'

গ্লাসে পাল্টা টোকা দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল বাকি অভ্যাগতরা।

উৎসাহ পেয়ে হাসল ওয়ালটন। 'আপনারা সবাই জানেন, ওয়ালটন আর বুভারি পরিবারের উৎস অনেকদিনের পুরনো।

আপনারা নিশ্চয়ই এ-ও জানেন, বুভারিরা ওয়ালটনদের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল ফর্জড্ স্টিল তৈরির ফর্মুলা। তাতে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে ওরা... আর আমরা হারিয়ে গেছি বিস্মৃতির অতলে।'

'যুদ্ধের ফসল,' গ্লাস উঁচু করে বলল রু মর্গের বনমানুষ।

'সেটা ভেবে পান করতে রাজি আছি আমি,' বলল ওয়ালটন। চুমুক দিল নিজের গ্লাসে। তারপর খেই ধরল কথার। 'দুর্ভাগ্য, কিংবা সৌভাগ্যক্রমে কখনও বুভারিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইনি আমরা, কারণ অকালে প্রাণ হারানোর একটা বাজে অভ্যাস আছে বুভারিদের।'

'ভালবাসার ফসল,' ঘণ্টিঅলা মহিলা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল অতিথিরা।

সবাই চুপ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওয়ালটন। তারপর বলল, 'আমার সন্দেহ আছে, ভালবাসা নামক শব্দটা এ-বাড়িতে কখনও উচ্চারিত হয়েছে কি না। তবে তা নিয়ে বুভারিদের কোনও মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। ভাল তো যে কেউ বাসতে পারে, কিন্তু ক'টা পরিবারের সাধ্য আছে একার চেষ্টায় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বাধানোর?'

আচমকা নীরব হয়ে গেল সবাই। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাদাম বুভারির দিকে। টেবিলের মাথায় একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে বসে আছে সে, পাশে ফিলিপ। মুখে একটা মেকি হাসি ঝুলছে, কিন্তু ওয়ালটনের কথা শুনে ক্রোধ ফুটে উঠল চোখের তারায়।

'বাড়িয়ে বলা লর্ড ওয়ালটনের অভ্যাস,' কণ্ঠ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল মহিলা। 'বুভারি পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলছেন উনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পিছনে বহু কারণ ছিল—লোভ, নির্বুদ্ধিতা, ঔদ্ধত্য, দম্ভ... আরও কত কী! ভুললে চলবে না, এখানে উপস্থিত প্রতিটা পরিবারই

যুদ্ধটা উস্কে দেয়ায় ভূমিকা রেখেছিল।'

গা জ্বালানো ভঙ্গিতে হাসল ওয়ালটন। 'যেখানে কৃতিত্ব পাওনা, সেখানে কৃতিত্ব নাও, মাই ডিয়ার আইরিন! হ্যাঁ, সে-আমলের সমস্ত সংবাদপত্র আমাদের কথায় উঠত-বসত; অসৎ রাজনীতিকদেরও ঘুষ দিয়েছিলাম আমরা যুদ্ধটার ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু বুভারি পরিবার ছিল কয়েক কাঠি সরেস, গ্র্যাণ্ড ডিউক ফার্দিনান্দকে খুনের জন্য টাকার জোগান দিয়েছিল ওরা। ওই হত্যাকাণ্ডই পুরো দুনিয়াকে জড়িয়ে ফেলেছিল রক্তক্ষয়ী এক লড়াইয়ে। থিয়োডর বুভারি যে পরিকল্পনাটার বিপক্ষে ছিল, সে-গুজব আমরা সবাই শুনেছি। সম্ভবত সেজন্যেই অকালে দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে তাকে।'

'ওয়ালটন!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল মাদাম বুভারির কণ্ঠ।

কিন্তু কথায় পেয়ে বসেছে ইংরেজ লর্ডকে। মদে চুমুক দিয়ে সে বলল, 'আপনারা যা জানেন না, তা হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পিছনেও দারুণ কারিশমা রয়েছে বুভারিদের। জনৈক অস্ট্রিয়ান কর্পোরালের রাজনৈতিক উত্থানের পিছনে সমস্ত খরচ দিয়েছিল ওরা, জাপানি ইম্পেরিয়াল আর্মি-কেও ঘুষ দিয়েছিল আমেরিকা আক্রমণের জন্য। তবে সেবারের বিনিয়োগ খুব একটা লাভজনক হয়নি বলে ব্যাপারটা চেপে গেছে ওরা। আমেরিকা ওদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে টের পেয়ে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের কারখানায় বোমাবর্ষণ করেছিল। অবশ্য তাতে কী এসে যায়? আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে আবারও পুরনো অবস্থানে ফিরে এসেছে ওরা। ওই যে... কী যেন বললেন... হ্যাঁ, যুদ্ধের ফসল।'

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে লাইব্রেরির ভিতরে।

এক টানে মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলল মাদাম বুভারি। রাগ আর ক্রোধে চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দেখে মনে হলো,

পারলে খালি হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে উদ্ধত লর্ডকে।

'ওয়ালটন, যথেষ্ট বলেছ,' বলে উঠল একজন অতিথি। 'এবার বসো।'

এই প্রথম মাদাম বুভারির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল ওয়ালটন। কুঁকড়ে গেল সে। বুঝতে পারছে, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ঠোঁট থেকে হাসি অদৃশ্য হলো তার, থেমে গেল মাতলামি। বোকার মত চাইল এদিক-সেদিক, তারপর বসে পড়ল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মাদাম বুভারি। যেন কুণ্ডলী খুলে খাড়া হলো একটা সাপ। ওয়ালটনের উপর থেকে দৃষ্টি ফেরাল না। বলল, 'চমৎকার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ, যদিও ওতে সত্যের লেশমাত্র নেই।' গ্লাস উঁচু করল সে। 'তাই নতুন একটা টোস্ট অফার করছি আমি। আসুন, ওয়ালটন পরিবারের হারানো সম্মানের উদ্দেশে পান করি।'

মৃদুস্বরে সায় জানাল অতিথিরা, ড্রিঙ্কে চুমুক দিল।

লর্ড ওয়ালটনের চেহারা ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। কোনোমতে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'মাফ করবেন, আমি উঠব। শরীর ভাল লাগছে না, সম্ভবত বদহজম হয়েছে।'

তাড়াহুড়ো করে আসন ছাড়ল সে। টলমল পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ছেলের দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। 'ওঁকে সাহায্য করো। পা পিছলে পরিখায় পড়ে গেলেও আমাদেরকে দুষবে।'

কথাটা শুনে হেসে উঠল সবাই। কিন্তু রানা গম্ভীর রইল। কেন যেন মনে হচ্ছে, নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করেছে ইংরেজ লর্ড।

ওর দিকে ঝুঁকল লুনা। 'কিছু বুঝতে পারছ?'

'হুঁ,' নিচু গলায় বলল রানা। 'নিজেদের নোংরা অতীত নিয়ে

ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করে না বুভারিরা। জনসমক্ষে তো নয়ই।'

ছেলের কানে কানে কী যেন বলল মাদাম বুভারি। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল ফিলিপ। বাটলার ভ্যাসিলিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল আর্মারি থেকে। ফিরে এল দশ মিনিট পরে। একা। রানা আর লুনার দিকে তাকিয়ে মায়ের কানে ফিসফিসাল। জবাবে মৃদু মাথা ঝোঁকাল মাদাম বুভারি। চেহারা নির্বিকার। তবে কী ঘটেছে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ওদের দুজনের নাম উচ্চারণ করেছে ফিলিপ। তারমানে ওয়ালটনের পরোয়ানায় ওদেরকেও যুক্ত করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল ভ্যাসিলি। তাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল ফিলিপ। হাততালি দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, প্রিন্স প্রসপেরোর পক্ষ থেকে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-লগ্নে বিশেষ এক চমকের আয়োজন করা হয়েছে।'

বাটলারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল সে। জ্বলন্ত একটা মশাল তুলে দেয়া হলো তার হাতে। টিউনিকের ভিতর থেকে বড় একটা চাবি বের করল ফিলিপ, তারপর আর্মারির পিছনদিকে চলে গেল। গুপ্ত এক দরজা খুলে গেছে ওখানে, ওপাশে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার পাতালে। গুমোট গন্ধ পাওয়া গেল।

'সাহস থাকে তো আমাকে অনুসরণ করুন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল ফিলিপ। নেমে গেল সিঁড়িতে।

হাসাহাসি করতে করতে ওর পিছু নিল অতিথিরা। লুনাও এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে বাধা দিল রানা।

'যেয়ো না,' বলল ও। 'ভাব দেখাও, যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছ।'

'হতে পারলে মন্দ হতো না,' বলল লুনা। 'ঘাড়ের কাছটা শিরশির করছে। মনে হচ্ছে ওখানে গেলে বিপদে পড়ব।'

'অভিনয় করো।'

সুযোগ পেল না লুনা, তার আগেই ওদের সামনে এসে দাঁড়াল মাদাম বুভারি। বলল, 'আমাকে যেতে হচ্ছে। দুঃখিত, আপনাদের সঙ্গে ভালমত আলাপ-পরিচয় হলো না।'

'আমিও দুঃখিত,' বলল রানা। 'লর্ড ওয়ালটনের বক্তৃতা শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছি কি না!'

'বনেদি পরিবারগুলোর নামে গুজব ছড়াতে ভালবাসে লোকে। ওতে কান না দিলেই ভাল করবেন।' লুনার দিকে ফিরল মাদাম বুভারি। 'আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে আমাদের পরিবারের একটা জিনিস রয়ে গেছে।'

'কীসের কথা বলছেন?' ভুরু কোঁচকাল লুনা।

'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই,' চেহারায় কাঠিন্য ভর করেছে মাদাম বুভারির। 'আমি জানি, আপনিই লুনা পারসেল। হেলমেটটা আপনার কাছেই আছে।'

'তারমানে জঘন্য ওই লোকটাকে আপনি পাঠিয়েছিলেন আমার অ্যাপার্টমেন্টে?'

'গ্যাস্টন? না, ও আমার ছেলের পোষা কুকুর। জেনে খুশি হবেন, ব্যর্থতার উপযুক্ত শাস্তি পেতে চলেছে সে। আপনিও রেহাই পাচ্ছেন না। আমাদের পরিবারের সম্পদ কোথায় লুকিয়েছেন, তা বের করে ছাড়ব। মসিয়ো রানা, আপনাকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। কাজেই বিদায়!'

'আশা করি আবার দেখা হবে,' হাসিমুখে বলল রানা।

শীতল দৃষ্টি ফুটল মাদাম বুভারির চোখে। 'আমার তা মনে হয় না।'

উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে। দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে গেল আর্মারি থেকে।

রানা-লুনার দিকে এগিয়ে এল ভ্যাসিলি। মুখে কুটিল হাসি।

বলল, 'চলুন। মসিয়ো ফিলিপ অনেক আয়োজন করেছেন আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য। সেগুলো দেখতে না গেলে মনে খুব কষ্ট পাবেন।'

'ওঁর মনে কষ্ট দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমাদের,' হালকা সুরে বলল রানা।

আরেকটা মশাল জ্বালল ভ্যাসিলি, ওদেরকে ইশারা করল এগোতে। দ্রুত পা চালিয়ে অতিথিদের মিছিলে যোগ দিল রানা আর লুনা। ভ্যাসিলি থাকল পিছনে, যাতে ওরা অন্য কোথাও যেতে না পারে।

পাথুরে সিঁড়ি পেরিয়ে ছ'ফুট চওড়া একটা প্যাসেজে নেমে এল মিছিল। পরিবেশটা ভীতিকর, ক্লস্ট্রোফোবিয়া জাগানোর মত। নিজের অজান্তেই হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করে দিল অতিথিরা, নীরব হয়ে গেল।

প্যাসেজ ধরে লম্বা একটা চেম্বারে ঢুকল ফিলিপ। দেয়ালে অনেকগুলো পাথুরে শেলফ দেখা গেল, প্রতিটিতে শুয়ে আছে একটা করে কঙ্কাল। কাছের একটা খুলি তুলে নিল ফিলিপ, দর্শকদের দিকে ফিরে বলল, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, শ্যাতো বুভারির ক্যাটাকুমে স্বাগতম! আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচিত হোন। ওঁরা আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতে পারছেন না বলে দুঃখিত।'

কেউ কোনও কথা বলল না। খুলিটা রেখে দিয়ে আবার এগোতে শুরু করল ফিলিপ। সবাইকে দ্রুত পা চালাতে বলছে। চেম্বার থেকে বেরিয়ে নতুন একটা প্যাসেজে পৌঁছুল মিছিল। দু'পাশে অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটার মুখে লোহার শিক লাগানো। ফিলিপ জানাল, শ্যাতোর ডানজনে পৌঁছেছে ওরা। প্রকোষ্ঠগুলো কারাগার এবং টর্চার চেম্বার হিসেবে ব্যবহার হতো এককালে।

এডগার অ্যালান পো-র বিভিন্ন গল্পের দৃশ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে একেকটা প্রকোষ্ঠ। নিখুঁত মোমের মূর্তি শোভা পাচ্ছে সবক'টায়, যেন এখুনি নড়ে উঠবে। প্রথম প্রকোষ্ঠে এক তরুণীর লাশ ঠেসে চিমনিতে ঢোকাচ্ছে বিশাল এক লোমশ গরিলা। পরেরটাতে কবর খুঁড়ে উঠে আসছে এক লোক। মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক রোগীকে সম্মোহন করা হচ্ছে আরেকটি প্রকোষ্ঠে। অপূর্ব এই প্রদর্শনী, মাদাম তুসোর মিউজিয়ামকে হার মানাবে। সবাই মুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকল প্রকোষ্ঠগুলো।

পিছিয়ে এসে রানা আর লুনার সঙ্গে যোগ দিল ফিলিপ। মশালের আভায় তার মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখছেন, মসিয়ো রানা?'

'চমৎকার!' তারিফ করল রানা। 'টিকেটের ব্যবস্থা রাখলে প্রচুর আয় হবে আপনার।'

'এখুনি এ-কথা বলছেন? আসল চমক-ই তো দেখেননি এখনও। আসুন।'

সামনে এগিয়ে গেল ফিলিপ, শেষ প্রকোষ্ঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওটার ভিতরে লাল আলো জ্বলছে। মেঝেতে মুখ ব্যাদান করে আছে একটা বড় গর্ত, তার উপরে... কাঠের তৈরি একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। ধারালো একটা পেণ্ডুলাম দুলছে কাঠামোর উপর, প্রতি দুলুনির সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে নামছে ওটা। ঠিক তলায়, কাঠামোর গায়ে চিত হয়ে আটকে আছে কালো কাকের পোশাক পরা একজন মানুষ। গায়ের উপর কিলবিল করছে অনেকগুলো ইঁদুর, পেণ্ডুলামটা তাকে দু'টুকরো করে ফেলবে খুব শীঘ্রি। অ্যালান পো-র *দ্য পিট অ্যাণ্ড দ্য পেণ্ডুলাম* গল্পের দৃশ্য, যেখানে স্প্যানিশ ইনকুইজিশন একজন বন্দির উপর এভাবে অত্যাচার চালায়। অন্যান্য প্রকোষ্ঠের সঙ্গে পার্থক্য হলো, এখানে বন্দির জায়গায় মোমের পুতুল নয়, লর্ড ওয়ালটনকে বেঁধে রাখা

হয়েছে!

'বড়ই চমৎকার, কী বলেন আপনারা?' দর্শকদের দিকে ফিরে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল ফিলিপ। 'এখানকার সবকিছুই বাস্তব। ইঁদুরগুলো... সেই সঙ্গে আমাদের কয়েদিও! লর্ড ওয়ালটন অত্যন্ত আমুদে মানুষ, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্বেচ্ছায় এ-দৃশ্যে অংশ নিচ্ছেন।'

হালকা হাততালি দিল কয়েকজন। তবে সেদিকে খেয়াল নেই বন্দি লর্ডের, শরীর মোচড়ামুচড়ি করছে বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য। পেণ্ডুলামটা তার বুকের এক ইঞ্চি উপরে নেমে এল।

'করছেন কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা। 'ভদ্রলোক মারা পড়বেন তো!'

'নাটকীয়ভাবে!' হাসল ফিলিপ। 'দেহটা দু'টুকরো হয়ে যাবে ওঁর!'

অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকাল সবাই। লোকটা ঠাট্টা করছে নাকি!

'রিল্যাক্স,'. ফিসফিসিয়ে বলল ফিলিপ। 'ভয়ের কিছু নেই। পেণ্ডুলামের ব্লেড-টা কাঠের তৈরি। ভেবেছেন সম্মানিত একজন অতিথির রক্তে হাত রাঙাব আমি?'

কেউ কোনও কথা বলল না।

'আপনারা দেখি মজাও বোঝেন না!' গোমড়ামুখে বলল ফিলিপ। 'বেশ, তা হলে ব্যাপারটার ইতি টানি এখানেই।' বলে তুড়ি বাজাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল পেণ্ডুলামের দুলুনি, ব্লেডের কিনার তখন বন্দির বুক স্পর্শ করেছে। ভয়ানক এক আর্তনাদ বেরুল লর্ড ওয়ালটনের মুখ দিয়ে। কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

অতিথিদেরকে গাইড করে ডানজনের শেষ কামরায় নিয়ে গেল ফিলিপ। চারপাশের দেয়াল কালো মখমলে ঢেকে দেয়া

হয়েছে, মশালের আলো যেন শুষে নিচ্ছে সেই মখমল। ভীতিকর পরিবেশ। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল সবাই।

ফিলিপ বলল, 'বুঝতে পারছি, এখানে আর ভাল লাগছে না আপনাদের। ঠিক আছে, ভ্যাসিলিকে অনুসরণ করুন। ও আপনাদেরকে বাইরে নিয়ে যাবে।'

খুশি হয়ে উঠল অতিথিরা। মশাল উঁচিয়ে একটা প্যাসেজ ধরে বেরিয়ে গেল ভ্যাসিলি, তার পিছু নিল সবাই। রানা আর লুনাও এগোচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল ফিলিপ বাধা দেয়ায়।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনারা আমাদের বিশেষ অতিথি,' বলল ফিলিপ। 'তাই বিশেষ একটা শো রয়েছে আপনাদের জন্য... শুধুই আপনাদের জন্য। আসুন।'

একপাশে গিয়ে ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ফেলল সে। দু'ফুট চওড়া আরেকটা প্যাসেজ দেখা গেল ওখানে।

'শো-টা না দেখলে চলে না?' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'উঁহুঁ,' বলল ফিলিপ। 'দেখতেই হবে আপনাদেরকে।' প্রিন্স প্রসপেরোর অভিনয় করছে না আর, স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে। পোশাকের ভিতর থেকে একটা পিস্তল বের করে আনল, তাক করল রানা-লুনার দিকে। 'প্লিজ, এগোন। আমি পিছনে থাকব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে লুনাকে নিয়ে প্যাসেজে পা রাখল রানা। পাতালের দিকে আরেকটা সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে থামল। পিছন থেকে তাড়া দিল ফিলিপ, মুহূর্তের জন্য পিস্তল সরাচ্ছে না। কী আর করা, নামতে শুরু করল ওরা।

যতই নীচে নামল, ততই কমল তাপমাত্রা। দু'পাশে ভেজা দেয়াল দেখতে পেল রানা, গা বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। বাতাসেও ভেজা গন্ধ, জলাভূমির পরিবেশ। সিঁড়ির শেষে ছোট এক প্রকোষ্ঠের দেখা মিলল—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দশ ফুটের বেশি হবে না।

এক পাশের দেয়ালে কুলুঙ্গির মত খোপ—একজন মানুষ দাঁড়াতে পারবে ভিতরে। ওখানে শেকল ঝুলছে।

প্রকোষ্ঠে পৌঁছেই দেয়ালের খাঁজে মশাল আটকাল ফিলিপ। তারপর এক কোণে গিয়ে ক্যানভাস সরাল ছোট একটা স্তূপের উপর থেকে। ইঁটের সারি আর সিমেন্টের ভেজা মিশ্রণ রাখা হয়েছে তলায়। আর আছে একটা মদের বোতল।

বোতলটা তুলে নিল ফিলিপ, দাঁত দিয়ে কামড়ে কর্কের ছিপি খুলল। তারপর বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। বলল, 'পান করুন, মসিয়ো রানা।'

নির্বিকার দৃষ্টিতে বোতলের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'উপরতলা থেকে কিছু আনা যায় না? আবর্জনা থেকে তুলে আনা জিনিসে মুখ দিতে আপত্তি আছে আমার।'

'আবর্জনা নয়, আপনার জন্যই এটা এনে রেখেছি এখানে,' বলল ফিলিপ। হুমকির ভঙ্গিতে নাড়ল হাতের পিস্তল। ধমকের সুরে হুকুম দিল, 'খান!'

হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিল রানা, মুখে ঠেকাল।

'তাড়াতাড়ি খান,' অধৈর্য শোনাল ফিলিপের কণ্ঠ।

বাধ্য ছেলের মত নির্দেশ মেনে নিল রানা, দ্রুত খেতে শুরু করল। তাড়াহুড়োয় মুখ থেকে উপচে পড়ল মদ, কষা বেয়ে গড়াতে শুরু করল। কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না। বোতলের অর্ধেক শেষ করে সোজা হলো ও। মদটা বাড়িয়ে ধরল ফিলিপের দিকে।

'নিন, এবার আপনার পালা।'

'ধন্যবাদ,' কপট ভদ্রতা দেখাল ফিলিপ। 'তবে জ্ঞান হারাবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'মানে?'

'যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছেন আপনি, মসিয়ো রানা,' কঠিন হয়ে

উঠল ফিলিপের গলা। 'আমার মা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন আপনার উপর। আমাকে বলেছেন আপনাকে পথ থেকে সরাতে। ওঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চলেছি আমি।' গলা চড়াল সে। 'গ্যাস্টন! এসো, মাদমোয়াজেল লুনাকে তোমার চাঁদমুখটা দেখাও।'

সিঁড়ির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী একজন মানুষ, মশালের আলোয় তার চেহারা চিনতে কষ্ট হলো না। দিদিয়ের দেশমের দোকানে দেখা সেই দৈত্য! স্লিঙে ঝুলছে তার ডান হাত। লুনার পায়ের কাছে একটা তীর ছুঁড়ে ফেলল সে, ক্রসবো-র সাহায্যে এই তীর দিয়েই লোকটার হাত এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল লুনা।

'এটা তোমার,' গমগম করে উঠল দৈত্যের গলা।

আতঙ্কে মুখ দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না লুনার, স্থবির হয়ে গেছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এসবের মানে কী?'

'এখুনি বুঝতে পারবেন,' বলল ফিলিপ। 'মদের সঙ্গে একটা ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে আপনাকে। ফলে খুব শীঘ্রি সারা শরীর অসাড় হয়ে যাবে, তবে অনুভূতিগুলো নষ্ট হবে না। জিন্দালাশ হয়ে যাবেন আপনি, অসহায়ভাবে দেখতে পাবেন নিজের পরিণতি।'

'কী পরিণতি?'

'*দ্য কাস্ক অভ অ্যামন্টিলাডো*, মসিয়ো রানা!' সকৌতুকে বলল ফিলিপ। 'সিমেন্ট আর ইঁট দেখে কিছু বুঝতে পারছেন না? দেয়ালের ওই খোপে জ্যান্ত কবর দেয়া হবে আপনাকে!'

'ইউ বাস্টার্ড!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। সঙ্গে সঙ্গে টলে উঠল। পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, হুড়মুড় করে বসে পড়ল মেঝেতে।

অট্টহাসি দিল ফিলিপ। 'গালি না দিয়ে ফরচুনাতো-র ভূমিকা নিন, মসিয়ো রানা। বলুন—*ফর দ্য লাভ অভ গড, মন্ট্রেসর!* তা

হলে হয়তো ছেড়েও দিতে পারি আমি।'

জবাব দিল না রানা, ওর সারা শরীর দুলছে।

বিপদ বুঝতে পেরে স্থবিরতা কেটে গেল লুনার। ফিলিপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, পিস্তলটা কেড়ে নিতে চায়। বিদ্যুৎ খেলে গেল গ্যাস্টনের শরীরে। পিছন থেকে ভাল হাতের ভাঁজে লুনার গলা আটকে ফেলল সে, একটানে সরিয়ে আনল মনিবের উপর থেকে। দমবন্ধ হয়ে এল লুনার, দুর্বলভাবে খামচি দিল দৈত্যের হাতে। অবশ্য তাতে কোনও লাভ হলো না।

'বাহ্, বাহ্! মাদমোয়াজেল দেখি লড়াইও করতে জানেন!' বিদ্রূপ ঝরল ফিলিপের কণ্ঠে। 'গ্যাস্টন, ঝামেলা শেষ করো...'

কথা শেষ হলো না তার, আচমকা নড়ে উঠল রানা। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, হাতের বোতলটা সজোরে নামিয়ে আনল দৈত্যের মাথার উপর। কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো, আর্তনাদ করে লুনাকে ছেড়ে দিল গ্যাস্টন। লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। পিস্তল ঘোরাল ফিলিপ, কিন্তু বুকের উপর রানার কাঁধের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। লাফ দিয়ে তার গায়ের উপর চড়ে বসল রানা। ফিলিপও কম যায় না, পড়ে গিয়েও অস্ত্র ছাড়েনি, হাত উঁচু করে গুলি করল।

নিখুঁত রিফ্লেক্সের কারণে বেঁচে গেল রানা। কাত হয়ে পড়ে গেল ফিলিপের উপর থেকে। কানের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। মাটিতে গড়ান দিয়ে উঠে বসতেই থমকে গেল। পিস্তলের ব্যারেল নিষ্কম্প হাতে ওর দিকে তাক করে রেখেছে ফিলিপ। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে এসে ওর কপালে অস্ত্র ঠেকাল।

'আপনি ডেঞ্জারাস মানুষ, মসিয়ো রানা,' বলল সে। 'যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে দেখছি খতম করা যাবে না আপনাকে। সরাসরি পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হচ্ছে।'

'দুঃখিত, এবারও হতাশ করতে হচ্ছে আপনাকে।' বলেই ছোবল মারল রানার হাত। মেঝে থেকে তীরটা তুলেই ঘ্যাচ করে নামিয়ে আনল ফিলিপের পায়ের পাতায়। নরম স্লিপার ভেদ করে ঢুকে গেল ধাতব ফলা।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফিলিপ। তবে চিৎকার শেষ হলো না তার, ট্রিগার চাপারও সময় পেল না। বসা থেকে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল রানা, ওর মাথা সজোরে বাড়ি খেল ফিলিপের চোয়ালে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাবার বিকট শব্দ হলো। জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ল বুভারি পরিবারের সন্তান... পোষা কুকুরের মাত্র কয়েক হাত তফাতে!

হতভম্ব হয়ে রানার কাণ্ডকারখানা দেখছে লুনা। এগিয়ে গিয়ে ওকে পরীক্ষা করল রানা। গলা লাল হয়ে আছে। জানতে চাইল, 'শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল লুনা।

'গুড!' বলল রানা। ফিলিপ আর গ্যাস্টনকে দেখল। ভালমতই অজ্ঞান হয়েছে ওরা। সহসা জ্ঞান ফিরবে না। পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজল। 'এদিকে এসো,' লুনাকে বলল ও। 'বদমাশদুটোকে আটকে রাখতে হবে।'

নড়ল না লুনা।

'কী হলো?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ক্... কীভাবে... তুমি...' মুখের ভাষা আটকে যাচ্ছে লুনার। গলা খাঁকারি দিল। 'মদে ওষুধ মেশানো ছিল, তাও তোমার কিছু হয়নি কেন?'

'খেয়েছি নাকি যে কিছু হবে?' হাসল রানা। 'ঢোঁক গিলিনি, সব গড়িয়ে বের করে দিয়েছি মুখ থেকে। ফিলিপকে বোকা বানানোর জন্য অভিনয় করেছিলাম। কপাল ভাল, কৌশলটা কাজে লেগেছে। এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

দুজনে মিলে ফিলিপ আর গ্যাস্টনকে কুলুঙ্গিতে ঢোকাল। শেকল আটকে দিল হাতে। ভাঁড়ের টুপিটা বুভারি-তনয়ের মাথায় পরিয়ে দিল রানা। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ফর দ্য লাভ অভ গড, মন্ট্রেসর!'

মশালটা হাতে তুলে নিল ও, লুনাকে নিয়ে উঠে এল ডানজনের উপরের অংশে। বেরুনোর আগে পেণ্ডুলামের প্রকোষ্ঠে ঢুকল। কাঠের কাঠামোর গায়ে লর্ড ওয়ালটন এখনও বন্দি। নড়ছে না, মুখে ভয়ানক আতঙ্কের একটা মুখোশ যেন স্থির হয়ে আছে। নাড়ি পরীক্ষা করল রানা, কোনও স্পন্দন নেই।

'ভদ্রলোক মারা গেছেন,' জানাল ও।

'কীভাবে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল লুনা। 'রক্ত তো দেখতে পাচ্ছি না।' পেণ্ডুলামের গায়ে হাত বোলাল। 'ফিলিপ মিথ্যে বলেনি। জিনিসটা সত্যিই কাঠের তৈরি।'

'লর্ড ওয়ালটন জানতেন না সেটা। দু'টুকরো হয়ে যাওয়ার ভয়ে হার্টফেল করেছেন বেচারা। চলো, আপাতত ওঁর জন্য কিছু করার নেই আমাদের।'

সাবধানে ডানজন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কোথাও কেউ নেই। ইতিমধ্যে শ্যাতোর অলিগলি মুখস্থ হয়ে গেছে রানার। পথ চিনে সদর দরজায় পৌঁছুতে দেরি হলো না। কেউ আটকাল না ওদেরকে। শ্যাতোর গাড়ি-বারান্দায় বেরুতেই বাকি অতিথিদের দেখা পাওয়া গেল। একে একে বিদায় নিচ্ছে তারা। ভৃত্যরা একটা করে গাড়ি নিয়ে আসছে দরজার সামনে।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল রানা-লুনা। কীভাবে বেরুবে ভাবছে। ভাগ্যদেবী সদয় হয়ে উঠলেন ওদের প্রতি, হঠাৎ রোলস-রয়েসটাকে এগোতে দেখল রানা। ওটাকেও সম্ভবত কোনও অতিথির গাড়ি বলে ভেবেছে ভৃত্যরা।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে গাড়ির পাশে পৌঁছুল রানা-লুনা। গাড়ি

থামতেই পিছনের দরজা খুলে ধরল রানা, সঙ্গিনীকে উঠতে ইশারা করল। আর তখুনি পিছনে শোনা গেল চিৎকার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আঁতকে উঠল রানা। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে মাদাম বুভারির বাটলার ভ্যাসিলি।

চোখের পলকে পাশে দাঁড়ানো এক ভৃত্য বদলে গেল। বিনয়ের খোলস ছেড়ে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে, হাত ঢুকিয়ে দিল কোটের ভিতর—পিস্তল বের করতে চাইছে। দেরি না করে লোকটার বুকে বেমক্কা এক লাথি হাঁকল রানা। দাঁড়িয়ে থাকা অতিথিদের গায়ের উপর ছিটকে পড়ল সে। শুরু হয়ে গেল আতঙ্কিত চেঁচামেচি।

লুনা ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে গাড়িতে। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে ফেলল রানা, ভিতরে বসা লোকটার চোয়ালে বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি ঝাড়ল। তারপর কলার চেপে ধরে বের করে আনল ভিতর থেকে, ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল ও। ইঞ্জিন চালুই আছে, গিয়ার বদলে চেপে ধরল অ্যাকসিলারেটর।

টায়ার ঘর্ষণের বিচ্ছিরি শব্দ হলো, জ্যা-মুক্ত তীরের মত সামনে বাড়ল রোলস-রয়েস। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, আড়াআড়িভাবে আঙিনা পেরিয়ে শ্যাতোর ফটকে পৌঁছুতে চাইছে। পিছনে গুলির শব্দ হলো, কোথায় লাগল বোঝা গেল না। তার আগেই সামনে ভীমদর্শন এক ভৃত্য উদয় হলো, হাতে উজি সাবমেশিনগান, উঁচু করে রেখেছে, ফায়ার করতে যাচ্ছে গাড়ির উপর।

নিচু হয়ে গেল রানা, কুঁকড়ে ফেলল শরীরকে, কিন্তু গতি কমাল না। প্রচণ্ড গতিতে মেশিনগানধারীকে আঘাত করল রোলস-রয়েস, বেচারা তখনও ট্রিগার চাপতে পারেনি। ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের উপর, মড়মড় করে ভাঙল

কাচ। দলা-পাকানো লাশটা মুহূর্তের জন্য স্থির থাকল, তারপর খসে পড়ল মাটিতে।

আবার সোজা হলো রানা। চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রবেশপথের ওপাশে ড্র-ব্রিজটা উঠে যেতে শুরু করেছে। শ্যাতোর ভিতর থেকেই সম্ভবত কন্ট্রোল করা হয় ওটা। উঠছেও খুব দ্রুত। দাঁতে দাঁত পিষল ও, অ্যাকসেলারেটরের উপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। গোঁ গোঁ শব্দে প্রতিবাদ করে উঠল ইঞ্জিন, তবে দুরন্ত বেগে ছুটছে রোলস-রয়েস। রকেটের মত পেরিয়ে গেল শ্যাতো-প্রাচীরের মূল ফটক, উঠে পড়ল ড্র-ব্রিজে।

অর্ধেক পথ যেতেই রানা বুঝতে পারল, হার হতে চলেছে ওদের। ব্রিজ প্রায় খাড়া হয়ে গেছে, থেমে যাবার দশা রোলস-রয়েসের। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খসে পড়বে নীচে... আঙিনায় আছাড় খাবে। তাতে মৃত্যু না ঘটলেও আটকা পড়বে শ্যাতোর সীমানার ভিতরে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না ও, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিক পাল্টাল, গাড়ি নিয়ে সোজা ঝাঁপ দিল ড্র-ব্রিজ আর ফটকের মাঝখানের ফাঁক গলে।

যেন অনন্তকাল বাতাসে ভেসে রইল অ্যান্টিক রোলস-রয়েস, তারপর আছড়ে পড়ল পরিখার বুকে। ফুলঝুরির মত কয়েকশ' লিটার পানি ছিটকে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সারফেসে স্থির রইল গাড়িটা, তারপরই ভাঙা উইণ্ডশিল্ড দিয়ে দ্রুতবেগে ঢুকতে থাকা পানির কাছে হার মানল; তলিয়ে গেল নিমেষে।

চার

প্রচণ্ড ঝাঁকিতে দম আটকে এল রানার। ব্যথাটা যখন সয়ে এল, তখন পরিখার তলদেশ স্পর্শ করেছে রোলস-রয়েসের চাকা। কপাল ভাল বলতে হবে, উল্টে যায়নি। যুগ-যুগান্তর ধরে জমে থাকা ধুলো আর কাদার স্তরে আলোড়ন উঠল, তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল গাড়িটা। হুড়মুড় করে ঢুকতে থাকা পানির মাঝে হামাগুড়ি দিল রানা, চলে এল ব্যাকসিটে। অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে সঙ্গিনীকে খুঁজছে।

রানার ছোঁয়া পেয়েই ওর হাত খামচে ধরল লুনা। তাকে উঁচু হতে সাহায্য করল রানা। দু'জনে মুখ তুলল আটকা পড়া বাতাসের মাঝখানে। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার। মুখ থেকে পানি বের করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

গড়গড়া করার মত শব্দ বেরুল লুনার মুখ দিয়ে। ইতিবাচক জবাব দিচ্ছে।

থুতনি পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি। বকের মত গলা বাড়িয়ে মুখটা বাতাসে রাখার প্রয়াস চালাল রানা। বলল, 'ভয় পেয়ো না, শান্ত থাকো। দম ফুরিয়ে গেলে আমার হাতে চাপ দিয়ো। বুঝতে পেরেছ?'

আরেকবার গড়গড়ার আওয়াজ হলো।

'গুড,' রানা বলল। 'তিনবার দম নাও। শেষটা আটকে রেখো।'

যতটুকু পারে, ফুসফুসে বাতাস ভরে নিল দু'জনে। তারপর ডুব দিল পানিতে। একপাশের দরজা খুলে ফেলল রানা, ওখান দিয়ে লুনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সবুজাভ পানি ঝলমল করে উঠছে চারপাশে। উপর থেকে পরিখায় আলো ফেলছে শ্যাতো বুভারির প্রহরীরা। মাথা তোলামাত্র খুন করা হবে ওদেরকে। এঁকেবেঁকে আলোকরশ্মিগুলোকে ফাঁকি দিল রানা, সঙ্গিনীকে নিয়ে ডুবসাঁতার কেটে সরে যাচ্ছে দূরে।

কয়েক গজ যেতেই ওর হাতে চাপ দিল লুনা। সাঁতার থামাল না রানা, পাল্টা চাপ দিয়ে ধৈর্য ধরার সঙ্কেত পাঠাল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আরও জোরে ওর হাত চেপে ধরল লুনা, ওর দম ফুরিয়ে এসেছে। সারফেসের অন্ধকার একটা অংশ লক্ষ্য করে উঠতে শুরু করল রানা, তাড়াহুড়ো করছে না। নাক পর্যন্ত ভাসাল ও পানির উপরে, লুনাকেও একই ভঙ্গিতে ভাসতে বাধ্য করল।

রোলস-রয়েস থেকে বেরিয়ে আসা বুদ্‌বুদ্‌ লক্ষ্য করে গুলি করছে ভ্যাসিলি আর তার চেলারা। অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই। লুনাকে দম নেবার সময় দিল রানা, তারপর আবার টেনে নামাল নীচে। সাঁতার কাটতে শুরু করল। পর পর কয়েকবার পদ্ধতিটা অনুসরণ করল ওরা। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে দূরে সরে এল, কিন্তু পরিখা থেকে উঠল না। শেষ পর্যন্ত পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে পেল রানা। পরিখার কিনার ঘেঁষে জন্মেছে বিশাল এক ঝোপ, অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে পানির উপরে। ওটার তলায় গিয়ে থামল ওরা।

ততক্ষণে গোলাগুলিতে ক্ষান্ত দিয়েছে প্রহরীরা। কর্ডন করার ভঙ্গিতে পরিখার কিনার ধরে এগোতে শুরু করেছে। পানিতে থাকা আর নিরাপদ মনে হলো না রানার। নিচু গলায় লুনাকে জানাল কী করতে হবে।

'পানি থেকে এবার উঠব আমরা,' বলল ও। 'দাঁড়িয়ো না,

উপরে উঠেই মাটিতে শুয়ে পড়বে, ঠিক আছে? ক্রল করে এগোব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। নির্দেশটা বুঝতে পারছে। ওকে কোমর ধরে একটু উঁচু করল রানা, পরিখার কিনারে উঠে যেতে সাহায্য করল। কয়েক মুহূর্ত পর নিজেও উঠে এল পানি ছেড়ে। ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল দু'জনে। আশপাশে হাঁকডাক শোনা গেল, তল্লাশিতে কিছু পাওয়া না যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ছে প্রহরীরা, তাদেরকে চোখকান খোলা রাখতে বলছে ভ্যাসিলি।

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল রানা-লুনা। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, দুজনে টেরই পেল না, অস্ত্রধারী এক প্রহরীর পাঁচ হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে ওরা। মাটিতে খসখস শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল লোকটা, ইতিউতি তাকাল এদিক-সেদিক। আর ঠিক তখুনি মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, চারদিক ভেসে উঠল আলোতে।

ঠিক একই সময় পরস্পরকে দেখতে পেল রানা আর প্রহরী। প্রায় লাফিয়ে উঠল লোকটা, চেঁচিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না রানা, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ও প্রহরীর উপর, দু'হাতে চেপে ধরল টুঁটি। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াতে চাইল লোকটা, পারল না। অসুরের শক্তি এসে গেছে যেন রানার গায়ে। চেপে বসেছে লোকটার পেটের উপর। এক হাতে কোমর থেকে পিস্তল বের করল, উল্টো করে আঘাত হানল শত্রুর কপালের পাশে। মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ হলো, খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল প্রহরী।

হতভম্ব হয়ে গেছে লুনা, কিছু বলতে চাইল। ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিল রানা। উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে শুরু করল ছুটতে। এখন আর হামাগুড়ি দেবার মানে হয় না। যা ঘটেছে, তা কেউ দেখেছে কি

না—জানার উপায় নেই। দেখে না থাকলেও খুব শীঘ্রি আবিষ্কার করবে ওরা অজ্ঞান লোকটাকে। এখন আর লুকোচুরির চেষ্টা করে লাভ নেই।

দূর থেকে চিৎকার করে উঠল কেউ, দুই শিকারকে দেখতে পেয়েছে। পরমুহূর্তে একটা গুলির আওয়াজ হলো। আলোকস্বল্পতার কারণে লক্ষ্যভেদ করতে পারল না বুলেট। চেঁচিয়ে গোলাগুলি থামাবার নির্দেশ দিল ভ্যাসিলি। রানা-লুনাকে জ্যান্ত অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য বলা হয়েছে তাকে। ওর কথা শুনে অস্ত্র নামিয়ে নিল প্রহরীরা, তবে হৈ-চৈ করে ধাওয়া করল দুই পলাতককে।

একটাই পথ দেখতে পাচ্ছে এখন রানা—মাঠ পেরিয়ে শ্যাতোর চারপাশ বেষ্টন করে থাকা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হবে। লুনাকে নিয়ে ছুটল ওদিকে। গাছপালার ফাঁকে আবছা একটা সাদাটে রেখা চোখে পড়ছে, ওখানে পৌঁছে বুঝল—রেখাটা আসলে নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ। পথ হারানোর ঝুঁকি নিতে চাইল না ও, পথটা ধরেই দৌড়াতে থাকল। ভেজা কাপড়ের কারণে যথেষ্ট দ্রুত এগোতে পারছে না, তারপরও চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব জোরে ছুটতে।

একটু পরেই চৌরাস্তার মত একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুল দু'জনে। লুনা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোন্‌দিকে?'

বাছাবাছির সুযোগ নেই, ডান-বাম আর পিছন থেকে ভেসে আসছে প্রহরীদের উত্তেজিত চেঁচামেচি। সামনে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। কিছুদূর যেতেই দু'পাশের জঙ্গল ঘন হয়ে এল। এখন চাইলেও আর পথ ছেড়ে নামা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। একটু বাঁক নিল পথটা, খানিক পরে পরিষ্কার একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। গলির মত দেখতে, দু'পাশে গাছপালার পরিবর্তে ঘন ঝোপ আর গুল্মের দেয়াল। অন্তত দশ ফুট উঁচু।

কোথায় পৌঁছেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, দৌড়ে চলল। আরেকটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। এটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। থেমে গেল রানা। ইতস্তত করে ডানদিকে কয়েক পা এগোল, তারপর আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। তাকাল বাঁয়ের পথে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল নিখুঁত সবুজ প্রাচীর। সময় নিয়ে জন্মানো হয়েছে ওগুলো। কিনারা একেবারে মসৃণ। আচমকা টের পেল কোথায় এসে ঢুকেছে।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করে উঠল ও।

'সেরেছে মানে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল লুনা।

'আমরা সম্ভবত একটা *গার্ডেন মেইজ*-এ এসে ঢুকেছি। সোজা ভাষায় গোলকধাঁধাও বলতে পারো।'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল লুনা। 'হা যিশু! এখন তা হলে কী করব?'

'সঙ্গে যেহেতু কোনও গাইড নেই, আপাতত ঠেকে শিখে পথ বের করে নিতে হবে। এসো।'

ডান-বামে কিছু এসে-যায় না এখন, তাই একটা পথ ধরে এগোতে শুরু করল রানা। কিছুদূর যেতেই দেখা গেল, ওটাও দু'ভাগ হয়ে গেছে। বড্ড জটিল একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, বুঝতে পারছে ও। ফ্রি-হ্যাণ্ড ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে এই গোলকধাঁধা। বৃত্তাকার এবং বর্গাকার... দু'রকম পথই আছে ভিতরে—মনে মনে ম্যাপিং করা দুঃসাধ্য। দশ মিনিট ধরে বিশাল এক বক্র পরিভ্রমণ করার পর দেখা গেল, আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে ওরা।

ভ্যাসিলির লোকজন ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে গোলকধাঁধায়। কয়েকবার দমবন্ধ করে থেমে যেতে হলো, প্রাচীরের ঠিক অন্যপাশেই শোনা গেল প্রহরীদের কণ্ঠ... মাত্র কয়েক ফুট দূরে! মাঝে ঝোপ আর গুল্মের বাধা না থাকলে দেখে ফেলত

ওদেরকে। কিন্তু এ-অবস্থা খুব বেশি সময় থাকবে না। রানা বুঝতে পারছে, খুব শীঘ্রি আরও লোক এনে গোলকধাঁধায় ঢোকাবে ভ্যাসিলি। বেরুনোর সমস্ত পথেও পাহারা বসাবে। পালানোর কোনও উপায় নেই।

হতাশায় মাটিতে লাথি মারতে গিয়ে কী যেন ঠেকল রানার পায়ে। নিচু হয়ে হাত দিয়ে পরখ করল জিনিসটা, সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে উঠল। একটা মই, গোলকধাঁধার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহার হয়। সম্ভবত কোনও মালী ফেলে গেছে।

দেয়ালের গায়ে মই ঠেকিয়ে উপরে উঠে গেল রানা, শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। পেটের মধ্যে চোখা ডালের খোঁচা লাগছে, কিন্তু তা গ্রাহ্য করল না। ঝোপঝাড়ের পুরু দেয়াল ওর ওজন সইতে পারছে সহজেই। গোলকধাঁধার এখানে-ওখানে টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছে ও উপর থেকে। ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দুটো আলো। ফিসফিসিয়ে লুনাকে ডাকল ও, মেয়েটা উপরে উঠে আসতেই মইটা টেনে তুলল। এবার আর নীচ থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদেরকে।

রানা-লুনার দশ ফুট নীচ দিয়ে হেঁটে চলে গেল প্রহরীরা। লোকগুলো দূরে সরে গেলে নড়ল রানা। মই নামিয়ে ঠেকাল দেয়ালের অন্যপাশে, নেমে গেল। তারপর আবার উঠে পড়ল পরের দেয়ালে। রয়ে-সয়ে পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি করতে থাকল। গোলকধাঁধার ভিতরে আর পথ হাতড়াতে হচ্ছে না, দেয়াল টপকেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবে ওরা।

সরলরেখায় এগোচ্ছে দু'জনে। পনেরো মিনিট পরেই জঙ্গলের উঁচু গাছপালার মাথা দেখতে পেল রানা, আর তিনটে প্রাচীর পেরুলেই পৌঁছুনো যাবে ওখানে। খুশি হয়ে উঠছিল, হঠাৎ বেরসিকের মত ভারী রোটরের আওয়াজ শোনা গেল। পিছন দিকে তাকিয়ে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল ও।

শ্যাতোর দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার উড়ে আসছে গোলকধাঁধার দিকে। তলায় জ্বলছে উজ্জ্বল সার্চলাইট, চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। একটু পরেই ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাবে কপ্টারের আরোহীরা।

'লুনা! তাড়াতাড়ি!!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। দ্রুত মই নামাল মাটিতে, তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পা ফসকাল, ধপাস করে আছড়ে পড়ল নীচে।

গুঙিয়ে উঠল রানা। পাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলায় লুনা জানতে চাইল, 'বেশি লেগেছে?'

সারা শরীর ব্যথা করছে, কিন্তু দাঁতে দাঁত পিষে রানা বলল, 'না। চলো, হাতে সময় নেই।'

পরের দেয়ালটা পেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লেগে গেল হেলিকপ্টারের আওয়াজে। এসে পড়েছে ওটা। তাড়াতাড়ি মইটা মাটিতে নামিয়ে রাখল রানা। দেয়ালের গোড়ায় শুয়ে পড়ল নিজেরা। লুনার পরনে কালো বেড়ালের সাজ, ওর গায়েও ডোরা-কাটা ভাঁড়ের পোশাক... নড়াচড়া না করলে উপর থেকে হয়তো বোঝা যাবে না।

ওর ধারণাই ঠিক বলে প্রমাণিত হলো। বাতাসের ঝড় বইয়ে ওদের উপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার, কিন্তু থামল না। চক্কর দিয়ে চলে গেল গোলকধাঁধার আরেক দিকে। লুনাকে দাঁড় করাল রানা। বার বার ভাগ্যের সহায়তা পাবে না, কাজেই এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে এই মৃত্যুপুরী থেকে।

কয়েক মিনিট পরে শেষ দেয়ালটা টপকে গোলকধাঁধার বাইরে পা রাখল দু'জনে। হেলিকপ্টারের সার্চলাইটের কল্যাণে আবছাভাবে আলোকিত হয়ে আছে চারপাশ। গাছপালার মাঝ দিয়ে একটা সংকীর্ণ ঘেসো পথ দেখতে পেল ওরা। ছুটল ওদিকে।

পিছনে নিষ্ফল তল্লাশিতে ব্যস্ত হয়ে আছে শত্রুপক্ষ, ফলে নিরাপদে এগোতে পারল রানা-লুনা। অনেকক্ষণ হাঁটার পর জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। গাছগাছালির আড়াল থেকে খোলা এক মাঠে বেরিয়ে এল ওরা। এক প্রান্তে বড় একটা বিল্ডিঙের মত কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয় ভৌতিক অবয়ব ধারণ করেছে।

'কী ওটা?' রানার বাহু খামচে ধরে জানতে চাইল লুনা।

'বুঝতে পারছি না,' রানা বলল। 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। আমি দেখে আসছি।'

মাথা নুইয়ে এক ছুটে মাঠ পেরুল ও। বিল্ডিঙের পাশে গিয়ে থামল। দেয়ালটা পাথরের তৈরি। হাতড়ে হাতড়ে এগোতে থাকল, একটু পরেই ছোট একটা দরজা পেল। খোলা পাবে বলে আশা করেনি, কিন্তু হাতল ঘোরাতেই হাট হয়ে খুলে গেল পাল্লা। সাবধানে বিল্ডিঙের ভিতর পা রাখল রানা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, তবে নাকে ভেসে এল তেল আর গ্রিজের গন্ধ। সম্ভবত গ্যারাজ, ভাবল ও, গাড়ি-টাড়ি রাখা হয়। দরজার পাশের দেয়ালে লাইটের সুইচ পাওয়া গেল। ওটা টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো বিল্ডিঙের অভ্যন্তর।

শিস দিয়ে উঠল রানা। গ্যারাজ না, ছোট একটা হ্যাঙারে এসে ঢুকেছে ও। মাঝখানে একটা লালরঙা ছোট্ট বিমান দাঁড়িয়ে আছে। লেজে বুভারিদের তিন-মাথা ঈগলের প্রতীক। কাছে গিয়ে চমৎকৃত হলো ও। অ্যান্টিক বাইপ্লেন... রেস্টোরেশনের জন্য প্রচুর শ্রম দেয়া হয়েছে। ফ্যাব্রিকের ফিউজলাজের গায়ে হাত বোলাল। দু'পাশের ডানার তলায় লাগানো আছে টর্পেডো-আকৃতির দুটো মেটাল ট্যাঙ্ক—গায়ে মড়ার খুলি আর হাড় আঁকা। তারমানে বিষাক্ত জিনিস বহন করে ওগুলো। বুঝতে অসুবিধে হলো না, বিমানটা কীটনাশক ছিটানোর কাজে ব্যবহার

করে বুভারিরা।

টুইন ককপিটের ভিতর উঁকি দিল রানা। পাইলট বসে পিছনের সিটে। কন্ট্রোল বলতে রয়েছে একটা সিঙ্গেল লিভার আর ফুট প্যাডাল। লিভার সামনে-পিছনে নিলে এলিভেশন বাড়ে-কমে, ডানে-বাঁয়ে নিলে ডানার অ্যালেরন নড়ে—বিমান নাক ঘোরায়। বড্ড প্রাচীন পদ্ধতি, তবে সুবিধে হলো, এই বিমান এক হাতে চালানো যায়।

চালানোর পদ্ধতি পুরনো হলেও নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে ককপিটে। রেডিও, জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম, আর মডার্ন কম্পাস আছে ওখানে। দ্রুত বিমানটা চেক করে নিল রানা। ইকুইপমেন্ট আর ইঞ্জিনে কোনও গড়বড় নেই। চালানো যাবে ওটা। খুশি হয়ে উঠল, হ্যাঙারের বাতি নিভিয়ে ফিরে গেল লুনাকে নিয়ে আসার জন্য।

'এত দেরি করলে কেন?' অভিমানী গলায় জানতে চাইল লুনা। 'আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিল...'

মুচকি হেসে ওর গালে চুমো দিল রানা। বলল, 'সরি, ডার্লিং। রিজার্ভেশন কাউন্টারে লম্বা লাইন পড়েছিল।'

'মানে!'

'এসো, নিজ চোখেই দেখবে।'

হ্যাঙারে ফিরে এল দু'জনে। বাতি জ্বালল রানা, বাউ করে বিমান দেখিয়ে বলল, 'বুভারি এয়ারওয়েজে স্বাগতম, মাদমোয়াজেল!'

ফ্যাল ফ্যাল করে অ্যান্টিক বাইপ্লেনের দিকে তাকাল লুনা। বলল, 'অদ্ভুত সুন্দর!'

'আশা করি উড়বেও সুন্দরভাবে।'

'তুমি ওড়াতে পারবে এটা?'

'মনে তো হয়।'

ভুরু কোঁচকাল লুনা। 'মনে হয় মানে? তুমি আগে কখনও এ-বিমান উড়িয়েছ?'

'বহুবার!' হাসিমুখে বলল রানা। লুনার চেহারা গম্ভীর হতে দেখে হার মানল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে... একবার মাত্র উড়িয়েছি। একটা বিমান মেলায়।'

'মেলা? কোথাকার মেলা?'

'আমেরিকায়... ওয়াশিংটনে। আরে বাবা, এত চিন্তা করছ কেন? স্বীকার করছি, আজকালকার বিমান অনেক সফিস্টিকেটেড হয়; কিন্তু ফ্লাইঙের বেসিক নিয়মকানুন সব বিমানের জন্যই এক।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুনা। 'আশা করি ড্রাইভিঙের চেয়ে তোমার ফ্লাইং ভাল।'

'এ ভারি অন্যায়,' গোমড়ামুখে বলল রানা। 'মাঝরাতে সাঁতার কাটার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার। বুভারিদের কারণে পানিতে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। নাকি ভুলে গেছ সেটা?'

হেসে ফেলল লুনা। রানাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কিছুই ভুলিনি আমি, *সুইট হার্ট!* এখন চলো, এই নরক ছেড়ে পালাই।'

'তা হলে সাহায্য করো আমাকে,' বলল রানা। দেয়ালে লাগানো সুইচবোর্ড দেখাল। লেবেলগুলো ফরাসি ভাষায় লেখা। 'মুখে ফ্রেঞ্চ বলতে পারি বটে, পড়তে ততটা পারি না। কোনটা কীসের সুইচ, তা জানতে চাই আমি।'

অনুবাদ করে শোনাল লুনা। রানা ওকে বলে দিল কী করতে হবে, তারপর নিয়ে গেল বিমানের সামনে। প্রপেলার ব্লেড কীভাবে ধরতে হবে, শিখিয়ে দিল। বলল, 'ইঞ্জিন চালু করার জন্য পাখাটা ঘুরিয়ে দিতে হবে তোমাকে। এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিয়ে পিছনে সরে যেয়ো। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। ককপিটে উঠে পাইলটের সিটে বসল

রানা। থ্রটল অ্যাডজাস্ট করে ইশারা দিল। প্রপেলারের পাখা এক ঝটকায় ঘোরাল লুনা, তারপর নির্দেশমত পিছিয়ে গেল কয়েক পা। কয়েক পাক ঘুরল প্রপেলার, তারপর কেশে উঠে থেমে গেল। থ্রটল বাড়িয়ে আবার ইশারা দিল রানা। আবার পাখা ঘোরাল লুনা। এবার চালু হলো ইঞ্জিন। কান ফাটানো আওয়াজ করে একরাশ কালো ধোঁয়া ছাড়ল। বদ্ধ হ্যাঙারের ভিতরটা কেঁপে উঠল সে-আওয়াজে।

রানার কথামত দেয়ালের সুইচবোর্ডের সামনে চলে গেল লুনা। হ্যাঙারের মেইন ডোর খুলল, জ্বেলে দিল ল্যাণ্ডিং লাইট, তারপর ছুটে এসে উঠে পড়ল ককপিটে। ব্রেক রিলিজ করে বাইপ্লেন আগে বাড়াল রানা। মেইন ডোর পেরিয়ে বেরিয়ে এল ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে।

ট্যাক্সিঙের জন্য সময় নষ্ট করল না রানা। থ্রটল ঠেলে ইঞ্জিনের আরপিএম সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গেল। ল্যাণ্ডিং লাইটের দুটো সারির মাঝ দিয়ে উন্মত্তের মত ছুটতে শুরু করল বাইপ্লেন—প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। অনভ্যস্ত হাতে কণ্ট্রোল সামলাতে হিমশিম খেল ও, বিমানটা কাঁপছে ভীষণভাবে। তবে বেশিক্ষণ যুদ্ধ করতে হলো না, অল্পক্ষণেই টেকঅফ স্পিডে পৌঁছে গেল বাইপ্লেন। কণ্ট্রোল লিভার ধরে আলতোভাবে পিছনে টানল রানা, ধীরে ধীরে নাক জাগাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মাটি ছাড়ল বিমানের চাকা। তবে উঠবার গতি বড্ড ধীর, সামনে গাছপালার মাথা দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠল ও, ওখানে সংঘর্ষ ঘটাতে যাচ্ছে বাইপ্লেন! লিভারের উপর সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিল রানা, টানছে পিছনদিকে। অবাধ্য বিমান গোঁ গোঁ করে উঠল, কিন্তু পাইলটের একরোখামির কাছে হার মানল। নাক আরেকটু উঁচু হলো, চাকাদুটো বাড়ি খেল একটা গাছের মাথায়, ভীষণ ঝাঁকুনি অনুভব করল দুই আরোহী। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, গাছপালার

সারি পেরিয়ে প্রাচীন আকাশযানটা উঠে এল আকাশে।

ক্লাইম্বের গতি স্থির রাখল রানা, ডানে-বাঁয়ে তাকাল বিয়ারিং পাবার জন্য। চারপাশের পুরো এলাকা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে। আলোকিত হয়ে আছে কেবল শ্যাতো বুভারি—টারেটগুলোর মাথায় জ্বালানো হয়েছে উজ্জ্বল ল্যাম্প। দুর্গটাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করল রানা, বিমানের নাক ঘোরাল জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া গাছপালার টানেলের দিকে, ওটার উপর দিয়ে উড়ে যাবে।

এক হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে বিমানকে লেভেলে আনল রানা। সামনে থেকে হালকা বাতাস বইছে, আশি মাইলের বেশি স্পিড তোলা গেল না। কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তিত হলো না ও, হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে। শ্যাতো বুভারি থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তাতেই খুশি। মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে সামনের ককপিটে বসা লুনার সঙ্গে যোগাযোগ করল।

'টেকঅফ-টা ভাল হয়নি,' বলল রানা। 'তুমি ভয় পাওনি তো?'

'দাঁতের ঠোকাঠুকি থামার পর জবাব দেব,' ঠাট্টা করল লুনা।

'এখুনি থামাও,' পাল্টা রসিকতা করল রানা। 'ঠোকাঠুকিতে দাঁতের ক্ষয়ক্ষতি হলে সমস্যা। ফোকলা মেয়েকে নিয়ে ডিনারে যেতে পারব না আমি।'

'আর কোনও চিন্তা নেই তোমার মাথায়?' কপট রাগ দেখাল লুনা। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা, জানতে পারি?'

'যে-দিক থেকে এসেছিলাম, সেইদিকেই,' রানা বলল। 'চোখ খোলা রাখো, নীচে আলো দেখতে পেলে জানিয়ো। ল্যাণ্ড করব। তারপর গাড়ি ভাড়া করে ফিরে যাব প্যারিসে।'

ফ্লাইঙে মনোনিবেশ করল রানা। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। প্রায় অন্ধের মত, অচেনা একটা এলাকায় উড়তে

হচ্ছে ওদেরকে। বিমানটাও আদ্দিকালের, এ-ধরনের এয়ারক্র্যাফট চালাবার অভিজ্ঞতা ওর নেই বললেই চলে। ককপিটে কোনও ক্যানোপি নেই, ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি আঘাত হানছে নাকে-মুখে, ভেজা কাপড়ের কারণে কাঁপছে শরীর, সারাক্ষণ কানে দামামার মত বাজছে প্রাচীন ইঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। ফ্লাইঙের আদর্শ পরিবেশ বলা চলে না মোটেই। হঠাৎ করেই পুরনো আমলের পাইলটদের প্রতি অদ্ভুত শ্রদ্ধা অনুভব করল রানা। এ-ধরনের বিপত্তি মোকাবেলা করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়তে হতো তাদেরকে, কাজটা মোটেই সহজ নয়।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ও, চমক ভাঙল ইয়ারফোনে লুনার চেঁচামেচি শুনে। তৎক্ষণাৎ চোখের কোণে নড়াচড়ার আভাস পেল। ওদিকে মুখ ঘোরাতেই চমকে উঠতে হলো। গোলকধাঁধার উপরে যে-হেলিকপ্টারটাকে দেখেছিল, সেটা যেন ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে ত্রিশ ফুট দূরে। ককপিটের আলো জ্বলছে, ভিতরে বসে আছে শ্যাতো বুভারির কয়েকজন প্রহরী। খোলা দরজা দিয়ে অটোমেটিক ওয়েপন বের করে রেখেছে একজন।

পরমুহূর্তে রেডিওতে ভেসে এল ফিলিপ বুভারির পরিচিত গলা, 'গুড ইভ্‌নিং, মসিয়ো রানা। আবার আপনার দেখা পেয়ে সত্যিই খুশি হলাম।'

'হোয়াট আ প্লেয্যাণ্ট সারপ্রাইয, ফিলিপ!' হালকা গলায় বলল রানা। 'কই, হেলিকপ্টারে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'কারণ শ্যাতোর সিকিউরিটি সেণ্টারে বসে আছি আমি। কপ্টারের ক্যামেরায় দেখছি আপনাকে।'

খেয়াল করল রানা, যান্ত্রিক ফড়িংটার তলায় একটা ক্যামেরা পড আছে। হাত নাড়ল ওদিকে। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম এখনও তুমি ডানজনের ইঁদুরগুলোর সঙ্গে ঘুমাচ্ছ।'

খোঁচাটা হজম করল ফিলিপ। বলল, 'আমার *ফকার*

এভিয়াটাক টা পছন্দ হয়েছে আপনার, মসিয়ো রানা?'

'এয়ার-টু-এয়ার মিসাইলসহ একটা এফ-সিক্সটিন ফাইটার পেলে ভাল হতো, তবে আপাতত এটাই কাফি। ব্যবহার করতে দেয়ায় ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই। অতিথিদের আপ্যায়নে কোনও খুঁত রাখি না আমরা। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত উল্টো ঘুরে শ্যাতোয় ফিরে আসুন, নইলে গুলি করে আপনাদেরকে মাটিতে ফেলে দেয়া হবে।'

হুমকিটা জোরালো করার জন্য কপ্টার থেকে ফাঁকা একটা গুলি ছোঁড়া হলো।

'হুম,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকেই ট্র্যাক করছ আমাদেরকে। আরও আগেই গুলি করোনি কেন?'

'বিমানটা অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেতে চাই আমি।'

'খুব শখের জিনিস, না?'

'গেট ব্যাক, মসিয়ো রানা। নাউ!'

বিমানকে একপাশে ভেসে যেতে দিল রানা। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য তড়িঘড়ি করে সরে গেল হেলিকপ্টারটা। মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'দুঃখিত, এভিয়াটাক চালানোর অভ্যাস নেই আমার,' বলল ও। 'আরেকটু হলেই তোমার শখের বিমানের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'এসব ছেলেমানুষি করে কোনও লাভ নেই, মসিয়ো রানা,' রাগী গলায় বলল ফিলিপ। 'এভিয়াটাকের ক্ষমতা কতটুকু, তা ভাল করে জানি আমি। কিছুতেই পালাতে পারবেন না। দরকার হলে বিসর্জন দেব ওটা, কিন্তু আপনাকে বাঁচতে দেব না। বিশ্বাস না হলে দেখুন।'

রেডিওতে সাগরেদদের কাছে নির্দেশ পাঠাল সে। কয়েক

মুহূর্ত পরেই বাইপ্লেনের উপরে উঠে এল হেলিকপ্টার। দুই আকাশযানের মাঝে এখন মাত্র কয়েক ফুট দূরত্ব। শক্তিশালী ডাউনড্রাফটের কবলে পড়ে টালমাটাল অবস্থা হলো এভিয়াটাকের। রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো রানাকে বিমান ভাসিয়ে রাখার জন্য। মিনিটখানেক চলল এই অত্যাচার, তারপর আবার ফিলিপের নির্দেশ পেয়ে সরে গেল হেলিকপ্টার।

'দেখতেই পাচ্ছেন, চাইলেই আপনাদেরকে ল্যাণ্ড করতে বাধ্য করতে পারি আমি,' বিজয়ীর সুরে বলল বুভারি-তনয়। 'উল্টো ঘুরুন, নইলে আপনাকে আর আপনার বান্ধবীকে খুন করতে বাধ্য হব।'

'আমার কোনও দাম নেই তোমার কাছে,' বলল রানা। 'কিন্তু লুনা মারা গেলে হেলমেটটা খুঁজে পাবে না তোমরা।'

'ঝুঁকিটা নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'তোমার মা এ-কথা জানে? একটু জিজ্ঞেস করে নেবে নাকি?'

ফরাসিতে গাল দিয়ে উঠল ফিলিপ। হেলিকপ্টারটা আবার ফিরে এল মাথার উপর। প্রচণ্ড বাতাসে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেল এভিয়াটাকের। নাক নিচু করে ওটাকে এড়াবার চেষ্টা চালাল রানা, কিন্তু নাছোড়বান্দার মত কপ্টারও নেমে এল। বুঝতে পারল ও, যান্ত্রিক ফড়িংটার বিরুদ্ধে এই মান্ধাতা আমলের বাইপ্লেন কোনও লড়াই করতে পারবে না। চাইলেই ওদেরকে ক্র্যাশ করাতে পারবে ফিলিপ।

'ঠিক আছে, ফিলিপ,' বলল রানা। 'হার মানছি। কী করতে হবে বলো।'

'ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে ফিরে আসুন। কোনও চালাকি করবেন না। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব।'

তা তো করবেই, বিড়বিড় করল রানা। কন্ট্রোল স্টিক নেড়ে

ধীরে ধীরে বিমান ঘোরাতে শুরু করল ও। পিছন পিছন আসছে হেলিকপ্টারটা। ইয়ারফোনে কথা বলে উঠল লুনা, রেডিও-তে রানা আর ফিলিপের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে ও।

'রানা, কী করছ তুমি? ফিরে গেলে ও তোমাকে খুন করবে!'

'গেলে একা আমি খুন হব,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু না গেলে খুন হব দুজনেই।'

'আমার জন্য এতবড় ঝুঁকি নিচ্ছ?'

'ঝুঁকি নিচ্ছি? কই, না তো!'

'কথা ঘুরিয়ো না, রানা। আমি চাই না তুমি মারা যাও।'

'আমিও চাই না,' হাসল রানা। 'শোনো, বিনা লড়াইয়ে হার মানার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। সিটবেল্ট শক্ত করে বাঁধো। আমি একটু খেলা দেখাব।'

জঙ্গলের উপর দিয়ে ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের কাছে ফিরে এল বাইপ্লেন। ওটাকে নামার সুযোগ করে দিতে একটু সরে গেল হেলিকপ্টার। মাটিতে বসানো আলোর সারির সঙ্গে বিমানকে অ্যালাইন করল রানা, নামতেও শুরু করল... কিন্তু হঠাৎ বিমানের নাক ঘোরাল ও। ছুটে গেল সোজা শ্যাতো বুভারির দিকে।

রেডিওতে চেঁচাতে শুরু করল ফিলিপ, গালাগাল দিয়ে রানার চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে। হেলিকপ্টারটা চোখের পলকে কাছে চলে এল, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, চক্কর দিতে শুরু করল প্রাসাদের সীমানার ভিতর, টারেটগুলোর ঠিক উপরে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে ওর পিছনে থাকল কপ্টার, গায়ে চড়ে বসছে না। এখন যদি জোর খাটিয়ে এভিয়াটাককে নীচে নামাতে চায়, তা হলে বিমানটা ক্র্যাশ করবে শ্যাতোর উপরে—সেটা চায় না প্রহরীরা।

সীমানার ভিতর কয়েকবার চক্কর দিল রানা, তারপর আচমকা দিক পাল্টে সবেগে ছুটল। রেডিওতে ফিলিপ চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরো

ওকে! পালাতে দিয়ো না!'

ভয়ঙ্কর গতিতে বাইপ্লেনের দিকে ধেয়ে এল হেলিকপ্টার। এঁকে-বেঁকে ওটার সামনে থেকে সরে গেল রানা, মাথার উপর পজিশন নিতে দিল না। শ্যাতো প্রাচীরের পাশের খোলা প্রান্তর পেরিয়ে গাছপালার সারির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এভিয়াটাকের নাক নিচু করল ও, ডাইভ দিয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মাঝখানের প্রাকৃতিক টানেলের ভিতর। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল লুনা। মাটি থেকে মাত্র ন'ফুট উঁচুতে উড়ছে এভিয়াটাক। টানেলের দেয়াল ডানা থেকে চার ফুটের বেশি নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ঘষা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু রানা নির্বিকার; অবিচল ভঙ্গিতে বিমান চালাচ্ছে ও।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে হেলিকপ্টারও ঢুকে পড়ল টানেলে। বাইপ্লেনের ডানার চেয়ে ওটার রোটরের বিস্তার বেশি, ফলে বেশ কসরত করতে হচ্ছে পাইলটকে। গতি বাড়িয়ে এভিয়াটাকের কাছাকাছি আসতে পারছে না। ব্যাপারটা লক্ষ করে নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ব্যাটা গর্দভ! গাছপালার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে টানেলের অন্যপ্রান্তে ওদের অপেক্ষায় থাকলেই পারত। কিন্তু ফিলিপ বুভারির হৈ-চৈ শুনে ভড়কে গেছে লোকটা। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি কাজ করছে না।

কপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে শরীরের একাংশ বের করে গুলি করল এক প্রহরী। দুই আকাশযানের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে বদ্ধ জায়গায় বিকট শব্দ হলো। আর অপেক্ষা করা চলে না, কন্ট্রোল প্যানেলে হাত রাখল রানা, স্প্রে-পডের বোতাম চেপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে এভিয়াটাকের ডানার তলায় লাগানো দুই ট্যাঙ্কের মুখ খুলে গেল। বাষ্পের মত ওখান থেকে বেরিয়ে এল তরল কীটনাশক, ছড়িয়ে পড়ল পিছনদিকে। বদ্ধ টানেলে বেশিদূর

ছড়াতে পারল না বিষ, ঢুকে পড়ল কপ্টারের ভিতর। আরোহীরা চিৎকার জুড়ল, ককপিট এখন ছোটখাট একটা গ্যাস-চেম্বারে পরিণত হয়েছে। চোখ জ্বালাপোড়া করছে, স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের বশে পাইলটের দু'হাত চলে গেল মুখের কাছে। ফলাফল হলো ভয়াবহ।

নিয়ন্ত্রণ হারাল হেলিকপ্টার, গোঁত্তা খেল একপাশে। মোটাসোটা গাছপালার গায়ে বাড়ি খেল রোটরের ডানা, টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চারপাশে। বাতাসের অবলম্বন হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টার, টেনিস বলের মত ড্রপ খেতে শুরু করল—দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে ফিউজলাজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘটল বিস্ফোরণ।

শরীর শক্ত করে শকওয়েভের ধাক্কা হজম করল রানা, কণ্ট্রোল থেকে হাত সরাল না। একটু পরেই বেরিয়ে এল টানেল থেকে। পিছনে তখন লাল, হলুদ আর কমলা রঙের একটা আগুনের গোলা জ্বলছে। টানেলের দুই প্রান্ত দিয়ে আলো বেরিয়ে এসে আলোকিত করে ফেলেছে অনেকদূর। ধোঁয়াও বেরুচ্ছে গাছপালার মাঝ দিয়ে। হেসে উঠল রানা।

'কী ঘটল ওখানে?' জিজ্ঞেস করল লুনা। সামনে বসা থাকায় পিছনের ঘটনা দেখতে পায়নি ও।

'কিছু না,' বলল রানা। 'ওষুধ ছিটিয়ে পোকামাকড় মারলাম। তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ। আগুন কীসের?'

'ওরা অ্যাক্সিডেন্ট করে এখন জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে।'

'আর কেউ পিছু নিয়েছে আমাদের?'

'উঁহুঁ। খায়েশ মিটিয়ে দিয়েছি। রিল্যাক্স, এনজয় দ্য ফ্লাইট।'

আধঘণ্টা পর ছোট্ট একটা শহরের পাশে ল্যাণ্ড করল এভিয়াটাক। ট্যাক্সিইং করে বিমানটাকে পাহাড়ি এক খাঁজের

ভিতরে নিয়ে গেল রানা। শুকনো খড়কুটো আর গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখল। তারপর লুনাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। যথেষ্ট ধকল গেছে, আর জার্নি করতে পারবে না। রাত কাটানোর মত একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।

ছোট্ট একটা সরাইখানা পাওয়া গেল শহরের শেষ প্রান্তে। সেখানে ঢোকার আগে রানাকে জড়িয়ে ধরল লুনা, ঠোঁটে গাঢ় একটা চুমো খেল। বলল, 'একটাই রুম নিয়ো, কেমন?'

'যথাজ্ঞা!' মাথা নত করল রানা।

পাঁচ

সাবমেরিনের মৃদু কাঁপুনি আর ইঞ্জিনের আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আসিফ, বাঙ্কে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ চোখ মেলল। কাঁপুনি থেমে গেছে, বদলে গেছে ইঞ্জিনেরও আওয়াজ। হালকা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পুরোপুরি থেমে গেল সাবমেরিন, তারপর নেমে এল নীরবতা।

উপরের বাঙ্কে তানিয়ার ঘুমও ভেঙে গেছে। উঠে বসেছে ও। বলল, 'কী ব্যাপার, সব থেমে গেল কেন?'

'সম্ভবত ডাঙায় ভিড়েছি আমরা,' বলল আসিফ।

বাঙ্ক থেকে উঠে পড়ল ও, এগিয়ে গিয়ে কান পাতল দরজায়। কিছু শুনতে পেল না প্রথমে। খানিক পর পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। অস্ত্রধারী দু'জন গার্ড দরজা খুলল, ইশারায় বিজ্ঞানী

দম্পতিকে বেরিয়ে আসতে বলল। করিডোরে বেরুতেই জয়েস কোটের দেখা পাওয়া গেল। হেণ্ডারসনের সঙ্গে সাবমেরিনের ভিতরটা দেখে আসার পরই ওকে অন্য একটা কেবিনে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, তারপর আর দেখা হয়নি আসিফ-তানিয়ার সঙ্গে। মাঝে কতটা সময় পেরিয়েছে, বলা কঠিন। সবার হাতঘড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, অ্যাকোমোডেশনের ভিতরেও কোনও দেয়াল ঘড়ি ছিল না। তা ছাড়া বদ্ধ সাবমেরিনে দিনরাতের পার্থক্য করা সম্ভব নয়।

জয়েসের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে। চোখ টিপে ওকে আশ্বস্ত করল আসিফ। মাথা ঝাঁকাল জয়েস। সাহসী মেয়ে, কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও ভেঙে পড়েনি। গার্ডরা রুক্ষ কণ্ঠে আদেশ দিতেই হাঁটতে শুরু করল তিনজনে। কয়েকটা সিঁড়ি আর করিডোর পেরিয়ে সাবমেরিনের আপার ডেকে উঠে এল ওরা, কোনিং টাওয়ারের সামনে।

চারপাশে তাকাল আসিফ-তানিয়া। চারশো ফুট লম্বা ডুবোজাহাজটা গুহা আকৃতির এক বিশাল সাবমেরিন-পেনে এসে থেমেছে। ছাদ এত উঁচু যে ঠিকমত দেখাই যাচ্ছে না। চেম্বারের একপ্রান্তে রয়েছে জটিল কলকব্জার এক সিস্টেম—কনভেয়ার বেল্ট আর ল্যাডার হয়েস্টের সারি বসানো হয়েছে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে। গ্যাঙওয়ে ধরে সাবমেরিন থেকে নামানো হলো তিন বন্দিকে। ড. হেণ্ডারসন ওদের অপেক্ষায় ডকে দাঁড়িয়ে আছে।

'গুড ডে, মাই ফ্রেণ্ডস্!' সহাস্যে বলল বিজ্ঞানী। 'অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে আপনাদের স্বাগতম! আসুন আমার সঙ্গে।'

ওদেরকে নিয়ে বড় এক ফ্রেইট এলিভেটরে চড়ল হেণ্ডারসন। বোতাম টিপে দিল গন্তব্যে যাবার জন্য। দরজা বন্ধ হতেই মুখের হাসি অদৃশ্য হলো তার। চকিতে ঘড়ি দেখল, বলল, 'কথা বলার জন্য বত্রিশ সেকেণ্ড পাবো আমরা।'

'কোথায় আনা হয়েছে আমাদেরকে, সেটা জানার জন্য আমি মাত্র দু'সেকেণ্ড চাই,' বলল আসিফ।

'এটা ঠিক কোন্ জায়গা, তা আমারও জানা নেই,' হেণ্ডারসন বলল। 'তবে আবহাওয়া আর মাটির গঠন দেখে মনে হচ্ছে নর্থ সি, বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোথাও হবে। স্কটল্যাণ্ডও হতে পারে, আমি শিয়োর না।' ঘড়ি দেখল সে। 'দুঃখিত, সময় শেষ!'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ছোট একটা কামরায় বেরিয়ে এল চারজনে। দু'জন অস্ত্রধারী গার্ড অপেক্ষা করছে ওখানে, বিজ্ঞানীদেরকে এলিভেটর থেকে নামতে দেখে মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলল একজন, রিপোর্ট করল। তারপর ওদেরকে নিয়ে গেল বাইরে। একটা মিনিবাস পার্ক করে রাখা হয়েছে, দরজা খুলে তাতে ওঠানো হলো সবাইকে। গার্ডদু'জনও উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করার আগে জানালার কালো কাঁচ তুলে দেয়া হলো, যাতে বাইরেটা দেখতে না পায় আরোহীরা। এক পলকের জন্য রাস্তার প্রান্তে একটা খাঁড়ি চোখে পড়ল আসিফের, সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। সাবমেরিন-পেন নিশ্চয়ই ওটার শেষ মাথায় গড়ে তোলা হয়েছে।

কাঁচা রাস্তা ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলল মিনিবাস। বিশ মিনিট পর থামল। অস্ত্রের ইশারায় চার বিজ্ঞানীকে নামতে বলল গার্ড। বাস থেকে নেমেই কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা একটা কম্পাউণ্ড দেখতে পেল আসিফ-তানিয়া। ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার দেখে বোঝা গেল, বেড়াটা বিদ্যুতায়িত। কম্পাউণ্ডের ভিতরে রয়েছে ছোট-বড় নানা আকারের বিল্ডিং। রুক্ষ চেহারার লোকজন অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সবখানে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের পরিবেশ।

কম্পাউণ্ডের মাঝখানে রয়েছে ওয়ায়্যারহাউস আকৃতির একটা সাদা রঙের বড় বিল্ডিং। কাঁটাতারের আলাদা বেড়া দিয়ে আলাদা

করা। ওদিকে ওদেরকে নিয়ে চলল দুই গার্ড। কাছাকাছি পৌঁছুতেই অপার্থিব এক চিৎকার শোনা গেল, তার পিছু পিছু অনেকগুলো কণ্ঠের চেঁচামেচি। ভয়ঙ্কর আওয়াজ, নবাগতদের শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল।

'কী ওটা?' কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল জয়েস। 'চিড়িয়াখানা?'

'একরকম চিড়িয়াখানাই বলতে পারেন,' হালকা গলায় বলল হেণ্ডারসন। 'অনবদ্য এক চিড়িয়াখানা। কারণ ওখানে যা আছে, তা দুনিয়ার আর কোনও চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবেন না।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না,' বলল তানিয়া। 'কী আছে ওখানে?'

'সবুর করুন, খুব শীঘ্রি বুঝতে পারবেন।'

ঝট্ করে দাঁড়িয়ে গেল আসিফ। হেণ্ডারসনের আস্তিন খামচে ধরল। 'হেঁয়ালি করবেন না, ডক্টর!' কড়া গলায় বলল ও। 'সোজা ভাষায় জবাব দিন। কী আছে ওখানে?'

'দুঃখিত,' বিব্রত কণ্ঠে বলল হেণ্ডারসন। 'ঠাট্টা করা উচিত হয়নি, আপনাদের মানসিক অবস্থা বুঝে কথা বলা উচিত ছিল। এনিওয়ে, ওখানে যা আছে, তা সোজা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। নিজ চোখে দেখলেই সব বুঝে যাবেন। একটাই পরামর্শ দিতে পারি—যা-ই দেখুন, ঘাবড়াবেন না। আপনাদেরকে স্রেফ ভয় দেখাতে চাইবে ওরা, কোনও ক্ষতি করবে না।'

তিক্ত হাসি ফুটল আসিফের ঠোঁটে। 'সাহস জোগানোয় আপনার তুলনা হয় না, ড. হেণ্ডারসন!'

'এবার কিন্তু আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'ব্যাপারটা ছোঁয়াচে। আমি নিরুপায়।'

'ভাল,' কাঁধ ঝাঁকাল হেণ্ডারসন। 'এ-জায়গার সঙ্গে শুধু নরকের তুলনা চলে। হাসি-ঠাট্টা করতে পারলে জীবন কিছুটা

সহজ হবে।'

'নরক?' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া।

'ড. মরোর দ্বীপ বললেই বরং বেশি মানাবে।' এইচ. জি. ওয়েলস্-এর বিখ্যাত উপন্যাসের কথা বলছে হেণ্ডারসন।

বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ডাবল স্টিলের সিকিউরিটি ডোর খুলে ধরল একজন গার্ড। নাকে ভেসে এল উৎকট দুর্গন্ধ; তবে ভিতরে ঢুকে একটু পর ওরা যা দেখল, তার সামনে দুর্গন্ধটা কিছুই নয়।

বিশাল এক গুদামের মত অভ্যন্তর। দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে অনেকগুলো খাঁচা—যেন এক চিড়িয়াখানা। খাঁচাগুলোর ভিতর রয়েছে মনুষ্য-আকৃতির একদল হিংস্র পশু—জান্তব হুঙ্কার ছাড়ছে, শিকের মাঝ দিয়ে হাত বের করে দিয়ে খামচি মারছে বাতাসে। সব মিলিয়ে ত্রিশ-চল্লিশটা প্রাণী, কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়; লম্বা, জট পাকানো চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নেমে এসেছে, ঢেকে দিয়েছে চেহারা। কদাচিৎ চোখে পড়ে রক্তলাল চোখ, তীব্র আক্রোশে জ্বলছে। উন্মুক্ত, কোঁচকানো চামড়ায় ছোপ ছোপ দাগ... বয়সের ভারে যেমনটা হয়।

ভয়াবহ দৃশ্য, যেন অন্যভুবন থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে এরা। দেখলেই শরীর জমে যায় আতঙ্কে। জয়েস চিৎকার করে উঠল, সাহস হারিয়ে ফেলেছে। উল্টো ঘুরে দৌড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল বিল্ডিং থেকে, কিন্তু একজন গার্ড খপ্ করে ধরে ফেলল ওকে, টানতে টানতে ফিরিয়ে আনল ঘরের মাঝখানে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই নতুন একজন মানুষ উদয় হলো। মাঝবয়েসী, পরনে জলপাই রঙের ইউনিফর্ম। মাথায় কালো বেরেট ক্যাপ। ঠোঁটের উপর পুরু গোঁফ, চুরুট টানছে। গটমট করে হেঁটে বন্দিদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'গুড ডে, ড. হেগ্গারসন!' ইয়োরোপীয় উচ্চারণে অভিবাদন জানাল সে। তীক্ষ্ণ চোখে তিন বন্দিকে দেখল। 'এরাই আমাদের নতুন রিক্রুট?'

মাথা ঝাঁকাল হেগ্গারসন। 'হ্যাঁ। তিনজনেই আমাদের ফিল্ড অভ স্টাডিতে এক্সপার্ট।'

দরজায় শব্দ হলো, বড় একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে দু'জন আর্দালি এসে ঢুকল বিল্ডিঙে।

'কী সৌভাগ্য!' বলল ইউনিফর্ম-পরা লোকটা। 'আমাদের অতিথিরা লাঞ্চটাইমে এসেছেন!'

ট্রলির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল আসিফ-তানিয়ার। থরে থরে সাজানো অনেকগুলো ইঁদুর-ধরার খাঁচা দেখা যাচ্ছে ওতে, তাতে কিচমিচ করছে বহুসংখ্য ইঁদুর। জ্যান্ত। ট্রলিটাকে এগোতে দেখেই দ্বিপদী পশুরা চঞ্চল হয়ে উঠল, সবাই এগিয়ে এল পরম প্রত্যাশায়। আর্দালিরা প্রতিটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে একে একে জ্যান্ত ইঁদুর ছুঁড়তে শুরু করল তাদের দিকে। রাক্ষসের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পশুরা, খালি হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল ইঁদুরগুলোকে, খেতে শুরু করল। বীভৎস!

ওয়াক ওয়াক করে উঠল জয়েস, উল্টো ঘুরে আবার ছুট লাগাল দরজার দিকে। বমি করবে। এবার তাকে বাধা দিল না গার্ডরা। একজন শুধু পিছু পিছু গেল ওকে পাহারা দেবার জন্য। আসিফ আর তানিয়া নির্বিকার রইল, কিন্তু ওদের পেটের ভিতরটাও পাক দিতে শুরু করেছে।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল মাঝবয়েসী লোকটা। বলল, 'আপনারা দেখছি আমাদের রি-সাইক্লিং সিস্টেমের মাহাত্ম্য বুঝতে পারছেন না!'

'রি-সাইক্লিং?' জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'ইঁদুরের বড্ড উৎপাত এখানে। ওগুলোকে খতম করছি,

একই সঙ্গে খাবার যোগাচ্ছি পোষা প্রাণীগুলোর। রি-সাইক্লিং নয়?' হেণ্ডারসনের দিকে তাকাল সে। 'জায়গাটা কত চমৎকার, তা আশা করি বুঝিয়ে বলেছেন ওদেরকে?'

'জী না,' হেণ্ডারসন বলল। 'আমার কথা বিশ্বাস করবেন না ওঁরা। আপনিই বুঝিয়ে দিন, কর্নেল।'

'বেশ।' জয়েস ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লোকটা। তারপর বলতে শুরু করল, 'আমি কর্নেল ভেগা—এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির কমাণ্ডার। এই যে... খাঁচার মধ্যে যে-নোংরা জানোয়ারগুলোকে দেখছেন, এরা কোনও এক সময়ে আপনার-আমার মতই স্বাভাবিক মানুষ ছিল। আপনারা যদি, আমার কথামত না চলেন, তা হলে এদের পরিণতি বরণ করবেন, কিংবা খাবার হয়ে যাবেন এদের। পুরোটাই নির্ভর করছে আমার মুড কেমন থাকে, তার ওপর। এখানকার নিয়মকানুন খুবই সরল। নাক-মুখ গুঁজে কাজ করবেন, বিনিময়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া হবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝেছি, কর্নেল,' আসিফ বলল। খোঁচা দেয়ার ঝোঁক সামলাতে পারল না। 'এমন সুযোগ দেয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ!'

'আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টা করবেন না,' কড়া গলায় বলল ভেগা। 'আমি ঠাট্টা-মশকরা পছন্দ করি না।'

গার্ডদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল সে। গরু খেদানোর ভঙ্গিতে বিল্ডিং থেকে বের করে আনা হলো বিজ্ঞানীদের। পিছন পিছন কর্নেল ভেগাও বেরিয়ে এল। নিজের মার্সিডিজ কনভার্টিবলে চড়ে চলে গেল কম্পাউণ্ডের ভিতরদিকে।

'যা ঘটল, তার জন্য দুঃখিত,' বলল হেণ্ডারসন। 'নতুন যারা আসে, তাদেরকে এভাবে ভয় দেখানো কর্নেল ভেগার অভ্যেস।'

'শুধু ভয় বললে কম হয়,' কাঁপা গলায় বলল জয়েস। 'আমার বুকের ধড়ফড়ানি কিছুতেই কমছে না। আরেকটু হলে

জামা-কাপড় ভিজিয়ে ফেলতাম।'

'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। ওদের কথামত চললে ভয়ের কিছু নেই। আর কখনও হয়তো দেখতেও পাবেন না ভয়ঙ্কর ওই প্রাণীগুলোকে।'

'কিন্তু কী ওগুলো?' জানতে চাইল তানিয়া। 'সত্যিই কি মানুষ?'

'এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' হেণ্ডারসন বলল। 'আপনাদের উপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে। চলুন এখন, লিভিং কোয়ার্টারে নিয়ে যাই। গোসল সেরে পোশাক পাল্টে নেবেন। ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।'

আবার মিনিবাসে চড়ল ওরা। কম্পাউণ্ডের আধমাইল ভিতরে যেতেই অ্যাকোমোডেশন এরিয়ায় পৌঁছে গেল। বৃত্তাকার একটা জায়গা—মাঝখানে একটা বড় বিল্ডিং, চারপাশ ঘিরে একতলা বাসস্থান।

'ওটা আমাদের মেইন ল্যাবরেটরি,' বাস থেকে নেমে বড় বিল্ডিংটা দেখাল হেণ্ডারসন। 'আপনারা ওখানেই কাজ করবেন।' ঝকঝকে একটা কটেজ দেখাল এরপর। 'ওখানে কর্নেল ভেগা থাকে। পাশের ঘরগুলোয় থাকে গার্ডরা। আমাদের লিভিং কোয়ার্টার এদিকে।' পথ দেখিয়ে বিপরীত প্রান্তের একসারি কটেজের কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল সে।

ড. হেণ্ডারসনের লাগোয়া একটা কটেজ নিল আসিফ-তানিয়া। ওদের পাশেরটা নিল জয়েস।

'ফ্রেশ হয়ে আমার ঘরে চলে আসুন,' হেণ্ডারসন বলল। 'গল্প করা যাবে।'

বিদায় নিয়ে যার যার কটেজে চলে গেল ওরা। সময় নিয়ে গোসল করল। লাগেজ নেই কারও, তবে সাবান-তোয়ালে-টুথপেস্ট-টুথব্রাশ সহ নতুন একপ্রস্থ জাম্পসুট দেয়া

হয়েছে সবার জন্য। বাথরুমে ওয়ান-টাইম রেজার আর শেভিং ক্রিমও পেল আসিফ। ঘণ্টাখানেক পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজেদেরকে আবার সভ্য মানুষ বলে মনে হলো ওদের।

হেণ্ডারসনের কটেজে যাবার আগে জয়েসের দরজায় কড়া নাড়ল তানিয়া, তারপর দরজা ঠেলে ঢুকল ভিতরে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া গেল তাকে। বিরক্ত করল না তাই, স্বামীকে নিয়ে চলে গেল হেণ্ডারসনের কটেজে।

'আমার ছোট্ট কুটিরে স্বাগতম!' দরজা খুলে সহাস্যে বলল হেণ্ডারসন। 'আসুন ভিতরে। ড. কোর্ট কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে,' সংক্ষেপে বলল তানিয়া।

'হুঁ, ঘুমাক। আপনাদের তুলনায় ভদ্রমহিলা অনেক নাজুক, বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।'

কটেজের ভিতরে নজর বোলাল আসিফ। আকার আয়তনে ওদেরটার মতই, তবে সাজসজ্জা অভিজাত। মেঝেতে নরম কার্পেট, আসবাবপত্রও অনেক আধুনিক। ছোট একটা টিভি, সঙ্গে ভিসিআর আছে। একটা মিনি-ফ্রিজও দেখা গেল ঘরের কোণে। এসি-র কল্যাণে হিমহিম ভাব বিরাজ করছে সবখানে। এসবের কিছুই নেই ওদের আবাসস্থলে।

'মনে হচ্ছে শ্রেণী বিভাজনের শিকার হয়েছি,' ঠাট্টার সুরে বলল ও। 'আপনার ঘরের সঙ্গে আমাদেরটার কোনও তুলনাই চলে না।'

হেসে উঠল হেণ্ডারসন। 'চিফ রিসার্চার হিসেবে একটু-আধটু সুযোগ-সুবিধা তো পেতেই পারি, তাই না? ডোণ্ট ওয়ারি, যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে এসব আপনাদের কপালেও জুটবে।'

'দুঃখিত, আমরা উচ্চাভিলাষী নই।'

'উচ্চাভিলাষের কিছু নেই, প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজেদের

সেরা কাজ দেখাতে হবে আপনাদেরকে,' গম্ভীর গলায় বলল হেণ্ডারসন। ফ্রিজ খুলে একটা উইস্কির বোতল বের করল। 'ড্রিঙ্ক চলবে?'

'উঁহুঁ, কফি থাকলে খাওয়াতে পারেন।'

'পারব।'

কফিমেকার থেকে দু'মগ কফি ঢেলে অতিথিদেরকে দিল হেণ্ডারসন, নিজে উইস্কি নিল। তারপর প্রস্তাব দিল, 'চলুন, বাইরে গিয়ে বসি।'

আপত্তি করল না আসিফ-তানিয়া, তিনজনে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, দ্বীপাঞ্চলের চমৎকার পরিবেশ চারদিকে। বারান্দাটা কম্পাউণ্ডের পিছনদিকে, কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে চোখে পড়ে সবুজ প্রকৃতি, কানে ভেসে আসে সাগরের গর্জন। ক্ষণিকের জন্য পরিস্থিতির কথা ভুলে গেল ওরা।

'সুন্দর জায়গা, ডক্টর,' বলল তানিয়া।

'সেজন্যে বাইরে আসিনি,' বলল হেণ্ডারসন। 'কর্নেল ভেগা আমার উপর কড়া নজর রাখে। ঘরের ভিতরে তাই আড়ি-পাতার যন্ত্র আছে বলে সন্দেহ আমার। ওখানে মন খুলে কথা বলতে পারতাম না।'

'হুম, লোকটাকে এমনিতেই সুবিধের বলে মনে হয়নি আমার।'

'মিথ্যে হুমকি দেয়নি আপনাদের। ধীরে ধীরে ওর স্বরূপ টের পাবেন। বসনিয়ায় অনেকগুলো গণকবর রচনার জন্য ওকে খুঁজছে বিশ্ব-আদালত।'

আসিফ ভুরু কেঁচাকাল। 'আপনি দেখি একের পর এক দুঃসংবাদ দিয়ে চলেছেন! অথচ আপনার আচার-আচরণ দেখে তো মনে হয় না কোনও বিপদের মধ্যে আছেন!'

হেণ্ডারসন কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি আসলে বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কল্পনার সাগরে ভেসে গিয়ে মনকে শান্ত রাখছি। দ্বীপটাকে আমি হলিডে রিসোর্ট হিসেবে কল্পনা করি... একটু অদ্ভুত ধরনের রিসোর্ট আর কী!'

'আমার জানামতে কোনও রিসোর্টের লাঞ্চে ইঁদুর সার্ভ করা হয় না।'

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এল কিছুটা সময়ের জন্য। শেষ পর্যন্ত তানিয়া বলল, 'খাঁচার জন্তুগুলো আসলে কী, ডক্টর? প্লিজ, খুলে বলুন!'

একটু ভাবল হেণ্ডারসন, তারপর বলল, 'ওরা এই প্রজেক্টের সায়েন্টিফিক ফেইলিওর... মানে ব্যর্থতা!'

'আরেকটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হয়,' বলল আসিফ।

'আপনাদেরকে সবকিছু তা হলে গোড়া থেকেই খুলে বলি।' উইস্কিতে চুমুক দিয়ে গলা ভেজাল হেণ্ডারসন। 'ব্যাপারটার সূচনা ঘটেছে বছরখানেক আগে। ফরাসি একটা ল্যাব আমাকে এনযাইম, বা জীবদেহের জটিল প্রোটিন নিয়ে গবেষণার জন্য ভাড়া করে। ওদের মূল আগ্রহ ছিল এইজিং প্রসেস... মানে জীবজন্তুর বয়স বাড়ার ক্ষেত্রে এনযাইমের ভূমিকা নির্ণয়ে। ল্যাবটা ছোট, তবে বিশাল একটা কোম্পানি ওটার মালিক হওয়ায় সুযোগ-সুবিধার কোনও অভাব ছিল না...'

'কোম্পানিটা কাদের?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল আসিফ।

'জানতাম না আমরা, জানার ইচ্ছেও হয়নি। আসলে ওখানে সবাই ছিলাম আমরা সত্যিকার বিজ্ঞানী, মনের মত গবেষণা করতে পেরেই খুশি ছিলাম আমরা। গবেষণার খরচ কে জোগাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও। বিধি-নিষেধের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাতে কিছু মনে করিনি কেউ।'

'কী ধরনের বিধি-নিষেধ?'

'সারাক্ষণ কড়া পাহারায় রাখা হতো আমাদেরকে। চলাফেরায় নানা রকম কড়াকড়ি ছিল। থাকতাম ল্যাবের খুব কাছে, কোম্পানির গাড়িতে আসা-যাওয়া করতে হতো। বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়া হতো না। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হতো কালে-ভদ্রে... তাও আবার প্রহরীদের সামনে, বাড়ি যাওয়ার অনুমতি ছিল না। গবেষণার গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য শপথ করানো হয়েছিল আমাদেরকে। অবশ্য এসবের সবই আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিলাম। বড় বড় কোম্পানিগুলো নিজেদের রিসার্চের খবর এমনিতেই গোপন রাখে, তার ওপর আমরা গবেষণা করছিলাম *ফিলোসফার'স্ স্টোন* নিয়ে...

'*ফিলোসফার'স্ স্টোন!* মানে পরশ পাথর? যা দিয়ে যে-কোনও ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায়?' ভুরু কোঁচকাল তানিয়া। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন কেমিস্ট... আলকেমিস্ট নন।'

'পরশ পাথরের ব্যাপারে আপনি একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন। ওটা শুধু সোনা বানানোর জিনিস নয়, পুরনো আমলের বহু লোক বিশ্বাস করত, ওটা অনন্ত জীবনের উৎস। পাথরটার স্পর্শ পাওয়া পানি বা মদ খেলে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়, আয়ু বাড়ে। ওই বিশেষত্বের পরশ পাথর আসলে খুঁজছিলাম আমরা।'

'অমরত্বের অন্বেষা,' বলল আসিফ। 'এরচেয়ে ধাতুকে সোনা বানানো বরং অনেক সহজ।'

মলিন হাসি ফুটল হেণ্ডারসনের ঠোঁটে। 'ও-কথা আমিও বহুবার ভেবেছি। গবেষণার সময় অনিশ্চয়তায় ভুগেছি... কাজটা আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে মনে।'

'এই অন্বেষায় আপনিই প্রথম ব্যর্থ হচ্ছেন না।'

'না, ড. রেজা। আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি ব্যর্থ হইনি।'

'মানে? অনন্ত জীবনের উৎস আপনি খুঁজে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আটলান্টিক মহাসাগরের তলায়... গোস্ট সিটির হাইড্রো-থারমাল ভেন্টগুলোয় পেয়েছি আমি সেই উৎস।'

বোকা বোকা চোখে হেণ্ডারসনের দিকে তাকাল রেজা দম্পতি। বোঝার চেষ্টা করছে, লোকটা ঠাট্টা করছে কি না। কিন্তু কেমিস্টের চেহারায় কোনও ভণিতা দেখতে পেল না।

'কিছু মনে করবেন না, ডক্টর। সাগরের তলা নিয়েই কারবার আমার,' বলল আসিফ। 'কিন্তু ওখানে কোথাও অমরত্বের ঝর্ণা আছে বলে শুনিনি।'

তানিয়া সুর মেলাল। 'মেরিন বায়োলজিস্ট হিসেবে গোস্ট সিটি সম্পর্কে আসিফের চেয়ে বেশি জানি আমি। মানুষকে অমর বানানোর মত কিছু ওখানে আছে বলে জানা নেই আমার।'

হেণ্ডারসনের চোখের তারা ঝিকমিক করে উঠল। 'যা ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন আপনি, ম্যা'ম। দয়া করে বলবেন কি... কেন ওখানকার মাইক্রোব কলোনি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে এত তোলপাড় হয়েছে?'

'এ তো খুবই সহজ,' বলল তানিয়া। 'ওখানে যে-ধরনের ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। ওগুলোকে জীবন্ত ফসিল বলা হচ্ছে। পৃথিবীর সূচনালগ্নের পরিবেশ বিরাজ করছে গোস্ট সিটিতে। আমরা যদি ওখানকার মাইক্রোবগুলোর জন্ম-রহস্য ভেদ করতে পারি, তা হলে পৃথিবীতে কীভাবে প্রাণের সূচনা হয়েছিল, তা জেনে ফেলব।'

'ঠিক বলেছেন। আমার চিন্তাধারাও ছিল একই ধরনের। আমি ভাবছিলাম, যে-জিনিস জীবনের সূচনা ঘটাতে পারে, সেটা জীবনকে প্রলম্বিতই বা করতে পারবে না কেন? গোস্ট সিটি থেকে সংগ্রহ করা স্যাম্পল ছিল আমাদের কাছে। মাইক্রোবগুলোর এনযাইম বিশ্লেষণ করতেই পেয়ে গেলাম সাফল্যের চাবিকাঠি!'

আগ্রহী হয়ে উঠেছে রেজা দম্পতি। আসিফ বলল, 'কীভাবে?'

চেয়ারে হেলান দিল হেণ্ডারসন। 'দেখুন, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই একটা কমন লক্ষ্য আছে—বংশবিস্তার। নতুন প্রজন্মকে জন্ম দিই আমরা, সব কাজের দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিই, তারপর অথর্ব হয়ে পড়ি। এক ধরনের সেলফ-ডেস্ট্রাক্টিং জিন আছে আমাদের শরীরে—পুরনো প্রজন্মকে হটিয়ে দেয়ার জন্য, যাতে নবীন-রা জায়গা করে নিতে পারে পৃথিবীর বুকে। মানবজাতির ভিতর কখনও কখনও এ-জিন সময়ের আগেই সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার ফলে হয় *ওয়ার্নারস্ প্রোগেরিয়া*-র মত রোগ—ওতে আট বছরের শিশুকে আশি বছরের বৃদ্ধের মত চেহারা পেতে দেখা যায়। আমাদের থিয়োরি হলো—জিনটা যেহেতু অসময়ে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, ওটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়াও সম্ভব। বার্ধক্য আর জরাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে তাতে।'

'এ-ধরনের একটা থিয়োরি আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন কীভাবে?' বলল তানিয়া। 'টেস্ট সাবজেক্টরা সত্যিই স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশি বাঁচে কি না, তা জানতে হলে দেড়শো-দুশো বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'গুড পয়েন্ট। এর পাশাপাশি পেটেন্ট নিয়েও ভাবতে হবে। ধরুন এনযাইম তৈরি করলাম, কিন্তু ওটার কার্যক্ষমতা নির্ণয়ের আগেই পেটেন্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। যে-কেউ তৈরি করতে পারবে ওই প্রোডাক্ট। অথচ তা হতে দেয়া যায় না। কারণ আমাদের এনযাইম শুধু বার্ধক্যই ঠেকাবে না, সুপার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে বার্ধক্যের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলোকেও হটিয়ে দেবে। চামড়া কুঁচকাবে না, দৃষ্টিশক্তি কমবে না... সোজা কথায় অনন্ত যৌবন এনে দেবে!'

'অমরত্বের পরশ-পাথর!' আপন মনে বলল আসিফ।

'এবার আপনারা বুঝতে শুরু করেছেন!' সন্তোষ ফুটল হেণ্ডারসনের কণ্ঠে। 'ড. তানিয়া, আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তো? মানুষটা কতদিন বাঁচবে, সেটা পরের কথা। কিন্তু এনযাইমটা সত্যিই কার্যকর কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। জিনিসটা প্রয়োগ করা হলে যৌবন ফিরে পাবে বৃদ্ধরা।'

'এই এনযাইম আপনারা তৈরি করতে পেরেছেন?' তানিয়ার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ। সাফল্যের সঙ্গে অ্যানিমেল-টেস্টিংও করেছি। বুড়ো কয়েকটা ইঁদুরের বয়স রাতারাতি কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা।'

'কতটা কমিয়েছেন?'

'অর্ধেক। পেশি আর হাড়ের গড়ন, শক্তিমত্তা, বংশবিস্তারের ক্ষমতা... এসব পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কোনও ভুল নেই। বোঝার ক্ষমতা থাকলে ইঁদুরগুলোও চমকে যেত।'

'ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছেন, স্বীকার করছি,' বলল তানিয়া। 'কিন্তু ইঁদুরের চেয়ে মানবদেহ অনেক জটিল।'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'সেটা এখন আমরা জানি।'

'তারমানে মানুষের উপরও পরীক্ষা চালিয়েছেন আপনারা?'

'আমি না, আমার টিমও না। তড়িঘড়ি করে এতবড় পদক্ষেপ নেবার পক্ষপাতী ছিলাম না কেউই। কোম্পানির কাছে স্রেফ প্রিলিমিনারি টেস্টগুলোর ফলাফল জমা দিয়েছিলাম আমরা। সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছিলাম, এনযাইমটা হিউম্যান টেস্টিঙের জন্য তৈরি নয়। আরও কাজ করতে হবে ওটার ওপর। রিপোর্ট পাবার পর কিছুদিন চুপচাপ রইল কোম্পানি, তারপর আমাদের রিসার্চ টিম ভেঙে দেয়া হলো, বন্ধ করে দেয়া হলো ল্যাব। না, অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। হাসিমুখে বিদায় দেয়া হয়েছে

আমাদেরকে, মোটাসোটা বোনাস-সহ। বলা হয়েছিল, প্রিলিমিনারি ডেটাগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে গবেষণার পরবর্তী ধাপের জন্য আবার খবর দেয়া হবে। এরপরই ঘটল ঘটনাটা!'

'কী ঘটনা?'

'ল্যাবের কম্পিউটারগুলোর সমস্ত ফাইল আর্কাইভ করে রাখছিল আমাদের এক কলিগ, মাস্টার-কম্পিউটারে কয়েকটা ভিডিও আবিষ্কার করে বসে। তাতে মানুষের ওপর আমাদের এনযাইমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছবি ছিল। নির্জন এক দ্বীপে চলছিল ওই গবেষণা...'

'এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল হেগ্রারসন। 'এরপরই বিরাট এক ভুল করে বসি আমরা। দল বেঁধে কোম্পানির প্রতিনিধির অফিসে গিয়ে হাজির হই। প্রতিবাদ করি হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টের বিরুদ্ধে। ঝোঁকের বশে করেছি সেটা। লোকগুলো কতটা ভয়ঙ্কর, তা আমাদের কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। এনিওয়ে, অফিস থেকে জানানো হলো—ও-নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার হারিয়েছি আমরা; তা ছাড়া এক্সপেরিমেন্টের মানুষগুলো স্বেচ্ছায় অংশ নিচ্ছে ওতে। খেপে গিয়ে মিডিয়ায় সব ফাঁস করে দেবার হুমকি দিলাম আমরা। কোম্পানি আমাদেরকে শান্ত করল ভাবনাচিন্তার জন্য কয়েকদিন সময় চেয়ে। বোনাসের উপরে ডাবল বোনাস দেয়া হলো সবাইকে, ছুটিতে পাঠানো হলো। এরপরই আমার সঙ্গীসাথীরা বিভিন্ন *দুর্ঘটনা*-য় পড়ে মরতে শুরু করল। কার-অ্যাকসিডেন্ট, হার্ট-অ্যাটাক, আত্মহত্যা... আরও কত কী! সব মিলিয়ে একুশজন বিজ্ঞানী!'

'আপনার ধারণা, ওঁদের সবাইকে খুন করা হয়েছে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল তানিয়া।

'ধারণা নয়, আমি নিশ্চিতভাবে জানি—ওদেরকে খুনই করা হয়েছে।'

'এতজন মারা গেল, পুলিশ কিছু সন্দেহ করেনি?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'দশটা দেশের নাগরিক ছিল ওদের ভিতর, ড. আসিফ। একেকজন একেক জায়গায়... ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মারা গেছে। এর ভিতর যোগসূত্র আবিষ্কার করা কঠিন। তা ছাড়া... পুলিশ কিছু সন্দেহ করলেও তো প্রমাণ নেই। গোপন গবেষণা করছিলাম আমরা, মারা যাওয়া মানুষগুলো যে একে অপরকে চিনত—এটাই তো জানে না ওরা।'

'আপনি বাঁচলেন কীভাবে?'

'কপালজোরে। প্রজেক্ট শেষ হবার পর বাড়িতে ফিরিনি, বেড়াতে চলে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রাচ্যে। স্কটল্যাণ্ডে যখন ফিরলাম, তখন ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'আপনাকে খুন করল না কেন?'

'নতুন একটা রিসার্চ টিম গড়ার জন্য আমাকে প্রয়োজন হয়েছে ওদের। অরিজিন্যাল টিমকে খুন করার পর ফর্মুলায় বিভিন্ন রকম খুঁত আবিষ্কার করে ওরা। অবাক হবার কিছু নেই, এমন জটিল একটা গবেষণা চট করে শেষ করা যায় না। অনেককিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়। সেসবের সুযোগ দেয়া হয়নি আমাদেরকে। এখন সেগুলো শোধরাতে হচ্ছে আমাকে।'

'কী ধরনের খুঁতের কথা বলছেন?'

'খাঁচায় বন্দি খুঁত—সায়েন্টিফিক ফেইলিওর... আপনারা যেগুলো দেখে এসেছেন। একদল মিউট্যান্ট!'

চোখ বড় হয়ে গেল তানিয়ার। 'ওই জন্তুগুলো আপনার অমরত্বের এনযাইমের সৃষ্টি?'

মাথা ঝাঁকাল হেগারসন। 'ঠিক ধরেছেন। মানুষের ভিতর অন্যরকম প্রতিক্রিয়া করে এনযাইমটা। আমাদের শরীরতত্ত্ব অনেক জটিল, একটু আগে সেটা নিজেই বলেছেন আপনি। কেমিক্যালটা কতখানি প্রয়োগ করতে হবে, সেটা একটা বড় ইস্যু। শরীরে বেশি পরিমাণে ইনজেক্ট করলে সাবজেক্ট মারা যাচ্ছিল, কম পরিমাণে করলেও দেখা দিচ্ছিল *প্রোগেরিয়া*, বা অকাল-বার্ধক্য। যাদের বেলায় কোনোটিই ঘটেনি, তারা পরিণত হয়েছে পশুতে—খাঁচার ওই মিউট্যান্টগুলোর কথা বলছি।'

'কেন এমন হলো?'

'যদ্দূর বুঝেছি, এনযাইমটা ওদের ভিতর থেকে মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তিগুলো বের করে এনেছে। প্রবর্তনের আগে... মানুষ যখন অন্যান্য পশুর মত ছিল, তখন মানবিক আবেগ-অনুভূতি ছিল না আমাদের মধ্যে। পাশবিকতা আর হিংস্রতাই ছিল একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ওদের জিনের মধ্যে সুপ্ত ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আবার জাগিয়ে তুলেছে এনযাইমটা। স্বাভাবিক মানবীয় গুণাবলী হারিয়ে গেছে, পশুর মত আচরণ করছে ওরা। কিন্তু বাইরেটা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না, ওরা এখনও মানুষই বটে। কর্নেল ভেগা সেটা টের পেয়েছে।'

'মানে?'

'দু'ধরনের প্রাণী আছে ওদের মধ্যে—*আলফা* আর *বিটা* বলে ডাকি আমরা। আমাকে বলা হয়েছে, আলফা গ্রুপটা হলো বহুদিন আগে করা আরেকটা এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল। অপেক্ষাকৃত সফল এক্সপেরিমেন্টও বলা যায়। কারণ পশুর মত আচরণ করলেও আলফা-রা অত্যন্ত স্মার্ট। কিছুদিন আগে ওদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটা মিউট্যান্ট পালিয়ে গিয়েছিল দ্বীপ ছেড়ে। বিস্ময়কর একটা ঘটনা বলতে হবে... গাছের গুঁড়ি দিয়ে ভেলা বানিয়েছিল ওরা, চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আরেকটা দ্বীপে চলে গিয়েছিল! মানুষের

বুদ্ধি ছাড়া এ-কাজ সম্ভব নয়।'

'তারপর?'

'ওই দ্বীপে কী যেন একটা ফিল্মের শুটিং চলছিল, ওখানে হামলা চালায় মিউট্যান্টরা, ফিল্ম ক্রু-দেরকে খুন করে। পরে ভেগা ওদেরকে ধরে আনে। বেশ কয়েকটা আলফা-কে টরচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়... বাকি মিউট্যান্টদের শিক্ষা দেবার জন্য।'

'নিয়ন্ত্রণ করা যদি এতই কঠিন হয়, তা হলে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার মানে কী?'

'প্রজেক্টের মালিকদের চোখে যথেষ্ট মূল্য আছে প্রাণীগুলোর। ডিসপোজেবল টুলের মত। যেখানে-সেখানে ব্যবহার করা যায়, নষ্ট হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই কোনও। আলফা গ্রুপের পরিচয় জানি না, তবে বিটা গ্রুপটা হচ্ছে আমাদের এনযাইমের সৃষ্টি। অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট... তৃতীয় বিশ্বের গরীব মানুষ; ইয়োরোপ-আমেরিকায় কাজের লোভ দেখিয়ে আদম-ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। এদের খোঁজ নেবার কেউ নেই।'

আসিফের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। এমন অমানবিক পৈশাচিকতার কথা ভাবাই যায় না! কে করছে এসব?

তানিয়াও গম্ভীর হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। আলভিনকে হাইজ্যাক করে আমাদেরকে ধরে আনা হলো কেন?'

'স্বাভাবিক পরিবেশে এনযাইমটা খুব বেশি সময় টিকে থাকে না,' হেণ্ডারসন বলল। 'তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে ওটা সংগ্রহ করে নিতে হয়। সাবমেরিনটা সে-কাজই করে। গোস্ট সিটির মাইক্রোব-কলোনি ভেঙে এনযাইম সংগ্রহ করে ওটা; ওখানেই স্ট্যাবিলাইজ করে নেয় জিনিসটা, তারপর এই দ্বীপে নিয়ে আসে গবেষণার জন্য। আপনাদের এক্সপিডিশনের কথা জানত ওরা।

ভয় পাচ্ছিল, গোস্ট সিটিতে ওদের মাইনিং অপারেশনের খবর ফাঁস হয়ে যাবে। তাই ঠেকানো হয়েছে আপনাদেরকে। দুর্ভাগ্যই বলব... অসময়ে ওখানে গিয়েছিলেন।'

'এতে ভাগ্যের কোনও ভূমিকা নেই, ডক্টর,' বলল আসিফ। 'আমরা ওখানে গরগন-উইডের উৎস খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

এবার হেণ্ডারসনের অবাক হবার পালা। 'গরগন-উইড! সে আবার কী জিনিস?'

'সাধারণ সামুদ্রিক-শৈবালের মিউটেটেড রূপ,' বলল তানিয়া। 'মস্ত এক উপদ্রব হিসেবে দেখা দিয়েছে ওটা। মিউটেশনের উৎস আমরা গোস্ট সিটি বলে ধারণা করছি।'

'মিউটেশন? কী ধরনের মিউটেশন?'

'সবচেয়ে বাজে ধরনের। শৈবালটাকে ঠেকানো না হলে সারা দুনিয়ার সাগর ঢেকে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে জলপথে বাণিজ্য। ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে পরিবেশের উপর। সামুদ্রিক সমস্ত প্রাণী মারা যাবে, আবহাওয়া বদলে যাবে। ক্ষুধা আর মন্দায় আক্রান্ত হবে পৃথিবী। মারা যাবে কোটি কোটি মানুষ!'

চুপ করে কথাটা শুনল হেণ্ডারসন, কোনও মন্তব্য করল না।

'কী ব্যাপার... আপনি মনে হয় অবাক হননি?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'এমন কিছু যে ঘটতে পারে, তা আমি আগেই ধারণা করেছি।'

'ধারণা করেছেন? কীভাবে?'

'গোস্ট সিটির মাইক্রোব আর এনযাইমের কথা বলছি... ওগুলোর ক্ষমতা কতখানি, ভাবুন। ইঁদুরের বয়স কমিয়ে দিচ্ছে, মানুষকে পশুতে পরিণত করছে... সবই ঘটছে জেনেটিক লেভেলে। মানে, অন্যান্য জীবের মধ্যে মিউটেশন ঘটাচ্ছে ওগুলো। নিজস্ব পরিবেশে মাইক্রোবগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে,

কিন্তু আমরা ওদের কলোনি ভেঙে দিচ্ছি। ফলে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারছে। শৈবালের মিউটেশন এ-কারণেই ঘটেছে... আমি শিয়োর! জানতাম এমন কিছু ঘটবে!'

'মিউটেশনটা বন্ধ করা যায় না? মিউটেটেড শৈবালকে কি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব?'

'এখানে ওই মাইক্রোব আর এনযাইম নিয়েই গবেষণা করছি আমরা। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। একেবারে অসম্ভব বলে মনে করি না। কিন্তু অমরত্বের ফর্মুলা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে দেবে না ওরা।'

'কর্নেল ভেগাকে যদি বুঝিয়ে বলি? হাজার হোক, পুরো দুনিয়া এখন ঝুঁকির মুখে!'

হেসে উঠল হেণ্ডারসন। 'ভেগার চোখে এই দ্বীপই ওর দুনিয়া। আর ও এখানকার ঈশ্বর। কিছুই বুঝতে চাইবে না, খামোকা সময় নষ্ট করবেন।'

'তা হলে পালাতে হবে আমাদেরকে,' দৃঢ় গলায় বলল আসিফ।

'আগেই বলেছি, সেটা অসম্ভব। পালাতে পারবেন না। কেউ আপনাদেরকে উদ্ধার করতেও আসবে না।'

'আসবে,' বলল তানিয়া। 'আমরা নুমা-র বিজ্ঞানী। আমাদের খোঁজে দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলবেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না,' উইস্কির গ্লাস খালি করে ফেলল হেণ্ডারসন। 'কারণ কোথায় আপনাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা জানার উপায় নেই কারও। ভেগার মুখে শুনেছি, সমস্ত ক্লু মুছে দিয়েছে সে। কীভাবে, তা জানি না। তবে দ্বীপ থেকে বেশ কিছু মিউট্যান্টকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুরো ব্যাপারটায় ওদের নিশ্চয়ই কোনও ভূমিকা আছে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল আসিফ-তানিয়া। বুঝতে পারছে, বাইরের সাহায্য পাওয়া যাবে না। ওদেরকে ধরে আনার পাশাপাশি রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এরও নিশ্চয়ই কোনও ক্ষতি করেছে শত্রুরা।

জাহাজের সহকর্মীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কিন্তু জোর করে সেটা চাপা দিল আসিফ। আগে হাতের সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।

'যেভাবে হোক, পালাব আমরা,' বলল ও। 'আপনার টিমে এখন কতজন বিজ্ঞানী আছে?'

'ছ'জন,' হেপ্তারসন বলল। 'ডিনারের সময় দেখা পাবেন সবার। তবে ওদের কাছ থেকে কিছু আশা করবেন না। সাদাসিধে মানুষ সবাই, ভেগার খুনে-বাহিনীর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। আমরাও ওই মিউট্যান্টদের মত ডিসপোজেবল টুল, ড. আসিফ। গবেষণার খাতিরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কাজ শেষ হলেই খতম করে দেয়া হবে।'

'কতটা সময় পাব আমরা, বলতে পারেন?'

'খুব বেশি না। সফল হলেই যে মারা যাব, তা জানি বলে আমরা ইচ্ছে করে গবেষণার জন্য বেশি সময় নিচ্ছি... মানে, সন্দেহ না জাগিয়ে যতটা পারা যায় আর কী! কিছুটা সাফল্য না দেখালেও মুশকিল। এসব করতে করতে শেষ সীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। অলরেডি ফিনিশড্ প্রোডাক্টের একটা শিপমেন্ট পাঠাতে হয়েছে আমাদেরকে।'

'ফিনিশড্ প্রোডাক্ট! তা হলে তো শেষ সীমা অতিক্রমই করে ফেলেছেন!'

'নির্ভর করছে আমাদের নিয়োগকর্তারা কতটা ধৈর্যশীল, তার ওপর। ফিনিশড্ প্রোডাক্টটা প্রাথমিক অবস্থায় চমৎকার কাজ করবে... রীতিমত জাদু দেখাবে বলতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

কী ঘটে, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওরা তা করে কি না, সেটাই দেখার বিষয়। বলা যায় না, শুরুতেই খুশি হয়ে আমাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারে।'

'তা হলে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসার মানে কী? ওরা যদি ফিনিশড্ প্রোডাক্ট পেয়ে যায়, তা হলে নতুন তিনজন বিজ্ঞানী দিয়ে কী করবে? প্রজেক্টই তো শেষ!'

'না, ড. আসিফ। এই প্রজেক্ট এখনও শেষ হয়নি। আস্থা রাখুন আমার উপর।' হেণ্ডারসন বলল। 'যথেষ্ট অগ্রগতি দেখিয়েছি আমি ওদেরকে খুশি করার জন্য, কিন্তু কাজ এখনও বাকি আছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্কটিশ বিজ্ঞানী মুখের ভাব জরিপ করল আসিফ। রহস্য করছে লোকটা। অভিযোগের সুরে বলল, 'কিছু একটা আপনি গোপন করছেন, ডক্টর!'

'সিরিয়াস কিছু না,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল হেণ্ডারসন। 'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ। বারান্দার কিনারায় গিয়ে তাকাল প্রকৃতির দিকে। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ, দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা।

'কিছু ভাবছ?' পিছন থেকে জানতে চাইল তানিয়া।

ঘুরে দাঁড়াল আসিফ। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। 'ড. হেণ্ডারসন, এই দ্বীপের সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চাই আমি। কোথায় কী আছে, কীভাবে পাহারা দেয়া হয়.... স-অ-ব!'

'এখনও পালাবার কথা ভাবছেন?' হতাশ গলায় বলল হেণ্ডারসন। 'ভুলে যান! কোনও উপায় নেই।'

'উপায় সবসময়ই থাকে, ডক্টর,' শান্ত গলায় বলল তানিয়া। স্বামীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক প্রত্যয় ভর করেছে ওর ভিতর। 'আমাদেরকে শুধু তা খুঁজে বের করতে হবে!'

ছয়

ঠিক সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল লুনার। চোখ খুলতেই দেখল, দিনের প্রথম আলোয় ভরে গেছে কামরার অভ্যন্তর। বিছানায় ও ছাড়া আর কেউ নেই। কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো, চোখ বোলাল কামরার ভিতর। জানালার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে আছে রানা, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বাইরে।

'রানা!' জড়ানো গলায় ডাকল ও।

ঘাড় ফেরাল রানা। হাসল। 'গুড মর্নিং! ঘুম ভাল হয়েছে?'

উঠে বসল লুনা। 'হুঁ। কোন্‌খান দিয়ে রাত কেটে গেছে, টেরই পাইনি। তুমি কখন জেগেছ?'

'ঘুমিয়েছি নাকি যে জাগব? রাতভর পাহারা দিচ্ছি তোমাকে!'

'মানে?'

'বুভারিদের নাগালের মধ্যে আছি আমরা এখনও। বাইরে চোখ রাখতে হয়েছে, ওরা উদয় হলে যেন দেখতে পাই।'

'তাই বলে সারারাত জেগে থাকবে? আমাকে বললেও তো দু-চার ঘণ্টা পাহারা দিতে পারতাম!'

'তুমি তো বিছানায় উঠতেই ঘুমিয়ে গেলে! কপালে আদর-সোহাগই জুটল না, পাহারা দিতে ডাকি কীভাবে?'

লজ্জায় আরক্ত হলো লুনার মুখ। 'সরি...'

হেসে ফেলল রানা। 'আরে, আমি তো ঠাট্টা করছি! কিছু ঘটেনি আমাদের মধ্যে, সেটা বরং ভাল হয়েছে। ক্ষণিকের আবেগের বশে ওসব উচিতও হতো না। ওঠো এখন, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে।'

বিছানা থেকে নেমে পড়ল লুনা। বাথরুম থেকে যখন বেরুল, ততক্ষণে নাশতা এসে পড়েছে। খেতে বসল দুজনে।

'আচ্ছা, রুমের ভাড়া-ব্রেকফাস্ট... এসবের বিল দেবে কীভাবে?' পাউরুটিতে কামড় দিয়ে জানতে চাইল লুনা।

'টাকা আছে আমার কাছে,' বলল রানা। 'পোশাক পাল্টালেও ওয়ালেট আর সেলফোন হাতছাড়া করিনি। ভাঁড়ের পোশাকের পকেটে নিয়ে নিয়েছিলাম।'

'এত দৌড়ঝাঁপের পরও হারায়নি ওগুলো?'

'ফোনটা হারিয়েছি পরিখার পানিতে। কপাল ভাল, ওয়ালেটটা শুধু ভিজেছে, পকেট থেকে পড়ে যায়নি। রাতে শুকিয়ে নিয়েছি সবক'টা নোট। সকালে এখানকার একজন মেইডকে পাঠিয়েছি আমাদের জন্য পোশাক কিনে আনতে। একটা গাড়িও ভাড়া করতে বলেছি প্যারিসে যাবার জন্য।'

'ভাল করেছ,' বলে নাশতায় মন দিল লুনা। একটু পর কী মনে পড়তে মুখ তুলে তাকাল। 'আচ্ছা, বুভারিদের ব্যাপারে কী করবে বলে ভাবছ? পুলিশে রিপোর্ট করবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তাতে কোনও লাভ হবে না। ওদের মত ধনী আর প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছুই করতে পারবে না।'

'কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, রানা।'

'স্বীকার করি। কিন্তু আইন আমাদের কোন্ কথাটা বিশ্বাস করবে? *পিট অ্যাণ্ড দ্য পেণ্ডুলাম*, নাকি *কাস্ক অভ অ্যামন্টিলাডো*-র গল্প? বরং বুভারিদের বিমান চুরি করার দায়ে

আমরাই উল্টো ফেঁসে যেতে পারি।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লুনা। 'বুঝতে পারছি সমস্যাটা। কিন্তু তাই বলে ওদেরকে পার পেয়ে যেতে দেব?'

'সেটা তো বলিনি,' রানা বলল। 'ওদের বিরুদ্ধে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা নেব আমরা, তবে তার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। আপাতত প্যারিসে ফিরে যাব আমরা, পরিচিত লোকজন আর কন্ট্যাক্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। চেষ্টা করব বুভারিদের সমস্ত কুকর্মের প্রমাণ জোগাড় করতে।'

'তুমি যা ভাল বোঝো।'

'ইয়ে...' গলা খাঁকারি দিল রানা, 'দেশমকে কী বলবে? ওর শখের অ্যান্টিক গাড়িটার যে-দশা করেছি আমরা...'

'ও নিয়ে ভেবো না,' হাসল লুনা। 'গাড়িটা এমনিতেই বদলাবার কথা ভাবছিল দিদিয়ের। নষ্ট হওয়ায় বরং লাভ হয়েছে, বীমা বাবদ একগাদা টাকা পাবে।'

ব্রেকফাস্ট শেষে করার কিছু রইল না। ভাঁড় আর কালো বেড়ালের কস্টিউম পরে দিনের বেলা কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। সরাইখানার মেইড নতুন পোশাক নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটানোর জন্য আলাপচারিতা চলল দুজনের মধ্যে।

'আচ্ছা,' বলল লুনা। 'লর্ড ওয়ালটনের কথাগুলো কি তোমার বিশ্বাস হয়? সত্যিই কি বুভারিরা প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী?'

'বিশ্বাস করা একটু কঠিন,' রানা বলল। 'অল্প কিছু মানুষের পক্ষে এত বড় দুটো যুদ্ধ বাধানো সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে দম্ভ, বোকামি আর হিসেবের ভুলচুকের বিরাট ভূমিকা থাকে।'

'তা ঠিক। কিন্তু সময়টার কথা ভাবো। ১৯১৪ সালে মহাশক্তিগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে অযোগ্য

কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ক। যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্তটা ছিল অল্প কয়েকজন মানুষেরই হাতে—ওদের কেউই খুব একটা দূরদর্শী ছিল না, ছিল স্বেচ্ছাচারী। একজন জার, বা কাইজারকে জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করতে হতো না। বুভারি বা অন্যান্য অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে কি তাদেরকে ম্যানিপুলেট করা সম্ভব ছিল না? তার ওপর গ্র্যাণ্ড ডিউকের হত্যাকাণ্ডটা ছিল একটা বড় অনুঘটক!'

'হুম, ওভাবে চিন্তা করলে অবশ্য মেনে নিতে হয় ওয়ালটনের অভিযোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও মোটামুটি একই পরিবেশ বিরাজ করছিল। হিটলারকে পোল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য প্রভাবিত করে ওই যুদ্ধও বাধানো হতে পারে।'

'তার মানে তুমি মেনে নিচ্ছ, এসবের পিছনে বুভারিদের হাত আছে?'

'হাতে প্রমাণ নেই, কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা হবার পর বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি—এককভাবে দুনিয়াকে বিশ্বযুদ্ধে ঠেলে দেয়ার চিন্তা কেবল বুভারিদের মাথা থেকেই বেরুতে পারে। ওয়ালটন অভিযোগের আঙুল তোলায় তাকে যেভাবে খুন করা হলো, তাতে মনে হচ্ছে কথাগুলোর মাঝে সত্যতা আছে।'

ইংরেজ লর্ডের পরিণতির কথা ভাবতেই কেঁপে উঠল লুনা। 'ওয়ালটন বলছিলেন, থিয়োডর বুভারি যুদ্ধটা থামাবার চেষ্টা করছিল। ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে ক্র্যাশ করে তার বিমান। কিন্তু ভেবে দেখেছ, আল্পস্ পেরুলেই ও সুইটজারল্যাণ্ডে পৌঁছে যেত!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছ। সুইটজারল্যাণ্ড একটা নিরপেক্ষ দেশ... ওখান থেকে পরিবারের উদ্দেশ্য দুনিয়ার সামনে ফাঁস করে দিতে পারত থিয়োডর।' নড়েচড়ে বসল ও। 'ঠিক আছে, আরেকটু ভাবা যাক ব্যাপারটা নিয়ে। প্রভাবশালী লোক ছিল থিয়োডর বুভারি, কিন্তু তারপরও নিশ্চয়ই ওর মুখের কথা বিশ্বাস করত না কেউ? দুনিয়াকে

দেখাবার জন্য প্রমাণ থাকা দরকার ওর কাছে—কাগজপত্র, বা গোপন দলিল...'

'অবশ্যই!' উত্তেজিত হয়ে উঠল লুনা। 'গ্লেসিয়ারে পাওয়া ওই স্ট্রংবক্সটা! থিয়োডর নিয়ে যাচ্ছিল ওটা... নিশ্চয়ই ভিতরে সমস্ত প্রমাণ ছিল। পরিবারের নোংরা পরিকল্পনা ফাঁস হতে দিতে চায়নি বুভারিরা, সেজন্যেই খুন করা হয়েছে ওকে! স্ট্রংবক্সটাও আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওদের পোষা গুণ্ডা।'

'আমি ঠিক মানতে পারছি না,' রানা কেন যেন দ্বিধান্বিত। 'দলিলপত্রগুলো প্রকাশ পেলেই বা কী এসে-যেত? টাকার অভাব নেই বুভারিদের, ভাল একটা পাবলিক রিলেশন্স ফার্ম ভাড়া করে পাল্টা অভিযোগ আনতে পারত—অপপ্রচার চালানো হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে। নামি-দামি উকিল ভাড়া করে মানহানির মামলা ঠুকতে পারত। দলিলগুলো জাল বলে দাবি করতে পারত। আফটার অল, এত বছর পর তো কোনও কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়!'

'তা হলে রিসার্চ টানেল পানিতে ডুবিয়ে দিল কেন? লেগ্রাঁকে খুন করল কেন? আমাদেরকেই বা খুন করার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে কেন?'

'হুম, তা হলে অন্য একটা থিয়োরি নিয়ে ভাবা যাক। হয়তো স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ নতুন কোনও প্রোডাক্ট ছাড়তে চলেছে বাজারে। কিংবা কোনও বড় কন্ট্রাক্ট পেতে যাচ্ছে বড় কোনও সুপারপাওয়ারের কাছ থেকে। প্রমাণ হোক, বা না হোক, ওদের নামে দুর্নাম ছড়ালে সেসব ভেস্তে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল লুনা। 'এটা একটা চমৎকার ব্যাখ্যা হতে পারে ওদের আচরণের।'

'কিন্তু একটা জিনিসের ব্যাখ্যা পাচ্ছি না,' রানা বলল। 'পুরনো ওই হেলমেটটা কেন থিয়োডর বুভারির সঙ্গে ছিল?'

'শখের জিনিস হতে পারে,' আন্দাজ করল লুনা। 'হয়তো

ফেলে যেতে চায়নি।'

'বড্ড সহজ করে ভাবছ তুমি,' রানা একমত হলো না 'বুভারিরা হলো হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক, কিন্তু ওদের প্রতিটা কাজের পিছনেই একটা উদ্দেশ্য থাকে। থিয়োডর বুভারি স্রেফ শখের বশে ওটা সঙ্গে নিয়েছিল বলে বিশ্বাস করি না আমি। যদি তা-ই হতো, তা হলে মাদাম বুভারি ওটা ফিরে পাবার জন্য এমন খেপে যেত না।'

'ওতে কোনও রহস্য আছে ভাবছ?'

'নিঃসন্দেহে।'

'দিদিয়ের হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে সেটা। এখান থেকে ফিরেই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

দরজায় টোকা পড়ায় আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটল। শপিং ব্যাগ নিয়ে ফিরে এসেছে মেইড। তাতে রানা আর লুনার জন্য নতুন পোশাক। আহামরি কিছু নয়, তবে কাজ চলে যাবে। মেইডকে বখশিশ দিয়ে খুশি করল রানা। পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এল সরাইখানা থেকে, ইতিমধ্যে ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে। রেন্টাল এজেন্সি থেকে একটা সিত্রোঁ সেডান এসে পড়েছে। ওতে চড়ে বসল দু'জনে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাল রানা। তিন ঘণ্টা পরে পৌঁছে গেল প্যারিসে। লুনার অ্যাপার্টমেন্টে গেল ওরা। বাড়িতে ঢুকেই দিদিয়ের দেশমকে ফোন করল লুনা। সময় চাইল দেখা করার জন্য।

'এখুনি চলে এসো,' বলল দেশম। 'বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেয়েছি, তোমার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার।'

'রওনা হচ্ছি,' বলে ফোন নামিয়ে রাখল লুনা। লকার থেকে জামা-কাপড় বের করে ব্যাগ গোছাতে শুরু করল।

'এখুনি না গেলে হয় না?' বলল রানা। 'বুভারি পরিবারের

ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার জন্য প্যারিসে থাকা দরকার আমার। রানা এজেন্সির অপারেটরদেরকে কাজে লাগাব।'

'থাকো না! মানা করছে কে?' লুনা বলল। 'দেশমের কাছে আমি একাই যেতে পারব।'

'বিপদ হতে পারে...'

'কীসের বিপদ? তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও, ট্রেন ধরে চলে যাব প্রোভেন্সে। দিদিয়ের আমাকে রিসিভ করে নেবে। ওর ভিলাতে পৌঁছে গেলে আর কোনও ভয় নেই। বাড়িটা তো দেখেছ তুমি। ফার্স্ট ক্লাস ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেম আছে ওখানে।'

'তবু...' ইতস্তত করল রানা, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

'আমাকে সারাক্ষণ পাহারা দিতে পারবে না তুমি, সেটা সম্ভব নয়। আমিও চাই না তোমার ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে। একটু নাহয় ঝুঁকি নিলাম, অসুবিধে কী? আপত্তি কোরো না তো!'

লুনার একগুঁয়েমির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, যাও তুমি। কিন্তু যোগাযোগ রেখো।'

'নিশ্চয়ই!' হাসল লুনা।

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেলে ওকে রেল-স্টেশনে পৌঁছে দিল রানা। প্রোভেন্স-গামী ট্রেনে তুলে দিল। তারপর ফিরে এল হোটেলে। ড্রাইভওয়েতে ভ্যালেকে গাড়ির চাবি ধরিয়ে দিয়ে রুমে যাবার জন্য পা বাড়াল ও, কিন্তু লাউঞ্জ পেরোনোর আগেই একজন পোর্টার ছুটে এল।

'মসিয়ো রানা, একজন ভিজিটর সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।'

'কোথায়?'

'ওই তো।' আঙুল তুলে দেখাল পোর্টার।

লবির কোণে বড় একটা সোফা দখল করে বসে আছে ববি মুরল্যাণ্ড। ঝিমোচ্ছে। অপেক্ষা করতে করতে ঘুম এসে গেছে ওর। নিঃশব্দে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তারপর খপ্ করে চেপে ধরল বন্ধুর কাঁধ। ফরাসি উচ্চারণে বলল, 'হোটেল সিকিউরিটি, সার। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।'

ধড়মড় করে সিধে হলো মুরল্যাণ্ড। ঝট্ করে তাকাল পিছনে। রানাকে দেখতে পেয়ে চেহারায় বিরক্তি ফুটল। 'ধ্যাত্তেরি! এভাবে চমকে দেয় কেউ? আরেকটু হলেই হার্টফেল করতাম।'

'হার্টফেল করতে? তুমি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমার তা মনে হয় না।'

'সরি, ভুল উপমা দিয়ে ফেলেছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আরেকটু হলেই তোমার ঘাড় মটকে দিতাম... এবার ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' হাসল রানা। 'এখানে কী করছ, জানতে পারি? আমি তো ভেবেছিলাম এখনও চামোয়াঁ মাউন্টেইনে ফ্রান্স আর আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলছ।'

'সোফি আমাকে ওর বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিল। লক্ষণটা ভাল না। আমি এখনও গাঁটছড়া বাঁধার চিন্তা করছি না। কাজেই পালিয়ে এসেছি। ভাল কথা, তুমি কোথায় ছিলে, বলো তো? কতবার তোমার সেলফোনে রিং দিলাম, কিন্তু জবাব পেলাম না!'

'কারণ ফোনটা ফরাসি এক দুর্গের পরিখার তলায় পড়ে আছে।'

'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এমন অনবদ্য অজুহাত আগে কখনও শুনিনি আমি। ফোনটা ওখানে গেল কী করে?'

'লম্বা কাহিনি। বলতে সময় লাগবে। আগে তোমার খবর বলো। সকাল থেকে অপেক্ষা করছ শুনলাম... কারণ কী?'

মুরল্যাণ্ডের চেহারায় মেঘ জমল। 'মি. রেডক্লিফের ফোন পেয়েছি।' জর্জ রেডক্লিফ নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর, তার কথা বলছে ও। 'গোস্ট সিটির এক্সপিডিশনে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আসিফ আর তানিয়া আলভিনে চেপে ডাইভ দিয়েছিল ওখানে। আর উঠে আসেনি। ওদের সঙ্গে আরও একজন বায়োলজিস্ট আছে।'

'বলো কী!' চমকে উঠল রানা। 'কী ঘটেছে ওখানে?'

'কেউ ঠিক বলতে পারছে না। সাবমারসিবলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কিছুক্ষণ পরই সারফেসে রিসার্চ ভেসেলের উপর একটা হামলা চালানো হয়েছিল। পুরো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, তাই ডিটেইলস্ বলতে পারছি না।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নির্দোষ একটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশনের উপর কে হামলা চালাবে?'

'সেটাই বের করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে। রাতের ট্রেনে চেপে আমি চলে এসেছি প্যারিসে। তোমার বসের সঙ্গেও কথা বলেছেন আমাদের অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, অনুমতি নিয়েছেন তোমাকে উদ্ধার-অভিযানে পাঠাবার জন্য। আফটার অল, আসিফ-তানিয়া দু'জনেই বাংলাদেশের উদীয়মান বিজ্ঞানী।'

'কখন থেকে নিখোঁজ ওরা?'

'চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আলভিনে সর্বোচ্চ আটচল্লিশ ঘণ্টা চলার মত বাতাস আর রেশন আছে। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। নেভির সাহায্য চেয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, ওরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে লোকেশনে। *দ্য গল* এয়ারপোর্টে নুমার একজিকিউটিভ জেট অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। চলো রওনা হয়ে যাই।'

'তৈরি হবার জন্য পাঁচ মিনিট দাও আমাকে।'

রুমে গিয়ে দ্রুত পোশাক পাল্টাল রানা, কয়েকদিন চলার মত কাপড় আর আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র ভরল ডাফল্ ব্যাগে। তারপর মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। নুমার একজিকিউটিভ জেটে চড়ে প্রথমে অ্যাজোরেসে গেল ওরা। সেখানে বিমান বদলাল, একটা সি-প্লেন ওদেরকে নিয়ে চলল অকুস্থলের দিকে।

ইতিমধ্যে নুমার একটা জাহাজ যোগ দিয়েছে রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এর সঙ্গে। জাহাজটার নাম *মারমেইড*—ভূমধ্যসাগরে একটা এক্সপিডিশন শেষ করে আমেরিকায় ফিরছিল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নির্দেশে চলে এসেছে মিড-আটলান্টিক রিজে। সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ অপারেশনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ভেসেল—অত্যাধুনিক রিমোট সেন্সিং ইকুইপমেণ্ট আছে ওতে, আরও আছে আণ্ডার-সি রোবট। নুমা চিফের অনুরোধে ইউ.এস. নেভির একটা ক্রুজারও গেছে ওদেরকে সাহায্য করবার জন্য।

সি-প্লেন নামতে শুরু করলে তিনটে জাহাজই দেখতে পেল রানা—পাশাপাশি ভাসছে। খুশি হলো মনে মনে। যথেষ্ট সাপোর্ট পাওয়া যাবে ওদের কাছ থেকে।

আকাশি রঙের নুমা-ভেসেলটার কাছাকাছি ল্যাণ্ড করল সি-প্লেন। জাহাজ থেকে পাওয়ার-বোট পাঠানো হলো, তাতে চেপে মারমেইডে গেল রানা-মুরল্যাণ্ড। ল্যাডার বেয়ে ডেকে উঠতেই ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল ব্যানিয়ন। রানা আর মুরল্যাণ্ডের পূর্ব-পরিচিত।

'নাইস টু মিট ইউ আগেইন, জেণ্টলমেন,' হাত মিলিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

'পরিস্থিতিটা অন্যরকম হলে বেশি খুশি হতাম,' রানা বলল।

ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। নেভির

ক্রুজার থেকে একটা জেমিনি বোট ছুটে আসছে এদিকে।

'হুঁ,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'মেহমানদারির সময় হয়েছে, ক্যাপ্টেন!'

'আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওঁরা,' ব্যানিয়ন বললেন। 'প্লেনটা দেখতে পেয়েই মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কখন এসেছে ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের আগেই। কাছেই কোথায় যেন একটা এক্সারসাইজে অংশ নিচ্ছিল, আটলান্টিসের ডিসট্রেস কল পেয়ে দ্রুত রেসপণ্ড করেছে। আমাদের সিকিউরিটির দিকটা দেখছে এখন ওরা। আসুন, কদ্দূর এগিয়েছি আমরা, তা দেখাই।'

ব্রিজে গেল ওরা। এলাকার বড় একটা চার্ট মেলে ধরলেন ক্যাপ্টেন ব্যানিয়ন, তাতে পেন্সিলে দাগানো নানা রকম আঁকিবুঁকি দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের ভাগ্য ভাল, বিরূপ আবহাওয়ার শিকার হইনি,' বললেন তিনি। 'এতে আমাদের কাভার করা এলাকার একটা ধারণা পাবেন। সোনার সার্ভে চালিয়েছি আমরা, রিমোট অপারেটেড ভেহিকেলও নামিয়েছি নীচে।'

'ইম্প্রেসিভ!' বলল রানা।

'ধন্যবাদ। *মারমেইড*-এর ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমরা একশো ফ্যাদম গভীরতায় একটা পয়সাও স্পট করতে পারি। পুরো গোস্ট সিটিতে তল্লাশি চালিয়েছি আমরা। আশপাশে আরও কিছু হাইড্রো-থারমাল ভেন্টের সন্ধান পেয়েছি, ওসব জায়গাও কাভার করা হয়েছে। রিজগুলোতেও তল্লাশি চালাচ্ছে *আটলান্টিস*। সব মিলিয়ে আমাদের সার্চিং ক্যাপাবিলিটির তুলনা হয় না। কিন্তু ফলাফল শূন্য। কী ঘটেছে, তা বুঝতে পারছি না। *আলভিন* একটা পরীক্ষিত সাবমারসিবল, এর আগে শত শত ডাইভ দিয়েছে... কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

'কোনও চিহ্নই পাননি ওটার?'

'উঁহুঁ। তবে ওখানেই ধাঁধাটার সমাপ্তি ঘটছে না। এটা দেখুন।' একটা সোনার রিডিঙের প্রিন্টআউট রানার হাতে তুলে দিলেন ব্যানিয়ন। 'গোস্ট সিটির তল্লাশি শেষ হলে আশপাশে মনোযোগ দিই আমরা। আরও তিনটে ছোট-বড় ভেন্ট সিটির সন্ধান পেয়েছি রিজে। প্রিন্টআউটে যেটা দেখছেন ওটাকে দ্বিতীয় গোস্ট সিটি, বা *জিসি-টু* বলে ডাকছি আমরা। অদ্ভুত একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে ওতে—আমরা কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।'

একটা ম্যাগনিফাইং গাস নিয়ে প্রিন্টআউটের উপর ঝুঁকল রানা। অভিজ্ঞ চোখে সবকিছুই বুঝতে পারল, কিন্তু থমকে গেল একটা বৈসাদৃশ্য দেখতে পেয়ে।

'এই সমান্তরাল রেখাগুলো কীসের?' জিজ্ঞেস করল ও।

'একই প্রশ্ন আমাদের,' বললেন ব্যানিয়ন। 'জানার জন্য একটা আর.ও.ভি. পাঠিয়েছিলাম। ছবি তুলে এনেছে ওটা। এই দেখুন।'

আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি একতাড়া ছবি বাড়িয়ে ধরলেন তিনি, রানা আর মুরল্যাণ্ড স্টাডি করল ওগুলো। উঁচু উঁচু হাইড্রো-থারমাল ভেন্টের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সমান্তরাল একজোড়া ট্র্যাক—যাবার পথে যা পেয়েছে, সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

'বড় কোনও বুলডোজার বা ট্যাঙ্কের ট্র্যাকের মত দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল রানা।

'শুধু বড় না, অতিকায়!' ব্যানিয়ন বললেন। 'আমরা হিসেব করে দেখেছি, ট্র্যাকদুটোর মাঝখানে ত্রিশ ফুট ব্যবধান রয়েছে।'

'ওখানে পানির গভীরতা কত?'

'আড়াই হাজার ফুট। অত গভীরে কোনও সি-বেড ক্রওলিং

ভেহিকেল থাকতে পারে না।'

'এতটা নিশ্চিত হবেন না,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'এমন ভেহিকেল দেখেছি আমরা আগে... চালিয়েছিও। তোমার মনে পড়ে, রানা?'

'*লোলা!* মনে পড়ে যেতে হাসল রানা। নুমার ডিপ-সি মাইনিং ভেহিকেল। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, জেনজো ইয়ামাদা নামে এক জাপানী ধনকুবের পুরো দুনিয়াকে জয় করার নেশায় মেতে উঠেছিল। তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল রানা ও মুরল্যাণ্ড। সেই অভিযানে *লোলা*-র অনেক ভূমিকা ছিল। ওটাকে ছাড়া সফলই হতে পারত না ওরা।*

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন ব্যানিয়ন।

ক্যাপ্টেনকে লোলা-র বিষয়ে সংক্ষেপে বলল রানা। শুনে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। বললেন, 'আপনাদের ওই লোলার সঙ্গে পার্থক্য আছে এটার। এই দেখুন।' একটা ছবি তুলে দেখালেন। সমান্তরাল ট্র্যাকদুটো হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ওখানে সাগরের মেঝেতে জমে থাকা পলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। 'লিফট-অফের চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে না? যদি তা-ই হয়, তা হলে মানতে হবে—এই সাবমেরিন শুধু সি-বেডে হামাগুড়ি দেয় না, সাঁতার কেটে ভেসেও যেতে পারে।'

'আমার ধারণা, আলভিন-কে এই সাবমেরিন-ই নিয়ে গেছে,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'এই ট্র্যাকের কাছাকাছি থেকে গায়েব হয়ে গেছে সাবমারসিবলটা। ব্যাপারটা কাকতাল বলে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

পায়ের শব্দ পেয়ে মাথা ঘোরাল ওরা। নতুন দু'জন মানুষ এসে ঢুকেছে ব্রিজে। পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্যানিয়ন। নেভির

---

* *জাপানী ফ্যানাটিক* দ্রষ্টব্য।

ক্রুজার ইউ.এস.এস. *অরল্যাণ্ডো*-র কমাণ্ডার জ্যাকব কার্টিস, আর রিসার্চ ভেসেল *আটলান্টিস*-এর ক্যাপ্টেন পল ম্যালোরি। করমর্দন করল রানা-মুরল্যাণ্ড।

'নাইস টু মিট ইউ,' বললেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'আপনাদের অনেক প্রশংসা শুনেছি, আমাদের প্রত্যাশার পারদ তাই আকাশ ছুঁয়েছে।'

'সাধ্যে যতটুকু সম্ভব, তার সবই করব আমরা,' বলল রানা। ফিরল ক্যাপ্টেন ম্যালোরির দিকে। 'কী ঘটেছিল, তা জানতে চাই। শুনলাম আলভিনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর পরই আপনাদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যালোরি। 'অদ্ভুত একটা জাহাজ দেখতে পাই আমরা। পুরনো... জং-ধরা একটা ফ্রেইটার। খোলের গায়ে নাম লেখা ছিল—*সেল্টিক রেইনবো*। মাল্টা-র জাহাজ। আমাদের কাছাকাছি এসেই ডিসট্রেস সিগনাল দিতে শুরু করে। একটু পরেই জাহাজের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখি আমরা। কিন্তু কোনও মানুষ দেখতে পাইনি। শেষ পর্যন্ত একটা বোর্ডিং পার্টি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই।'

'হুঁ, তারপর?'

'আমার লোকজন পাঠাতে চাইছিলাম, কিন্তু লেফটেন্যান্ট বেকার তাঁর টিম নিয়ে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন...'

'লে. বেকার?'

'অবসরপ্রাপ্ত। প্রাইভেট সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। আটলান্টিসের নিরাপত্তার জন্য ছোট একটা টিম-সহ তিনি এসেছিলেন।'

'আমি চিনি লে. বেকারকে,' বলে উঠলেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'একসঙ্গে কাজ করেছি বেশ কিছুদিন। শক্ত লোক, প্রাক্তন সিল-কমাণ্ডো।'

'কোথায় তিনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুঃখিত। মারা গেছে বেচারা। পানিতে আমরা ওর লাশ পেয়েছি; কিন্তু টিমের বাকি সদস্য, কিংবা রহস্যময় জাহাজটার খোঁজ পাইনি।'

'একটা ফ্রেইটার কীভাবে খোলা সাগর থেকে গায়েব হয়ে যায়?'

ম্যালোরি বললেন, 'আলভিন হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েছিলাম আমি। তাতে সাড়া দিয়ে ছুটে আসে *ইউ.এস.এস. অরল্যাণ্ডো।* দারুণ টাইমিং ওঁদের—লে. বেকার ফ্রেইটারে উঠলেন, একটু পর জাহাজটা আমাদের গায়ের উপর চড়ে বসার চেষ্টা করল, আর তখুনি হাজির হলেন ওঁরা। দিগন্তে নেভি শিপকে দেখতে পেয়েই পিঠটান দেয় *সেল্টিক রেইনবো।*'

কার্টিসের দিকে তাকাল রানা। 'আপনারা ধাওয়া করেননি?'

'আটলান্টিসের কাছে এসে থামতে হয়েছে আমাদেরকে,' কমাণ্ডার বললেন, 'পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হয়েছে। এরপর ধাওয়া করেছিলাম ফ্রেইটারকে। দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে অসুবিধে ছিল না। আমাদের স্পিড যে-কোনও ফ্রেইটারের চেয়ে বেশি, ধরে ফেলতে পারতাম। রেইডারেও ট্র্যাক করা যাচ্ছিল ওদেরকে।'

'তা হলে?'

'আচমকা রেইডার থেকে গায়েব হয়ে গেল ওটা। জায়গামত পৌঁছে দেখলাম, পানিতে খোলের ভাঙাচোরা অংশ আর তেল ভাসছে। লে. বেকারের লাশও পেয়েছি ওর মাঝে।'

'ডুবে গেছে বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, তবে আস্ত অবস্থায় নয়। বিস্ফোরিত হয়ে!'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা কথাটা শুনে।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। স্পেশাল ওয়ারফেয়ারে দুনিয়ার সেরা ট্রেইনিং পায় সিল-কমাণ্ডোরা। জং-ধরা একটা ফ্রেইটারকে সাহায্য করতে গিয়ে কেন ওরা খুন হয়ে যাবে?'

থমথমে গলায় কার্টিস বললেন, 'কারণ ওরা এমন কিছুর মুখোমুখি হয়েছিল, যা মোকাবেলা করার ট্রেইনিং পায়নি।'

'কী হতে পারে সেটা... কিছু আন্দাজ করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আন্দাজ না, আমি আপনাকে দেখিয়েই দিতে পারি,' বললেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

সাত

মারমেইড-এর ওয়ার্ডরুমে গিয়ে বসল সবাই। সঙ্গে একটা ভিডিওটেপ নিয়ে এসেছেন কমাণ্ডার কার্টিস, সেটা ভিসিআর-এ ঢুকিয়ে প্লে করলেন। ধীরে ধীরে পর্দায় ভেসে উঠল একটা কাঁপা কাঁপা দৃশ্য। হ্যাণ্ডহেল্ড ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে দৃশ্যটা। মাথায় ব্যানডানা জড়ানো তিনজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে, সবার কাছে অটোমেটিক ওয়েপন আছে। ইনফ্লেইটেবল একটা বোটে বসে আছে ওরা; ঢেউয়ের দোলায় বোট একবার উঁচু, একবার নিচু হচ্ছে। মাঝারি আকারের পুরনো একটা ফ্রেইটারকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। একটু পর আউটবোর্ড

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল একটা ভারী কণ্ঠ।

'অ্যাপ্রোচিং টার্গেট। গেট রেডি, বয়েজ! ধরে নাও বিপদ অপেক্ষা করছে। এবার একটু থামব আমরা, দেখা যাক কেউ গুলি ছোঁড়ে কি না।'

ক্যামেরার ঠিক সামনে বসা লোকটা উল্টো ঘুরে বুড়ো আঙুল তুলল॥

রিমোটের বাটন চেপে ছবি স্থির করে ফেললেন কার্টিস, উঠে গিয়ে ছবির মানুষটাকে দেখালেন। 'এ হলো টমাস রসকো,' বললেন তিনি। 'প্রথম শ্রেণীর একজন কমাণ্ডো। সিল টিম সিক্সের প্রাক্তন সদস্য, এক্সপার্ট ইন অ্যান্টিটেরোরিজম। পারশিয়ান গালফের যুদ্ধে একপাদা মেডেল পেয়েছে। অবসর নেয়ার পর যোগ দিয়েছিল লে. বেকারের কোম্পানিতে।'

'যে-কণ্ঠটা শুনলাম, ওটাই নিশ্চয়ই বেকারের?' বলল রানা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ম্যালোরি। 'চেস্ট হারনেসে একটা ভিডিও ক্যামেরা লাগিয়ে রাখত বেকার, সব ধরনের অপারেশনের রেকর্ড রাখার জন্য। পরে ওই ভিডিও দেখে টিমের ভুল-ত্রুটি শোধরাত।'

'লাশের বুক থেকেই ক্যামেরা আর এই টেপ উদ্ধার করেছি আমরা,' যোগ করলেন কার্টিস। 'কপাল ভাল, ওটা একটা ওআটরপ্রুফ হাউজিঙে আটকানো ছিল। ছবির কোয়ালিটি খুব ভাল নয়, তবে কী ঘটেছিল, তার একটা ধারণা পাবেন আপনারা॥'

সোফায় ফিরে এসে আবার প্লে-বাটন চাপলেন তিনি।

কিছুক্ষণ স্থির রইল বোট। বেকার বলল, *'কেউ আক্রমণ করেনি আমাদের উপর। ঠিক আছে, এগোনো যাক।'*

ছায়াছবির মত পরের ঘটনাগুলো দেখতে পেল দর্শকরা। গ্যাস-মাস্ক পরে নিল কমাণ্ডোরা, অ্যালুমিনিয়ামের গ্র্যাপলিং হুক

সহ নাইলন বোর্ডিং ল্যাডার বো-র একপাশে আটকানো হলো, তারপর অস্ত্র-সহ রশির মই বেয়ে সবাই উঠল জাহাজে। অ্যাঙ্কর উইঞ্চ-এর সামনে জড়ো হলো। পুরো ডেক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, চারপাশে কোনও মানুষজন নেই। দলকে দু'ভাগ করল বেকার—দু'জন সামনে, দু'জন পিছনে... এই পদ্ধতিতে পুরো জাহাজে তল্লাশি চালাবার সিদ্ধান্ত নিল।

দলকে নিয়ে এরপর তিন ডেক উপরের ব্রিজে উঠল বেকার। মাঝে মাঝে ধারাভাষ্য দিচ্ছে পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে। অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টে বোঝাই ব্রিজের দেখা পেল দর্শকরা, জাহাজের অটোমেটেড সিস্টেম সম্পর্কে কমাণ্ডো দলের ডেপুটির মন্তব্য শুনল।

এরপর কমিউনিকেশন রুমে গেল দলটা। কামরাটাও খালি, তবে জ্যান্ত হয়ে আছে রেডিও ট্রান্সমিটার, মাইক্রোফোনের সামনে খাড়া করে রাখা হয়েছে একটি টেপ-রেকর্ডার, স্পিকারে বেরিয়ে আসছে রেকর্ড করা কণ্ঠ... *'মে-ডে! মে-ডে!!'*

'হোয়াট দ্য...' গাল দিয়ে উঠল এক কমাণ্ডো।

'তামাশা করছে কেউ আমাদের সঙ্গে!' বলল ডেপুটি।

বেকার বলল, *'না! ঠাট্টা না... এটা একটা ফাঁদ। কুইক! গেট ব্যাক, এভরিবডি! জাহাজে ফিরে চলো এখুনি!'*

কমিউনিকেশন রুম থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল কমাণ্ডোরা, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। নরক ভেঙে পড়ল ব্রিজের ভিতর। ছবি ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। চেঁচামেচি, পাশবিক চিৎকার আর গুলির আওয়াজে কান ঝালাপালা। কী ঘটছে ঠাহর করা মুশকিল, শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে—আক্রান্ত হয়েছে কমাণ্ডোরা। শত্রুপক্ষের পরিচয় আঁচ করা সম্ভব হলো না। পর্দায় কদাচিৎ ভেসে উঠছে লম্বা-সাদা চুল, হলুদ শ্বদন্ত, রক্তলাল চোখ আর লোমশ দেহের চল।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়ল বেকার। স্ক্রিনে মুহূর্তের জন্য দেখা গেল ব্রিজের ছাত। পরমুহূর্তে তা ঢাকা পড়ে গেল লোমশ একটা দেহ বেকারের গায়ে চড়ে বসায়। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হলো, ক্যামেরার লেন্সে ছিটকে পড়ল কয়েক ফোঁটা রক্ত। এরপর সম্ভবত বেকারের প্রাণহীন দেহটা তুলে ছুঁড়ে মারা হলো বাল্কহেডের গায়ে। আঘাত লাগল ক্যামেরার গায়ে। স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। স্পিকারে শুধু খসখসে আওয়াজ বেরুচ্ছে এখন।

ভিসিআর বন্ধ করে দিলেন কমাণ্ডার কার্টিস। বললেন, 'দিস ইজ অল।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। ভিডিওতে যা দেখা গেল, তা অবিশ্বাস্য... ভয়ঙ্কর। ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিচ্ছে সবাই। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল রানা।

'আপনার এই ভিডিও থেকে যত না জবাব পাচ্ছি, তারচেয়ে বেশি প্রশ্ন জাগছে মনে,' ও বলল।

'জানি,' কার্টিস কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কিন্তু এটাই ঘটেছে। অ্যামবুশ পেতে বেকার আর তার টিমকে খুন করেছে ওরা। তবে খুনের কায়দাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। ওর লাশের গলা দেখে মনে হয়েছে, খালি হাতে শ্বাস আর কণ্ঠনালী ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কাজটা সহজ নয়।'

'স্ক্রিনের ওই প্রাণীগুলোকে মানুষ বলে মনে হয়েছে আপনার?'

মাথা নাড়লেন কার্টিস।

'কমাণ্ডার, ভিডিও-র শেষ কয়েক সেকেণ্ড আরেকবার দেখাতে পারেন?' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। কার্টিস টেপটা একটু রিওয়াইণ্ড করে আবার ছাড়লেন।

'থামুন এখানে!' হঠাৎ বলল মুরল্যাণ্ড।

পজ করলেন কার্টিস। স্ক্রিনের পুরোটা জুড়ে এখন রক্তলাল দুটো চোখ দেখা যাচ্ছে। চারপাশ সাদাটে চুলে ঢাকা। কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মুরল্যাণ্ড।

'কী এটা!' ফিসফিসাল ও।

'জানি না আমি,' বললেন কার্টিস। 'শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, ভয়ঙ্কর একটা ফাঁদের ভিতর পা দিয়ে বসেছিল লে. বেকার।'

'ওরা নিশ্চয়ই সশস্ত্র একদল কমাণ্ডোকে আশা করেনি? বেশ কয়েকটা প্রাণীকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছি।'

'হোয়াটএভার! শিপের অ্যামবুশটাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। *আটলান্টিস*-ই মূল টার্গেট ছিল বলে ধারণা আমার। আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে গেছে।'

'হুম!'

ক্যাপ্টেন ব্যানিয়ন উঠে দাঁড়ালেন। 'আমাকে ব্রিজে যেতে হয়। কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাবেন।'

'আমিও যাই,' ম্যালোরি সুর মেলালেন। 'জাহাজে আমাকেও ফিরে যেতে হবে।'

দুই ক্যাপ্টেনকে বিদায় জানাল রানা। তারপর কমাণ্ডার কার্টিসকে বলল, 'আপনি কী করবেন? জাহাজে ফিরবেন না?'

'না,' বললেন কার্টিস। 'আপনাদের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করা দরকার। হাতে সময় আছে তো?'

'অবশ্যই।'

ওয়ার্ডরুমের ওয়াইন-কেবিনেট থেকে বোতল বের করে তিনটে গ্লাসে উইস্কি ঢাললেন কার্টিস। একটা নিজে নিলেন, অন্যদুটো দিলেন রানা-মুরল্যাণ্ডকে। তারপর ওদের মুখোমুখি বসলেন।

'প্রথম যখন হামলার খবর শুনি, আমি ভেবেছিলাম

জলদস্যুদের কাণ্ড,' বললেন তিনি। 'যদিও এই এলাকায় দস্যুতার তেমন নজির নেই।'

'এখন তা হলে ব্যাপারটার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক নেই ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' গ্লাসে চুমুক দিলেন কার্টিস। 'বলতে ভুলে গেছি, নৌবাহিনীর একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার আমি। ভিডিও-টা দেখেই ওয়াশিংটনে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করেছিলাম, জানতে চেয়েছিলাম লাল চোখ-অলা দানব বা পশুর ব্যাপারে কিছু জানা আছে কি না ওদের। অপমানজনক বেশ কিছু মন্তব্য শুনতে হয়েছে আমাকে, তবে শেষ পর্যন্ত বড়কর্তাদেরকে কনভিন্স করতে পেরেছি। ইন্টেলিজেন্স স্টাফরা ড্রাকুলা, ফটোগ্রাফি আর হলিউড মুভি থেকে শুরু করে যত ধরনের রেফারেন্স পেয়েছে, সব ঘেঁটে দেখেছে। জানেন আপনারা, *রেড-আইড ডেমনস্* নামে একটা রক ব্যাণ্ড পর্যন্ত আছে?'

'দুঃখিত,' বলল মুরল্যাণ্ড। '*স্পাইস গার্লস্* ভেঙে যাবার পর থেকে মনের দুঃখে রক সঙ্গীত শোনা ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

'আমিও ওসব শুনি না,' রানা বলল।

'এনিওয়ে,' আগের কথার খেই ধরলেন কার্টিস, 'ই-মেইলের মাধ্যমে ওয়াশিংটন থেকে সমস্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে আমার কাছে। সেগুলোতে চোখ বোলাতে গিয়ে আমি এটার সন্ধান পেয়েছি।'

সেন্টার-টেবিলের উপর রাখা ফোল্ডার থেকে একটা পেপার-কাটিং বের করে দেখালেন তিনি। কয়েক মাস আগের পত্রিকা থেকে নেয়া। সেটা এরকম:

টিভি শো-র কলাকুশলী নিখোঁজ। পুলিশ দিশেহারা।
(রয়টার্স, লণ্ডন)

রিয়্যালিটি গেম শো আউটকাস্ট-এর সাতজন অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং দশজন শুটিং ক্রু-র কোনও সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, তাঁরা স্কটল্যাণ্ড উপকূলের একটি নির্জন দ্বীপে শুটিং চলাকালে নিখোঁজ হন। প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তাঁদের পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

তল্লাশি অভিযানে যৌথভাবে অংশ নিচ্ছে পুলিশ এবং কোস্ট গার্ড। আমেরিকা থেকে আসা এফবিআই-এর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তাঁদেরকে সাহায্য করছেন। অভিযানের নেতৃত্বে থাকা পুলিশ কমিশনার হ্যারল্ড গ্যাভিলান বলেছেন, তাঁরা দ্বীপে লড়াইয়ের আলামত পেয়েছেন, যা থেকে ধারণা করা হচ্ছে—ওখানে কোনও ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটেছিল।

পুরো কলাকুশলীর মধ্যে একজন মাত্র অভিনেত্রী রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর নাম এডিথ ম্যাকলিন, বর্তমানে হাসপাতালে আছেন। মিস ম্যাকলিনের ভাষ্যমতে একদল লাল-চোখঅলা হিংস্র দানব আক্রমণ করেছিল তাঁদের ইউনিটকে, ওরাই খুন করেছে তাঁর সহকর্মীদেরকে। পাহাড়ি একটি ফাটলে লুকিয়ে তিনি নিজের প্রাণ বাঁচান।

কর্তৃপক্ষ এই ভাষ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জানিয়েছেন: মিস ম্যাকলিন ঘটনার ভয়াবহতায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, আক্রান্ত হয়েছেন হ্যালুসিনেশনে। সুস্থ হবার আগে তাঁর কাছ থেকে সঠিক ঘটনা জানতে পারার কোনও সম্ভাবনা নেই...

কাটিং-টা কার্টিসের কাছে ফিরিয়ে দিল রানা। বলল, 'লাল-চোখঅলা দানব... আপনার ধারণা, ভিডিওতে ওগুলোকেই

দেখেছি আমরা?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কার্টিস।

'আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না,' মুরল্যাণ্ড দ্বিমত পোষণ করল। 'কোথায় স্কটল্যাণ্ড উপকূল, আর কোথায় আটলাণ্টিক ম্যাসিফ! তা ছাড়া *আলভিন*-এর নিখোঁজ হবার সঙ্গে একদল দানবের কী সম্পর্ক? ওরা নিশ্চয়ই ঘাড়ে তুলে নিয়ে যায়নি সাবমারসিবলটাকে?'

'এসো, আলোচনা করে দেখি,' বলল রানা। 'অদ্ভুত ওই ট্র্যাকের কথা ভাবো। এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে: গোস্ট সিটিতে গোপনে কিছু একটা করছিল কেউ; এবং সেটা ফাঁস হতে দিতে চাইছিল না।'

'তা অবশ্য ঠিক,' মুরল্যাণ্ড একমত হলো। 'ওদের জায়গায় আমি থাকলে থারমাল ভেন্টের আশপাশে কারও ছোঁক ছোঁক করাটা পছন্দ করতাম না।'

'তা হলেই ভাবো, ক্যামেরা আর নানা রকম সেন্সরে ভরা একটা সাবমারসিবল উদয় হলে ওদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে।'

'পাততাড়ি গোটাব আমি।'

'তাতে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। নীচে তোমার উপস্থিতির চিহ্ন থেকে যাচ্ছে। তুমি কোনও সাক্ষী রাখার ঝুঁকি নিতে পারো না।'

'তারমানে সাবমারসিবলটাকে গায়েব করে দিতে হবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু ওটাকে গায়েব করলে চলছে না। উপরে সাপোর্ট শিপ আছে, সাবমারসিবলের খোঁজে ওটা তল্লাশি চালাতে শুরু করবে।'

'তা হলে সাপোর্ট শিপও গায়েব করে দিতে হবে,' এবার বুঝতে শুরু করেছে মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু লাল-চোখা কয়েকটা দানব

কীভাবে *আটলান্টিস*-কে গায়েব করবে? ওদের দৌড় কেবল মানুষ খুন করা পর্যন্ত। তাও একসঙ্গে শিপের সমস্ত ক্রু-কে খুন করতে পারবে না।'

'আমার ধারণা, ওদেরকে রাখা হয়েছিল শুধু বোর্ডিং পার্টিটাকে খতম করার জন্য। ফ্রেইটারটা অটোমেটেড, ভিডিওতে দেখেছি আমরা। বেকারের টিম মারা যাবার পর ওটা চেষ্টা করছিল *আটলান্টিস*-এর কাছাকাছি আসতে, যেন বোর্ডিং পার্টি ওটাকে চালিয়ে নিয়ে আসছে। ওতে বোমা ছিল... বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুটো জাহাজই ধ্বংস করে দিতে পারত। নেভির ক্রুজার এসে পড়ায় প্ল্যানটা কাজে লাগেনি। শেষ পর্যন্ত বোমা ফাটিয়ে ফ্রেইটারটাকেই ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে কেউ আর ওটা থেকে কোনও সূত্র না পায়।'

'নাইস থিয়োরি, মি. রানা,' প্রশংসা করলেন কার্টিস। 'বুল্‌স্ আই! আমার তো মনে হয়, একেবারে ঠিক জায়গাতেই তীর লাগিয়েছেন।'

পেপার কাটিংটার দিকে ইশারা করল রানা। 'স্কটল্যাণ্ডে লাল-চোখের দানব, আর এখানেও লাল-চোখের দানব... কো-ইনসিডেন্স বলে ভাবতে পারছি না কিছুতেই। বিশেষ করে এই জাতের দানব যেহেতু দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় না।'

'আমিও একই কথা ভাবছি,' কার্টিস মাথা ঝাঁকালেন। 'কথা হলো, *আলভিন*-এর কপালে কী ঘটেছে।'

'সাবমারসিবলটা গোস্ট সিটিতে থাকলে এতক্ষণে খোঁজ পাওয়া যেত—আস্ত, কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড... যে অবস্থাতেই হোক না কেন। ওটা নেই এখানে। তারমানে ওটাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আসিফ আর তানিয়া বেঁচে আছে। ওদেরকে উদ্ধার করতে হবে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

কমাণ্ডার কার্টিসের দিকে ফিরল রানা। 'স্কটিশ উপকূলের ওই দ্বীপটাই আমাদের একমাত্র সূত্র। আপনি একটু খোঁজখবর নিতে পারবেন এলাকাটা সম্পর্কে?'

'আপনার চেয়ে আমি এগিয়ে আছি, মি. রানা,' হাসলেন কার্টিস। 'ওই এলাকার স্যাটেলাইট ফটো জোগাড় করেছি।' ব্রিফকেস থেকে ছবির বাণ্ডিল বের করলেন তিনি, দেখতে দিলেন। 'দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো দ্বীপ উপকূলীয় এলাকায়। জনবসতি কম—দু-চারটে দ্বীপে জেলেদের গ্রাম আছে, বাকিগুলো সাপ আর বুনো পাখির আস্তানা। এর মাঝে একটামাত্র দ্বীপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই যে... এটা।'

বাছাই করে একটা ফটো রানার হাতে তুলে দিলেন তিনি। ওতে নানা রকম ইমারতের কাঠামো আর ভাঙাচোরা একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

'কে থাকে এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দ্বীপের আসল মালিক ব্রিটিশ সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর কোল্ড-ওঅরের সময় ওখানে একটা সাবমেরিন ঘাঁটি ছিল। পরে প্রাইভেট এক কর্পোরেশনকে লিজ দেয়া হয়েছে। কর্পোরেশনের পরিচয় জানার চেষ্টা করছি আমরা, এখনও সফল হইনি।'

'কীসের জন্য লিজ দেয়া হয়েছে, তা জানেন?'

'পক্ষী-গবেষণা। অস্বাভাবিক, তাই না? পাখি নিয়ে গবেষণার জন্য গোটা দ্বীপ লিজ নেবে কেন কেউ? খবর পেয়েছি, ওখানে অনুমতি ছাড়া কেউ পা রাখতে পারে না। স্থানীয় জেলেরা কাছে ঘেঁষলে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়।'

ছবিতে দেখা যাওয়া একটা লম্বাটে বিন্দুর উপর আঙুল রাখল রানা। 'কী এটা?'

'সম্ভবত প্যাট্রোল বোট। অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য টহল দিচ্ছে। দ্বীপের যতগুলো ছবি তোলা হয়েছে, সবগুলোতেই

দেখেছি নির্দিষ্ট একটা রুটে ঘুরঘুর করছে ওটা।'

ছবিতে দ্বীপের তটরেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল রানা। হঠাৎ ওর চোখ আটকে গেল দ্বীপে ঢোকার খাঁড়ির মুখে আবছা একটা আকৃতি দেখতে পেয়ে। তাড়াতাড়ি বাকি ছবিগুলো স্টাডি করল। না, লেন্সের কারসাজি নয়; সবক'টাতেই আছে আকৃতিটা। মুরল্যাণ্ডের দিকে বাড়িয়ে দিল প্রথম ছবিটা। 'ববি, দেখো তো, কিছু বুঝতে পারো কি না।'

অভিজ্ঞ চোখে মুরল্যাণ্ডও সনাক্ত করল বৈসাদৃশ্যটা। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আণ্ডারওঅটর ভেহিকেলের মত লাগছে! তবে অনেক ছোট।'

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কার্টিস।

দেখানো হলো তাকে।

'মাই গড!' বললেন কার্টিস। 'আমি তো এটা খেয়ালই করিনি। দেখলেও হয়তো মাছ বলে ভেবেছি।'

'মাছ-ই... যান্ত্রিক মাছ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ব্যাটারিচালিত এবং মোটরাইজড্। আমার ধারণা—এ.ইউ.ভি।'

'অটোনমাস আণ্ডারওঅটর ভেহিকেল?'

ইতিবাচক সাড়া দিল মুরল্যাণ্ড। এ.ইউ.ভি. হচ্ছে আণ্ডারসি টেকনোলজির সাম্প্রতিকতম উৎকর্ষ—কমার্শিয়াল এবং রিসার্চের কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এক ধরনের রোবট ভেহিকেল, প্রোগ্রাম করা নির্দেশনার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেট করতে পারে পানির নীচে। বাইরে থেকে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

'সোনার আর অ্যাকুস্টিক ইন্সট্রুমেন্ট বসানো যায় এ.ইউ.ভি-তে,' ব্যাখ্যা করল ও। 'তাতে পানির উপর বা নীচ দিয়ে আসা যে-কোনও অনুপ্রবেশকারীকে ডিটেক্ট করা যাবে।

দ্বীপের মূল অংশে বসানো মনিটরে ছবিও পাঠাতে পারবে ওটা। নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।'

'নেভিতে আমরা মাইন-ডিটেকশনের জন্য এ.ইউ.ভি. ব্যবহার করছি,' কার্টিস বললেন। 'তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওগুলোকে হামলা চালানোর জন্যও প্রোগ্রাম করা যায় বলে শুনেছি।'

'দ্বীপটার ব্যাপারে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠছি,' রানা বলল। 'এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রাখা হয়েছে... এর ভিতর একটা রহস্য থাকতে বাধ্য!'

'ওখানে উঁকি দিতে চান?' কার্টিস ভুরু নাচালেন। 'এখানে তো করার কিছু নেই আপনাদের। গোস্ট সিটিকে চিরুণী-তল্লাশির জন্য *মারমেইড* আর *আটলান্টিস*-ই যথেষ্ট।'

'আমাদেরকে বলছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ বা প্রমাণ ছাড়া ইউ.এস. নেভি একটা ব্যক্তি-মালিকানাধীন দ্বীপে হানা দিতে পারে না। তাতে কেলেঙ্কারি বেধে যাবে। কিন্তু অতি-উৎসাহী দুজন ভদ্রলোক যদি সে-কাজ করেন, বড়জোর মামলা ঠুকতে পারে ওরা। ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে?'

বন্ধুর দিকে ফিরল রানা। 'কী বলো, ববি?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? বাঘের গুহায় ঢোকার প্রস্তাব কখনও ফেরাতে দেখেছ আমাকে? তবে হয়তো সময়ই নষ্ট করবে। লাল-চোখের একদল দানবকে তাড়া করলেই যে তোমার বন্ধুদেরকে পাওয়া যাবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। ওরা হয়তো অন্য কোথাও বন্দি হয়ে আছে। মাঝখান থেকে আমরা দানবগুলোর লাঞ্চ বা ডিনার হয়ে যাব।'

ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রানা। 'আমার তা মনে হয়

না। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওখানেই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।'

আপত্তি করল না মুরল্যাণ্ড। জানে, রানার অনুমান এ-ধরনের ক্ষেত্রে মিথ্যে হয় না। তাই বলল, 'তা হলে আর আটলান্টিকের হাওয়া খেয়ে লাভ কী? সি-প্লেন আছে আমাদের সঙ্গে। চলো, এখুনি রওনা হয়ে যাই।'

উঠে দাঁড়াল দু'বন্ধু।

'বেস্ট অভ লাক,' ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন কমাণ্ডার কার্টিস। 'আমি জানতাম, আপনারা এই সিদ্ধান্তই নেবেন।'

আট

প্রোভেন্সের পুরনো শহরের প্রান্তে দিদিয়ের দেশমের ভিলা। লাল টালির ছাত আর সিমেন্টে মোড়া ইমারতটা এককালে ফার্মহাউস হিসেবে ব্যবহার হতো। এখন সংস্কার করে নেয়া হয়েছে। রেল-স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে হাজির হলো লুনা। ভাড়া মিটিয়ে বেল বাজালে দেশম নিজেই দরজা খুলল। সৌজন্য বিনিময় হলো, তারপর ভিলার পিছনে সুইমিং পুলের ধারে গিয়ে বসল দুজনে। ড্রিঙ্ক পরিবেশন করল দেশম।

'ট্রেনে এলে কেন?' জানতে চাইল সে। 'আমার গাড়িটা আনোনি যে? ড্রাইভ করতে চাইছিলে না?'

ইতস্তত করল লুনা। 'ইয়ে... ড্রিঙ্কটা শেষ করতে দাও।

গাড়ির খবর তারপর দিচ্ছি।'

ভুরু কোঁচকাল দেশম। 'মনে হচ্ছে দুঃসংবাদ দেবে?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তা-ই বলতে পারো। প্রাণ নিয়ে যে ফিরে এসেছি, সে-ই ঢের।'

'মানে! গিয়েছিলে তো মাদাম বুভারির ইন্টারভিউ নিতে, প্রাণ হারাবার মত পরিস্থিতি দেখা দেবে কেন?'

ধীরে ধীরে শ্যাতো বুভারির ঘটনা খুলে বলল লুনা। শেষে যোগ করল, 'বুঝতেই পারছ, গাড়িটা বাঁচাবার কোনও উপায় ছিল না। আমি সত্যি দুঃখিত।'

হাসল দেশম। 'খামোকা বিব্রত হচ্ছ। তোমার প্রাণের চেয়ে একটা রোলস-রয়েস কি বেশি দামি? তা ছাড়া ওটা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে কিনেছিলাম... খুব সস্তায়। আমার তেমন কোনও লস হয়নি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লুনা। 'আমি রানাকে সে-কথাই বলেছি। বাঁচা গেল, তোমাকে অমন আরেকটা গাড়ি কিনে দেয়ার সাধ্য নেই আমার।'

'ভুলে যাও ও-কথা। এখন থিয়োডর বুভারির পোর্ট্রেটের কথা বলো। তুমি শিয়োর, গ্লেসিয়ারে পাওয়া হেলমেটটাই ছবিতে পরে আছে সে?'

'হ্যাঁ, তাতে কোনও ভুল নেই। ওটার আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে কদ্দূর এগোলে?'

'অনেক দূর,' গর্বিত কণ্ঠে বলল দেশম। 'যদি খুব বেশি ক্লান্ত না হও, তা হলে উইবেলের কাছে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে।'

'উইবেলটা আবার কী?'

'*কী* না, *কে*। অস্কার উইবেল আমার এক অ্যালসেশিয়ান বন্ধুর নাম, কাছেই থাকে। হেলমেটটা ওর কাছে আছে।'

'কেন দিয়েছ ওর কাছে?'

'ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে। চলো।'

একটু পরেই দেশমের গাড়িতে বেরিয়ে পড়ল ওরা। লুনা বলল, 'দেখো, হেঁয়ালি ভাল্লাগছে না। তোমার বন্ধুর ব্যাপারটা কী? খুলে বলো আমাকে।'

মোড় নেয়ার জন্য একটু চুপ করে থাকল দেশম। অলতেয়ার দ্যু সেজানি আর সেইন্ট সোভা ক্যাথিড্রালের মাঝখানের রাস্তায় উঠে এসে মুখ খুলল। বলল, 'উইবেল হলো ধাতুর কারিগর... আমার জানা সেরা শিল্পী। অ্যান্টিক অস্ত্র-শস্ত্র নকল করায় ওর জুড়ি নেই। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু দুনিয়ার বহু মিউজিয়াম আর প্রাইভেট কালেক্টরের সংগ্রহে অথেনটিক বলে পরিচিত এমন সব আর্টিফ্যাক্ট শোভা পাচ্ছে, যেগুলো ওর হাতেই তৈরি। অথচ কেউ সেটা জানে না।'

'সোজাসুজি বললেই পারো—ও একটা জালিয়াত।'

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল দেশম। 'বড্ড বাজে একটা শব্দ। হাই কোয়ালিটি রিপ্রোডাকশন আর্টিস্ট বলতে পছন্দ করি আমি।'

'রিপ্রোডাকশনগুলো তুমিই নিশ্চয়ই চড়া দামে বিক্রি করো?'

হাসল দেশম। 'আমি কখনও বিক্রি করা মালের অথেনটিসিটি দাবি করি না। জিনিসটা কবেকার হতে পারে, তেমন একটা ধারণা শুধু দিই। এরপর সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্পূর্ণ এখতিয়ার ক্রেতারই। কেউ যদি ভালমত মাল পরখ না করে ঠকতে চায়, তা হলে আমার কী করার থাকতে পারে? আমি তো আর জোর করে কাউকে জিনিস গছাচ্ছি না।'

বিতৃষ্ণা ফুটল লুনার চোখে। 'তোমার এই ফিলোসফি আমি মানতে পারছি না।'

'মানা না-মানা তোমার ব্যাপার,' কাঁধ ঝাঁকাল দেশম। 'এই

যে, পৌঁছে গেছি আমরা।'

বাঁক নিয়ে রাস্তা থেকে নেমে গেল গাড়ি। পুরনো ডিজাইনের একটা দোতলা বিল্ডিঙের সামনে থামল। সদর দরজায় গিয়ে বেল বাজাল দেশম। একটু পর ওভারঅল-পরা বয়স্ক এক লোক দরজা খুলল। দেশমকে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে, আলিঙ্গন করল। লুনার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল অ্যান্টিক ব্যবসায়ী।

'লুনা পারসেল, এ হলো আমার পুরনো বন্ধু—অস্কার উইবেল।'

'নাইস টু মিট ইউ,' বলে হাত মেলাল উইবেল। অতিথিদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিল্প-জালিয়াতকে দেখল লুনা। মাথাটা দেহের তুলনায় বড়, সেখানে একটাও চুল নেই। বিশাল টাক চকচক করছে। চশমা খুললে দেখা গেল, চোখদুটো খুব ছোট। পা-দুটো লিকলিকে, দেহের ভার বইতে গিয়ে যেন যে-কোনও মুহূর্তে মট করে ভেঙে যাবে। হাতের আঙুলগুলো শীর্ণ ও লম্বা—পিয়ানো-বাদকদের যেমন হয়। একটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই—লোকটার ভিতর অদ্ভুত এক প্রাণশক্তির আভাস রয়েছে।

উইবেলও দেখছে লুনাকে। দৃষ্টিতে প্রশংসা ফুটল। বন্ধুকে বলল, 'মাদমোয়াজেলের রূপের তারিফ না করে পারছি না, দিদিয়ের। এখানে এসে আমাকে কৃতার্থ করেছেন উনি।'

'তোষামোদ বন্ধ করো, উইবেল,' বিরক্ত গলায় বলল দেশম। 'সারাদিন থাকতে পারব না এখানে। কাজের কথায় এসো।'

'একটু আপ্যায়ন তো করতে দেবে! মাদমোয়াজেল, চা চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল লুনা। 'দিতে পারেন। জার্নি করে এসেছি,

একটু চা পেলে মন্দ হয় না।'

'আসুন।'

অতিথিদেরকে কিচেনে নিয়ে গেল উইবেল, বসতে দিল। তারপর চা বানিয়ে পরিবেশন করল। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে হালকা গল্পগুজব চলল। লুনার পেশা-নেশা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করল উইবেল। সংক্ষেপে সেসবের জবাব দিল লুনা।

'আপনি কী করেন, সে-কথা বলেছে আমাকে দিদিয়ের,' বলল ও। 'ওর মতে আপনি দুনিয়ার সেরা জালি... দুঃখিত, রিপ্রোডাকশন আর্টিস্ট।'

'জালিয়াত বলতে চাইছিলেন তো?' হাসল উইবেল। 'বলতে পারেন, আমি কিছু মনে করব না। জালিয়াতিও একটা শিল্প, যাকে-তাকে দিয়ে এ-কাজ হয় না। প্রমাণ চান? চলুন, আমার ওঅর্কশপ দেখাই।'

সংকীর্ণ একটা সিঁড়ি ধরে ওদেরকে বেজমেন্টে নিয়ে গেল সে। ভাঁড়ার ঘরের জায়গায় তৈরি করা হয়েছে ওঅর্কশপ, হঠাৎ দেখায় কামারখানার মত লাগে। ঘরটা ফ্লুরোসেন্ট বাতির কল্যাণে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাতুড়ি-বাটালি আর নানা রকম লোহা-লক্কড়। দেয়ালে ঝুলছে ব্রেস্টপ্লেট, লেগ আর্মার আর লোহার দস্তানার সারি। একপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো হেলমেট। ওগুলোর উপর নজর বোলাল দেশম। বুভারি-হেলমেটটা দেখতে পেল না।

'আমাদের জিনিসটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখানে রেখেছি ভেবেছ নাকি?' বলল উইবেল। 'অমন স্পেশাল জিনিস বাইরে ফেলে রাখা যায়?'

ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা বর্মের সামনে গেল সে। ভাইজর সরিয়ে হাত ঢোকাল গর্তে। ক্লিক করে শব্দ হতেই ঘড় ঘড় করে সরে গেল দেয়ালের একটা অংশ। পিছনে রয়েছে

স্টিলের একটা দরজা।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল লুনা।

হাসল উইবেল। দরজার গায়ে লাগানো কি-প্যাডে কোড পাঞ্চ করল। খুলে গেল তার গুপ্তকুঠুরির প্রবেশদ্বার। ভিতরে ঢুকল, পিছন পিছন দুই অতিথি।

ওয়াক-ইন ক্লজিটের মত একটা কামরা ওপাশে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ছোটবড় নানা আকারের কাঠের বাক্স—প্রতিটার গায়ে নম্বর লেখা আছে। একটা বাক্স নিয়ে বেরিয়ে এল উইবেল। নামিয়ে রাখল ওঅর্কশপের টেবিলের উপর। ডালা খুলে বের করল থিয়োডর বুভারির শিরোস্ত্রাণটা। মুখমণ্ডলের অবয়ব দেয়া ভাইজরের উপর দৃষ্টি আটকে গেল লুনার। থিয়োডরের পোর্ট্রেটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। চেহারাদুটোয় দারুণ মিল!

'অসাধারণ একটা পিস, মাদমোয়াজেল... অসাধারণ!' জাদুশিল্পীর মত শিরোস্ত্রাণের উপরে বাতাসে হাত বোলাল উইবেল। 'ধাতুটা পরীক্ষা করিয়েছি আমার নিজস্ব বিশেষজ্ঞ দিয়ে। এ-জিনিস দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ওর ধারণা, কোনও উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া গেছে ধাতুটা।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম,' দেশম বলল। 'কতদিনের পুরনো এটা, তা বের করতে পেরেছ?'

'ডিজাইনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে খাপছাড়া, তা তো তুমি জানোই। সঠিক বয়স তাই নির্ণয় করা কঠিন। তবে আন্দাজ করতে বললে আমি বলব জিনিসটা পনেরো শতকের। ওই সময়েই প্রথম মানুষ বা পশু-পাখির চেহারা দিয়ে ভাইজর বানানো শুরু করে কারিগররা। এটা তাই তারচেয়ে পুরনো হতে পারে না। ধাতুটা আরও প্রাচীন হবার সম্ভাবনা আছে। হেলমেটটাও পুরনো কোনও হেলমেট গলিয়ে তৈরি করা হয়ে

থাকতে পারে। তবে আপাতত আমি পনেরো শতক ধরে নিতে চাইছি।'

'কে বানিয়েছে, তা অনুমান করতে পারো?'

'অবশ্যই,' জোর গলায় বলল উইবেল। 'এমন নিখুঁত জিনিস বানাবার মত টেকনোলজি বা দক্ষতা সে-আমলে খুব বেশি লোকের ছিল না। এদিকে এসো, হেলমেটের ভিতরদিকটা দেখো। একেবারে মসৃণ। হাতুড়ি বা বাটালির একটা টোকারও দাগ নেই। আমার জানামতে, এমন উঁচু মানের ইস্পাত সে-আমলে শুধু বুভারি পরিবার তৈরি করতে পারত।'

'অবাক হচ্ছি না,' মুখ বাঁকিয়ে বলল দেশম। 'ওরাই এটার মালিক।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল উইবেল। 'ঈগলের প্রতীক দেখে আমিও তা-ই ভেবেছি।'

'বুভারি পরিবার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন আমাকে?' সাগ্রহে জানতে চাইল লুনা।

'ঐতিহ্যবাহী স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজকে যে-তিনটে পরিবার মিলে গড়ে তুলেছিল, তাদের মধ্যে একটা পরিবার হলো বুভারিদের,' উইবেল বলল। 'তিনটে পরিবারেরই আলাদা আলাদা ফিল্ডে স্পেশালিটি ছিল। একটা পরিবার ছিল ধাতু গলানোয় বিশেষজ্ঞ, আরেকটা ছিল বর্ম আর ঢাল-তলোয়ার তৈরিতে ওস্তাদ। বুভারিদের বিশেষত্ব ছিল ব্যবসা চালানোয়। ওরা ছিল স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের সেলিং আর্ম—সারা ইয়োরোপে ঘুরে বেড়াত, পণ্যের বিজ্ঞাপন করত, তারপর বিক্রির ব্যবস্থা করত। এর ফলে বিভিন্ন দেশের উঁচু উঁচু রাজনৈতিক মহলে ওদের ভাল সখ্য গড়ে ওঠে। তাই বলে ওদের প্রোডাক্টকে ভুল চোখে দেখার কিছু নেই। কোয়ালিটিতে স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। নিজেদের বানানো অস্ত্রে কখনও প্রতীক বসাত না ওরা, মনে

করত কোয়ালিটিই ওদের পরিচয়। এই হেলমেটের গায়ে তাই তিন-মাথা ঈগলের প্রতীক দেখে খুব অবাক হয়েছি। নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এটার।'

'মাদাম বুভারি বলেছে, ঈগলগুলো ওই তিন পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে,' বলল লুনা।

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল উইবেল। 'মাদাম বুভারি! আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন?'

ইতিবাচক সাড়া দিল লুনা।

'ইন্টারেস্টিং!' উইবেল বলল। 'আমি শুনেছিলাম, ভদ্রমহিলা মুখচোরা স্বভাবের। কেমন দেখলেন তাঁকে?'

'মুখচোরা বলা ঠিক হবে না। আমার কাছে বরং কাঁকড়াবিছে আর বিষাক্ত গোখরার মিশেল বলে মনে হয়েছে।' নির্দ্বিধায় জানাল লুনা। 'মহিলা বলছিল, মাঝখানের মাথাটা ওদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে। ওরাই বাকি দু'পরিবারকে পিছনে ফেলে সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।'

'কীভাবে গ্রহণ করেছে, সেটা বলেননি? বলেননি, বাকি দু'পরিবারের পুরুষরা অকালে মারা পড়েছে, আর মেয়েদেরকে গায়ের জোরে বাধ্য করা হয়েছে বুভারি পরিবারের বউ হবার জন্য?'

'পরিবারের ব্যাপারে খোলাখুলি হতে খুব আপত্তি দেখলাম। বিশেষ করে দুই মহাযুদ্ধ বাধানোর ক্ষেত্রে ওদের যে হাত আছে, এ-কথা তো সহ্যই করতে পারে না!'

'পুরনো গুজব,' কাঁধ ঝাঁকাল উইবেল। 'এমন কাহিনি বহুদিন থেকেই বাতাসে ভাসছে। প্রথম আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পিছনে নাকি ইয়োরোপীয় অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের হাত ছিল! এ-সব আপনি কোথায় শুনলেন?'

'এক ইংরেজ ভদ্রলোকের মুখে। লর্ড ওয়ালটন। বুভারিরা

নাকি ওঁর পরিবারের আবিষ্কার করা ফর্মুলা চুরি করেছে।'

'বুঝেছি, লর্ড এলমোর ওয়ালটনের কথা বলছেন। মিথ্যে অভিযোগ করেননি ভদ্রলোক, বুভারিরা সত্যিই ওঁদের কাছ থেকে ফর্জড স্টিল তৈরির কৌশল চুরি করে এনেছিল। যাক সে-কথা। এদিকে আসুন। আরেকটা জিনিস দেখাই।' হেলমেটের কপালে আঙুল বোলাল উইবেল। 'ঈগলের প্রতীকটা ভাল করে দেখুন। কোনও বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ছে?'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লুনা। কিছু বুঝতে পারল না। আগে যা দেখেছে, এখনও তা-ই দেখছে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের কথা বলছেন?'

'থাবায় ধরা বর্শাগুলো দেখুন।'

এবার বুঝতে পারল লুনা। উত্তেজিত গলায় বলল, 'বর্শার যতগুলো মাথা আছে, লেজ তার চেয়ে একটা বেশি! থাবা থেকে একটা বর্শা বেশি বেরিয়ে এসেছে!'

'ভেরি গুড!' হাসল উইবেল। 'বুভারিদের মূল প্রতীকের সঙ্গে জিনিসটা মিলিয়ে দেখেছি আমি। ওতে এ-ধরনের কোনও খুঁত নেই। তাই ভাল করে পরীক্ষা করেছি ওটা। আমার বিশ্বাস, বাড়তি বর্শাটা আগে ছিল না হেলমেটের গায়ে। ওটা বড়জোর একশো বছর আগে খোদাই করা হয়েছে ওখানে।'

'কেন?' লুনা হতভম্ব।

একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ওর হাতে তুলে দিল উইবেল। 'নিজেই দেখুন।'

প্রতীকের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল লুনা। বাড়তি বর্শাটা আসলে বর্শা নয়! খুদে খুদে অক্ষরে এক ধরনের লিপি খোদাই করে রাখা হয়েছে!

'মাই গড!' ফিসফিসিয়ে বলল ও। 'এ তো দেখছি নানা রকম অক্ষর আর সংখ্যার সমষ্টি!'

'কই দেখি!' দেশমও ঝুঁকল হেলমেটের উপর। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার কাছে অ্যালজেব্রার ইকুয়েশনের মত লাগছে!'

'এগজ্যাক্টলি!' মাথা ঝাঁকাল উইবেল। 'ইকুয়েশনই বটে। কিন্তু কী বলা হচ্ছে, তা ডিসাইফার করতে পারিনি। আমার বিদ্যায় কুলাচ্ছে না। অন্য ধরনের বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।'

সোজা হলো লুনা। 'রানা বলছিল, হেলমেটের মধ্যে কোনও ধরনের রহস্য লুকিয়ে আছে। এটাই নিশ্চয়ই সেটা!'

'শিয়োর হতে চাইলে কোনও ক্রিপ্টোলজিস্ট বা ম্যাথমেটিশিয়ানের সাহায্য লাগবে তোমার,' দেশম বলল।

'তা হলে এখুনি এটা আমি প্যারিসে নিয়ে যেতে চাই। ইউনিভার্সিটিতে আমার পরিচিত অনেক গুণী অধ্যাপক আছেন। তাঁদেরকে দেখাব লেখাটা।'

'এখুনি নিয়ে যাবেন?' হতাশ হলো উইবেল। 'এত সুন্দর একটা পিস... আমি একটা রিপ্রোডাকশন তৈরি করার কথা ভাবছিলাম।'

'পরে, মসিয়ো উইবেল,' সান্ত্বনা দিল লুনা। 'আপাতত হেলমেটের রহস্য বের করা বেশি জরুরি। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে,' কাঁধ ঝাঁকাল উইবেল। কাগজের কার্টন বের করে তাতে প্যাক করে দিল হেলমেট। একটা কাপড়ের ব্যাগে ভরে তুলে দিল লুনার হাতে। তাকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল লুনা আর দেশম।

ঘড়ি দেখল লুনা। বলল, 'আমাকে এখুনি স্টেশনে পৌঁছে দাও, দিদিয়ের। আধঘণ্টা পর একটা ট্রেন আছে, ওটা ধরতে চাই।'

'সে কী! এখুনি চলে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার আর তর সইছে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

প্যারিসে গিয়ে লেখাটা কাউকে দেখাতে চাই।'

'সেটা আগামীকাল করলেও তো চলে।'

'প্লিজ, বাধা দিয়ো না।'

'তোমার কাজে বাধা দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমার, লুনা,' বলল দেশম। 'কিন্তু আমি ভাবছি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে। প্যারিসে থাকা নিরাপদ নয় বলেই তো এখানে এসেছ তুমি।'

'অত ভেবো না,' হাত নাড়ল লুনা। 'ওখানে রানা আছে। আমার কোনও ভয় নেই।'

একটা ভুরু একটু উঁচু করল দেশম। 'ভদ্রলোকের উপর তোমার দেখছি অগাধ আস্থা। ব্যাপারটা কী?'

'ওভাবে বলছ কেন? ওকে তুমিও তো অ্যাকশনে দেখেছ... তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আস্থা রাখার মত মানুষ নয়?'

'অবশ্যই, তবে আমার আস্থার মধ্যে অন্য কিছু মেশানো নেই।'

'আমারটার মধ্যে কী আছে?'

'আবার দেখা হবার আকুতি, মনের আনচান দশা...'

'মার খাবে কিন্তু!' চোখ রাঙাল লুনা।

হেসে উঠল দেশম। 'বুঝেছি, আমার সন্দেহই ঠিক। তোমাকে রানার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত হবে না। চলো, স্টেশনেই চলো। লাগেজ আমি পরে পাঠিয়ে দেব।'

দশ মিনিটে রেলস্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। টিকেট কেটে ট্রেনে উঠল লুনা। প্ল্যাটফর্মে দেশম বিদায় দিল ওকে।

'সাবধানে থেকো,' যাবার আগে বলল সে। 'মসিয়ো রানা সুপারম্যান নন। সব বিপদ থেকে তাঁর পক্ষেও হয়তো সম্ভব হবে না তোমাকে বাঁচানো।'

'থাকব,' বলল লুনা। 'আমার জন্য চিন্তা কোরো না। গুডবাই।'

ট্রেন ছেড়ে দিল একটু পর। সিটে হেলান দিয়ে রানার নাম্বারে ডায়াল করল ও। কোনও রিং হলো না, তার পরিবর্তে ভেসে এল যান্ত্রিক কণ্ঠ। সংযোগ দেয়া যাচ্ছে না। রানার হোটেলে ফোন করল, রিসেপশনিস্ট জানাল—মসিয়ো রানা হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। তবে একটা মেসেজ রেখে গেছেন মাদমোয়াজেল পারসেলের জন্য। খুব জরুরি একটা কাজে ফ্রান্সের বাইরে যেতে হচ্ছে ওকে, যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসবেন। লুনা যেন অপেক্ষা করে।

একটু বিষণ্ন হয়ে পড়ল লুনা। কেন, তা বলতে পারবে না। তা হলে কী দেশমের কথাই ঠিক? রানার দেখা পাবার জন্য মন উতলা হয়ে উঠেছিল? অস্বীকার করার উপায় নেই, দুঃসাহসী বাঙালি যুবকটির প্রতি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। আশ্চর্য লোকটার ব্যক্তিত্ব, কোমল-কঠোরে মেশানো হৃদয়টা অদ্ভুত সুন্দর! আর চোখ দুটো... সেখানে যেন জাদু আছে। তাকালেই হারিয়ে যায় ও—কী অদ্ভুত মায়া মণিদুটোতে, দেখলেই মনে হয় এই লোককে বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হবে না। আবার ভয়ও লাগে, কেমন জানি একটা বেপরোয়া ভাব আছে রানার চেহারায়, যেন চাইলেই দারুণ নির্মম হয়ে উঠতে পারবে। ইতিমধ্যে তার প্রমাণও দেখতে পেয়েছে।

কে এই মাসুদ রানা? ধূমকেতুর মত কোত্থেকে উদয় হলো ওর জীবনে? এর জন্যই কি তা হলে এতগুলো বছর অপেক্ষা করছিল ও? আর্কিয়োলজিকেই নিজের নেশা আর পেশা বলে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল লুনা, কখনও কোনও পুরুষের প্রতি ক্ষীণতম আকর্ষণ অনুভব করেনি। ক্ষণিকের আবেগের বশে দু-একটা সম্পর্ক যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সে-আবেগ কাটতেও সময় লাগেনি। আবার পুরনো খোলসে ফিরে গেছে ও। কিন্তু সবকিছু পাল্টে দিয়েছে এই আশ্চর্য মানুষটার আবির্ভাব। না,

এ-মানুষ ক্ষণিকের আবেগ হতে পারে না। এর জন্মই হয়েছে কোনও ভাগ্যবতী মেয়েকে জন্ম-জন্মান্তরের সুখ দেবার জন্য। অথচ ওকে দেখলে মনে হয়, কোনও বাঁধনে জড়াবার জিনিস নয়, আটকানোর চেষ্টা করা বৃথা। নারী ও, সব বুঝতে পারে। রানার মত পুরুষকে বাঁধনে জড়ানোর ক্ষমতা নেই ওর, বরং তার সান্নিধ্যটুকু অমূল্য রত্নের মত আগলে রাখতে হবে ওকে। এর চেয়ে কষ্টকর আর কী হতে পারে!

তিনঘণ্টার ট্রেন-জার্নিতে শুধু এসব নিয়েই ভাবল লুনা। যখন প্যারিসে নামল, তখন বিষাদে ছেয়ে আছে অন্তর। ট্যাক্সি নিল অ্যাপার্টমেন্টে যাবার জন্য। ভাড়া মিটিয়ে বিল্ডিঙের সামনে যখন নামল, তখনও অন্যমনস্ক হয়ে আছে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে ততক্ষণে।

'এক্সকিউজ মোয়া!' অপরিচিত একটা কণ্ঠ গমগম করে উঠল কাছ থেকে। *'পার্লে ভুঁ আংলে?'*

মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই স্ট্রিটলাইটের আবছা আলোয় মাঝবয়েসী একজন পুরুষকে দেখতে পেল লুনা। পাশে একই রকম বয়সের একজন হাস্যমুখী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলার হাতে একটা মিচেলিন গাইড। নিশ্চয়ই ট্যুরিস্ট, উচ্চারণে আমেরিকান বলে মনে হচ্ছে।

'জী, ইংরেজি বলতে পারি,' হাসি ফোটাল লুনা। 'কী করতে পারি আপনাদের জন্য?'

বিব্রত কণ্ঠে লোকটা বলল, 'ইয়ে... আমরা হারিয়ে গেছি...'

স্বামীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মহিলা বলল, 'সব তোমার দোষ! কখন থেকে বলছি, কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও। না, তাতে সাহেবের ঘোর আপত্তি। এবার বোঝো মজা!'

লোকটার মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। তাকে বাঁচানোর জন্য নাক গলাল লুনা। 'কোথায় যাবেন আপনারা?'

'ইয়ে... লুভার মিউজিয়াম কোন্‌দিকে, তা বলতে পারেন?'

এই রাতের বেলায় এই দম্পতি লুভার মিউজিয়ামে গিয়ে কী করবে, তা আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না লুনার। বলল, 'সে তো রাইট ব্যাঙ্কে। এখান থেকে বেশ দূর। এক কাজ করতে পারেন, কাছে মেট্রো স্টেশন আছে, ওখান থেকে ট্রেন ধরলে সহজে পৌঁছে যাবেন।'

'আমাদের গাড়িতে ম্যাপ আছে,' বলল মহিলা। 'যদি অসুবিধে না হয়, একটু দেখিয়ে দেবেন, ঠিক কোথায় আছি আমরা?'

হতাশায় মাথা দোলাল লুনা। বোকার হদ্দ আর কাকে বলে? প্যারিসের কিছু চেনে না জানে না, গাড়ি ভাড়া করেছে কোন্‌ বুদ্ধিতে?

মাঝবয়েসী দম্পতির পিছু পিছু গাড়ির কাছে গেল ও, ওটা রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা হয়েছে। পিছনের দরজা খুলে মাথা ঢোকাল মহিলা, পরমুহূর্তে বের করে আনল। বলল, 'উফ্‌ফ্‌, পারছি না। কোমরের ব্যথাটা বড্ড ভোগাচ্ছে।' লুনার দিকে তাকাল। 'মাফ করবেন, মিস। ম্যাপটা একটু বের করে দেবেন? সিটের উপরেই আছে ওটা।'

কিছু সন্দেহ করল না লুনা। হেলমেট-সহ হাতের ব্যাগটা বাঁ হাতে চেপে ধরল, তারপর একটু কুঁজো হয়ে শরীর ঢোকাল গাড়ির ভিতর। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, সিটের উপরে কিচ্ছু নেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু ঘাড়ে বোলতার কামড়ের মত কী যেন ফুটল। বিস্মিত হয়ে মাথা ঘোরাল ও। দেখল, মাঝবয়েসী লোকটার হাতে একটা খালি সিরিঞ্জ শোভা পাচ্ছে।

চিৎকার করতে চাইল লুনা, কিন্তু পারল না। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। একটা স্নায়ুও সাড়া দিচ্ছে না। খড়ের

পুতুলের মত ওকে পিছনের সিটে বসিয়ে দিল লোকটা। তারপর দুই দুর্বৃত্ত উঠে বসল গাড়ির সামনে। ইঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ পেল লুনা, তারপর চলতে শুরু করল গাড়ি।

ধীরে ধীরে দৃষ্টি ঘোলা হয়ে এল লুনার। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটু পর জ্ঞান হারিয়ে সিটের উপর ঢলে পড়ল ও।

নয়

সত্যিকার একজন বিজ্ঞানীর প্রতিচ্ছবির মত দেখাচ্ছে আসিফকে। চোখে চশমা, পরনে হাঁটু-পর্যন্ত লম্বা সাদা অ্যাপ্রন, গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে স্পেক্ট্রোমিটারের ডিসপ্লে-র দিকে। মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে হাতের নোটপ্যাডে। সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে নানা রকম যন্ত্রপাতি আর স্যাম্পল। তবে গবেষণা করছে না ও, ব্যস্ত রয়েছে অন্য কাজে। ড. হেণ্ডারসনের কাছ থেকে যা জানার জেনে নিয়েছে ইতিমধ্যে, সেই অনুযায়ী দ্বীপের একটা মানচিত্র তৈরি করছে।

বাইরে থেকে ল্যাবরেটরিটাকে আহামরি কিছু মনে হয় না। হবার কথাও নয়। দ্বীপের সমস্ত বিল্ডিংই ব্রিটিশদের সাবমেরিন বেসের আমলে তৈরি করা হয়েছিল। সামরিক ডিজাইন কখনও নয়ন-জুড়ানো হয় না, তা তো জানা কথা। মিলিটারির লোকজন সৌন্দর্যের চেয়ে বিল্ডিঙের টিকে থাকার ক্ষমতার বেশি ভক্ত।

তবে বাইরের অভাব ল্যাবের ভিতরে ঘুচিয়ে দেয়া হয়েছে। ভিতরটা খোলামেলা, আলোকিত এবং হিটারের কল্যাণে আরামদায়ক উষ্ণ। ইকুইপমেন্টের অভাব নেই, সবই অত্যাধুনিক। এমনকী নুমার ল্যাবেও এমন চমৎকার যন্ত্রপাতি দেখেনি আসিফ-তানিয়া। এই ল্যাব যে-কোনও বিজ্ঞানীর জন্যই স্বপ্নের জগৎ... মানে, আনাচে-কানাচে দাঁড়ানো অস্ত্রধারী প্রহরীদেরকে বাদ দিয়ে আর কী! লোকগুলো সারাক্ষণই নজরবন্দি করে রাখছে ওদেরকে।

হেণ্ডারসনকে বিমানে করে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। ফলে আকাশ থেকে দ্বীপের পুরো বিস্তার দেখার সুযোগ হয়েছে তার। রেজা দম্পতিকে জানিয়েছে, দ্বীপের আকার অনেকটা চায়ের কাপের মত। সাগর থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। চারপাশের কিনারাগুলো খাড়া পাথুরে পাঁচিল হয়ে নেমে গেছে সাগরের বুকে। খাঁড়ির অংশটাতে শুধু কোনও পাঁচিল নেই, ওপাশটা ঢালু হয়ে পানিতে মিশেছে। আধমাইল লম্বা একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির সৈকত রয়েছে খাঁড়ির পারে, সৈকতের পিছনে রয়েছে নিচু পাহাড়ি প্রাচীর।

সাবমেরিন পেনের অবস্থান ইনলেটের মুখে। খাঁড়ির পাশের পাঁচিলের উপর দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে ক্রু-কোয়ার্টার থেকে পেনের এন্ট্রান্স পর্যন্ত। রাস্তার পাশে চোখে পড়বে একটা পরিত্যক্ত গির্জা, আগাছায় ঢাকা কবরস্থান, আর পুরনো এক জেলে-গ্রামের ধ্বংসস্তূপ। ইনল্যাণ্ডের আরেকটা রাস্তা মিশেছে ওটার গায়ে, সেটা অনুসরণ করলে একটা গিরিখাতের ভিতর দিয়ে দ্বীপের বহু পুরনো মরা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে পৌঁছুনো যাবে। দ্বীপের চারপাশ পাথুরে পাঁচিলে ঘেরা হলেও মূল ভূ-খণ্ডে পাথরের অস্তিত্ব কম। বেশিরভাগটাই নানা রকম ঝোপঝাড় আর নানা প্রজাতির গাছগাছালিতে ঢাকা।

পায়ের শব্দ হলো। পরমুহূর্তে ড. হেণ্ডারসন উদয় হলো আসিফের পাশে। বলল, 'কাজে বাধা দেয়ায় দুঃখিত। আপনার অ্যানালিসিস কেমন এগোচ্ছে?'

নোটবুকের উপর নজর বোলাল আসিফ। 'এখনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না, ডক্টর।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকল হেণ্ডারসন। নিচু গলায় বলল, 'কর্নেল ভেগার সঙ্গে মিটিং সেরে এলাম। সুসংবাদ না দুঃসংবাদ বলব, বুঝতে পারছি না; তবে আমাদের পাঠানো ফর্মুলার টেস্টিং সফল হয়েছে।'

'কংগ্রাচুলেশন্স!' তিক্ত গলায় বলল আসিফ। 'তা হলে তো আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ওদের কাছে। এখনও দম ফেলছি কেন?'

'ভেগা একটা খুনে পিশাচ হতে পারে, কিন্তু কাজ করে নিয়ম মেনে। দ্বীপের অপারেশন বন্ধ করার আয়োজন করবে সে আগে, যাতে আমাদেরকে খতম করার আনন্দটা সময় নিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে। আমার ধারণা, আগামীকাল জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আমাদের দিয়ে কবর খোঁড়াবে ও।'

'তারমানে যা করার, তা আজ রাতেই করতে হবে আমাদেরকে,' বলল আসিফ। নোটবুক তুলে দিল হেণ্ডারসনের হাতে। 'দেখুন তো, দ্বীপের টপোগ্রাফি ঠিকমত আঁকতে পেরেছি কি না।'

মানচিত্রটা দেখল হেণ্ডারসন। হেসে বলল, 'কার্টোগ্রাফিতে চমৎকার হাত আপনার! দারুণ এঁকেছেন। কোনও খুঁত নেই। কী করতে চান এখন?'

'স্বীকার করছি, এসব পরিস্থিতি সামলানোর তেমন অভিজ্ঞতা নেই আমার। তবে আমার বন্ধু মাসুদ রানা বলে—যা-ই করো, জটিল কিছু করতে যেয়ো না। সহজ পথটা

বেছে নিয়ো।'

'এখানে সহজ পথ কোন্‌টা?'

'এটা,' ম্যাপের উপর আঙুল রাখল আসিফ। 'গিরিখাতের ভিতরের রাস্তাটা ধরে খাঁড়ির ধারে পৌঁছুব আমরা। আপনি বলছিলেন, ওখানে একটা জেটি আছে।'

'সম্ভবত। সন্ধেবেলা এসেছিলাম বিমানে, আলো কম ছিল। শিয়োর হবার উপায় ছিল না।'

'ধরে নিচ্ছি ভুল করেননি। সত্যিই জেটি আছে ওখানে। আর জেটি থাকলে বোটও থাকার কথা। একটা বোট ধার নেব আমরা, ওটায় চড়ে সাগরে ভেসে পড়ব। তারপর কী ঘটে, সেটা তখন দেখা যাবে।'

'আপনার এই প্ল্যানে যদি কোনও গড়বড় দেখা দেয়? বিকল্প কী থাকছে আমাদের হাতে?'

'দুঃখিত, কোনও বিকল্প নেই। হয় এস্পার, নয় ওস্পার। পালাব, নইলে মারা পড়ব। মরণ তো এমনিতেই দরজায় কড়া নাড়ছে, নাহয় একটু চেষ্টা করে দেখি। অসুবিধে তো নেই।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসিফের মুখ দেখল হেগ্রারসন। দৃঢ়সংকল্প ফুটে আছে ওতে। বুঝতে পারল, ঠাট্টা করছে না, তরুণ এই বিজ্ঞানী সত্যিই সিরিয়াস।

হাসল হেগ্রারসন। 'আপনার মনোভাব আমার পছন্দ হয়েছে, ড. রেজা। ঠিক আছে, আমি যতদূর পারি সাহায্য করব আপনাদেরকে।'

একটা টুল টেনে নিয়ে বসল আসিফ, অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে থাকায় পা ব্যথা করছে। চোখ ফেরাল তানিয়া আর জয়েসের দিকে। থারমাল ভেন্ট থেকে আনা জৈব স্পেসিমেন নিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে বসে গবেষণা করছে ওরা। অন্যান্য বিজ্ঞানীদেরকেও দেখল, সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত; অন্য

কোনও দিকে মনোযোগ নেই।

হেণ্ডারসনও তাকাচ্ছে সহকর্মীদের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'ওদের ব্যাপারে কী করবেন বলে ভাবছেন?'

'প্ল্যানের কথা খুলে বলব কিনা বুঝতে পারছি না,' আসিফ বলল। 'ওদের ভিতর কর্নেল ভেগার চর থাকতে পারে। হয়তো গিয়ে সব ফাঁস করে দেবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' হেণ্ডারসন মাথা নাড়ল। 'বেশ কিছুদিন থেকে আমার সঙ্গে কাজ করছে ওরা। অমন কেউ থাকলে নিশ্চয়ই টের পেতাম। নাহ্, খামোকাই সন্দেহ করছেন। আমাদের মত ওরাও জেনুইন বিপদের মধ্যে আছে।'

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল আসিফ। শেষ পর্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো। বলল, 'না, ওদেরকে আপাতত কিছু জানাব না আমরা। সঙ্গেও নেব না। বেশি লোক নিতে গেলে কেউই পালাতে পারব না। চারজনই পারব কি না বলা কঠিন।'

'তাই বলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে যাবেন ওদেরকে?' বিস্মিত গলায় বলল হেণ্ডারসন।

'কারও মৃত্যুই চাই না আমি, ডক্টর,' বলল আসিফ। 'এখান থেকে পালাতে পারলে ওদের জন্য যত দ্রুত সম্ভব সাহায্য পাঠাব আমরা। বোঝার চেষ্টা করুন, সবাইকে নিতে গেলে পুরো প্ল্যানের দফা-রফা হয়ে যাবে।'

যুক্তিটা মানতে বাধ্য হলো হেণ্ডারসন। বলল, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরাই বা পালাব কীভাবে? পুরো কম্পাউণ্ড ঘিরে রাখা হয়েছে ইলেকট্রিফায়েড ফেন্সে। সবখানে গার্ড আছে। ওদেরকে ফাঁকি দেবেন কীভাবে?'

'ডাইভারশন তৈরি করব বলে ভাবছি।'

'যে-সে ডাইভারশনে কাজ হবে না। এরা সবাই ট্রেইণ্ড যোদ্ধা, সহজে ঘাবড়ায় না।'

'আমি যে-প্ল্যান এঁটেছি, তাতে দুনিয়ার সেরা যোদ্ধাও ঘাবড়াতে বাধ্য।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল আসিফ। শুনে চোখ বড় হয়ে গেল হেগ্তারসনের। হতভম্ব ভঙ্গিতে বলল, 'মাই গড, ম্যান! আপনি তো লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার ফন্দি এঁটেছেন! যদি সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়?'

'আমি চাই ওলোট-পালোট হোক, পরিস্থিতি যেন কেউ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারে।' গম্ভীর গলায় বলল আসিফ। 'গাড়ি ম্যানেজ করতে না পারলে আমাদেরকে হেঁটে রওনা হতে হবে। কাজেই এখানে সবকিছু এলোমেলো থাকা দরকার। কেউ যাতে আমাদের পিছু নিতে না পারে।'

একজন গার্ডকে ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখল হেগ্তারসন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আসিফের পাশ থেকে। নিচু গলায় বলল, 'আমাদের আলোচনা নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠছে ওরা। আর এখানে থাকতে পারছি না। আমি যাই, পরে কথা হবে।'

'ঠিক আছে, ডক্টর।'

তড়িঘড়ি করে চলে গেল হেগ্তারসন। আসিফও উঠে পড়ল টুল থেকে। হাঁটতে শুরু করল ল্যাবের বিপরীত প্রান্তের দিকে। তানিয়া আর জয়েসকে সব খুলে বলতে হবে।

নোংরা, পুরনো এক মদ্যশালা। নাম—*দ্য ব্লাডি সি সার্পেন্ট।* দরজা খুলতেই রানার নাকে-মুখে ঝাপটা মারল ধোঁয়ার মেঘ। সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আছে। মুখের সামনে হাত নেড়ে মেঘটা পাতলা করল ও, আগে বাড়ল। কোনার একটা টেবিল দখল করে বসে আছে মুরল্যাণ্ড, কথা

বলছে ফোকলা এক বুড়োর সঙ্গে, লোকটার পরনে তেল চিটচিটে পোশাক। যেন *ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি*-র পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র।

রানা এগোতেই মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উঠে পড়ল বুড়ো। তার খালি চেয়ারটায় বসল রানা। বলল, 'নতুন বন্ধু পাতিয়েছ দেখছি!'

'খোঁচা না মেরে বরং পিঠ চাপড়ে দাও,' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'এখানে বন্ধু পাতানো কি সহজ কাজ? স্কটিশ এই নচ্ছাড়গুলোর সঙ্গে কথা বলার জন্য দোভাষী দরকার। একটা শব্দও যদি ঠিকমত উচ্চারণ করতে জানে! আর একেকজনের যা ব্যক্তিত্ব! পুরনো আমলের রাজা-বাদশাকেও বোধহয় এভাবে তোয়াজ করতে হতো না।'

'হুম,' মুচকি হাসল রানা। 'দেখতে পাচ্ছি, চমৎকার মুডে আছ তুমি।'

সামনে রাখা ময়লা মদের গ্লাস দেখাল মুরল্যাণ্ড। 'উইস্কির নামে শেয়ালের পেচ্ছাপ পেটে পড়লে মুড চমৎকার হবে না কেন? ট্রাই করতে চাও?'

'মাফ করো, ভাই,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা। 'অত আনন্দ সইবে না।'

মুখে যা-ই বলুক, গ্লাস তুলে নিয়ে ঢকঢক করে চুমুক দিল মুরল্যাণ্ড। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাজ কদ্দূর এগোল?'

'ষোল আনা।' উইণ্ডব্রেকারের পকেটে হাত দিয়ে একটা চাবির গোছা বের করে আনল রানা। টেবিলের উপর রাখল। 'তোমার সামনে এখন নুমার ফ্লিটের নবতম সংযোজনের চাবি দেখতে পাচ্ছ।'

'অসুবিধে হয়নি তো?'

'উঁহুঁ। ফিশ-পিয়ারে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে বিচ্ছিরি বোটটা

খুঁজে বের করলাম, তারপর ওটার মালিককে এমন এক অফার দিলাম, যা ওর পক্ষে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।'

'কিছু সন্দেহ করেনি?'

'কীসের সন্দেহ? ওকে বলেছি, আমি একজন টিভি প্রোডিউসার, *আউটকাস্ট* শো-র রহস্যটা নিয়ে তদন্ত করছি, তাই একটা বোট দরকার। তবে কাভার স্টোরির দরকার ছিল না, টাকার অ্যামাউন্ট শুনেই ব্যাটার বেহুঁশ হবার দশা, নতুন আরেকটা বোট কিনতে পারবে ওই টাকা দিয়ে। যদি বলতাম ভিনগ্রহ থেকে এসেছি, তাতেও কিছু হেরফের হতো না। তার ওপর ওকে আমার অনুষ্ঠানে একটা পার্ট দেব বলে কথা দিয়ে এসেছি।'

'হারানো টিভি ক্রু-দের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছ?'

'হুঁ, তবে সবই গুজব। পুলিশ আর কোস্ট গার্ড *পি আইল্যাণ্ড* নামের দ্বীপটাতে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, তবে কী পেয়েছে না পেয়েছে, সে-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেনি। চালু গুজব হলো, রক্ত আর মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেয়েছে ওরা। আরেকদল পুরো ব্যাপারটাকেই পাবলিসিটি স্টাণ্ট বলে মনে করছে। কিছুদিনের মধ্যেই নাকি হারানো ক্রু-রা নতুন কোনও টিভি শো নিয়ে হাজির হবে। এনিওয়ে, তুমি কী জানতে পারলে?'

উঠে যাওয়া বুড়োর দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'ওই ব্যাটার কাছে অনেক কিছু শুনলাম। জন্মের পর থেকে এখানে বাস করছে, সবাইকে চেনে। আশপাশের গোটা এলাকার ব্যাপারে চলন্ত বিশ্বকোষ বলতে পারো। দু'পাইন্ট মদ খাওয়াতেই গড়গড় করে সব উগরে দিল।'

'আমরা যেখানে যেতে চাইছি, সে-জায়গা সম্পর্কে কিছু বলতে পেরেছে?'

'হুঁ। *আউটকাস্ট*-এর ঘটনার পর শুরুতে ওই দ্বীপের দিকেই সন্দেহের দৃষ্টি দিয়েছিল সবাই। তবে পাবলিসিটি স্টান্টের গুজব ছড়াবার পর সব আবার থিতু হয়ে গেছে।'

'*পি আইল্যাণ্ড* থেকে ওই দ্বীপটার দূরত্ব কত?'

'পাঁচ মাইল। স্থানীয় লোকজনের ধারণা, ওখানে কোনরকম সেমি-অফিশিয়াল অপারেশন চলছে... দ্বীপটা এখনও সরকারের সম্পত্তি। কাজেই অমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সিকিউরিটির যে ব্যবস্থা ওখানে, প্রাইভেট পর্যায়ে এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। কেউ ধারেকাছে ঘেঁষলেই সশস্ত্র প্যাট্রোল বোট এসে তাড়া করে। কোনও কোনও জেলে নাকি মিনিয়েচার সাবমেরিনের ধাওয়াও খেয়েছে।'

'নিশ্চয়ই এ.ইউ.ভি. দেখেছে ওরা,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ওটাকেই মিনিয়েচার সাবমেরিন ভাবছে।'

দড়াম করে মদ্যশালার দরজা খুলে গেল। মোটাসোটা এক লোক এসে ঢুকল ভিতরে। বারের কাছে গিয়ে উঁচু গলায় ঘোষণা দিল, উপস্থিত সবাইকে ড্রিঙ্ক করাবে সে।

'ব্যাটার দেখছি দয়ার শরীর!' টিটকিরি মারল মুরল্যাণ্ড।

'দয়া-টয়া না, পকেট গরম। সবার সামনে ফুটানি দেখাতে চাইছে,' রানা বলল। 'ওর কাছ থেকেই বোট কিনেছি আমি। ব্যাটা দেখি ব্যাপারটা ঢোল পিটিয়ে জানাবার আয়োজন করছে!'

'চলো কেটে পড়ি,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'তোমাকে দেখতে পেলে না জানি কোন্ কাণ্ড ঘটায়! এখানে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে না।'

'চলো,' বলে উঠে পড়ল রানা। মুরল্যাণ্ড-সহ মদ্যশালার পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ভাড়া করা রুমিং হাউস থেকে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে খানিক পরেই ডকে পৌঁছে গেল ওরা।

ভাঙাচোরা জেটি ধরে এগিয়ে চলল দু'জনে। একটু পর পঁচিশ ফুট লম্বা এক বোটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। হতশ্রী চেহারা। রুদ্র সাগরের আঘাতে আঘাতে নড়বড়ে হয়ে গেছে কাঠামো। শরীর বিবর্ণ। নোংরা আপার ডেকে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুইলহাউস—ওটার অবস্থান বো-র কাছে।

'স্থানীয় লোকজন এ-ধরনের বোটকে বলে *ক্রিলার,*' রানা বলল। 'পুরনো মালিকের মুখে শুনলাম, এটা '৭১ সালে তৈরি হয়েছে।'

'১৯৭১, নাকি ১৮৭১?' মুখ বাঁকা করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমি একটু কনফিউজড্। তোমার এই লাক্সারি ইয়টের বিল দেখে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটা আন্দাজ করতে পারো?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা। কারণ বোট কেনার বুদ্ধিটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, আমি তো প্যারাজাম্প করতে চাইছিলাম!'

'হুম, বলব অ্যান্টিক ভ্যালু দিয়ে কিনেছি আমরা।' স্টার্নে লেখা নামটা পড়ল মুরল্যাণ্ড। '*স্পুটার!* সে আবার কী জিনিস?'

'এক ধরনের ঝিনুক। নামটা স্থানীয়। লোকজন বিশ্বাস করে, এই ঝিনুকের মাংসে কামোদ্দীপক গুণ আছে।'

'অমন কথা আমি গণ্ডারের শিঙের ব্যাপারেও শুনেছি। যত্তসব গাঁজাখুরি!'

হাসল রানা। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, গণ্ডারের শিং নিয়ে তোমার কোনও বিব্রতকর অভিজ্ঞতা আছে।'

'জানতে চেয়ো না, প্লিজ। এখন চলো, তোমার ভাসমান মিউজিয়ামের ভিতরটা দেখি।'

বোটে চড়ল দুজনে। ডেক দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড,

রানা ঢুকল হুইলহাউসে। কেবিনটা বেশি বড় নয়, বড়জোর দুটো টেলিফোন বুথের সমান জায়গা। ডিজেলের ধোঁয়া আর পোড়া সিগারেটের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ইঞ্জিন কন্ট্রোল আর হুইল পরীক্ষা করে দেখল ও, সন্তুষ্ট হলো। যখন বেরিয়ে এল, তখন মুরল্যাণ্ড ডেকে পা ঠুকছে।

'মজবুত মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'সমস্যা হবে না আশা করি।'

'ঠিকই ধরেছ,' রানা বলল। 'দেখতে যতটা দেখায়, আসলে অত খারাপ না বোটটা। এসো, চার্ট পাওয়া যায় কি না দেখি।'

হুইলহাউসের কাবার্ডে গ্রিজের দাগঅলা একটা চার্ট পাওয়া গেল। ওটায় চোখ-বুলিয়ে নির্দিষ্ট দ্বীপটা খুঁজে বের করল ওরা। ডক থেকে দশ মাইল দূরে। আশপাশের এলাকা ভাল করে দেখল রানা, তারপর নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল।

'কী মনে হয় তোমার?' জানতে চাইল ও।

'হাই-টেক চ্যালেঞ্জের লো-টেক সমাধান,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'তবে মনে হচ্ছে কাজ হবে। কখন রওনা হতে চাও?'

'এখুনি নয় কেন? ট্যাঙ্কে যথেষ্ট ফুয়েল আছে।'

আপত্তি করল না মুরল্যাণ্ড। 'ঠিক আছে, আমি তা হলে ইঞ্জিন চালু করছি।'

একটু পরেই গগনবিদারী আর্তনাদ ছাড়ল *স্পুটার*-এর ইঞ্জিন। মুরল্যাণ্ড বোটের বাঁধন খুলে দিলে থ্রটল বাড়াল রানা। আস্তে আস্তে সরে এল ডকের পাশ থেকে। মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ওরা।

দশ

বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগোচ্ছে আসিফ। এগোচ্ছে ছায়ায় ছায়ায়। ভালমত খেয়াল না করলে ওকে কেউ দেখতে পাবে না। মাঝরাত হতেই কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়েছে ও। অতি-সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। তবে এতটা সতর্ক না হলেও ক্ষতি ছিল না। কম্পাউণ্ডে কোনও প্রহরী টহল দিচ্ছে না, গার্ড-টাওয়ারগুলো খালি। ব্যারাক থেকে ভেসে আসছে প্রহরীদের মাতাল হৈ-হল্লার আওয়াজ। দ্বীপে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় সম্ভবত আনন্দে পার্টি করছে ওরা।

কিছুক্ষণ পর হৈ-হল্লার আওয়াজ ফিকে হয়ে এল। অ্যাকোমোডেশন এরিয়া থেকে দূরে সরে এসেছে আসিফ। এবার আর লুকিয়ে এগোনোর প্রয়োজন নেই। ধুলোমাখা পথ ধরে দ্রুত এগোতে থাকল ও। নাকে বোটকা গন্ধ পেতে বুঝতে পারল, গন্তব্যের কাছে পৌঁছে গেছে।

কর্নেল ভেগার *চিড়িয়াখানা*-র সীমানায় এসে গতি কমাল আসিফ। বেশ ক'টা ফ্লাডলাইট জ্বেলে আশপাশ আলোকিত করে রাখা হয়েছে। একটু থেমে চারপাশ পরখ করে নিল। না, কোনও গার্ড দেখা যাচ্ছে না। পার্টিতে যোগ দিতে গেছে সবাই। এক ছুটে বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছুল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল সদর দরজা। অ্যালার্ম সিস্টেম আছে বলে মনে হলো না।

এখানে কেউ অনুপ্রবেশ করবে বলে আশা করেনি ভেগা, তার কোনও কারণও নেই।

ভবনের ডাবল স্টিল ডোর যথেষ্ট শক্তিশালী, কিন্তু আটকে রাখা হয়েছে স্রেফ একটা প্যাডলক দিয়ে। ল্যাব থেকে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে এসেছে আসিফ, ওগুলোর সাহায্যে তালা ভাঙতে কোনও কষ্ট হলো না। সাবধানে পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ বোটকা গন্ধ ঘুসির মত আঘাত হানল নাকে-মুখে।

সময় নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল আসিফ, তারপর চোখ বোলাল ভিতরে। বিশাল কামরাটা আধো-অন্ধকার। ছাতে লাগানো অল্প কয়েকটা বালব ছাড়া আর কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। সবগুলো এ-মুহূর্তে জ্বলছেও না। তবে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ভিতরের অধিবাসীরা। খাঁচার ভিতর থেকে নড়াচড়ার শব্দ ভেসে এল। লাল চোখগুলো ওর প্রতিটি পদক্ষেপ খেয়াল করছে।

সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট এনেছে আসিফ। সেটা জ্বেলে দেয়ালের সুইচবোর্ড খুঁজে বের করল, অন্ করে দিল সবক'টা বালব। এবার আলোকিত হয়ে উঠল অভ্যন্তর। শুরুতে একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল খাঁচার প্রাণীগুলো। একটু পর ভয় কেটে গেল তাদের। এগিয়ে এসে খাঁচার শিকের কাছে জড়ো হলো। আগন্তুককে দেখছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

নার্ভাস বোধ করছে আসিফ, তবে খেয়াল করল—হিংস্র আচরণ করছে না মিউট্যাণ্টরা। নিচু কণ্ঠে গরগর করছে, ভাব বিনিময় করছে পরস্পরের সঙ্গে। ওকে ভয় পাবার কোনও কারণ দেখছে না, বরং কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এতে স্বস্তি বোধ করার কিছু নেই, এরা এককালে মানুষ ছিল। বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও অক্ষুণ্ন আছে। ফন্দি আঁটছে কি না কে জানে। কিন্তু ঝুঁকি

না নিয়েও উপায় নেই।

লঘু পায়ে খাঁচার সারি পেরিয়ে বিল্ডিঙের অন্য প্রান্তে চলে গেল আসিফ। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল খাঁচার কন্ট্রোল প্যানেল। অনেকগুলো সুইচ... কোন্‌টা কোন্‌ খাঁচার দরজা খোলে, তা মার্কিং করে রাখা আছে। সেই সঙ্গে খাঁচার বন্দিরা আলফা না বিটা গোত্রের, তাও উল্লেখ করা আছে।

বুক ধক ধক করছে, পরীক্ষামূলকভাবে আলফা গ্রুপের একটা সুইচ টিপল আসিফ। ধাতব শব্দ করে সরে যেতে শুরু করল খাঁচার দরজা। ভিতরের প্রাণীগুলো ভড়কে গেল সে-শব্দ শুনে, হুড়মুড় করে দৌড়ে গিয়ে জটলা পাকাল খাঁচার পিছনদিকে। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যাবার পর যখন কিছু ঘটল না, তখন একটা প্রাণী এগিয়ে এল সামনে। খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে; বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা ফাঁদ কি না।

আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। মিউট্যান্টদের ভয় কেটে গেলেই বিপদ। দ্রুতহাতে সবগুলো সুইচ টিপে দিল আসিফ। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। পিছনে হুঙ্কার ছাড়ল মুক্তি পাওয়া পিশাচেরা।

কম্পাউণ্ডের মেইন গেট থেকে একশো গজ দূরে, ঘন হয়ে জন্মানো অনেকগুলো গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে তানিয়া, জয়েস আর হেণ্ডারসন। অপেক্ষা করছে আসিফের জন্য। ওর পিছু পিছুই কটেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। তানিয়া আর জয়েস নির্বিকার হলেও দুশ্চিন্তা এড়াতে পারছে না হেণ্ডারসন। এই দ্বীপে ওদের চাইতে অনেক বেশি সময় ধরে থাকছে সে, জানে—গার্ডদের মতিগতির কোনও ঠিক নেই। এখন ফুর্তি করছে বটে, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে পাছায় কর্নেল

ভেগার লাথি খেয়ে সবাই ডিউটির জন্য বেরিয়ে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

একটু পরেই ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর চাপা গলায় ডাক।

'তানিয়া!'

আসিফের গলা চিনতে পারল ওরা। আড়াল থেকে বেরিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল তানিয়া। বলল, 'কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে!'

'বাঁচিয়েছেন!' শব্দ করে শ্বাস ফেলল হেণ্ডারসন। 'চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হবার দশা। ভাবছিলাম কোনও বিপদ ঘটল কি না।'

গাছের আড়ালে এসে বসে পড়ল আসিফ। বলল, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। যতটা ভেবেছিলাম, তারচেয়ে সহজে সারতে পেরেছি কাজটা।'

সামান্য দূরে উবু হয়ে থাকা কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখে চমকে উঠল ও। তারপর আবার সহজ হয়ে এল। সহকর্মী ছয় বিজ্ঞানীকে চিনতে পেরেছে। ওরা সবাই এগিয়ে এল ওর দিকে।

'দুঃখিত,' বলল হেণ্ডারসন। 'ওদেরকে ফেলে আসতে পারলাম না।'

'আইডিয়াটা আমার,' তানিয়া বলল।

'ইটস্ ওকে,' হাত নাড়ল আসিফ। 'আমিও মত পাল্টেছি খানিক আগে। সবাইকে নিয়ে যাব বলে ভাবছিলাম। কেউ পিছে পড়ে যায়নি তো?'

'না,' বলল এক বিজ্ঞানী। 'কিন্তু এখন আমরা কী করব?'

'অপেক্ষা,' সংক্ষেপে জবাব দিল আসিফ। হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গেল, যাতে আশপাশে কী ঘটছে তা দেখতে পায়।

মেইন গেটের পাশে একটা সেন্ট্রিহাউস আছে, ওটার সামনে

চেয়ার পেতে বসে আছে দু'জন প্রহরী। এরা পার্টিতে অংশ নেয়ার অনুমতি পায়নি। মন-মেজাজ খারাপ, ডিউটি করছে বটে, কিন্তু কাজে মনোযোগ নেই।

শান্তভাবে পরিস্থিতি বিচার করল আসিফ। হিসেবি চাল দিয়েছে ও, সেটা কাজে লাগার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি। এমন হতে পারে, মুক্তি পেয়ে মিউট্যাণ্টরা পালাবার চেষ্টা করবে। সুস্থ মস্তিষ্কের যে-কারও জন্য সেটাই স্বাভাবিক রিঅ্যাকশন। কিন্তু মিউট্যাণ্টদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক নয়; জেদি, হিংস্র স্বভাবের প্রাণী ওরা। যারা ওদেরকে বন্দি করে রেখেছিল, অত্যাচার চালিয়েছে এতদিন, তাদের উপর প্রতিশোধের নেশা সওয়ার হতে পারে ওদের উপর। সেটাই চায় ও।

গেটের দিকে তাকাল আসিফ। দুই প্রহরী সিগারেট ফুঁকছে, মদের একটা বোতল চালাচালি করছে নিজেদের মধ্যে। পার্টিতে যেতে পারেনি তো কী হয়েছে, নিজেরাই পার্টির পরিবেশ তৈরি করে নিচ্ছে। এবার মিউট্যাণ্টদের আবাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ও। আসার পথে দরজা টেনে দিয়ে এসেছিল, হঠাৎ ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা, এক চিলতে আলো বেরিয়ে এল বিল্ডিঙের ভিতর থেকে। তারপর দলে দলে কালচে অবয়ব বেরুতে শুরু করল দরজা গলে। আসিফের অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হলো, পালাল না প্রাণীগুলো। দল বেঁধে এগোতে শুরু করল গার্ডদের ব্যারাকের দিকে। চোখের পলকে মিশে গেল গাছগাছালির ছায়ায়।

কিছুক্ষণ সব আগের মত রইল। তারপরই পার্টির হৈ-হল্লা থেমে গেল। তারপরই শুরু হলো চেঁচামেচি। গুলির আওয়াজ হলো কয়েকটা, কিন্তু সবকিছু চাপা পড়ে যেতে শুরু করল জান্তব ভয়াবহ হুঙ্কারের তলায়। শুরু হলো মানুষের আর্তচিৎকারের রোল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ব্যারাকে রক্তগঙ্গা বয়ে যেতে

শুরু করেছে।

ব্যারাকের দিক থেকে ভেসে আসা আওয়াজ কানে গেছে মেইন গেটে দাঁড়ানো দুই প্রহরীর। নিজেরা উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল। করণীয় ঠিক করতে পারছে না। একটু পরেই অ্যাকোমোডেশন এরিয়া থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল একটা গাড়ি, ছুটে যাচ্ছে গেটের দিকে। ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছে।

বাহনটা আলোকিত একটা জায়গায় পৌঁছুতেই ভেগার কনভার্টিবল বলে চিনতে পারল আসিফ। অনেকগুলো মিউট্যান্টের ভিড়ে চাপা পড়ে গেছে গোটা চেসিস। হুড আর দু'পাশ ধরেও ঝুলছে কয়েকটা প্রাণী। উন্মত্তের মত গাড়িকে ডানে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে চালক, ঝটকা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে অনাহূত আরোহীদেরকে। কিন্তু সফল হতে পারছে না।

গুলি শুরু করল দুই গার্ড। হুডের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল দুটো প্রাণী। কিন্তু বাকিরা নড়ল না। গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ল সেন্ট্রিহাউসের দেয়ালে। প্রবল ঝাঁকিতে ছিটকে পড়ে গেল মিউট্যান্টরা। টলতে টলতে দরজা খুলে নেমে এল কর্নেল ভেগা, তার পুরো শরীর রক্তে রঞ্জিত। কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আনল, গুলি করল সবচেয়ে কাছে পড়ে থাকা মিউট্যান্টের গায়ে।

হিতে-বিপরীত হলো তাতে। প্রবল আক্রোশে কর্নেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি প্রাণীরা। তাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। লোমশ দেহগুলোর আড়ালে এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ। হঠাৎ কর্নেলের একটা হাত ছিঁড়ে আনল এক মিউট্যান্ট, তার দেখাদেখি একটা পা-ও হিপ জয়েন্ট থেকে আলাদা করে ফেলল আরেকজন। আর্তনাদ থেমে গেল কর্নেলের। তার প্রাণহীন দেহের উপর হুটোপুটি করতে থাকল হিংস্র প্রাণীগুলো।

যা বোঝার বুঝে ফেলেছে দুই গার্ড, অস্ত্র ফেলে দিয়ে পিঠটান দিল। হৈ-হৈ করে তাদের পিছু নিল সবগুলো প্রাণী। পিছনে পড়ে রইল ভেগার রক্তাক্ত, বিকৃত মৃতদেহ।

সঙ্গীদের একত্র করল আসিফ। আশপাশ দেখে নিয়ে ছুটতে শুরু করল সেন্ট্রিহাউসের দিকে। মিউট্যান্টদের চিহ্ন নেই কোথাও। হতভাগ্য দুই গার্ডকে শিকার করায় ব্যস্ত তারা। সুযোগটা কাজে লাগাল ওরা। ভেগার গাড়িতে উঠে পড়ল। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি একটু পিছিয়ে আনল আসিফ, তারপর সবেগে সামনে বাড়ল। কম্পাউণ্ডের মেইন গেট ভেঙে বেরিয়ে এল রাস্তায়। খাঁড়ির দিকে ছুটল সর্বোচ্চ গতিতে।

মুক্তি এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

হারবার ছেড়ে বেরিয়ে আসার খানিক পরেই লিক দেখা দিল রানা-মুরল্যাণ্ডের সাধের বোটে। শান্ত পানি থেকে দু'ফুট উঁচু ঢেউসমৃদ্ধ সাগর আসলে খুব বড় কোনও পার্থক্য নয়, কিন্তু *স্পুটার*-এর বুড়ো খোল সেই ধাক্কাই সহ্য করতে পারল না। রানা হেলমে রয়েছে, হঠাৎ খেয়াল করল হুইল ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না। সুইচ টিপে বিলজ্ পাম্প চালু করতে চাইল, কিন্তু ওটার মোটর তাতে যেন রাজি নয়।

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'কামোদ্দীপক না ছাই, এটার নাম ভাঙা ছাঁকনি রাখলে বেশি মানানসই হতো।'

'কী করা যায়, একটু দেখবে?' বলল রানা। 'এখুনি সাঁতার কাটার ইচ্ছে নেই আমার।'

'আমার বুঝি আছে? দেখছি।' বলে উঠে পড়ল মুরল্যাণ্ড। মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে খুশি হয়েছে করার মত একটা কাজ পেয়ে। পেশায় ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, জটিল কলকব্জা আর তেল-কালি ঘেঁটে আনন্দ পায়। ডেক হ্যাচ খুলে নীচে নেমে

গেল। একটু পর গলা চড়িয়ে বলল, 'এবার চেষ্টা করে দেখো।'

সুইচ টিপল রানা। কয়েকবার কাশি দিয়ে চালু হলো পাম্প। ধীরে ধীরে ওটার আওয়াজ স্বচ্ছন্দ হয়ে এল। একটু পর উঠে এল মুরল্যাণ্ড। কালি মেখে ভূতের মত চেহারা হয়েছে ওর।

'জাদু দেখিয়ে দিয়েছ,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'কী করেছ নীচে গিয়ে?'

'ইঞ্জিন মেরামতের সবচেয়ে বেসিক কাজ,' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলল মুরল্যাণ্ড। 'কোথাও তার ছিঁড়ে গেছে কি না, সেটা চেক করে দেখা।'

হেসে ফেলল রানা। একেবারে ঠিক সময়ে পাম্পটা চালু করতে পেরেছে মুরল্যাণ্ড। পানির ওজনে একদিকে কাত হয়ে পড়েছিল স্পুটার। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে ডুবে যেত। পাম্প চালু হওয়ায় ধীরে ধীরে সিধে হয়ে গেল বোট। সহজে এগোতে পারল।

আস্তে আস্তে স্পুটারের প্রতি অনুরাগ জন্মাল রানার। বয়সের কারণে দুর্বল হয়েছে বটে, তারপরও এই এলাকার সাগরের জন্য একেবারে আদর্শ জলযান। উঁচু বো এমনভাবে ঢেউ কেটে এগোচ্ছে, যেন পুকুর পাড়ি দিচ্ছে কোনও ক্যানু। পিছন থেকে বাতাস বইছে, ফলে গতিও বেড়ে গেছে অনেকটা। নির্দিষ্ট দূরত্ব পার হতে বেশি সময় লাগবে না।

কোর্স মেইনটেন করার জন্য রেইডারের সাহায্য নিতে হচ্ছে ওকে। ঘনঘোর রাতের কারণে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খানিক পর হেলমের দায়িত্ব মুরল্যাণ্ডের হাতে তুলে দিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল। প্রাণভরে টেনে নিল সাগরের আর্দ্র বাতাস। সামনে আবছা একটা আকৃতি যেন দেখতে পেল। তাই ফিরে এল হুইলহাউসে।

'দ্বীপটা ঠিক সামনেই হবার কথা,' বলল রানা। 'স্পিড

কমাও।'

গ্রটল টানল মুরল্যাণ্ড, গতি কমাল বোটের। উইণ্ডশিল্ডে মুখ ঠেকিয়ে সামনেটা ঠাহর করার চেষ্টা চালাল রানা। কালচে নীল আকাশের পটভূমিতে দ্বীপের গাঢ় কাঠামো দেখতে পেল একটু পর। হুইল ঘুরিয়ে বোটকে অন্যদিকে নিতে বলল মুরল্যাণ্ডকে। সন্দেহ নেই, শত্রুপক্ষের সেন্সরে ধরা পড়েছে স্পুটার। ওদেরকে বোঝানো দরকার, দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে এগোতে চাইছে ওরা।

রানার মূল চিন্তা এ.ইউ.ভি.-কে নিয়ে। ওটার যান্ত্রিক চোখ আর কানকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না। ইতিমধ্যে স্যাটেলাইট ফটোয় চোখ বুলিয়ে ওটার কোর্স জানার চেষ্টা করেছে ও। তাতে কোনও ধরনের খুঁত দেখতে পায়নি। ডুবোযানটা মাঝে মাঝে মেইনল্যাণ্ডে ব্যাটারি রিচার্জের জন্য ফিরে যায় বটে, তবে সেটার কোনও নির্দিষ্ট রুটিন নেই। কাজেই অমন সুযোগ কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

ঘড়ি দেখল রানা। ওর হিসেব অনুসারে এ.ইউ.ভি. এখন দ্বীপের অন্যপাশে থাকার কথা। বিড়বিড় করে স্রষ্টাকে ডাকল—ওর হিসেব যেন ঠিক হয়। তারপর মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে হুইল নিয়ে বোটের মুখ ঘোরাতে শুরু করল। দ্বীপের পাহাড়ি পাঁচিলের দিকে এগোচ্ছে। খুব শীঘ্রি বোঝা যাবে, ওর প্ল্যানটা কাজে লাগবে কি না।

ইনলেটের মুখে, ছোট্ট একটা বিল্ডিঙের ভিতরে দ্বীপের কমাণ্ড সেন্টার। অর্ধেকটা গিজগিজ করছে নানা ধরনের ইলেকট্রনিক সার্ভেইলান্স ইকুইপমেন্টে, বাকি অর্ধেক হচ্ছে ব্যারাক—বারোজন প্রহরী থাকে ওখানে। এরাই পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেয় কমাণ্ড সেন্টারে। প্রতি শিফটে চারজন থাকে। দিনের বেলায় বোট নিয়ে তিনজন টহল দেয় দ্বীপের পেরিমিটারে, চতুর্থ জন

কমাণ্ড সেন্টারে ইলেকট্রনিক মনিটরিং করে।

রাতের রুটিন অন্যরকম। দ্বীপের সীমানার পানি নানা রকম ধারালো পাথরে ভরা, ওখানে রাতের বেলা বোট নিয়ে ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক। তাই টহল দেয়া হয় না রাতে। বোট-ক্রুরা ব্যারাকে বিশ্রাম নেয়, রেইডারে বা এ.ইউ.ভি.-র সেন্সরে কোনও কন্ট্যাক্ট দেখা দিলে শুধু ইন্টারসেপ্ট করার জন্য যায়।

আজ রাতে জার্মান এক মার্সেনারি ডিউটি করছে কমাণ্ড সেন্টারে, তার নাম জার্গেন। রেইডার স্ক্রিনে ছোট্ট বোটটাকে অনেকক্ষণ আগেই দেখতে পেয়েছে সে, কিন্তু ওটা দিক পাল্টে অন্যদিকে রওনা হওয়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কোলের উপর *প্লেবয়* পত্রিকার পুরনো একটা সংখ্যা নিয়ে বসেছে সে, ব্যস্ত হয়ে আছে নগ্ন নারীদেহ দেখায়। বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর আবার মুখ তুলল রেইডারের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল।

ডিসপ্লে একেবারে ফকফকা, তাতে কোনও কন্ট্যাক্ট নেই। এর মানে একটাই হতে পারে, ও যখন নারীদেহের ছবি দেখায় ব্যস্ত ছিল, তখন বোটটা মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছে রেইডারের ব্লাইণ্ড স্পটে—দ্বীপের পাথুরে পাঁচিলের পাশে। বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার, তবে মারাত্মক কোনও বিপর্যয় বলা চলে না একে। অনুপ্রবেশকারীদেরকে ঠেকানোর জন্য ওদের হাতে এ.ইউ.ভি. আছে।

ছোট্ট ডুবোযানটা মাত্র বারো ফুট লম্বা—দেখতে অনেকটা মাণ্টা রে মাছের মত। পিঠে ডরসাল ফিন আকৃতির ট্রান্সমিশন অ্যান্টেনা আছে। নানা রকম অত্যাধুনিক সেন্সর আছে ওতে—সোনার আর ভিডিও ক্যামেরা থেকে শুরু করে আরও কত কী! আর আছে চারটে মিনি টর্পেডো—ওগুলো দিয়ে একটা

নেভাল ডেস্ট্রয়ারকে ডুবিয়ে দেয়া যাবে। বিধ্বংসী ক্ষমতার কারণে ঠাট্টা করে ওটাকে *গারট্রুড* বলে ডাকে প্রহরীরা, ওই নামে ওদের একজনের প্রাক্তন শ্বাশুড়ি নাকি বিধ্বংসী স্বভাবের মহিলা ছিলেন।

দ্রুত *গারট্রুড*-এর ইলেকট্রনিক ব্রেনে মেসেজ পাঠাল জার্গেন, ওটাকে কন্ট্যাক্টের শেষ পজিশনে আসতে বলল। তারপর ইন্টারকম তুলে যোগাযোগ করল শিফটের অন্যান্য প্রহরীদের সঙ্গে।

'সরি বয়েজ, তোমাদের খেলায় একটু বিঘ্ন ঘটাতে হচ্ছে। সিকিউরিটি জোনের ভিতরে একটা বোট ঢুকে পড়েছে।'

জুয়া খেলছিল তিন বোট-ক্রু। ওদের দু'জন ফরাসি, তৃতীয়জন দক্ষিণ আফ্রিকান। খেলা বেশ জমে উঠেছিল, আচমকা বাধা পড়ায় বিরক্ত হলো তাই। হাত থেকে তাস ফেলে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকান প্রহরী বলল, 'মর জ্বালা! শান্তিতে থাকার জো নেই।'

'বোটটা কোথায়?' ইন্টারকমে জানতে চাইল এক ফরাসি।

'উত্তর দিক থেকে সিকিউরিটি পেরিমিটার অতিক্রম করেছে, তারপর চলে গেছে রেইডারের ব্লাইণ্ড আর্কে। আমি *গারট্রুড*-কে পাঠিয়েছি ওখানে। তোমাদেরও যাওয়া দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল তিনজনে। জ্যাকেট আর বুট পরল, কাঁধে ঝোলাল কম্প্যাক্ট অ্যাসল্ট রাইফেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্যাট্রোল বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

'বোটটাকে আবার দেখতে পাচ্ছি রেইডারে,' রেডিওতে বলে উঠল জার্গেন। 'ইনলেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওটা।'

'ঠিক আছে,' বলল দক্ষিণ আফ্রিকান। 'আমরা দেখছি ব্যাটাদের মতলব কী।'

চল্লিশ নট বেগে ছুটছে প্যাট্রোল বোট, জায়গামত পৌঁছুতে

বেশি সময় লাগল না। নিঃসঙ্গভাবে ভাসতে থাকা পুরনো ক্রিলারকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ওদের।

'হোয়াট দ্য হেল...'

'কী হয়েছে?' রেডিওতে জানতে চাইল জার্গেন।

'জংধরা, পুরনো একটা ক্রিলার দেখতে পাচ্ছি। আলো জ্বলছে না, ইঞ্জিনও বন্ধ।'

'কাছে গিয়ে দেখো।'

ধীরে ধীরে স্পুটারের পাশে ভিড়ল প্যাট্রোল বোট। অস্ত্র হাতে দুই ফরাসি নামল ওটার ডেকে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। দেখতে পেল শুধু পানি... ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের হ্যাচ উপচে পানি উঠছে ডেকে।

'রদ্দি মাল,' কমাণ্ড সেন্টারে রিপোর্ট পাঠাল দক্ষিণ আফ্রিকান প্রহরী। 'ডুবতে বসেছে। অবস্থা দেখে মাঝিমাল্লা পালিয়েছে বলে ধারণা করছি আমরা।'

'আমাদের সিকিউরিটি পেরিমিটারের ভিতরে ঢুকল কী করে?' দ্বিধান্বিত গলায় বলল জার্গেন।

'নিশ্চয়ই স্রোতের টানে।'

'কিন্তু রেইডারে যখন প্রথম দেখলাম, তখন তো মনে হলো নির্দিষ্ট একটা কোর্স ধরে এগোচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ। মদ গিলছিলে নিশ্চয়ই?'

'মদ আমি একাই গিলি না,' রাগী গলায় বলল জার্গেন। 'এনিওয়ে, কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না। বোটটা পানির তলায় না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো তোমরা ওখানে।'

'আরে! হুকুম দিচ্ছ নাকি? তোমাকে কে আমাদের বস বানিয়েছে শুনি?'

'তর্ক কোরো না। যা বলছি করো, নইলে কর্নেল ভেগার কাছে নালিশ করতে বাধ্য হবো।'

যেন জোঁকের মুখে লবণ পড়ল, হার মানতে বাধ্য হলো দক্ষিণ আফ্রিকান গার্ড। দুই সঙ্গীকে নিয়ে অস্ত্র হাতে বসে রইল সে, চুপচাপ দেখল ভাঙাচোরা ক্রিলারের ডুবে যাওয়া। জলযানটা পানির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলে রেডিওর হ্যাণ্ডসেট তুলে নিল সে। বলল, 'এই যে মহারাজ, জংধরা বালতিটা ডুবেছে। এবার আমরা ফিরতে পারি?'

'ঠিক আছে, এসো। সাবধানে বোট চালিয়ো, গারট্রুড কাছাকাছি আছে। শেষে না অনুপ্রবেশকারী ভেবে তোমাদেরকেই ডুবিয়ে দেয়!'

গাল দিয়ে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকান। এ.ইউ.ভি.-র ফিন দেখতে পাচ্ছে সে। প্যাট্রোল বোটের ইঞ্জিন চালু করে মুখ ঘোরাল, ফিরে চলল তীরের দিকে। গারট্রুড অবশ্য পিছু নিল না, কাল্পনিক কয়েকটা রেখার সাহায্যে গ্রিড তৈরি করল ওটা। সে-অনুসারে কয়েক দফা আগুপিছু করল এলাকায়, সার্ভে চালাল। ওটার সেন্সরে দেখা গেল, সাগরের মেঝেতে গিয়ে স্থির হয়েছে ডুবন্ত ক্রিলার। সন্তুষ্ট হয়ে এ.ইউ.ভি.-কে পুরনো কোর্সে ফিরতে নির্দেশ দিল জার্গেন।

এর পনেরো মিনিট পর, যখন গারট্রুড নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে, ডুবুরির পোশাক পরা দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল স্পুটারের ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে। সাঁতার কাটতে শুরু করল দ্বীপের উদ্দেশে।

এগারো

ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরে রেখেছে আসিফ। প্রবল বেগে ছুটছে কর্নেল ভেগার মার্সিডিজ কনভার্টিবল। যত দ্রুত পারে কম্পাউণ্ড থেকে দূরে সরে যেতে চায় ও। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে রয়েছে তানিয়া আর হেণ্ডারসন, পিছনে জয়েস আর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা গাদাগাদি করে বসেছে একে অন্যের কোলের উপর।

আসিফের ড্রাইভিং দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে হেণ্ডারসন। একটু পর বলল, 'ড. রেজা, সামনে একটা কঠিন বাঁক আছে। স্পিড কমান, নইলে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে যাব।'

স্পিডোমিটারের দিকে তাকাল আসিফ। সত্তর মাইল বেগে ছুটছে গাড়ি। ব্রেক চেপে গতি কমাল, জ্বেলে দিল হেডলাইট। সামনের দৃশ্য চোখে পড়তেই আঁতকে উঠল। বাঁকটা প্রায় নব্বুই ডিগ্রির মত, দ্বীপের কিনারা ঘেঁষে ওখানে ঘুরে গেছে রাস্তা। গার্ডরেইল নেই। রাস্তা পেরুলেই কয়েকশো ফুট নীচে সাগরের উদ্দাম ঢেউ।

বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল আসিফ। নুড়ি বিছানো রাস্তায় স্কিড করল টায়ার, পিছলাতে পিছলাতে মুখ ঘোরাতে শুরু করল মার্সিডিজ। যাত্রীরা সবাই চিৎকার করে উঠল। মাথা ঠাণ্ডা রাখল আসিফ, স্টিয়ারিংকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে গাড়ির ব্যালান্স

মেইনটেন করল। খাড়া কিনারা থেকে মাত্র দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল চাকা, বাঁক অতিক্রম করল গাড়ি। সামনে এবার সোজা রাস্তা; ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আসিফ। বলল, 'সতর্ক করে দেবার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর। আরেকটু হলেই দুর্ঘটনা ঘটে যেত।'

হেণ্ডারসনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। নিষ্প্রাণ হাসি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই সতর্ক করেছি আপনাকে।'

মাথা ঘুরিয়ে পিছনে গাদাগাদি করা সঙ্গীদের দিকে তাকাল আসিফ। 'সবাই ঠিক আছেন? কেউ পড়ে-টড়ে যাননি তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল জয়েস। 'গাড়ির সঙ্গে পেরেক-গাঁথা হয়ে আছি আমরা। হাতুড়ি আর ছেনি ছাড়া আমাদেরকে আলাদা করতে পারবেন না।'

হেসে ফেলল আসিফ। মন হালকা হলো কিছুটা। বাইরে থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করছে ও। নইলে মাথার উপর চেপে বসে রয়েছে শঙ্কা। নয়জন মানুষের প্রাণ নির্ভর করছে ওর উপর। অনেক বড় একটা দায়িত্ব। কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বটে, কিন্তু বিপদ কাটেনি এখনও। সবাইকে সুস্থ এবং জীবিত অবস্থায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলে ভাগ্যেরও সহায়তা প্রয়োজন।

সামনে রাস্তার জাংশান দেখতে পেয়ে বাস্তবে ফিরে এল আসিফ। দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে পথ। বাঁয়ের শাখাটা দেখিয়ে হেণ্ডারসনের কাছে জানতে চাইল, 'আমরা কি এটা ধরে এসেছিলাম?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল হেণ্ডারসন। 'ইনলেটের কিনার ধরে সাবমেরিন পেনে গেছে এই রাস্তা। ওখানে একটা গ্যারিসন আর

ট্রুপস্ কোয়ার্টার আছে। ডানে গেলে আমরা খাঁড়ির কাছে পৌঁছুব। ওখানে বোট প্যাট্রোলের জেটি আর কমাণ্ড সেণ্টার আছে।'

'হুম, সব দেখি আপনার মুখস্থ।'

'আপনি একাই এখান থেকে পালানোর ব্যাপারে মাথা ঘামাননি।'

'শুনে ভাল লাগল।' কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল আসিফ। তারপর বলল, 'কোনও বিকল্প দেখতে পাচ্ছি না। খাঁড়ির কাছে গিয়ে প্যাট্রোল বোটটা দখল করতে হবে। ওটাই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

'আমি একমত,' সায় জানাল তানিয়া। 'মৌচাকে খোঁচাখুঁচি করতে চাইলে ছোট মৌচাক বেছে নেয়াই ভাল। সাবমেরিন পেনের গ্যারিসন ভর্তি সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারব না আমরা।'

কেউ আপত্তি করল না। কাজেই ডানের রাস্তা ধরে গাড়ি ছোটাল আসিফ। আধ মাইল যেতে সৈকতের দেখা মিলল। দূরে মিটিমিটি আলো দেখতে পেয়ে ব্রেক কষল ও। সঙ্গীদেরকে অপেক্ষা করতে বলে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। হাঁটতে শুরু করল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। সমুদ্রের লোনা আর্দ্রতার কারণে বাতাস ভারী, ঝাপটা মারছে নাকে-মুখে। মুক্ত পরিবেশ ভাল লাগল আসিফের, তবে ভুলল না—এ মুক্তি সাময়িক। সত্যিকার মুক্তি পেতে চাইলে আরও অনেকদূর যেতে হবে ওদেরকে।

একটু পর কংক্রিটের একতলা বিল্ডিং দেখতে পেল ও। কমাণ্ড সেণ্টার। জানালার পর্দা নামানো, সেখান দিয়ে আবছাভাবে বেরিয়ে আসছে ভিতরের আলো। ক'জন আছে ওখানে, বোঝা গেল না। ঝুঁকি নিল না আসিফ, দূর থেকে বিল্ডিংকে অতিক্রম করল, চলে গেল অন্যপাশে। এবার

দৃষ্টিসীমায় ভেসে উঠল কাঠের তৈরি একটা পিয়ার। তবে ওটা শূন্য। প্যাট্রোল বোট নেই, এমনকী কোনও দাঁড়-টানা খেয়াও দেখা যাচ্ছে না।

হতাশ হয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল আসিফ। স্বামীর পাংশু চেহারা দেখে তানিয়া জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'পিয়ারে কোনও বোট নেই,' গম্ভীর গলায় বলল আসিফ। 'সম্ভবত টহলে গেছে, কখন ফিরবে কে জানে! অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু সূর্য ওঠার আগে বোট না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'তা হলে?'

'সাবমেরিন পেনেই ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে আপনার?' প্রতিবাদ করে উঠল হেণ্ডারসন। 'ওখানে কতজন সৈনিক আছে জানেন? বেঘোরে মারা পড়ব আমরা!'

'এখুনি হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?' হালকা গলায় বলল আসিফ। 'স্বল্প লোকবল নিয়েও ইতিহাসে কত বড় বড় লড়াই হয়েছে, জানেন?'

'কত লড়াই হয়েছে, জানি না। তবে দু'চারটের ফলাফল জানি। আমেরিকার অ্যালামো দুর্গ, কালোডেনের স্কটিশ যুদ্ধ... এমনকী আপনাদের তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাতেও দুর্বলেরা খতম হয়ে গিয়েছিল।'

'আমাদের হাতে অন্য আর কোনও উপায় নেই। ইতিহাস বদলাবার চেষ্টা করতে হবে।'

'কী চেষ্টা করবেন? আমরা কেউই যোদ্ধা নই, গোবেচারা বিজ্ঞানী। একদল প্রশিক্ষিত সৈনিকের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'সম্মুখযুদ্ধে নামার কথা বলছি না। তবে লুকিয়ে যদি

সাবমেরিনে উঠতে পারি, ওটার রেডিও ব্যবহার করে বাইরে থেকে সাহায্য আনতে পারব।'

'আর যদি সেটা সম্ভব না হয়?'

'নতুন কিছু চিন্তা করব। চলুন, রওনা হয়ে যাই।'

ভুরু কুঁচকে আসিফের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল হেণ্ডারসন। তারপর হেসে ফেলল। 'নাহ্, আপনার সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল। পেশায় বিজ্ঞানী হলেও বিপদ মোকাবেলায় আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনার তুলনা হয় না। অন্যের বুকে সাহস জাগাতে জানেন।'

'দয়া করে এত প্রশংসা করবেন না,' আসিফ বলল। 'শেষে দেখা যাবে কিছুই করতে পারিনি, মরার সময় গালি খাবো সবার।'

'আমার কেন যেন তা মনে হচ্ছে না,' জয়েস সুর মেলাল হেণ্ডারসনের সঙ্গে।

গাড়িতে চড়ে বসল সবাই। স্টার্ট দিয়ে মুখ ঘোরাল আসিফ। একটু পর রাস্তার জাংশানে পৌঁছে সাবমেরিন পেনের দিকে এগোতে শুরু করল। পরিত্যক্ত গির্জার সামনে পৌঁছে থামল ও। গাড়িটা ভাঙা বিল্ডিঙের আড়ালে লুকিয়ে সবাইকে নামতে বলল। তারপর আড়াল থেকে উঁকি দিল লক্ষ্যের দিকে।

গ্যারিসনের সীমানা ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ভাল করে জায়গাটা দেখে নিল আসিফ। ক্লিফের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিং, একটা অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে ইনলেটের উপরে। সেখান থেকে একটা লোহার মই নেমে গেছে নীচে। কোনও প্রহরী নেই বাইরে, বিল্ডিঙের ভিতর থেকে আবছাভাবে ভেসে আসছে হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ। ল্যাব কম্পাউণ্ডের মত এখানকার অধিবাসীরাও নিশ্চিন্তে ফুর্তি করছে। সহকর্মীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা

এখনও জানে না।

'ভালই হয়েছে, বাধা দেয়ার কেউ নেই,' বলল আসিফ। 'নিশ্চিন্তে এগোনো যেতে পারে।'

'চলো, আমিও যাবো,' বলল তানিয়া।

'তোমার যাবার দরকার কী? এখানেই থাকো...'

'উঁহুঁ, আর অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি। তোমাকে একা পাঠালে দুশ্চিন্তায় জান খারাপ হয়ে যায়। তারচেয়ে সঙ্গে যাওয়া ভাল। সমস্যা দেখা দিলে সাহায্য করতে পারব।'

স্ত্রী-র স্বভাব জানে আসিফ, একবার যখন যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছুতেই তা বদলানো যাবে না। তাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো। কিন্তু কোনও শব্দ কোরো না।'

একছুটে অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের তলায় পৌঁছুল রেজা দম্পতি। ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল কেউ ওদেরকে দেখতে পেয়েছে কি না, সেটা বোঝার জন্য। তবে তেমন কোনও আলামত পাওয়া গেল না। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সঙ্কেত বিনিময় করল দুজনে, তারপর মই বেয়ে নামতে শুরু করল।

একেবারে পানির কাছাকাছি পর্যন্ত নেমে গেছে মই। শেষ মাথায় রয়েছে একটা ক্যাটওয়াক। ওটায় নামল আসিফ-তানিয়া। ক্যাটওয়াক ধরে কয়েক কদম এগোতে সাবমেরিন পেনে ঢোকার দরজা পেল, তালা দেয়া নেই। সাবধানে হাতল ঘোরাল আসিফ, পাল্লা আর চৌকাঠের মধ্যকার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল পেনের ভিতর। মৃদু আলোয় বিকট এক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সবমেরিনটা। কিন্তু কোনও মানুষ নেই ধারেকাছে।

সন্তুষ্ট হয়ে তানিয়াকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল আসিফ। গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে এল সাবমেরিনের পিঠে। এণ্ট্রি-হ্যাচ খুঁজে পাওয়া গেল সহজে, সেটা গলে যান্ত্রিক দানবের পেটে প্রবেশ করল দুজনে।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে হাঁটতে শুরু করল। একটু পর খুঁজে বের করল কমিউনিকেশন রুম।

তাড়াতাড়ি রেডিওফোনের পাওয়ার অন্ করল আসিফ। তানিয়া দরজায় পাহারায় থাকল, আর ও ডায়াল করল নুমা হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে। কয়েক মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কাটল, রিসিভারে কোনও আওয়াজ নেই। তারপর ভেসে এল রিংটোন।

'ন্যাশনাল আণ্ডার... মেরিন এজেন্সি,' ওপাশ থেকে দুর্বলভাবে শোনা গেল মেয়েলি কণ্ঠ। রিসেপশন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

'মি. রেডক্লিফকে কানেকশন দিন, প্লিজ। আমি ড. আসিফ রেজা বলছি।'

'একটু ধরুন।'

মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হলো, কিন্তু সেটাই আসিফ আর তানিয়ার কাছে কয়েক যুগের মত মনে হলো। অস্থিরতা অনুভব করছে দু'জনেই। কিছুক্ষণ খুটখাট হওয়ার পর রিসিভারে ভেসে এল নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরের কণ্ঠ।

'আসিফ! ইজ দ্যাট ইউ? গড, কী দুশ্চিন্তাই না করছি... কী অবস্থা তোমাদের?'

'আমরা ভাল আছি, মি. রেডক্লিফ। কাজের কথায় আসি। আলভিনকে হাইজ্যাক করা হয়েছে। আমাদেরকে বন্দি করে আনা হয়েছে একটা দ্বীপে। জায়গাটা স্কটিশ কিংবা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান উপকূলে হবার জোরালো সম্ভাবনা আছে। আরও সাতজন বিজ্ঞানী বন্দি আছেন আমার আর তানিয়ার সঙ্গে। বিচ্ছিরি একটা গবেষণা করানো হচ্ছে আমাদেরকে দিয়ে। পালিয়েছি আমরা, কিন্তু বেশিক্ষণ মুক্ত থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি আমাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।'

'তোমার কথা ভেঙে যাচ্ছে, আসিফ... যদ্দূর বুঝেছি, দ্বীপের সঠিক লোকেশন জানা নেই তোমাদের, রাইট?'

'ঠিক শুনেছেন।'

'রিল্যাক্স, আমরা লোকেশন বের করার চেষ্টা করছি। রানা আর মুরল্যাণ্ড গেছে স্কটিশ উপকূলে। কতদূর এগিয়েছে তা বলতে পারব না। তোমরা একটু ধৈর্য ধরো।'

'ধৈর্য ধরার উপায় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।'

'রেডিওতে থাকতে পারবে কিছুক্ষণ?'

'না, ধরা পড়ে যাব। আমাদেরকে এখুনি সরে পড়তে হবে।'

'তা হলে রেডিওটা অন্ রেখে যাও। আমরা সিগনাল ট্র্যাক করে তোমাদের লোকেশন বের করব।'

চাপা গলায় তানিয়ার ডাক শুনতে পেল আসিফ। কে যেন আসছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল রিসিভার, তারপর স্ত্রীকে নিয়ে একটা কেবিনেটের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পর কমিউনিকেশন রুমের দরজা খুলে গেল। মোটাসোটা শরীরের একজন গার্ড এসে ঢুকল ভিতরে। টহল দিতে এসেছে। রেডিওফোনের আলো জ্বলতে দেখে সন্দেহ ঘনাল তার চোখে। এগিয়ে গেল যন্ত্রটার দিকে।

প্রমাদ গুনল আসিফ। সব ফাঁস হয়ে যেতে বসেছে। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি করল না। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। ঝটকা দিয়ে ওকে ফেলে দিল গার্ড। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘুসি হাঁকল। প্রচণ্ড আঘাতে চোখেমুখে অন্ধকার দেখল আসিফ, কিন্তু হাল ছাড়ল না। লাফ দিয়ে লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরল, চেষ্টা করল ল্যাঙ মেরে ফেলে দিতে।

কিন্তু দশাসই গার্ডের গায়ে হাতির জোর। একচুল নড়ল না, বরং আসিফকেই তুলে ফেলল শূন্যে। আছাড় মারল মেঝেতে। হুঁক করে বুক থেকে দম বেরিয়ে গেল আসিফের। শোয়া

অবস্থায় দেখল, কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেছে গার্ড, তাক করছে ওর দিকে।

পরমুহূর্তে ঠং করে একটা শব্দ হলো। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল গার্ডের। সেইসঙ্গে দড়াম করে সে-ও পড়ে গেল মেঝেতে। এতক্ষণে তানিয়াকে দেখতে পেল আসিফ। হাতে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—খুলে নিয়েছে বাল্কহেডের ব্র্যাকেট থেকে। ওটা দিয়ে গার্ডের মাথায় আঘাত করেছে ও।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল আসিফ। বলল, 'দারুণ দেখিয়েছ! আরেকটু হলেই অক্কা পেতাম।'

'বেশি লেগেছে তোমার?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল তানিয়া।

'সিরিয়াস কিছু না। চলো, আর কেউ এসে পড়ার আগে ভাগি।'

'ওকে এভাবে ফেলে যাবে? জ্ঞান ফেরার পর তো সব ফাঁস করে দেবে!'

'হুম! এসো, তা হলে বেঁধে ফেলি ওকে।'

খুঁজে-পেতে একটা দড়ি নিয়ে এল তানিয়া। সেটা দিয়ে হাত-পা বেঁধে দেয়া হলো গার্ডের, মুখেও গোঁজা হলো কাপড়। তারপর লোকটাকে সাবমেরিনের একটা খালি কেবিনে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওরা। ভিতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিল।

মি. রেডক্লিফের সঙ্গে আরেক দফা কথা বলে নিল আসিফ। তারপর রেডিওফোন অন্ রেখে দুজনে বেরিয়ে এল সাবমেরিন থেকে। এবার আগের চেয়েও সাবধানে এগোল ওরা। পেন থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠল, তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে এল পরিত্যক্ত গির্জার কাছে।

'ড. হেণ্ডারসন! কোথায় আপনারা?' গাড়ির কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাকল আসিফ।

আর তখুনি একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল চারপাশ থেকে। আলোকরশ্মির মাঝে নিজেদেরকে নাঙ্গা বলে মনে হলো আসিফ-তানিয়ার, কোথাও মুখ লুকাবার উপায় নেই। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই অস্ত্রধারী একদল সৈনিক ঘিরে ফেলল ওদেরকে। বন্দি করল।

বন্দুকের নলের নির্দয় খোঁচা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হলো রেজা দম্পতিকে, নিয়ে যাওয়া হলো গির্জার ভিতরে। ওখানে বাকি বিজ্ঞানীদের দেখা মিলল। পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে সবাইকে, বসিয়ে রাখা হয়েছে নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে। সবার চেহারায় পরাজয়ের ছাপ।

গির্জার বেদির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যদলের নেতা। আসিফ আর তানিয়াকে উদয় হতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'যথেষ্ট খেল্ দেখিয়েছ তোমরা,' কঠিন গলায় বলল সে। 'এবার সেটার সমাপ্তি টানব আমি।'

হাতের মেশিন-পিস্তল তাক করল লোকটা বিজ্ঞানী দম্পতির দিকে।

সাগর পারের আধমরা এক গাছের ডালে বসে আছে নিঃসঙ্গ এক পেঁচা। কান খাড়া করে শুনছে ঘাসের আড়ালে হুটোপুটি করতে থাকা ইঁদুরের আওয়াজ। বড় বড় চোখ আঠার মত সেঁটে আছে ওদিকে শিকার পাবার আশায়। একটু পর ঘাসের ভিতর থেকে শরীরের একাংশ বের করল একটা ইঁদুর, ওটার উপর হামলা চালাতে গিয়ে থমকে গেল পেঁচা। সাগরের পানি ভেদ করে উঠে আসছে একটা কালো ছায়ামূর্তি। ইঁদুরটাও দেখতে পেয়েছে, ভয় পেয়ে মুখ লুকাল ঘাসের ভিতর। পেঁচা হারাল তার রাতের

খাবার। বিরক্ত হয়ে উড়ে চলে গেল দ্বীপের ভিতরদিকে। নতুন কোনও শিকার খুঁজবে।

প্রথম ছায়ামূর্তির পিছু পিছু দ্বিতীয় আরেকটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো কয়েক মিনিট পরে। ভেজা বালির উপর দিয়ে থপ থপ করে এগোল দুজনে। গাছগাছালির কাছে এসে থামল। এরপর মুখ থেকে ফেসমাস্ক সরাল মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যাণ্ড। পা থেকে ফিন খুলল ওরা, পিঠ থেকে এয়ারট্যাঙ্ক নামাল, ওয়েটসুট ছাড়ল; তারপর যার যার ওঅটরপ্রুফ প্যাক থেকে বের করে আনল নাইন মিলিমিটার *সিগ-সাওয়ার* পিস্তল আর অ্যামিউনিশন।

চমৎকার কাজ দিয়েছে রানার প্ল্যান। টহলদার গার্ড আর এ.ইউ.ভি.-র চোখের সামনে পুরনো ক্রিলারটা ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা, নিজেরা ডুবুরির পোশাক পরে লুকিয়ে ছিল ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের ভিতর। বোটটা সাগরের তলায় গিয়ে স্থির হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থেকেছে ওরা। প্যাট্রোল বোট আর এ.ইউ.ভি. চলে যাবার পর সাঁতার কেটে চলে এসেছে দ্বীপে। বোট ডুবে যাবার পর কেউ যে এভাবে আসতে পারে, তা ভাবেইনি দ্বীপের সিকিউরিটি। ওদের উপস্থিতি বোঝার কোনও উপায় ছিল না তাদের।

কবজিতে বাঁধা ঘড়ির ডায়ালে নজর বোলাল রানা। ভোরের আলো ফোটার আগে চারঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। মুরল্যাণ্ডকে ইশারা দিল ও। তারপর দু'জনে সৈকতের কিনারা ধরে হাঁটতে শুরু করল। একটু পরেই নুড়ি বিছানো রাস্তায় উঠে এল ওরা। প্যাক থেকে একটা মিনি-কম্পিউটার বের করল রানা, ওটার পর্দায় দেখে নিল দ্বীপের স্যাটেলাইট ইমেজ।

'এই রাস্তা ধরে এগোলেই মেইন কম্পাউণ্ডে পৌঁছুতে পারব আমরা,' মুরল্যাণ্ডকে বলল ও।

'ওখানে ঢুকবে কীভাবে?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড। 'নিশ্চয়ই ভাবছ না, দরজা খুলে আমাদেরকে স্বাগত জানাবে ওরা?'

'অভদ্রতা দেখালে কী আর করা?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমাদেরকেও একটু অভদ্র হতে হবে।'

'আমি তো তা-ই চাই,' দাঁত বের করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'চলো ভায়া, আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।'

অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

বারো

সৈন্যদলের নেতার চেহারা ছুঁচোর মত। হাসলে আরও জঘন্য দেখায়। অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণে সে বলল, 'আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মেইট!'

'কীভাবে জানলে, আমরা এখানে?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

হাসল লোকটা। 'পুরো দ্বীপেই যে সার্ভেইলান্স ক্যামেরা বসানো আছে, তা বোধহয় জানা নেই তোমাদের। মদ খাওয়ায় ব্যস্ত না থাকলে আমার লোকজন আরও আগেই স্পট করতে পারত তোমাদেরকে। যা হোক, বেটার লেট দ্যান নেভার।'

'মনে হচ্ছে তোমাদের পার্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেলেছি। দুঃখিত।'

'শুধু মানসিক দুঃখ না, আরও অনেক ব্যথাও পাবে তোমরা। তার আগে বলো, কর্নেল ভেগার গাড়ি কোথায় পেয়েছ। তোমার বন্ধুরা মুখে কুলুপ এঁটেছে। কিছুই বলছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল আসিফ। 'কর্নেল গাড়িটা ব্যবহার করছিলেন না, তাই ভাবলাম একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

ওর পাশে দাঁড়ানো সৈনিককে চোখের ইশারা করল ছুঁচোমুখো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত হানল আসিফের তলপেটে। কেশে উঠল আসিফ, বাতাসের অভাবে খাবি খেতে খেতে বসে পড়ল মাটিতে। বেশিক্ষণ ওভাবে থাকতে দেয়া হলো না, কলার ধরে টেনে আবার দাঁড় করানো হলো ওকে।

'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা পছন্দ করি না আমি,' বলল ছুঁচোমুখো। 'ঠিকঠাক জবাব দাও আমার প্রশ্নের, নইলে পস্তাবে।'

'লাথি-গুঁতো দিলেই গান গাইব বলে ভাবছ নাকি?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আসিফ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ওকে যাচাই করল ছুঁচোমুখো। তারপর হাতের মেশিন-পিস্তল ঘোরাল তানিয়ার দিকে। বলল, 'না, লাথি-গুঁতো আর দেব না। এই মেয়েটাকে গুলি করব।'

'রিল্যাক্স,' শান্ত গলায় বলল আসিফ। 'খুনখারাপিতে জড়াবার মত পরিস্থিতি দেখা দেয়নি এখনও। কী জানতে চাও?'

'গাড়িটা কোথায় পেয়েছ?'

'কর্নেল ভেগা মারা গেছে, গাড়ি নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি।'

'মারা গেছে!' চমকে উঠল সৈন্যদলের নেতা। 'কর্নেল ভেগা মারা গেছে? কীভাবে?'

'বললে বিশ্বাস করবে না,' আসিফ বলল। 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি নিজ চোখে দেখো।'

ইতস্তত করল ছুঁচোমুখো। চোখের মণিতে সন্দেহের ছাপ ফুটতে শুরু করেছে। মেশিন-পিস্তল আসিফের বুকে তাক করে জিজ্ঞেস করল, 'কী মতলব এঁটেছ, বলে ফেলো তো!'

'কোনও বিশেষ মতলব নেই আমাদের,' আসিফ নির্বিকার। 'চারদিকে তাকিয়ে দেখো। তোমাদের কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা কি আছে আমাদের?'

'তা অবশ্য নেই,' খুশি খুশি গলায় বলল ছুঁচোমুখো। 'ঠিক আছে, চলো ল্যাব-কম্পাউণ্ডে। কী ঘটেছে ওখানে, সেটা দেখে আসি।'

মার্চ করিয়ে বন্দিদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো গির্জার বাইরে। মার্সিডিজে ওঠানো হলো আসিফ-তানিয়াকে, বাকিরা উঠল সৈন্যদলের পিকআপে। আসিফকে ড্রাইভ করতে বলল ছুঁচোমুখো।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আসিফ বলল, 'আমাদেরকে তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? গবেষণা শেষ হয়েছে, পুরো প্রজেক্টই সফল হয়েছে। খামোকা আমাদেরকে খুন করার দরকার কী?'

'সেটার জবাব আমাদের বস দিতে পারবে,' বলল ছুঁচোমুখো। 'এখন মুখ বন্ধ রেখে ড্রাইভ করো।'

হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল আসিফ, গাড়িকে নামিয়ে আনল রাস্তায়। চলতে শুরু করল ল্যাব কম্পাউণ্ডের উদ্দেশে। পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। ভাঙা গেট পেরিয়ে থামল মার্সিডিজ আর পিকআপ। বন্দিদের নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সৈন্যরা। সবার হাতে উদ্যত অস্ত্র, বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি।

অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করছে কম্পাউণ্ডে। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও। রাতের পাখি ডাকছে না, আওয়াজ করছে না একটা ঝিঁঝি পোকাও। বিস্মিত হয়ে আসিফ লক্ষ করল, কর্নেল ভেগার লাশটা নেই গেটের কাছে। সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ভয়ানক এক হত্যাযজ্ঞ যে ঘটে গেছে, সেটা বোঝার উপায় নেই। মিউট্যাণ্টদের মাংসাশী স্বভাবের কথা মনে পড়ল ওর।

লাশগুলো কি ওরা খাওয়ার জন্য নিয়ে গেছে? তেমন সম্ভাবনাই বেশি।

ভাঙাচোরা গেট আর গার্ডহাউস দেখল সৈন্যদের অস্ট্রেলীয় নেতা। নজর বোলাল চারপাশে। তারপর মুখোমুখি হলো আসিফের।

'হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস? এখানকার লোকজন সব কোথায়?'

সরাসরি জবাব দিল না আসিফ। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'এখানে কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল, জানো?'

'হ্যাঁ। জীবাণু নিয়ে। সাগরের তলা থেকে পাওয়া অর্গানিজম থেকে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন বানানো হচ্ছিল এখানে। তেমনটাই বলা হয়েছে আমাদেরকে। এখানে কখনও ঢুকতে দেয়া হতো না আমাদেরকে। জীবাণু সংক্রমণের ভয় দেখানো হয়েছিল।'

হেসে উঠল আসিফ।

'হাসছ কেন?' গরম গলায় জানতে চাইল ছুঁচোমুখো।

'তোমাদের অজ্ঞতা দেখে,' আসিফ বলল। 'তোমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। এখানে জীবাণু না, এনযাইম নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছিল।'

'সেটা আবার কী?'

'ফিলোসফার'স্ স্টোনের কথা শুনেছ?'

আসিফের পাঁজরে মেশিন-পিস্তলের ব্যারেল ঠেকাল সৈন্যনেতা। 'বন্দুকের নল-ই আমার ফিলোসফি।'

নির্বিকার রইল আসিফ। বলল, 'আমি পরশ পাথরের কথা বলছি। ওটার সাহায্যে যে-কোনও ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়।'

'ওটা তো মিথ!'

'মিথ? তোমার ধারণা একটা মিথের পিছনে এত টাকা ঢেলেছে তোমার বসেরা? চারপাশে তাকাও, মরীচিকার পিছনে এভাবে তাড়া করে কেউ?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল ছুঁচোমুখো। ভাবছে। শেষে বলল, 'তোমাদের গবেষণা সফল হয়েছে বলে শুনেছি। তা হলে সোনা কোথায়?'

'গুদামে রাখা হয়েছে। এসো দেখাচ্ছি। হয়তো আমাদেরকে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখবে তুমি।'

'আগে সোনা, তারপর অন্য কথা, মেইট!'

আসিফ জানে, ফোর্ট নক্সের সমস্ত সোনা দিয়েও ওদের ভাগ্য বদলানো যাবে না। তাই বেপরোয়া একটা পরিকল্পনা এঁটেছে ও। গাড়িতে উঠে বসল, ড্রাইভ করে সোজা চলে গেল মিউট্যান্টদের আবাসস্থলের সামনে।

'এসে গেছি,' ইঞ্জিন বন্ধ করে মার্সিডিজ থেকে নামল আসিফ।

পিকআপও এসেছে ওর পিছু পিছু। বন্দিদেরকে নামিয়ে একসারিতে দাঁড় করানো হলো, দু'জন সৈনিক ওদেরকে পাহারা দেবে। অন্যেরা দলনেতার সঙ্গে বিল্ডিঙে ঢুকবে। আসিফ পথ দেখাবে ওদেরকে। তানিয়াকে বাকি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল ছুঁচোমুখো।

'ইটস্ ওকে,' অভয় দেয়ার সুরে বলল আসিফ। 'যাও।'

'কী করতে চাইছ তুমি?' বাংলায় জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'খুলে বলার সময় নেই। গোলমাল দেখা দিলে দুই পাহারাদারকে সামলাতে হবে তোমাদের। পারবে?'

'মার্শাল আর্ট জানি আমি, সঙ্গে আরও আটজন আছে। আশা করি পারব।'

'ভাল। যাও এখন। আমি খুব শীঘ্রি ফিরব।' ছুঁচোমুখোর

দিকে ফিরল আসিফ। 'আমি রেডি।'

'পথ দেখাও।' খেঁকিয়ে উঠল অস্ট্রেলীয় লোকটা।

তানিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিল্ডিঙের দিকে এগোল আসিফ। অস্ত্র হাতে ওকে অনুসরণ করল সৈন্যরা। কাছাকাছি যেতেই খোলা দরজা দিয়ে ভেসে এল উৎকট দুর্গন্ধ।

'কীসের গন্ধ?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল এক সৈনিক।

'সোনার,' খুশি খুশি গলায় বলল আসিফ। আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

রীতিমত জুয়া খেলছে ও। মিউট্যান্টদেরকে অন্যান্য বুনো পশুর কাতারে ফেলে ওদের আচরণ আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। বন্য প্রাণীরা শিকার শেষে নিজ আবাসে ফিরে যায়। আর মিউট্যান্টদের জন্য এখানকার খাঁচাগুলোই ঘরবাড়ি। আশপাশে ওদেরকে দেখতে না পেয়ে আসিফ ধারণা করছে, শিকার করা খাবার নিয়ে ওরা এখানে ফিরে এসেছে। উৎকট গন্ধ প্রমাণ করছে, ভুল ভাবেনি ও।

অন্ধকার বিল্ডিঙের ভিতর ঢুকে পড়ল দলটা। ভিতরে ভয় জাগানো নানা রকম শব্দ হচ্ছে। ছেঁড়া হচ্ছে ভেজা মাংস, হাড় ভেঙে অস্থিমজ্জা চুষে খাওয়া হচ্ছে। শুনলেই হাত-পা জমে আসে। চকিতের জন্য অন্ধকারে লাল চোখের সারি জ্বলজ্বল করতে দেখা গেল।

'ক্... কী ওগুলো?' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল এক সৈনিক।

দেয়ালে লাগানো সুইচবোর্ড খুঁজে বের করল আসিফ, জ্বেলে দিল ভিতরের সবক'টা বাতি। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিসীমায় ভেসে উঠল এক নারকীয় দৃশ্য।

আসিফের অনুমান সঠিক। খাঁচায় ফিরে এসেছে সবক'টা মিউট্যান্ট। তাদের সামনে স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে কম্পাউণ্ডের হতভাগ্য গার্ডদের লাশ। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা

হচ্ছে লাশগুলোকে, খাওয়া হচ্ছে রাক্ষসের মত। মিউট্যান্টদের হাত-মুখ তাজা রক্তে রঞ্জিত।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কয়েকজন সৈনিক। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া থামিয়ে মাথা ঘোরাল সবক'টা মিউট্যান্ট। টকটকে লাল চোখে তাকাচ্ছে নবাগতদের দিকে।

'হোয়াট দ্য...' বিড়বিড় করল ছুঁচোমুখো। পরমুহূর্তে আসিফের দিকে ঝট্ করে ফিরল। 'তুমি মরবে এবার!'

একহাতে আসিফের গলা চেপে ধরল লোকটা, ধাক্কা দিয়ে ঠেসে ধরল দেয়ালের উপর, পেটে ঠেকাল মেশিন-পিস্তলের নল।

'বস!' পিছন থেকে ফিসফিসাল এক সৈনিক।

'চুপ!' খেঁকিয়ে উঠল ছুঁচোমুখো। 'এ-ব্যাটাকে এখুনি খতম করব আমি।'

'বস!' আবার বলল সৈনিক। 'এদিকে তাকান।'

ঘাড় ফিরিয়ে চমকে উঠল ছুঁচোমুখো। খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে মিউট্যান্টরা। সৈনিকদের ইউনিফর্ম আর অস্ত্র দেখে খেপে উঠেছে, হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা। পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

'গেট ব্যাক,' চাপা গলায় নির্দেশ দিল সে। 'গেট ব্যাক এভরিবডি!'

পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল সৈনিকরা। একই তালে মিউট্যান্টরাও এগোচ্ছে। এক সৈনিক ধৈর্য হারিয়ে উল্টো ঘুরল, দৌড়াতে শুরু করল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র গর্জন করে উঠল মিউট্যান্টরা। ঝাঁপ দিল সৈনিকদের লক্ষ্য করে।

'ফায়ার!' চেঁচাল ছুঁচোমুখো।

অটোমেটিক ওয়েপনের গুলিবর্ষণ আর জান্তব চিৎকারে ছেয়ে গেল বিল্ডিঙের অভ্যন্তর। সামনে থাকা অনেকগুলো মিউট্যান্ট খতম হয়ে গেল, কিন্তু তাতে হামলা বন্ধ হলো না। মৃতদের

ডিঙিয়ে ছুটে এল বাকিরা, ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈনিকদের উপর। সবার আগে ঘায়েল হলো অস্ট্রেলীয় দলনেতা। খালি হাতে তার টুঁটি ছিঁড়ে নিল এক মিউট্যান্ট। হাতাহাতি লড়াইয়ে সৈনিকদের অস্ত্র অচল হয়ে পড়ল। কমে গেল গোলাগুলির আওয়াজ, তার বদলে শুধু ভাসতে থাকল আর্তচিৎকার আর মানুষের হাড্ডি-মাংস চুরমার হবার আওয়াজ।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বিস্ফারিত চোখে হত্যাযজ্ঞ দেখছে আসিফ। হঠাৎ ওর উপর চোখ পড়ল এক মিউট্যান্টের। হিংস্র ভঙ্গিতে ছুটে এল প্রাণীটা, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। কৌতূহলী চোখে দেখতে শুরু করল ওকে। এই প্রথম কোনও মিউট্যান্টের চেহারায় মনুষ্যত্বের ছাপ দেখতে পেল আসিফ। ওর গায়ে ইউনিফর্ম নেই, হাতেও নেই কোনও অস্ত্র—ব্যাপারটা লক্ষ করে হঠাৎ মত পাল্টাল মিউট্যান্ট, উল্টো ঘুরে সৈনিকদের উপর ফের ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্বস্তি পেল না আসিফ। একটা মিউট্যান্ট ওকে ছেড়ে দিয়েছে মানে এই নয় যে, বাকিরাও একই আচরণ করবে। আদিম প্রবৃত্তি কাজ করছে ওদের ভিতরে। সৈনিকদের খতম করা হলে নতুন শিকার খুঁজবে। খোলা দরজা লক্ষ্য করে ছুটল ও।

বাইরে ততক্ষণে দুই সৈনিক ঘায়েল হয়েছে। ভিতরে গোলাগুলি শুনে চমকে গিয়েছিল ওরা, সেই সুযোগে বিজ্ঞানীরা আক্রমণ করেছে ওদেরকে। মার্শাল আর্টের কয়েক মুভমেন্টে একজনকে শুইয়ে দিয়েছে তানিয়া, ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, লোকটা প্রতিরোধ করার সময় পায়নি। দ্বিতীয় গার্ডকে বিজ্ঞানীরা স্রেফ সংখ্যার জোরে পরাজিত করেছে। গণপিটুনির মত মার খেয়ে ভূপাতিত হয়েছে সে-ও।

বিল্ডিঙের ভিতর থেকে আসিফ যখন ছিটকে বেরুল, তখন বিজ্ঞানীরা পিকআপে উঠে বসেছে। তানিয়া হাতছানি দিয়ে

ডাকল ওকে। 'আসিফ! এদিকে!!'

লাফ দিয়ে পিকআপে উঠল আসিফ, আর তখুনি দরজা ঠেলে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল অনেকগুলো মিউট্যান্ট। পিকআপে বসা মানুষগুলোকে দেখতে পেয়ে গর্জন করে উঠল।

'মুভ, তানিয়া! মুভ!!' চেঁচাল আসিফ।

চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল তানিয়া, গিয়ার দিয়ে সবেগে সামনে বাড়াল পিকআপ। পিছন পিছন ধাওয়া করে এল মিউট্যান্টরা। ওদের গতি দেখে চমকে উঠল আসিফ—প্রায় গাড়ির মত দ্রুত ছুটছে! নিশ্চয়ই এনযাইমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষমতা পেয়েছে ওরা।

পিকআপের পিছন থেকে বিজ্ঞানীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করল। হেণ্ডারসন বলল, 'ফর গডস্ সেক, ড. তানিয়া! জোরে চালান! যত জোরে পারেন!!'

পাগলের মত কম্পাউণ্ডের সীমানা অতিক্রম করল পিকআপ। আর তার পর পরই আচমকা ব্রেক কষল তানিয়া। রাস্তার ঠিক মাঝখানে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ছায়ামূর্তি! স্কিড করে ওদের ছ'ইঞ্চি তফাতে থামল গাড়ি।

'হাই!' শোনা গেল হাসিখুশি কণ্ঠ। 'একটা লিফট পাওয়া যাবে?'

'ববি! রানা!!' দুই আগন্তুককে চিনতে পেরে চমকে উঠল আসিফ। 'তোমরা কোত্থেকে?'

'লম্বা কাহিনি,' ড্রাইভিং ক্যাবের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'তোদের এ-অবস্থা কেন? দেখে তো মনে হচ্ছে ভূতে তাড়া করেছে।'

'ভূত না, পিশাচ! পিছনে তাকা।'

হিংস্র গর্জন ভেসে এল দূর থেকে। অস্বাভাবিক দ্রুততায় এগিয়ে আসতে থাকা অনেকগুলো ছায়াকে দেখতে পেল রানা

আর মুরল্যাণ্ড।

'আঁই!' আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'কী ওগুলো?'

'মিউট্যাণ্ট,' বলল তানিয়া। 'জলদি ওঠো গাড়িতে। ওরা নাগাল পাবার আগেই পালাতে হবে আমাদেরকে।'

'সরো সুন্দরী,' ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'আমাকে ড্রাইভ করতে দাও।'

তানিয়াকে কিছু বলার সুযোগ দিল না ও, ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ল স্টিয়ারিঙের পিছনে। লাফ দিয়ে রানা চড়ল পিকআপের পিছনে।

'কেমন আছেন আপনারা?' জড়োসড়ো হয়ে থাকা বিজ্ঞানীদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ও।

গিয়ার দিয়ে অ্যাকসেলারেটর চাপল মুরল্যাণ্ড। চাকায় কর্কশ শব্দ তুলে আবার আগে বাড়ল পিকআপ। ততক্ষণে বেশ কাছে চলে এসেছে মিউট্যাণ্টরা। লোমশ দেহ আর রক্তলাল চোখ দেখতে পেল রানা।

'ববি! স্পিড বাড়াও!' চেঁচাল ও। 'ব্যাটারা কাছে চলে এসেছে!'

'বাড়াচ্ছি, তবে ছিটকে পড়ে যেয়ো না।' সতর্ক করল মুরল্যাণ্ড।

পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেতে শুরু করল পিকআপ। অমসৃণ রাস্তায় রীতিমত লাফঝাঁপ দিচ্ছে গাড়িটা। একে অন্যের উপর আছড়ে পড়ল আরোহীরা, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লেগে গেল। আতঙ্ক আর ব্যথায় চেঁচাতে শুরু করল সবাই।

প্রতিযোগিতায় ভয়ানক প্রাণীগুলোকে হারানো গেল না। পিকআপের দেখাদেখি গতি বাড়িয়েছে ওরাও, কাছাকাছি এসে ঝাঁপ দিল ধাবমান বাহনটার গায়ে। নির্বিকার ভঙ্গিতে *সিগ-সাওয়ার* তুলে গুলি করল রানা। নাইন মিলিমিটার বুলেটের

আঘাতে ছিটকে পড়ে গেল কয়েকটা প্রাণী। বাকিগুলো ইতস্তত করে পিছিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পর নতুন বিপদ দেখা দিল। তীক্ষ্ণ বাঁকটার কাছে গতি কমাতে বাধ্য হলো মুরল্যাণ্ড, সাবধানে মোড় ঘুরল। কিন্তু রাস্তা ধরে এগোল না ধাওয়ারত মিউট্যান্টরা, আড়াআড়ি ভাবে পেরিয়ে এল মোড়ের জায়গাটা, ফলে পিকআপের আগেই রাস্তার সামনের অংশে পৌঁছে গেল। পথ আটকে দাঁড়াল। হেডলাইটের আলোয় লোমশ দেহের জঙ্গল দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠল তানিয়া।

'ববি!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'সামনে ব্যারিকেড!'

'ব্যারিকেডের নিকুচি করি!' রাগী গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'পিছনের তোমরা শক্ত হয়ে বসো!'

জটলা করে থাকা মিউট্যান্টদের উপর নির্মম ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিকআপ। বাম্পারের ধাক্কায় উড়ে গেল কয়েকটা প্রাণী, চাকার তলায়ও পড়ল কয়েকটা। আহত-নিহতদের আর্তনাদ, সেই সঙ্গে জীবিতদের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে ভরে উঠল চারপাশ। অ্যাকসেলারেটরের উপর থেকে চাপ কমাল না মুরল্যাণ্ড। আড়চোখে ডানে-বাঁয়ে ছিটকে যেতে দেখল মিউট্যান্টদের... যারা পারছে না, তারা সোজা চলে যাচ্ছে চাকার তলায়। ভারী দেহগুলো মাড়াতে গিয়ে রীতিমত লাফাচ্ছে বাহনটা, ক্রমাগত ঝাঁকি খেয়ে চলেছে। সাইডভিউ মিররে তাকাতেই দেখা গেল, পিছন থেকে লাফ দিয়ে পিকআপের গায়ে উঠে পড়েছে বেশ কয়েকটা পিশাচ—হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আমচকা ধড়াম করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠল মুরল্যাণ্ড। পিকআপের ছাদ থেকে বিশাল এক মিউট্যান্ট লাফ দিয়ে নেমেছে বনেটের উপর, ঘুসি দিয়ে উইণ্ডশিল্ড ভাঙতে চাইছে। ছোঁ মেরে কোমর থেকে নিজের

সিগ-সাওয়ার বের করল ও, ট্রিগার চেপে ওটার কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল। আর্তনাদ করে বনেট থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল প্রাণীটা। আরেকটা মিউট্যান্ট উদয় হলো ড্রাইভারের পাশের জানালায়, গুলি করে ওটাকেও ফেলে দিল মুরল্যাণ্ড।

পিছনে রানাও লড়াই করে চলেছে। একের পর গুলি ছুঁড়ে ধরাশায়ী করছে হিংস্র প্রাণীগুলোকে। একটা মিউট্যান্ট উঠে পড়ল পিকআপের পিছনে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। ঠেকাতে পারল না রানা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝের উপর। ওর গায়ে চেপে বসল প্রাণীটা, হাঁ করে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলার প্রয়াস চালাল। ওটার গলা চেপে ধরল রানা, ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করল মুখটা গলার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে। ওর প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হলো না, প্রাণীটার শরীরে ভয়ানক শক্তি, ধীরে ধীরে হাঁ করা মুখটা নেমে আসছে নীচে। তীব্র দুর্গন্ধে দম আটকে এল রানার। উপায়ান্তর না দেখে হাঁটু ভাঁজ করল ও, সজোরে আঘাত হানল মিউট্যান্টের উরুসন্ধিতে।

কাজ হলো আঘাতে। জেনেটিক পরিবর্তন ঘটলেও প্রাণীটার জননাঙ্গ আগের জায়গাতেই রয়েছে। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল, সরে গেল রানার উপর থেকে। পিস্তল তুলে ট্রিগার চাপল রানা, কিন্তু খালি চেম্বারে খটাস করে পড়ল হ্যামার। অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে, রিলোড করার সময় নেই। শোয়া অবস্থাতেই জন্তুটার বুকে লাথি মারল ও, একই সময়ে বড় একটা ঝাঁকি খেল গাড়ি। তাল হারিয়ে উল্টেপাল্টে পড়ে গেল মিউট্যান্ট পিকআপ থেকে।

মিউট্যান্টদের ব্যারিকেড পেরিয়ে এসেছে পিকআপ। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে খোলা রাস্তা ধরে। মুরল্যাণ্ড বলল, 'একটা প্ল্যান দরকার, রানা। এভাবে ছোটাছুটি করে বেশিক্ষণ পার পাওয়া যাবে না।'

'আমার মগজ থেমে নেই, ববি,' পিছন থেকে গলা চড়িয়ে জবাব দিল রানা।

'কী বলছ এসব?' বিস্ময় ফুটল আসিফের কণ্ঠে। 'কোনও রকম প্ল্যান ছাড়া এখানে এসেছ তোমরা?'

'অনেকটা তা-ই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আশাবাদী লোক আমরা, ভেবেছিলাম দ্বীপে ঢুকতে পারলে বেরুনোর একটা উপায়ও পেয়ে যাব।'

'ফাজলামি কোরো না, ববি। কীভাবে এসেছ তোমরা?'

'সাঁতার কেটে।'

'কী!'

'একটা বোট ছিল, তবে ওটা ডুবিয়ে দিতে হয়েছে।'

'তা হলে আমরা যাব কীভাবে?'

ড্রাইভিং ক্যাবের রিয়ার উইণ্ডোতে উদয় হলো রানার মুখ। ও বলল, 'আমি এখানকার প্যাট্রোল বোট নিয়ে ভাবছি। ওটা দখল করলে কেমন হয়?'

'মনের মত একটা কথা বলেছ, দোস্ত,' হাসল মুরল্যাণ্ড।

'ওটার কথা আমরাও ভেবেছিলাম,' আসিফ বলল। 'কিন্তু পিয়ারে নেই ওটা, টহলে গেছে।'

'গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে,' শুধরে দিল রানা। 'আমি আর ববি ওটাকে তীরে ফিরতে দেখেছি।'

'কিন্তু গোলাগুলির শব্দে গার্ডরা এখন সতর্ক হয়ে গেছে। বোট চুরি করা সহজ হবে না।'

'চুরি শব্দটা একবারও উচ্চারণ করিনি। আমি হাইজ্যাক করার কথা ভাবছিলাম।'

'আহ্, তুমি তো আমাকে পাগল করে দিচ্ছ হে!' খুশি খুশি গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'কতদিন বোট হাইজ্যাক করি না! আমার আর তর সইছে না!'

'তোমরা দু'জনই পাগল!' বিরক্ত গলায় বলল তানিয়া। 'কীভাবে হাইজ্যাক করবে বোট? দুটো পিস্তল ছাড়া তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। গার্ডদের কাছে অটোমেটিক রাইফেল, মেশিনগান... সব আছে।'

'আর আমাদের সঙ্গে আছে রি-ইনফোর্সমেন্ট,' হালকা গলায় বলল রানা। 'ববি, স্পিড একটু কমাও। পিছনের বন্ধুরা যাতে ফলো করতে পারে আমাদেরকে। বোট দখলের জন্য ওদের সাহায্য দরকার হবে।'

'আপনাদের কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল হেণ্ডারসন। 'কোন্ সাহসে মিউট্যান্টগুলোকে কাছে আনতে চাইছেন?'

'এই ভীতুর ডিমটা কে?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'সরি, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি,' বলল তানিয়া। 'ইনি ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন। এখানকার রিসার্চ প্রজেক্টের প্রধান।'

'রিসার্চ প্রজেক্ট?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'পিছনের ওই আপদগুলো কি আপনার সৃষ্টি?'

'অনেকটা সেরকমই বলতে পারেন,' স্বীকার করল হেণ্ডারসন।

'অ! আপনাকে একটু গালাগাল দিলে আশা করি কিছু মনে করবেন না?'

মুখ কালো করে ফেলল হেণ্ডারসন।

রাস্তার জাংশানে পৌঁছে গেছে পিকআপ। আসিফের নির্দেশে বাঁয়ে মোড় নিল মুরল্যাণ্ড, ছুটে চলল কমাণ্ড সেন্টারের দিকে। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো একতলা বিল্ডিংটা। আসিফের আশঙ্কা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম

ভেঙে গেছে গার্ডদের। সবাই জটলা পাকাচ্ছে বিল্ডিঙের বাইরে। ছুটন্ত পিকআপকে দেখতে পেয়ে হাতের অস্ত্র তুলল।

'থেমো না,' বলল রানা। 'আমি ওদেরকে সামলাচ্ছি।'

সিগ-সাওয়ার তুলে জটলার দিকে গুলি করল ও। প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক লাফিয়ে পড়ল গার্ডরা, তারপর পাল্টা গুলি ছুঁড়ল।

'শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো সবাই!' চিৎকার করল রানা।

একসারি বুলেট পিকআপের উইণ্ডশিল্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। মাথা নামিয়ে নিয়েছে সবাই, মেঝেতে অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে রেখেছে মুরল্যাণ্ড। গতি কমল না গাড়ির। আবার গুলি করল গার্ড-বাহিনী। ঠক্ ঠক্ করে চেসিসে বিঁধল বুলেট।

'ববি, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'পিয়ারে পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে।' শরীর একটু জাগিয়ে গুলি করল ও গার্ডদের উদ্দেশে।

বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল মুরল্যাণ্ড, কমাণ্ড সেণ্টারের পাশ দিয়ে ছুটে চলল সামনে। পিছন থেকে আবার গুলি করল গার্ডরা। ধড়াম করে পিছনের টায়ার ফাটল, চাকায় গুলি লেগেছে। ব্যালান্স হারিয়ে ডানে-বাঁয়ে মাতালের মত দোল খেতে শুরু করল পিকআপ।

মাথা তুলে সামনে তাকাল রানা। পিয়ার মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। শেষ মাথায় বেঁধে রাখা হয়েছে প্যাট্রোল বোট।

'থামো, ববি,' বলল ও। মুরল্যাণ্ড ব্রেক কষতেই হুকুম দিল, 'নামো সবাই। দৌড়াতে শুরু করো।'

ঝটপট পিকআপ থেকে নেমে পড়ল আরোহীরা। ছুটতে শুরু করল পিয়ারের দিকে। ওদেরকে তাড়া করে এল গার্ডের দল। পিছনে থাকল রানা-মুরল্যাণ্ড। গুলি ছুঁড়ে ব্যতিব্যস্ত রাখল ধাওয়াকারীদের। পিয়ারে পা রাখতেই শোনা গেল আর্তনাদ। মিউট্যাণ্টরা পৌঁছে গেছে।

এক মুহূর্তের জন্য থেমে পরিস্থিতি যাচাই করল রানা। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে দলে দলে মিউট্যান্ট, বেরিয়ে এসেছে নিরেট একটা সচল পাঁচিলের মত। কী বলা যায়! হিংস্র বললে কিছুই বলা হয় না। সাক্ষাৎ মৃত্যু, সগর্জনে ছুটে এসেছে, এক নিমেষে গ্রাস করেছে অসতর্ক গার্ডদেরকে। হিংস্র প্রাণীর বিশাল স্রোতটা চোখের পলকে ঢেকে ফেলল তাদের... কিছু বুঝে ওঠার আগেই। টেনে-হিঁচড়ে শুইয়ে ফেলল সবাইকে, দাঁত দিয়ে কামড় বসাল উন্মুক্ত চামড়ায়। আতঙ্কিত গার্ডরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, এক একজনের মাংস লুঠ করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসংখ্য ঘৃণ্য পিশাচ।

উল্টো ঘুরে আবার ছুটতে শুরু করল রানা। হেণ্ডারসন পিছিয়ে পড়েছে, খোঁড়াচ্ছে। তার পাশে পৌঁছে থামল ও। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ডক্টর?'

'আ... আমার সম্ভবত গুলি লেগেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হেণ্ডারসন।

স্কটিশ বিজ্ঞানীর বুকের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা। শার্ট ভিজে যাচ্ছে রক্তের অঝোর ধারায়। তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধে তুলে নিল ও। ছুটল বোটের দিকে। সবাই তাতে উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে।

'ববি, লেটস্ গো!' চেঁচাল ও।

'আই, আই, ক্যাপ্টেন!' বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। কিন্তু ইঞ্জিন চালু হচ্ছে না কেন যেন। রেগে গিয়ে শুরু করল গালাগাল। 'হারামজাদী, ডোবাবি নাকি আমাকে?'

হেণ্ডারসনকে সাবধানে ডেকের উপর শুইয়ে দিল রানা। কিছু বলতে হলো না কাউকে, বিজ্ঞানীর রক্তাক্ত জামা-কাপড় দেখে সবাই বুঝে ফেলল কী ঘটেছে।

'ববি, দেরি করছ কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বেটি কথা শুনছে না,' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমি দেখছি সমস্যাটা কোথায়। তুমি বোটের বাঁধন খোলো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেকের কিনারে চলে গেল রানা। পিয়ারের সঙ্গে বাঁধা রশি খুলতে শুরু করল। শেষ বাঁধনটা খুলতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল মুরল্যাণ্ড। আর তখুনি রানার গায়ে পড়ল একটা কালো ছায়া।

চোখ তুলতেই চমকে উঠল ও। একটা মিউট্যান্ট এসে পড়েছে পিয়ারে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপ দিল বোটের ভিতর। প্রাণীটাকে জাপটে ধরল রানা, দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল ডেকের উপর। আতঙ্কে চেঁচাতে শুরু করল বিজ্ঞানীরা।

ঘাড় ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড। দেখল, পিয়ার ধরে ছুটে আসছে আরও অনেকগুলো মিউট্যান্ট। গুঙিয়ে উঠল ও, 'সেরেছে!'

'ববি!' ধস্তাধস্তির ফাঁকে ধমকে উঠল রানা। 'রওনা হচ্ছ না কেন?'

থ্রটল পুরোপুরি ঠেলে দিল মুরল্যাণ্ড। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বোট। পিছন থেকে আরও কয়েকটা প্রাণী ঝাঁপ দিয়েছে বোট লক্ষ্য করে, কিন্তু পৌঁছুতে পারল না। ঝপাস্ করে আছড়ে পড়ল পানিতে।

রানা তখনও যুঝছে ওর গায়ে চেপে বসা প্রাণীটার সঙ্গে, কিন্তু পেরে উঠছে না। বিজ্ঞানীরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, আসিফ আর তানিয়াও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কেউ ওকে সাহায্য করছে না। ব্যাপারটা লক্ষ করে রাগ ফুটল মুরল্যাণ্ডের চেহারায়।

'যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর না!' বলল ও, 'এত বড় সাহস! আমার ওস্তাদের বুকে চড়ে বসে!' আসিফের হাতে বোটের হুইল ধরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। লম্বা কদম ফেলে হাজির হলো

ধস্তাধস্তি করতে থাকা রানা আর মিউট্যান্টের কাছে। এক হাতের ভাঁজে প্রাণীটার গলা আটকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও, তুলে আনল রানার উপর থেকে। অন্যহাতে মাথার একটা পাশ চেপে ধরে প্রচণ্ড এক ঝটকা দিল। মট্ করে ভেঙে গেল মিউট্যান্টের ঘাড়। মুরল্যাণ্ডের হাতের ভাঁজে নিস্তেজ হয়ে গেল দেহটা। ওটাকে ছুঁড়ে ডেকের উপর ফেলে দিল ও।

কাশতে কাশতে উঠে বসল রানা। দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ফুটল। বলল, 'ইনক্রেডিবল হাল্কের ভূমিকা নেয়ায় ধন্যবাদ, ববি। আরেকটু দেরি হলেই পটল তুলতাম।'

'এতকিছু থাকতে কাল্পনিক একটা দানবের সঙ্গে তুলনা করলে আমার?' আহত কণ্ঠে বলল মুরল্যাণ্ড।

হেসে ফেলল রানা। 'সরি, আর কোনও উপমা খুঁজে পেলাম না।'

'রানা! ববি!' ডেকে উঠল তানিয়া।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দু'বন্ধু। হেণ্ডারসনের অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে। বিড় বিড় করে কী যেন বলতে চাইছে।

'রিল্যাক্স, ডক্টর,' হাঁটু গেড়ে বসে বলল রানা। 'বিপদ কেটে গেছে, একটু ধৈর্য ধরুন। খুব শীঘ্রি আপনার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করছি। সাহস রাখুন।'

মলিন হাসি ফুটল হেণ্ডারসনের ঠোঁটে। 'আপনার অভিনয় বড্ড কাঁচা। জানি, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তার আগে জরুরি একটা কথা বলে যেতে চাই।'

'কিচ্ছু বলতে হবে না আপনাকে,' ধরা গলায় বলল তানিয়া। ওর চোখ ভিজে গেছে। 'আপনি বিশ্রাম নিন।'

'না... কথাটা জরুরি...' গলার স্বর আটকে যাচ্ছে

হেণ্ডারসনের। 'ড. তানিয়া... প্লিজ, তৃতীয় ডোজ... ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি...'

'কীসের তৃতীয় ডোজ? কীসের চাবিকাঠি?'

'সব সমস্যা সমাধানের...'

কথা শেষ করতে পারল না হেণ্ডারসন। ভয়ানকভাবে কেশে উঠল। তারপর নিথর হয়ে গেল সে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল তানিয়া। সহজ-সরল মানুষটাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল ওর, তার কারণেই এখনও বেঁচে আছে ওরা। বেচারার অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারছে না।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল সবাই।

'কীসের কথা বললেন ভদ্রলোক?' কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল রানা।

'জানি না,' মাথা নাড়ল তানিয়া। 'আমার কোনও ধারণা নেই।'

আধঘণ্টা পর ব্রিটিশ কোস্ট গার্ডের একটা জাহাজ উদ্ধার করল ওদেরকে সাগর থেকে।

তেরো

হার ম্যাজেস্টি'জ কোস্টগার্ড শিপ *রেসকিউয়ার*-এর ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন কমাণ্ডার রেজিনাল্ড অ্যানসন, ঢেউ ও সাদা ফেনার মাথায় নৃত্যরত ছোট একটা মোটর বোটের উপর চোখ

বোলাচ্ছেন। দড়ির সাহায্যে ওটাকে টেনে আনা হচ্ছে। আইল অভ ম্যানে জন্ম, কমাণ্ডার অ্যানসন অত্যন্ত ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ, তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর স্বভাব নয়। প্রায় বিশ বছর সাগরে আছেন তিনি, সহকর্মী ও ক্রুরা তাঁকে সম্মান করে। কাঁচা-পাকা ছোট দাড়িতে হাত বোলালেন তিনি, চিন্তা করছেন মোটর বোটের আরোহীরা কারা হতে পারে।

একটু পরেই *রেসকিউয়ার*-এর গায়ে ভিড়ল ছোট্ট বোট। ল্যাডার বেয়ে উঠে এল দশজন মানুষ। ওখানেই থামানো হলো, অস্ত্রধারী গার্ডরা ঘিরে ফেলল সবাইকে।

'চমৎকার সারপ্রাইজ!' বলে উঠল গাঁট্টাগোট্টা শরীরের একজন। 'উদ্ধারকারীরাই বন্দুক দেখাবে, এমনটা আশা করিনি।'

'বিপদে পড়া যে-কোনও বোটকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব,' বললেন কমাণ্ডার অ্যানসন। 'কিন্তু তাই বলে পরিচয় না জেনে জাহাজে ঢোকাতে পারি না কাউকে।'

'তাতে দোষের কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' বলে কয়েক পা এগিয়ে এল সুদর্শন এক যুবক। 'আমি মাসুদ রানা। স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি। কষ্ট করে একটু ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করলেই নিশ্চিত হতে পারবেন।'

'নুমা!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন অ্যানসন। 'আপনাদের সঙ্গে কি ড. আসিফ রেজা, তানিয়া রেজা এবং জয়েস কোর্ট বলে কেউ আছেন?'

'হ্যাঁ, আমরা।' বলে এগিয়ে এল আসিফ-তানিয়া-জয়েস। 'আপনি আমাদের নাম জানলেন কী করে?'

'আপনাদেরকে উদ্ধার করার জন্যই তো যাচ্ছিলাম আমরা!' বললেন অ্যানসন। 'নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে কোস্টগার্ড

হেডকোয়ার্টারে মেসেজ পাঠানো হয়েছে—তিনজন বিজ্ঞানী নাকি একটা দ্বীপে আটকা পড়ে আছেন। দ্বীপের কো-অর্ডিনেটস্ দিয়ে আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে আপনাদেরকে উদ্ধার করে আনার জন্য। তাই তড়িঘড়ি করে পাঠানো হয়েছে *রেসকিউয়ার*-কে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল আসিফ-তানিয়া। নিশ্চয়ই মি. রেডক্লিফের কাণ্ড। সাবমেরিনের রেডিও সিগনাল ট্র্যাক করে দ্বীপের লোকেশন বের করেছেন, তারপর খবর দিয়েছেন ব্রিটিশ কোস্টগার্ডকে।

'আপনাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছি আমরা,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'দ্বীপ থেকে বের করে এনেছি ওদেরকে। এখন চলুন, বাড়ির সামনে নামিয়ে দিন আমাদেরকে।'

'আপনার পরিচয়?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যানসন।

'ববি মুরল্যাণ্ড। আমিও নুমার সঙ্গে আছি।'

ভ্রূকুটি দেখা দিল কমাণ্ডারের কপালে। 'আমাকে শুধু তিনজনের কথা বলা হয়েছে। আপনারা এত লোক এলেন কোত্থেকে?'

'ওরা সবাই ওই দ্বীপে বন্দি ছিল,' বলল রানা। 'আমি আর ববি ওদেরকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম।' সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বলল ও। এড়িয়ে গেল মিউট্যান্টদের প্রসঙ্গ। শেষে বলল, 'বোট নিয়ে কুয়াশায় পথ হারিয়েছিলাম, তাই ডিসট্রেস সিগনাল দিয়েছি। আপনারা সাড়া দিয়েছেন তাতে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মাথা দোলালেন অ্যানসন। 'চলুন ভিতরে। আপনাদের বিশ্রাম দরকার। আমি কমাণ্ডার রেজিনাল্ড অ্যানসন, এই শিপের অধিনায়ক। ওয়েলকাম টু দ্য রেসকিউয়ার।'

'নাইস টু মিট ইউ, কমাণ্ডার,' বলে হাত মেলাল রানা। 'আরেকটু সাহায্য চাইব আপনার। নুমা হেডকোয়ার্টারে

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছে একটা মেসেজ পাঠানো দরকার—আমরা সবাই সুস্থ আছি।'

'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনারা যান।'

'আরেকটা ব্যাপার... বোটে দুটো ডেডবডি আছে। ওগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।'

'ডেডবডি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। ওগুলো উঠিয়ে আনছি।'

অ্যানসনের নির্দেশে উদ্ধারকৃতদের নিয়ে যাওয়া হলো শিপের ভিতরে। বোট থেকে লাশদুটো সিক বে-তে নিয়ে যেতেও বলে দিলেন তিনি। তারপর গেলেন ব্রিজে। রেডিওতে মেসেজ পাঠালেন নুমা হেডকোয়ার্টারে, তারপর কোস্টগার্ড কমাণ্ডের জন্য রিপোর্ট তৈরি করতে বসলেন। মিনিট পনেরো যেতেই ইন্টারকমে মেডিক্যাল অফিসার যোগাযোগ করল। খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে সে।

'কমাণ্ডার, একটু সিক বে-তে আসতে পারেন?'

'কী ব্যাপার, গ্র্যান্ট?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইলেন অ্যানসন।

'নিজ চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। প্লিজ, এখুনি আসুন।'

কাগজ-কলম রেখে উঠে দাঁড়ালেন অ্যানসন। বিনা কারণে ডাকাডাকি করার লোক নয় ডা. গ্র্যান্ট। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। তাড়াহুড়ো করে সিক বে-তে হাজির হলেন তিনি।

অপারেটিং টেবিলের উপর পড়ে আছে দুটো কালো রঙের বডি ব্যাগ। ওগুলোর সামনে কমাণ্ডারকে নিয়ে গেল গ্র্যান্ট। একটার চেইন ধরে বলল, 'শান্ত থাকবেন, সার।'

'নাটক ছেড়ে যা দেখাবে দেখাও!' বিরক্ত গলায় বললেন

অ্যানসন।

মাথা ঝাঁকিয়ে একটানে চেইন খুলে ফেলল গ্র্যান্ট। ভিতরের লাশ দেখতে দিল কমাণ্ডারকে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল অ্যানসনের। জীবনে বহু লাশ দেখেছেন তিনি, পচা-গলা মৃতদেহও কখনও বমির উদ্রেক করেনি তাঁর ভিতরে। কিন্তু আজ মনে হলো বমি না করে উপায় নেই। তাঁর চোখের সামনে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে একটি ভয়ানক প্রাণী। এমন চেহারা বা অবয়ব দেখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন অ্যানসন। মুখে হাত চাপা দিয়ে বহু কষ্টে নিরস্ত করলেন পাকস্থলীকে। তারপর সোজা হয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্...কী ওটা?'

'আমার জানা নেই, সার,' মাথা নাড়ল গ্র্যান্ট। 'এ ধরনের কোনও প্রাণীর যে অস্তিত্ব আছে, তা-ই তো শুনিনি কখনও।'

দ্বিতীয় বডিব্যাগের দিকে ইশারা করলেন অ্যানসন। 'ওটা?'

'স্বাভাবিক মানুষ,' চেইন খুলে দেখাল গ্র্যান্ট। মাঝবয়েসী একজন পুরুষ। 'নাথিং স্পেশাল।'

'চেইন বন্ধ করো,' বললেন অ্যানসন। 'আর কেউ যেন দেখতে না পায় এগুলো। আমি কোনও প্যানিক চাই না।'

'বোট থেকে লাশ তোলায় কয়েকজন সাহায্য করেছে আমাকে। ওদের মুখ বন্ধ রাখা সহজ হবে না।'

'ডেকে এনে কথা বলো। দরকার হলে আমিও বোঝাব ওদেরকে। শিপের মধ্যে মরা দানবের গল্প ছড়িয়ে পড়লে লোকজনকে সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে।'

'আমি দেখছি কী করা যায়।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন অ্যানসন। পালা করে বডিব্যাগদুটোর দিকে তাকাচ্ছেন। একটু পর জিজ্ঞেস করলেন,

'কীভাবে মারা গেছে ওরা?'

'ওই ভদ্রলোক গুলি খেয়েছেন,' বলল গ্র্যান্ট। 'আর জন্তুটার ঘাড় মুচড়ে ভাঙা হয়েছে।'

থমথমে হয়ে উঠল অ্যানসনের চেহারা। 'আমাদের নতুন অতিথিদের সঙ্গে এ-নিয়ে একটু কথা হওয়া দরকার। যাচ্ছি আমি। তুমি লাশদুটো ফ্রিজারে রাখার ব্যবস্থা করো।'

'ইয়েস, সার।'

সিক বে থেকে বেরিয়ে এলেন কমাণ্ডার অ্যানসন। হনহন করে হেঁটে হাজির হলেন মেস হলে। ওখানে গরম সুপ আর পাউরুটি নিয়ে বসেছে উদ্ধারকৃতরা। চঞ্চল চোখে রানাকে খুঁজে বের করলেন তিনি। মুরল্যাণ্ড-সহ আসিফ-তানিয়ার সঙ্গে আলাদা একটা টেবিলে বসেছে ও। স্বামী-স্ত্রীর মুখে শুনছে ওদের কিডন্যাপ হওয়া থেকে শুরু করে দ্বীপের সমস্ত ঘটনা।

'হ্যালো, মি. রানা!' টেবিলের সামনে গিয়ে বাঁকা সুরে বললেন অ্যানসন।

'কমাণ্ডার!' সহাস্যে বলল রানা। 'আপনার আতিথেয়তার তুলনা হয় না। প্লিজ, আমাদের সঙ্গে বসুন।'

'বসতে আসিনি,' অ্যানসন গম্ভীর হয়ে আছেন। 'আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলা দরকার আমার... এখুনি!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, উঠে পড়ল। ওকে মেস হলের বাইরে করিডোরে নিয়ে এলেন অ্যানসন।

'বলুন কী ব্যাপার,' কমাণ্ডারের মুখোমুখি হলো রানা।

'ডেডবডিদুটো দেখে এসেছি আমি,' শান্ত গলায় বললেন অ্যানসন।

'হুম। কোনও সমস্যা?'

'হেঁয়ালি করবেন না। কে... বা কী ওগুলো, মি. রানা?'

'মানুষটা একজন স্কটিশ বিজ্ঞানী—ড. ওয়েসলি হেণ্ডারসন।

দ্বিতীয় লাশের সঠিক পরিচয় আমারও জানা নেই। শুধু শুনেছি, বিশ্রী একটা সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল ওই প্রাণী—একটা মিউট্যান্ট!'

'কী ধরনের সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট?'

'দুঃখিত, বিস্তারিত জানা নেই আমার।'

'ওরা কীভাবে মারা গেছে, তা জানেন?'

'ড. হেণ্ডারসন পালাবার সময় গুলি খেয়েছেন। আর মিউট্যান্টটা আমাদের উপর হামলা করেছিল। তাই আমার বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড ওটার ঘাড় মটকে দিতে বাধ্য হয়।'

হাঁ হয়ে গেলেন অ্যানসন কথাটা শুনে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ওই দ্বীপে তা হলে গোপন গবেষণা চলছিল?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনারা কিছু জানতেন না?'

'উঁহুঁ। একেবারেই গুরুত্বহীন একটা দ্বীপ ওটা, নাম নেই কোনও, শুধু কো-অর্ডিনেটস্ দিয়ে পরিচয়। বহুকাল আগে একটা সাবমেরিন বেস ছিল, তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রাইভেট একটা কোম্পানি লিজ নিয়েছে ওটা কয়েক বছর আগে, সরকারের উঁচু মহলে সম্ভবত বেশ টাকা-পয়সা ঢেলেছে ওরা, আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল—ওই দ্বীপে কখনও পা রাখা যাবে না। ঠাট্টা করে আমরা তাই জায়গাটাকে *ফরবিডেন আইল্যাণ্ড*, মানে নিষিদ্ধ দ্বীপ বলে ডাকতাম।'

'ওই নিষিদ্ধ দ্বীপেই আমার বন্ধুদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি আর ববি যদি নাক না গলাতাম, তা হলে এতক্ষণে ওরা মিউট্যান্টদের খাবার হয়ে যেত।'

'কারা কিডন্যাপ করেছিল ওঁদের, তা জানেন?'

'না। দ্বীপের সিকিউরিটি বাহিনী ছিল ভাড়া করা। পালের গোদারা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। ওদেরকে আমি খুঁজে বের

করব।'

আলাপে বাধা পড়ল ধোপদুরস্ত পোশাক পরা এক ইয়োম্যান এসে হাজির হওয়ায়। ভাঁজ করা কয়েকটা কাগজ তুলে দিল সে অ্যানসনের হাতে।

'জরুরি মেসেজ, সার। এইমাত্র এসেছে।'

ভাঁজ খুলে মেসেজগুলো পড়লেন অ্যানসন। রানার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের পাঠানো মেসেজ অ্যাকনলেজ করা হয়েছে। আপনাকে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তীরে পৌঁছুনোমাত্র।'

'আর কিছু?'

'না। তবে কোস্টগার্ড কমাণ্ড থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনাদেরকে ভিআইপি-র মর্যাদায় রাখতে হবে। বলুন, কীভাবে খেদমত করতে পারি?'

কমাণ্ডারের কণ্ঠে বিরক্তির সুর ফুটে উঠেছে। স্বাভাবিক, উড়ে এসে জুড়ে বসা কাউকে তোয়াজ করার আদেশ পেলে একজন বর্ষীয়ান কমাণ্ডারের ভাল না লাগারই কথা।

'রিল্যাক্স,' হেসে বলল রানা। 'ভিআইপি হবার কোনও ইচ্ছে নেই আমাদের। আপনার ক্রু-দের অংশ হতে পারলেই ধন্য হব।'

'ক্রু হবেন মানে?'

'বিজ্ঞানীদের কথা জানি না, তবে শুয়ে-বসে আরাম করার অভ্যেস নেই আমার বা ববির। নুমায় কাজ করি, জাহাজ আর সাগর সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। সাহায্য করতে পারব আপনাকে।'

অ্যানসনও হাসলেন। রানার ব্যাপারে ভুল ধারণা ভেঙে গেছে তাঁর। 'প্রস্তাবটার জন্য ধন্যবাদ। তবে কাল দুপুরেই বন্দরে পৌঁছে যাব আমরা। এত অল্প সময়ের জন্য খাটাখাটনি

না করলেও চলবে। যথেষ্ট ধকল গেছে আপনাদের উপর দিয়ে। যান, বিশ্রাম নিন।'

উল্টো ঘুরে চলে গেলেন তিনি।

পরদিন বেলা দুটোয় স্কটিশ ওর্কনি দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী কার্কওয়েলে পৌঁছুল *রেসকিউয়ার।* বন্দরে অদ্ভুত এক দৃশ্য অপেক্ষা করছিল রানাদের জন্য। রেলিঙে ভর দিয়ে জেটিতে কালো কাঁচে মোড়া একটা বাস দেখতে পেল ওরা, সেইসঙ্গে শব-পরিবহনকারী একটা গাড়ি। আর আছে কণ্টামিনেশন সুট পরা দু'ডজন মানুষ।

রানার গায়ে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল মুরল্যাণ্ড। 'এদেশের ফ্যাশন কত বদলে গেছে দেখেছ? আজকাল কণ্টামিনেশন সুট পরে অভ্যর্থনা জানানোর রেওয়াজ শুরু হয়েছে।'

হাসল রানা। কমাণ্ডার অ্যানসন কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ডিকণ্টামিনেশন টিম কেন?'

'মিউট্যাণ্টের লাশের কথা জানিয়েছিলাম হাই-কমাণ্ডকে, কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন,' বললেন অ্যানসন। 'আমাদের সবাইকে কোয়ারেণ্টিনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মেইনল্যাণ্ডে যাতে কোনও ধরনের জীবাণু ছড়াতে না পারি।'

'মনে হচ্ছে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি আপনাদেরকে।'

'কী যে বলেন! আপনারা আসায় বরং এ-ধরনের একটা থ্রিলিং ব্যাপার ঘটল। নইলে খুবই বোরিং সময় কাটাই।'

'সো নাইস অভ ইউ!' কমাণ্ডারের সঙ্গে হাত মেলাল রানা।

জাহাজ জেটিতে ভিড়লে সঙ্গীদের নিয়ে নেমে পড়ল ও। ওদের সবাইকে প্লাস্টিকের পোশাক, ক্যাপ আর সার্জিক্যাল মাস্ক পরানো হলো; তারপর তোলা হলো বাসে। লাশদুটো তোলা হলো শব-পরিবহনকারী গাড়িতে। রওনা হলো বাহনদুটো। পাঁচ

মিনিট চলার পর পুরনো এক ওয়্যারহাউসের সামনে এসে থামল। ওটার ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে ডিকন্টামিনেশন ল্যাব।

ওয়্যারহাউসের ভিতরে নিয়ে সবাইকে উদোম করা হলো, তারপর শাওয়ারের নীচে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষে গোসল করানো হলো। তোয়ালে দেয়া হলো না, আলট্রা-ভায়োলেট চেম্বারে ঢুকিয়ে শরীর শুকানো হলো অদৃশ্য রশ্মির সাহায্যে। এরপর হাসপাতালের রোগীদের মত একপ্রস্থ কাপড় দেয়া হলো পরতে। একদল ডাক্তার উদয় হলো এরপর। রক্ত নেয়া হলো সবার, থুতু নেয়া হলো, মুখের ভিতর থেকে নরম কোষ সংগ্রহ করা হলো। সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সবাইকে সুস্থ এবং সংক্রমণহীন হিসেবে ঘোষণা করল বিশেষজ্ঞরা। ততক্ষণে প্রায় চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

নতুন পোশাক দেয়া হলো সবাইকে। ভদ্রস্থ হবার পর নিয়ে যাওয়া হলো ওয়্যারহাউস সংলগ্ন আরেকটা বিল্ডিঙে। ওয়েটিং রুমের মত একটা কামরায় বসানো হলো বিজ্ঞানীদেরকে। নুমার স্টাফদের মধ্যে জয়েস ছাড়া বাকিদেরকে... মানে রানা, মুরল্যাণ্ড, আসিফ আর তানিয়াকে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটা কামরায়। সেখানে কনফারেন্স টেবিল আর চেয়ার বসানো হয়েছে। আধুনিক ছাঁটের পিন-স্ট্রাইপড্ সুট পরা এক যুবক অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

'প্লিজ, বসুন আপনারা,' আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল সে।

চেয়ার টেনে বসল রানা আর ওর সঙ্গীরা।

'নাইজেল ওয়াটসন, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস,' নিজের পরিচয় দিয়ে সবার সঙ্গে হাত মেলাল যুবক। করমর্দন শেষে রানাকে বলল, 'আমাদের চিফ... মি. মারভিন লংফেলো আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, মি. রানা। ডিকন্টামিনেশন প্রসিডিওরের জন্য অসুবিধে হয়ে থাকলে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'না, না, কোনও অসুবিধে হয়নি,' ঠাট্টা করল মুরল্যাণ্ড। 'এমনিতেই গা ডলে গোসল করা দরকার ছিল আমাদের। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের কাপড় কোন্ লণ্ড্রিতে পাঠিয়েছেন, জানতে পারি? কতটুকু ডিটারজেন্ট ঢালবে, সেটা বলে দেয়া দরকার।'

হাসল নাইজেল। 'চমৎকার রসিকতা। আপনার এই রসিক স্বভাবের কথা ফাইলে পড়েছি, এবার সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হলো।'

'এখানে কি কমেডি করার জন্য আনা হয়েছে আমাদেরকে?'

'মোটেই না,' সিরিয়াস হলো নাইজেল। 'কমাণ্ডার অ্যানসনের রিপোর্টে লাশ, গোপন গবেষণা আর মিউট্যান্টের কথা পড়ার পর বিষয়টাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেউ কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, তাই নিশ্চিত করা হয়েছে—আপনাদের মাধ্যমে যেন গ্রেট ব্রিটেনের মাটিতে কোনও ধরনের কণ্টামিনেশনের সূত্রপাত না হয়। ডিকণ্টামিনেশনের মধ্য দিয়ে সেজন্যেই আসতে হয়েছে আপনাদেরকে।'

'জানতাম না, আমাদের গায়ের গন্ধ এত খারাপ,' টিটকিরির সুরে বলল মুরল্যাণ্ড।

'মি. লংফেলোকে আশ্বস্ত করতে পারেন, এর সঙ্গে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের কোনও সম্পর্ক নেই,' বলল রানা।

'বলব আমি,' নিজের চেয়ার টেনে বসে পড়ল নাইজেল। 'কিন্তু তার আগে কেউ কি বলবেন, পুরো ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে?'

তানিয়া আর আসিফের দিকে তাকাল রানা। 'এ-প্রশ্নের জবাব ওঁরা দুজন সবচেয়ে ভাল দিতে পারবেন।'

বলতে শুরু করল স্বামী-স্ত্রী। গোস্ট সিটিতে আলভিন হাইজ্যাক হবার পর থেকে ওদের উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল। অমরত্বের গবেষণা আর লাল চোখঅলা

মিউট্যান্টের কথা শুনে নাইজেল অবাক হয়ে যাবে বলে ভেবেছিল রানা, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। বরং আসিফ-তানিয়ার গল্প শেষ হলে সে সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল।

বলল, 'হ্যাঁ, সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। আমি জানতাম, বিজ্ঞানীদের অকালমৃত্যুর পিছনে বড় কোনও একটা রহস্য আছে।'

'কীসের কথা বলছেন আপনি?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কয়েক মাস আগে আমার ডিপার্টমেন্টকে কয়েকজন বিজ্ঞানীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত করবার দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথমজন ছিলেন পঞ্চান্ন বছরের এক কম্পিউটার এক্সপার্ট। নিজের বাগানের ছাউনিতে পাওয়া যায় তাঁকে—সারা গায়ে ইলেকট্রিকের তার পেঁচানো, মুখে রুমাল গোঁজা অবস্থায়। তারের মাথা পাওয়ার আউটলেটে ঢুকিয়ে ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেছিলেন ভদ্রলোক...'

'অদ্ভুত পদ্ধতি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এভাবে আত্মহত্যার কথা আগে শুনিনি।'

'ওটা স্রেফ শুরু। এরপর আরেক জীববিজ্ঞানী লণ্ডন থেকে ফেরার পথে গাড়িসহ খাদে পড়ে মারা গেলেন। পুলিশ পোস্টমর্টেম করে জানাল, ভদ্রলোকের রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকমের বেশি পাওয়া গেছে। নেশার ঘোরেই সম্ভবত অ্যাকসিডেন্ট করেছেন বেচারা। বিজ্ঞানী বউ-ছেলেমেয়ে খুব হৈচৈ করল, ভদ্রলোক নাকি মোটেই মদ খেতেন না। কিন্তু কেউ তাদের কথায় কান দিল না।'

'ইন্টারেস্টিং!' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'শুনতে থাকুন, সবে তো শুরু করলাম। স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ে স্কিয়িং করতে গিয়ে মারা পড়লেন এক তরুণ বিজ্ঞানী, আরেক

বিজ্ঞানী স্ত্রী-সন্তানকে খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করলেন। গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আরেকজন...'

'কতজন মারা গেছে এভাবে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'দু'ডজন। সবাই বিজ্ঞানী।'

'এর সঙ্গে ওই নিষিদ্ধ দ্বীপের কী সম্পর্ক?'

'সেসময় কোনও সম্পর্ক পাইনি আমরা,' নাইজেল বলল। 'মারা যাওয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে দু'জন ছিল আমেরিকান, তাই ইউ.এস. এম্ব্যাসি থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয় ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার জন্য। দায়িত্বটা দেয়া হয় আমার ডিপার্টমেন্টকে। গোপনে খোঁজখবর নিয়েছি আমরা, তারপর রিপোর্ট জমা দিয়েছি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে।'

'তারপরও হৈ-চৈ হয়নি এ-নিয়ে?'

'কেন যেন গুরুত্ব দেয়া হয়নি কেসটাতে। এর পিছনে কোনও রহস্য আছে কি না, জানি না। আমি মারা যাওয়া সব বিজ্ঞানীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। জানতে পেরেছি, ওরা সবাই ফ্রান্সের একটা ল্যাবে কাজ করত।'

'ড. হেণ্ডারসনের রহস্যময় নিয়োগকর্তার ল্যাব?'

'ঠিক ধরেছেন। হেণ্ডারসনকে খুঁজে পাইনি আমরা, তাই ধরে নিয়েছিলাম—লোকটা এই খুনোখুনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এতদিন পর পাওয়া গেছে তাঁকে... যদিও মৃত অবস্থায়... কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই, ওই বিজ্ঞানীদের মৃত্যুর সঙ্গে অমরত্বের গবেষণার সম্পর্ক আছে।'

সামনে ঝুঁকল আসিফ। 'ফ্রান্সের ওই ল্যাবে কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল?'

'আমাকে বলা হয়েছে, মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক গবেষণা। অফিশিয়াল কোনও মন্তব্য জোগাড় করতে পারিনি।

ওই ল্যাবের মালিকরা ডামি কর্পোরেশন, ওভারসিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর পেপার ট্রেইলের এমন এক দুর্ভেদ্য জাল বুনে রেখেছে যে, তার আড়াল থেকে লোকগুলোর সত্যিকার পরিচয় বের করা এক কথায় অসম্ভব কাজ। আমরা এখনও খেটে মরছি।'

'ওদেরকে পাওয়া গেলে কি বিজ্ঞানীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন?'

'ব্যাপারটা আরও সিরিয়াস,' বলল নাইজেল। 'আপনার গল্প যদি সত্যি হয়, তা হলে অবৈধভাবে মানুষের উপর গবেষণা এবং মিউট্যান্ট তৈরির অভিযোগে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে ওদেরকে।'

'আসুন, গোছানোর চেষ্টা করি সব তথ্য,' বলল রানা। 'ফ্রান্সের ল্যাবে অমরত্বের ফর্মুলা আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল একদল বিজ্ঞানী। গোস্ট সিটির এনযাইম ব্যবহার করে সফল হয়েছিল ওরা, কিন্তু এ-খবর ফাঁস হতে দিতে চায়নি নিয়োগকর্তারা। বিজ্ঞানীদেরকে খুন করেছে। কিন্তু ওরা মারা যাবার পর ফর্মুলায় খুঁত আবিষ্কৃত হলো। এমন সব খুঁত, যার ফলে সাধারণ মানুষ হিংস্র, মাংসাশী মিউট্যান্টে পরিণত হয়। তাই ফর্মুলা ঠিকঠাক করার জন্য শেষ জীবিত বিজ্ঞানী হেণ্ডারসনকে ধরে আনে ওরা। স্কটিশ ওর্কনির একটা বিশেষ দ্বীপে নতুন ল্যাব বানিয়ে আবার গবেষণা শুরু করে। আসিফ আর তানিয়া ওদের গোস্ট সিটি এক্সপিডিশনে অবৈধ মাইনিঙের চিহ্ন আবিষ্কার করে ফেলায় ওদেরকেও কিডন্যাপ করা হয়। কারেক্ট?'

'চমৎকারভাবে গুছিয়ে বলেছেন, মি. রানা,' বলল নাইজেল। 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনারা আরও আগেই ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য চাননি কেন? কেন ঝুঁকি নিয়ে, অনুমতি ছাড়া একা ওই দ্বীপে হানা দিয়েছেন?'

'পাল্টা আমি একটা প্রশ্ন করলেই জবাব পেয়ে যাবেন। আমরা যদি লাল চোখঅলা একদল মিউট্যান্টের গল্প শোনাতাম, আপনারা সেটা বিশ্বাস করতেন?'

'মনে হয় না।'

'সত্যি কথা বলায় ধন্যবাদ। বুঝতেই তো পারছেন, রেগুলার চ্যানেলে এগোলে কাজটা কেমন কঠিন হয়ে যেত! আসিফ আর তানিয়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না আমার।'

'বুঝতে পারছি। আপনার জায়গায় আমি থাকলেও সম্ভবত একই কাজ করতাম।'

'সবই তো শুনলেন,' বলল তানিয়া। 'এখন কী করবেন আপনারা?'

'সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেয়া হয়ে গেছে,' জানাল নাইজেল। 'রয়্যাল মেরিনের কন্টিনজেন্টসহ একটা নেভাল শিপ পাঠানো হচ্ছে ফরবিডেন আইল্যাণ্ডে। ওখানে লুকানো সাবমেরিন দখল করবে ওরা, ল্যাব বন্ধ করে দেবে, বন্দি করবে গার্ড আর মিউট্যান্টদেরকে।'

'যা দেখে এসেছি, তাতে একজন গার্ডকেও আস্ত পাবেন কি না সন্দেহ!' তানিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করল।

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল নাইজেল। 'মিউট্যান্টরা সাংঘাতিক, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের লোকজন দ্বীপে পা রাখার আগে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আপনি আর ড. আসিফ তো খুব কাছ থেকে দেখেছেন ওগুলোকে। কিছু বলতে পারেন মিউট্যান্টের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে?'

'ওরা বুনো, মাংসাশী, এবং অত্যন্ত শক্তিশালী,' বলল আসিফ। 'ছুটতেও পারে খুব দ্রুত। পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে দেখেছি আমরা। তা ছাড়া... রিয়্যালিটি শো-র

ওই ঘটনা মাথায় রাখলে স্বীকার করতে হবে, ওরা পরিকল্পনা করতে জানে।' মিউট্যান্টদের বন্দিশালার ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর—একটা প্রাণী দয়া দেখিয়েছিল ওকে, খুন করেনি। তাই বলল, 'আমার বিশ্বাস, মানবিক গুণাবলী সম্পূর্ণ হারায়নি ওরা।'

'খুব অদ্ভুত কথা বলছেন,' ভুরু কোঁচকাল নাইজেল। 'দানবের ভিতরে এখনও মানবিক গুণ আছে?'

'আমার তা-ই ধারণা। আদিম প্রবৃত্তির পাশে সেগুলো খুব জোরালো নয়, কিন্তু আছে।'

'এ-নিয়ে কতক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলবে, জানতে পারি?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমরা এখানে কতক্ষণ বসে থাকব?'

'বেশি না, আমার কাজ প্রায় শেষ,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাইজেল। 'আসুন, যাবার আগে আপনাদেরকে ইণ্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখাই।'

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আরেকটা কামরায় ওদেরকে নিয়ে গেল সে। জায়গাটা মেডিক্যাল এগযামিনারের ল্যাবের মত করে সাজানো হয়েছে। বাতাসে জীবাণুনাশকের কড়া গন্ধ, চারপাশে নানা রকম ইকুইপমেন্ট। কামরার মাঝখানে রয়েছে অপারেটিং টেবিল, তাতে চাদর দিয়ে একটা দেহ ঢেকে রাখা হয়েছে।

নাইজেলের ইশারা পেয়ে অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার চাদরটা সরিয়ে ফেলল। দেখা গেল মুরল্যাণ্ডের হাতে মারা পড়া মিউট্যান্টের লাশ। চোখ বন্ধ থাকায় এখন আর তেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না। নাক-মুখও খিঁচিয়ে নেই হিংস্র ভঙ্গিতে। ফলে মানুষের মত একটা চেহারা দেখা যাচ্ছে।

'সুদর্শন বলব না,' বলে উঠল নাইজেল, 'তবে ফ্রেঞ্চম্যান হিসেবে চেহারা একেবারে মন্দ না।'

'অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছেন, নাকি নিশ্চিতভাবে জানতে

পেরেছেন, লোকটা ফরাসি ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মুচকি হেসে পকেট থেকে একটা গলার চেইন বের করল নাইজেল, লকেটের বদলে সেটায় একটা ধাতব পাত লাগানো। সৈনিকরা গলায় এ-ধরনের জিনিস পরে। *ডগ-ট্যাগ* বলা হয় একে। জিনিসটা রানার হাতে দিল নাইজেল। বলল, 'ওর গলায় ঝোলানো ছিল এটা। বয়সের ভারে জর্জরিত, কিন্তু লেখাগুলো পড়া যায়।'

উল্টে-পাল্টে ডগ-ট্যাগটা দেখল রানা। ওটা লেখা: *ক্যাপিটান পিয়েরে লোভাঁ, ল্য আর্মি দ্যু ল্য রিপাবলিক দ্যু ফ্রান্স। বর্ন ১৮৮৫।*

'চোরাই মাল বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল ও।

মাথা দোলাল নাইজেল। 'তেমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবতা হলো—জিনিসটা ওরই।'

অবাক চোখে ব্রিটিশ এজেন্টের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি বলতে চাইছেন, এই মিউট্যান্টের বয়স একশোর বেশি?'

'একজ্যাক্টলি বলতে গেলে... একশো পঁচিশ। আমাদের বিশ্বাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছে এই ক্যাপ্টেন।'

'কোথাও ভুল করছেন আপনারা,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'ডগ-ট্যাগের ক্যাপ্টেন যে এই লোকই, তা শিয়োর হচ্ছেন কীভাবে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বহু মানুষ যুদ্ধ করেছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু সব দেশের সেনাবাহিনীই তাদের যোদ্ধাদের চমৎকার রেকর্ড রেখেছে। কারা কবে মারা গেছে, কিংবা হারিয়ে গেছে, তার নিখুঁত নথি পাবেন সবখানে। ফ্রেঞ্চদের সবকিছুই এখন কম্পিউটারাইজড্। আমাদের স্রেফ কয়েক মিনিট লেগেছে এই ডগ-ট্যাগের তথ্য ভেরিফাই করতে। ক্যাপ্টেন পিয়েরে লোভাঁ নামে সত্যিই এক অফিসার ছিল ফরাসি সেনাবাহিনীতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হারিয়ে যায় সে।'

'তাতে কী হয়েছে? এ-ই যে সেই নিখোঁজ অফিসার, তা জানছেন কীভাবে?'

'আপনি অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ মানুষ, মি. রানা,' বাঁকা সুরে বলল নাইজেল। 'ঠিক আছে, এটা দেখুন। লোকটার পকেটে পেয়েছি। স্বীকার না করে উপায় নেই, ব্যাটা এককালে রীতিমত হ্যাণ্ডসাম ছিল।' পুরনো আমলের একটা পকেটঘড়ি রানার হাতে তুলে দিল সে।

ঘড়ির পিছনে খোদাই করে ফরাসিতে কয়েকটা শব্দ লেখা। অর্থ করলে দাঁড়ায়—*প্রিয়তম পিয়েরে-কে, ভালবাসাসহ, ক্লদেত।* ঘড়ির ডালা খুলল রানা। ভিতরে সুদর্শন এক তরুণ আর রূপবতী এক তরুণীর সাদা-কালো ছবি লাগানো হয়েছে। কালের প্রবাহে হলদে হয়ে এসেছে ছবিটা।

সঙ্গীদেরকে ডগ-ট্যাগ আর ঘড়িটা দেখতে দিল ও। জানতে চাইল, 'কী মনে হয় তোমাদের?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা দোলাল তানিয়া। 'ছবির সঙ্গে চেহারার কিছুটা মিল আছে বটে, কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো রানা। 'আর্কিয়োলজির এক প্রফেসর আমাকে বলেছিলেন, কানেক্টিকাটের গমের খেতে একটা রোমান মুদ্রা পাওয়া যাবার মানে এ-ই নয় যে, ওখানে রোমান সভ্যতার পা পড়েছিল। আধুনিক যুগের কোনও মুদ্রা-সংগ্রাহকের পকেট গলেও পড়তে পারে ওটা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অকাট্য প্রমাণ। প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক না।'

'আমার ধারণা, ডা. ক্লিফটন আপনাদেরকে কনভিন্স করতে পারবেন,' বলল নাইজেল।

অপারেটিং টেবিলের পাশে দাঁড়ানো ডাক্তার ভদ্রলোক গলা

খাঁকারি দিলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। লাশের অটোপ্‌সি করেছি আমরা, দেহের কোষগুলো বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মানুষের মত সজীব। কিন্তু ব্রেইন আর হাড়ের গঠন বলছে—এ লোকের বয়স একশোর বেশি! বিলিভ মি!'

'এর মানে বুঝতে পারছ, রানা?' উত্তেজিত গলায় বলল তানিয়া। 'মৃত্যুকে জয় করার এই গবেষণা বহুদিন আগে থেকেই চলছে। হেণ্ডারসনের টিমই এর পিছনে প্রথম কাজ করেনি।'

'আমিও তা-ই ভাবছি,' নাইজেল বলল। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুপার-সোলজার তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে একটা গুজব চালু আছে। হতে পারে সেটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই মিউট্যান্টের।'

ইশারা পেয়ে চাদর দিয়ে লাশ আবার ঢেকে দিলেন ডা. ক্লিফটন।

'বেচারা!' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল মুরল্যাণ্ড। ঘড়িতে লাগানো ক্যাপ্টেন লোভাঁর ছবি দেখছে। 'একশো বছর ধরে বেঁচে আছে... অথচ কী মূল্যহীন সে জীবন!'

'পুরো রহস্যের স্রেফ শুরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা,' নাইজেল বলল। 'কে জানে, গত এক শতাব্দীতে এই গোমরের পিছনে কত লোকের জীবন গেছে!'

'অবাক হচ্ছি না,' আসিফ বলল। 'এ-ধরনের ব্যর্থতার খবর ধামাচাপা দিতে চাইবে যে-কেউ।'

'আমি ব্যর্থতার চেয়ে সাফল্য নিয়ে বেশি চিন্তিত,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ভেবে দেখেছ, মানুষ অমরত্ব পেলে কী ধরনের সমস্যা দেখা দেবে?'

'প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে,' বলল তানিয়া। 'জনসংখ্যা আর কোনোদিন কমবে না। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে

যাবে।'

'বিশাল এক সমস্যা, তবে এ-নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য অনেক মানুষ আছেন,' বলল নাইজেল। 'আমি আপাতত ব্যর্থ গবেষণার পিছনে জড়িত ক্রিমিনালদেরকে খুঁজে বের করতে চাই। আপনারা ক'দিন থাকবেন এখানে?'

'থাকার ইচ্ছে নেই, হাতে প্রচুর কাজ,' রানা বলল। 'যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। কখন যাচ্ছি, সেটা ফাইনাল করে জানাব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ,' বলে নিজের ভিজিটিং কার্ড দিল নাইজেল। 'ফোনের অপেক্ষায় থাকব। আর ইয়ে... সবকিছু চুকে-বুকে যাবার আগে ব্যাপারটা গোপন রাখলে ভাল হয়।'

'কিছু কিছু জায়গায় দায়বদ্ধ আমি, সেখানে রিপোর্ট না দিলেই নয়,' রানা বলল। 'উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটও ওদের হারানো সাবমারসিবলের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সেটা জানতে চাইবে। তবে কথা দিচ্ছি, ব্যাপারটা যেন বেশি না ছড়ায়, সেদিকে লক্ষ রাখব আমরা।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল নাইজেল। 'দ্বীপে মেরিনরা কী পেল না পেল, সেটা জানতে পারবেন আমার কাছে। রহস্যটার জড় খুঁজে বের করার জন্য আপনাদের সাহায্য পাব বলে আশা করছি।'

'নিশ্চয়ই! নিজেদের আয়ু বাড়াবার আশায় অন্যের জীবন নিয়ে খেলছে ওরা, কিছুতেই ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'অমরত্ব...' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল নাইজেল, 'মন্দ কাজের জন্য খুবই আকর্ষণীয় একটা মোটিভ। দু-চারটে পাপ করে যদি মৃত্যুকে চিরতরে এড়ানো যায়, তাতে কে রাজি হবে না, বলুন?'

'অনেকেই হবে না,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা।

'কী বলছেন! সুযোগ পেলে অমর হতে চাইবে না, এমন কেউ দুনিয়ায় আছে নাকি?'

অপারেটিং টেবিলের দিকে তাকাল রানা। 'এ-প্রশ্নটা আপনি ওই শতবর্ষী যোদ্ধাকে করুন। জবাব পেয়ে যাবেন।'

চোদ্দ

নাইজেল ওয়াটসনের সঙ্গে ইন্টারভিউ শেষে স্থানীয় এক হোটেলে নিয়ে আসা হলো নুমা টিমের সদস্যদেরকে। ড. জয়েস কোর্ট দেশে ফিরতে উতলা হয়ে উঠেছে বলে রাতের ফ্লাইটে তাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ড. হেণ্ডারসনের টিমের বিজ্ঞানীরা অবশ্য যেতে পারলেন না, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একটা সেফহাউসে তাঁদেরকে কয়েকদিন থাকতে হবে। অমরত্বের প্রজেক্ট সম্পর্কে মনে হয় বিস্তারিত জানতে চাইবে ব্রিটিশ সরকার।

হোটেলে পৌঁছে ঢাকায় ফোন করল রানা। বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করল। নুমার সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করার জন্য রানাকে নির্দেশ দিলেন চিফ। তাই নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে এরপর ফোন করল রানা। উদ্ধার অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দিল।

'হুম!' সব শোনার পর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল।

'অমরত্বের ফর্মুলা আর মিউট্যান্ট... যা ভেবেছিলাম, তারচেয়েও দেখছি ব্যাপারটা অনেক সিরিয়াস।'

'কারা পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে, সেটা জানা গেলে একটা ব্যবস্থা নেয়া যেত,' বলল রানা।

'জানা গেছে, রানা। দ্বীপের লিজ একটা ডামি কর্পোরেশন নিয়েছিল, তবে আমরা ওটার আসল মালিকের খোঁজ বের করতে পেরেছি। তুমি চেনো কোম্পানিটাকে—স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ!'

'বুভারি পরিবার?' চমকে উঠল রানা। 'তারমানে এতদিন থেকে একই শত্রুর পিছনে ছুটছি আমরা?'

'অবস্থাদৃষ্টে তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

'এতে কোনও সন্দেহ নেই তো, অ্যাডমিরাল? মানে... ব্রিটিশরা তো অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে, কিন্তু স্পিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে কোনও কানেকশন খুঁজে পায়নি।'

'ওদের হাতে ভিনাস নেই। ডামি কর্পোরেশনের ট্রেইল তছনছ করতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা লেগেছে ল্যারি কিঙের।'

অবাক হলো না রানা। ল্যারি কিং নুমার কম্পিউটার উইযার্ড। ওর তৈরি করা সুপার-কম্পিউটার ভিনাস এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। দুনিয়ার সেরা কম্পিউটার বললে অত্যুক্তি করা হয় না। স্বাভাবিক কম্পিউটারের পক্ষে অসম্ভব, এমন যে-কোনও কাজ চোখের পলকে করে ফেলতে পারে ভিনাস।

'ব্রিটিশ সরকারকে কি বুভারি পরিবারের কথা জানানো হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'না, ওরা নিজেরাই খুঁজে বের করুক,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ঢাকঢোল পিটিয়ে এমন একটা প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। আমি চাইছি চুপচাপ একটা ব্যবস্থা নিতে।'

'কীভাবে, সার?'

'বুদ্ধিটা তোমার মাথা থেকেই আসবে বলে আশা করছি আমি। টেক ইয়োর টাইম। মুরল্যাণ্ড আছে তোমার সঙ্গে, ড. আসিফ আর ড. তানিয়াকেও চাইলে দলে রাখতে পারো। কিন্তু বুভারিদের ঠেকানোর একটা পরিকল্পনা তৈরি করা চাই।'

'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল। আমি দেখছি কী করা যায়।'

'বেস্ট অভ লাক। আর হ্যাঁ... ফ্রান্স থেকে দিদিয়ের দেশম নামে এক লোক খুব খোঁজাখুঁজি করছে তোমাকে। আমাদের এখানে ফোন করেছে বেশ কয়েকবার। চেনো ওকে?'

'জী। অ্যান্টিক ডিলার। ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারে পাওয়া হেলমেটের ব্যাপারে সাহায্য করছে আমাকে আর লুনা পারসেলকে। ঠিক আছে, আমি যোগাযোগ করব ওর সঙ্গে।'

'কী ঘটে না ঘটে, জানিয়ো আমাকে।'

'জানাব, সার।'

লাইন কেটে দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। দরজায় টোকা পড়ল। শোনা গেল মুরল্যাণ্ডের গলা।

'রানা, ডিনার করবে না? আমরা রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি।'

'যাও, আমি আসছি।'

দশ মিনিট পর একটা টেবিল দখল করে বসল নুমার চার সদস্য। অ্যাডমিরালের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, তা সবাইকে খুলে বলল রানা।

'শুনে ভারি খুশি হলাম,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'বুভারি নামের বদমাশগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আমি এক পায়ে খাড়া!'

'আমরাও তোমার সঙ্গে আছি, রানা,' বলল আসিফ।

'তোমরা কিন্তু আসল সমস্যার কথা ভুলে যাচ্ছ,' বলে উঠল তানিয়া।

'ঠিক বলেছ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ক্ষুধার চেয়ে বড় সমস্যা আর নেই। খালি পেটে সিরিয়াস আলাপ জমে? এখানকার ওয়েইটার

কোথায়?'

'ঠাট্টা-মশকরা বন্ধ করো, ববি,' বিরক্ত গলায় বলল তানিয়া। 'আমি গরগন-উইডের কথা বলছি।'

'ভুলিনি আমি,' রানা বলল। 'এখনকার পরিস্থিতি কী?'

'ড. সলোমনের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আমার। শৈবালটা আগের চেয়েও দ্রুত ছড়াচ্ছে।'

'বুভারিদের মাইনিং অপারেশন বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। এতে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তানিয়া। 'তা হলে তো ভালই হতো। কিন্তু গরগন-উইড এখন নিজেরাই বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। ওদের বিস্তার আর গোস্ট সিটির এনযাইমের উপর নির্ভরশীল নয়।'

'কতটা সময় আছে আমাদের হাতে?'

'বলা মুশকিল। সামুদ্রিক স্রোতের সঙ্গে ছড়াচ্ছে শৈবালটা। নির্দিষ্ট সময়সীমা আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তবে খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না, এটা নিশ্চিত।'

'বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'বুভারি পরিবার অমর হতে চাইছে, অথচ ওদেরই কারণে এমন এক পৃথিবীর সৃষ্টি হতে চলেছে, যেখানে অমর হয়ে কোনও লাভ নেই!'

সঙ্গীদের দিকে পালা করে তাকাল রানা। 'কীভাবে ঠেকানো যায় এই শৈবালকে, কিছু ধারণা করতে পারো?'

'গোস্ট সিটির এনযাইমে লুকিয়ে আছে গোটা মিউটেশনের চাবিকাঠি,' তানিয়া বলল। 'ওটার মলিকিউলার মেকআপ যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে একটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে আশা করি।'

'ড. হেণ্ডারসন কী যেন এক তৃতীয় ডোজের কথা বলছিল...'

'আগেই বলেছি, ওটা কী জিনিস, সে-ব্যাপারে কোনও

ধারণা নেই আমার। মরার আগে প্রলাপও বকে থাকতে পারেন।'

'তা হলে কী করতে চাও তোমরা?'

'আমার মনে হয়, ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়াই ভাল হবে,' নিজের মতামত দিল আসিফ। 'ড. সলোমনের সাহায্য নিয়ে নুমার ল্যাবে এনযাইম নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারি।'

'হুম, সেটাই বোধহয় ভাল হবে,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, কাল সকালে কোনও ফ্লাইট পাও কি না দেখো। আমি আর ববি এদিক থেকে বিকল্প প্ল্যান সাজাব।'

ওয়েইটার এসে পড়েছে। ডিনারের অর্ডার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে লবি থেকে দিদিয়ের দেশমের নাম্বারে ফোন করল রানা। দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে অ্যান্টিক ডিলারের কণ্ঠ ভেসে এল।

'দেশম বলছি।'

'মসিয়ো দেশম, আমি মাসুদ রানা।'

'মসিয়ো রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল দেশম। 'কোথায় আপনি? আমি গত ক'দিন থেকে আপনাকে খুঁজে মরছি।'

'দুঃখিত, ব্যস্ত ছিলাম। কী ব্যাপার?'

'লুনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আপনার?'

'না তো! ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি আমি, এ-মুহূর্তে স্কটল্যাণ্ডে আছি। ওর তো আপনার সঙ্গে থাকার কথা।'

'লুনা আমার এখানে নেই, মসিয়ো রানা। যে-দিন এসেছিল, সে-দিন বিকেলেই আবার ফিরে গেছে। হেলমেটের গায়ে আমরা একটা অদ্ভুত একটা সমীকরণ আবিষ্কার করেছি, ওটা সরবোনের এক বিশেষজ্ঞকে দেখাতে নিয়ে গেছে ও। আমি নিজে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়েছি। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ

নেই ওর। ইউনিভার্সিটিতে ফোন করেছিলাম, কিন্তু ওখানে যায়নি ও।'

'অসুস্থ হয়ে বাসায় পড়ে নেই তো?'

'না, মসিয়ো রানা। বাসার ফোন ধরছে না কেউ। মোবাইল ফোন বন্ধ। ওর বাড়িওয়ালির সঙ্গেও কথা বলেছি। লুনা নাকি সেদিনের পর থেকে বাসাতেই ফেরেনি।'

লুনার অমঙ্গল আশঙ্কায় রানার মনটা ছোট হয়ে গেল। বলল, 'আপনি এখুনি পুলিশে খবর দিন, মসিয়ো দেশম।'

'পুলিশ? কিন্তু...'

'জানি, আপনি পুলিশি হাঙ্গামা পছন্দ করেন না,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু এখন খবর না দিয়ে উপায় নেই। লুনার জীবন-মরণের প্রশ্ন। দরকার হলে থানায় বেনামী ফোন করুন।'

'ঠিক আছে, আমি ফোন করব,' বলল দেশম। 'লুনাকে আমি নিজের মেয়ের মত দেখি। ওর কোনও বিপদ হোক, তা চাই না। মানা করেছিলাম প্যারিসে ফিরতে, কিন্তু জেদি মেয়েটা কোনও কথাই শুনল না।'

'রিল্যাক্স, ওকে খুঁজে বের করব আমরা। আমি আগামীকালই ফিরছি ফ্রান্সে। প্যারিসে পৌঁছে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'আমি অপেক্ষা করব, মসিয়ো রানা।'

ফোন নামিয়ে রেখে রুমে ফিরে গেল রানা। সঙ্গীদের ডেকে আনল।

'কী ব্যাপার?' হাই তুলে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আচমকা আবার তলব কেন?'

দিদিয়ের দেশমের ফোনের কথা খুলে বলল রানা।

ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'ভাবছ, বুভারিরা কিডন্যাপ করেছে তোমার বান্ধবীকে?'

'নিরীহ একজন আর্কিয়োলজিস্ট, কিংবা পুরনো আমলের একটা হেলমেটের ব্যাপারে আর তো কারও আগ্রহ নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল তানিয়া। 'ওরা হেলমেট চাইছে। জিনিসটা লুনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেই চলত। ওকে কিডন্যাপ করেছে কেন?'

'বুঝতে পারছ না?' হেঁয়ালির ভঙ্গিতে বলল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সবাই। তারপর মুরল্যাণ্ডের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'টোপ... লুনা পারসেলকে টোপ বানানো হয়েছে, যাতে তুমি পা দাও ওদের ফাঁদে।'

'ঠিকই ধরেছ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওরা জানে, লুনা কিডন্যাপ হয়েছে শুনলে আমি শ্যাতো বুভারিতে হানা দেব। ওখানে আমার জন্য জামাই-আদরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'যাচ্ছিস না নিশ্চয়ই?' বলল আসিফ।

হাসল রানা। 'এত আশা করে ফাঁদ পেতেছে... ওদেরকে হতাশ করি কীভাবে?'

'কী!'

'ঠিকই শুনছিস। লুনাকে উদ্ধার করতে হবে... আর সেজন্য শ্যাতো বুভারিতে না গিয়ে উপায় নেই। ফাঁদে পা দেব আমি, তবে সেই ফাঁদ তছনছ করে বেরিয়েও আসব। তোদের সাহায্য দরকার।'

'আমাদের ওয়াশিংটনে যাবার প্ল্যান তা হলে বাতিল?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'আপাতত,' বলল রানা। 'শ্যাতো বুভারির ধারেকাছে চেহারা দেখাতে পারব না আমি। কাজেই ওখানে গিয়ে ভিতরে ঢোকার একটা পথ বের করতে হবে তোমাদের দু'জনকে।'

'আর ববি?'

'ও আমার সঙ্গে থাকবে। তোমরা যখন শ্যাতোর কাছে ঘুরঘুর করবে, আমি আর ববি তখন ফাঁদ-কাটার জোগাড়যন্ত্র করব।'

'আমার একটা কথা আছে,' স্কুলছাত্রের মত ডানহাত তুলল মুরল্যাণ্ড। 'বুভারিদের গালে জুতোর বাড়ি দেবার সুযোগ দিতে হবে আমাকে। নইলে আমি এর মধ্যে নেই।'

হেসে উঠল সবাই।

রানা বলল, 'ওই সুযোগ অনেকেই চাইবে। তোমাকে লাইন ধরতে হবে, ববি।'

'আচ্ছা বেশ, এখুনি ধরলাম।'

আরেক দফা হাসল সবাই।

'তা হলে... কখন যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'কাল সকালে,' রানা বলল। 'নাইজেলের সঙ্গে কথা বলছি এখুনি। টিকেটের ব্যবস্থা করতে বলব। তোরা বুভারি এস্টেটে যাবি, আর আমরা যাব প্যারিসে। সাবধানে থাকিস, মাদাম বুভারি আর তার ছেলে খুবই ভয়ঙ্কর মানুষ। কোন্ মতলবে ওখানে গেছিস, সেটা টের পেলে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে।'

'চিন্তা করিস না, সাবধানেই থাকব আমরা।'

'সবাই তা হলে এখন শুতে যাও, বিশ্রাম নাও ভাল করে। সামনে অনেক কাজ।'

লুনার বয়স যখন পাঁচ, তখন ওকে নটরডেমের ক্যাথেড্রালে নিয়ে গিয়েছিলেন ওর বাবা। ওখানেই জীবনের প্রথম গারগয়েল দেখে ও। পাথর কুঁদে তৈরি করা পিশাচমূর্তি দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল লুনা, ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন মি. পারসেল এ-ই বলে যে, গারগয়েল আসলে বিল্ডিঙের ছাতের কিনারায় লাগানো

নলের মুখ ছাড়া আর কিছু না। বৃষ্টি-বাদলের সময় ছাতে জমে থাকা পানি ওই নল দিয়ে বেরিয়ে আসে। ভয় কেটে গিয়েছিল, কিন্তু মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়েছে নিরন্তর—বিদঘুটে পিশাচের চেহারা না দিয়ে নলের মুখ কি সুন্দর কোনও ভাস্কর্য হতে পারত না? তাতে ক্ষতি কী ছিল?

আজ বহুদিন পর ছেলেবেলার সেই ভয়টা ফিরে এল। পিট পিট করে চোখ খুলতেই গারগয়েলের মত ভয়ঙ্কর একটা চেহারা দেখতে পেল লুনা। ওকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে ওটা।

'ওয়েলকাম ব্যাক, মাদমোয়াজেল,' খসখসে কণ্ঠ শুনতে পেল লুনা। 'আপনাকে আমরা মিস করেছি।'

ঘোর ঘোর ভাব অনুভব করছে লুনা। মাথা ঝাঁকিয়ে কাটাবার চেষ্টা করল সেটা। চিনতে পারল বিশ্রী চেহারা আর কণ্ঠের মালিককে। ভ্যাসিলি... শ্যাতোর বুভারির রক্ষী-বাহিনীর প্রধান।

'উঠুন, হাত-মুখ ধুয়ে ধাতস্থ হোন,' বলল লোকটা। 'দেরি করবেন না, আমি পনেরো মিনিট পর আসব আপনাকে নিয়ে যেতে।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ মুদল লুনা। যখন খুলল, তখন ভ্যাসিলি অদৃশ্য হয়েছে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। চারপাশে তাকাল। পরিচিত কামরা, এখানেই কস্টিউম পার্টিতে যাবার আগে পোশাক পাল্টেছিল। আচমকা বুঝতে পারল, শ্যাতো বুভারিতে ফিরে এসেছে ও। মনে পড়ে গেল জ্ঞান হারাবার আগের ঘটনা। অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিঙের সামনের সেই হাসিখুশি দম্পতি... ওরা একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল ওকে।

গোঙানির মত একটা শব্দ বেরুল লুনার কণ্ঠ দিয়ে। পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে গেছে দিবালোকের মত। ওকে কিডন্যাপ

করা হয়েছে!

বিছানা থেকে পা নামাল লুনা। মুখের ভিতর একটা তিতকুটে স্বাদ লেগে আছে, সম্ভবত শরীরে ইনজেক্ট করা কেমিক্যালের প্রতিক্রিয়া। হায় ঈশ্বর, কত সময় ধরে অজ্ঞান ছিল ও। কয়েক ঘণ্টা, নাকি কয়েক দিন? বোঝার কোনও উপায় নেই। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। সঙ্গে সঙ্গে মাতাল হয়ে উঠল দুনিয়া—মাথা ঘুরছে। টলমল পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ও, বমি করল কমোডে।

আয়নায় নিজেকে দেখল লুনা। চেহারা বদলে গেছে। মুখের রঙ ফ্যাকাসে, গর্তে বসে গেছে চোখ। হাত-মুখ ধুয়ে নেবার পর একটু ভাল বোধ করল। আঙুল দিয়ে এলোমেলো চুল আঁচড়াল, হাত দিয়ে চেপে জামা-কাপড়ের ভাঁজ সমান করল যতটা পারে। রুমে ফিরতেই দরজা খুলে গেল। ভ্যাসিলি ফিরে এসেছে। কিছু বলল না, শুধু ইশারা করল তাকে অনুসরণ করতে।

রক্ষী-বাহিনীর প্রধানের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল লুনা। সিঁড়ি আর কার্পেটে মোড়া কয়েকটা করিডোর পেরিয়ে পোর্ট্রেট গ্যালারিতে পৌঁছুল ওরা। জায়গাটা পেরুনোর সময় থিয়োডর বুভারির পেইন্টিং খুঁজল ও, কিন্তু দেখতে পেল না। পোর্ট্রেটটা নামিয়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখন সাদা দেয়াল। একটু পর মাদাম বুভারির অফিসের সামনে পৌঁছে থামল দুজনে।

লুনার দিকে ফিরে রহস্যের হাসি হাসল ভ্যাসিলি, তারপর নক করল দরজায়। ভিতর থেকে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল। দরজা খুলে লুনাকে কামরার মাঝে ঠেলে দিল ভ্যাসিলি, নিজে ঢুকল না। আস্তে করে টেনে দিল দরজা। ডেস্কের ওপাশে স্বর্ণকেশী এক মহিলাকে দেখতে পেল লুনা, মাদাম বুভারির মত বয়স্ক নয়, পাশ ফিরে জানালার দিকে মুখ করে রেখেছে। দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে সুইভেল চেয়ার ঘোরাল, মুখোমুখি হলো

বন্দিনীর।

এবার মহিলাকে ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল। বয়স টেনেটুনে চল্লিশ হতে পারে, মাখনের মত কোমল চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে কি পড়েনি। বেশ সুন্দরী, চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের গভীর। চেহারাটা কেন যেন চেনা চেনা ঠেকছে।

'শুভ অপরাহ্ন, মাদমোয়াজেল পারসেল!' ভরাট কণ্ঠে সম্ভাষণ জানাল মহিলা। 'আবার আপনার দেখা পেয়ে ভাল লাগছে। সেদিন এত তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন, ঠিকমত বিদায় দিতে পারিনি।'

থতমত খেয়ে গেল লুনা। দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হয়েছে কি না বুঝতে পারছে না।

'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।' চেয়ার দেখিয়ে বলল মহিলা।

রোবটের মত আদেশটা পালন করল লুনা। মাথা কাজ করছে না।

মুচকি হাসল মহিলা। 'কী ব্যাপার? আপনাকে কেমন যেন হতবাক দেখাচ্ছে।'

আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই লুনার। সামনে বসা মহিলার কণ্ঠ পরিষ্কার চিনতে পারছে ও—মাদাম বুভারির! বার্ধক্যজনিত বৈশিষ্ট্যগুলো নেই বটে, কিন্তু কণ্ঠটা যে তারই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা খেলছে ওর মাথায়। কে এই মহিলা? আইরিন বুভারির মেয়ে? নাকি ভেন্ট্রিলোকুইজমের জাদু দেখানো হচ্ছে ওকে?

'কী হলো? অমন চুপ মেরে গেলেন কেন?' বলল মহিলা।

গলা খাঁকারি দিল লুনা। জানতে চাইল, 'আমাকে কি সম্মোহন করা হয়েছে?'

'মোটেই না,' হাসল মহিলা। 'যা দেখছেন, তার পুরোটাই বাস্তব।'

অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে গেল লুনার। 'আ... আপনি মাদাম বুভারি?'

'এক এবং অদ্বিতীয়, মাই ডিয়ার,' দম্ভ ফুটল মাদাম বুভারির কণ্ঠে। 'পার্থক্য শুধু এই যে, নবযৌবন ফিরে পেয়েছি আমি।'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল লুনার। 'আপনার প্লাস্টিক সার্জনের নামটা জানা যাবে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে এল মাদাম বুভারি, ওর পাশে এসে দাঁড়াল, ঝুঁকল একটু লুনার হাত তুলে নিজের গালে ঠেকাল সে। 'এবার বলুন, কোনও সার্জনের পক্ষে এমন নিখুঁত কাজ সম্ভব কি না।'

হাতের তালুতে মোলায়েম ত্বকের স্পর্শ পাচ্ছে লুনা। তাতে এক বিন্দু কৃত্রিমতা নেই। না, দুনিয়ার কোনও শল্য চিকিৎসক এমন ত্বক সৃষ্টি করতে পারবে না।

'অবিশ্বাস্য!' মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল লুনার।

সোজা হলো মাদাম বুভারি, বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরে গেল নিজের চেয়ারে। টেবিলের উপর মেলে ধরল দু'হাত। লুনা লক্ষ করল, মুখের মত হাতের আঙুলগুলোও যৌবন ফিরে পেয়েছে। সামান্যতম ভাঁজ নেই চামড়ায়। মুখে কোনও কথা ফুটল না ওর।

'ভয়ের কিছু নেই,' হেসে বলল মাদাম বুভারি। 'আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন না। বাইরেটা শুধু বদলেছে, ভিতরে আমি আগের মানুষই আছি, ঠিক যেমন আপনি আর মসিয়ো মাসুদ রানা দেখেছিলেন। ভাল কথা, উনি কেমন আছেন?'

'জানি না,' বলল লুনা। 'রানার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি সেদিনের পর থেকে।' একটু ইতস্তত করল ও। 'কীভাবে?'

'কীভাবে আমি থুত্থুরে বুড়ি থেকে জোয়ান হয়ে উঠলাম?' চেয়ারে হেলান দিল মাদাম বুভারি। 'লম্বা এক কাহিনি সেটা।

তবে আমাদের পারিবারিক হেলমেট নিয়ে থিয়োডর যদি পালিয়ে না যেত, তা হলে এই কাহিনি অনেক সংক্ষিপ্ত হতে পারত। ওর কারণে একশো বছর পিছিয়ে গেছি আমরা, অলরেডি সফল হওয়া একটা গবেষণার পিছনে শত শত কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়েছে।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

লুনার চোখে চোখ রাখল মাদাম বুভারি। 'আপনি তো পুরনো অস্ত্র-শস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ। থিয়োডরের হেলমেট সম্পর্কে কী জানতে পেরেছেন?'

'জিনিসটা খুবই পুরনো,' বলল লুনা। 'বয়স পাঁচশো বছর, কিংবা তারও বেশি। ধাতু অত্যন্ত উন্নত মানের, সম্ভবত কোনও উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া গেছে ওটা।'

হাততালি দিল মাদাম বুভারি। 'চমৎকার। একেবারে ঠিক আন্দাজ করেছেন। বহুকাল আগে এক উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া গিয়েছিল ওই মেটাল। সেটার সাহায্যে আমাদের এক পূর্বপুরুষ ওই হেলমেট তৈরি করেন। প্রাচীনকালের বহু যুদ্ধে বহু বুভারির প্রাণ বাঁচিয়েছে ওটা। পরিবারের ঐতিহ্য হিসেবে প্রতি প্রজন্মের প্রধান বুভারির হাতে তুলে দেয়া হতো এই হেলমেট। সে-হিসেবে জিনিসটার সত্যিকার মালিক আমি; আমার ভাই থিয়োডর নয়। ওটা চুরি করেছিল ও।'

এক মুহূর্ত লাগল লুনার কথাটা বুঝতে। তারপরই ভুরু কুঁচকে ও বলল, 'আপনার ভাই মানে?'

'ঠিক শুনছেন। থিয়োডর আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ছিল।'

থমকে গেল লুনা। বলে কী এই মহিলা? 'আ... আপনি থিয়োডরের বোন? তবে যে শুনেছিলাম, আপনি থিয়োডরের বোনের নাতনি?'

'দুনিয়ার চোখে ধুলো দেয়ার জন্য সামান্য মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছি। সত্যিকার পরিচয় জানলে লোকে আমার ব্যাপারে অতি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠত।'

হিসেব করার চেষ্টা করল লুনা। কিন্তু তালগোল পাকিয়ে গেল সব। অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো আপনার বয়স...'

'সম্ভ্রান্ত কোনও ভদ্রমহিলাকে বয়স জিজ্ঞেস করতে হয় না,' শান্ত সুরে বলল মাদাম বুভারি। 'ওটা অভদ্রতা। তবে এটুকু জানিয়ে রাখি—একশো বছরের সীমা বহুদিন আগে পার করেছি আমি।'

মাথা নাড়ল লুনা। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনার অবিশ্বাস দেখে দুঃখ পাচ্ছি,' বলল মাদাম বুভারি, তবে সেটা শুধুই কথার কথা, খুশি হয়েছে আসলে। 'বিস্তারিত জানতে চান?'

কৌতূহল আর ভয়ের টানাপড়েন শুরু হলো লুনার ভিতর। বলল, 'আপনাদের সম্পর্কে বেশি জানলে কী হয়, সেটা লর্ড ওয়ালটনের বেলায় দেখেছি আমি।'

'হাহ্, ওয়ালটন ছিল একটা মদ্যপ বাচাল। ওকে দুনিয়া থেকে সরানো খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আপনাকে এখুনি পরপারে পাঠানোর ইচ্ছে নেই আমার! তাতে নিজেরই ক্ষতি। মরা টোপের চেয়ে জ্যান্ত টোপ অনেক বেশি কাজ দেয়, তা জানেন তো?'

'টোপ! কীসের জন্য?'

'কীসের নয়, বলুন কার জন্য।' শয়তানি হাসি ফুটল মাদাম বুভারির ঠোঁটে। 'মাসুদ রানা! আর কে?'

পনেরো

গনগনে উত্তাপে ভরা মরুভূমির মাঝে মরুদ্যান দেখতে পেলে যে-ধরনের অনুভূতি হয়, রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ দেখতে পেয়ে ঠিক একই অনুভূতি সৃষ্টি হলো আসিফ আর তানিয়ার মধ্যে। সারাদিন রাস্তায় কেটেছে ওদের, খাওয়াদাওয়ার সুযোগ মেলেনি, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। রেস্তোরাঁ দেখেই গাড়ি থামাল ওরা। ঢুকে পড়ল ওখানে।

জায়গাটা আহামরি কিছু নয়। পুরনো এক ফার্মহাউস সংস্কার করে রেস্তোরাঁ বানানো হয়েছে। আশপাশে এখনও রয়ে গেছে ফসলের খেত। একেবারে গ্রামীণ পরিবেশ। তবে ওখানে ঢোকায় নানা দিক থেকে লাভবান হলো ওরা। রান্না চমৎকার, সুস্বাদু খাবারে পেট ভরাতে পারল; একই সঙ্গে আবিষ্কার করল, রেস্তোরাঁর তরুণ মালিক এই এলাকার খবরের ভাণ্ডার।

ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে অর্ডার দিতে শুরু করেছিল আসিফ, কিন্তু তরুণ জানাল—সে ইংরেজি জানে। তার নাম ফ্যেনুয়্যা, নিউ ইয়র্কের এক রেস্টুরেন্টে বেশ কিছুদিন বাবুর্চি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু আমেরিকার জীবন ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে ওঠায় দেশে ফিরে এসেছে, এখানে ছোট রেস্তোরাঁ খুলে ব্যবসা করছে।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল আসিফ। 'আমি আসিফ রেজা। ইনি আমার স্ত্রী... তানিয়া।'

'ইণ্ডিয়ান?' জিজ্ঞেস করল ফ্যেনুয়্যা।

'না, বাংলাদেশি। তবে এখন আমরা আমেরিকায় সেটেলড্।'

মুগ্ধ চোখে তানিয়াকে দেখল ফরাসি তরুণ। প্রশংসার সুরে বলল, 'আপনি অত্যন্ত সুন্দরী, মাদমোয়াজেল। এমন স্ত্রী পেয়েছেন, সেটা আপনারও সৌভাগ্য, মসিয়ো রেজা।'

'ধন্যবাদ,' বলে একহাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল আসিফ। ফ্যেনুয়্যাকে বুঝিয়ে দিল, আমার বউয়ের দিকে আর নজর দিয়ো না, বাছা। 'এখন কি অর্ডার দিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' তাড়াতাড়ি বলল ফ্যেনুয়্যা। ইশারা বুঝতে পেরেছে। মেন্যু বাড়িয়ে দিল খদ্দেরের দিকে।

অর্ডার দিল আসিফ-তানিয়া। খানিক পর খাবারের ট্রে নিয়ে হাজির হলো ফ্যেনুয়া। রেস্তোরাঁয় আর কোনও কর্মচারী নেই। সে নিজেই বাবুর্চি, ওয়েইটার, মালিক ও ম্যানেজার। আর কোনও কাস্টোমার নেই এ-মুহূর্তে, খাতিরযত্নের চূড়ান্ত করল। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, 'আপনারা কি বেড়াতে এসেছেন? নাকি কাজে?'

'দুটোই,' তানিয়া বলল।

'ওয়াশিংটনে আমাদের কয়েকটা ওয়াইন শপ আছে,' ব্যাখ্যা করল আসিফ। গল্পটা আগে থেকেই সাজিয়ে নিয়েছে ওরা। ভুয়া একটা ভিজিটিং কার্ড দিল ফ্যেনুয়্যাকে। 'তাই যেখানেই যাই, চোখ-কান খোলা রাখি। আঙুরের খামার দেখলেই ওখানকার মদ কেমন, সেটা পরীক্ষা করি। ভাল লাগলে দোকানের জন্য কিনি।'

'একেবারে ঠিক জায়গায় এসেছেন, মসিয়ো,' বলল ফ্যেনুয়্যা। 'এখানকার স্থানীয় মদের তুলনা হয় না। ট্রাই করে দেখবেন? পছন্দ হলে খামারের মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আপনাদের।'

'নিশ্চয়ই, নিয়ে আসুন।'

দুটো গ্লাসে মদ পরিবেশন করল ফ্যেনুয়্যা। ছোট এক চুমুক দিয়ে তানিয়া বলল, 'বেশ কড়া! র‍্যাসবেরির ফ্লেভার আছে মনে হচ্ছে।'

আসিফও চুমুক দিল। 'হুম। ঝাঁঝালো একটা ভাব আছে, সেটাও পছন্দ হয়েছে আমার। সম্ভবত একটু মরিচের গুঁড়ো মেশানো হয়েছে।'

ড্রিঙ্ক করার অভ্যেস নেই রেজা দম্পতির। কিন্তু ওয়াইন-এক্সপার্টদের কথা বলার ভঙ্গি শিখে এসেছে ওরা রানার কাছে। সে-অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলো ফ্যেনুয়্যা। বলল, 'আপনারা সত্যিই মদ চেনেন!'

'ধন্যবাদ,' বলল তানিয়া। 'আর কোনও খামারের মদ আছে?'

'আছে মানে?' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল ফ্যেনুয়্যা। 'আমাদের এলাকা তো আঙুর চাষের জন্যই বিখ্যাত। অনেক আঙুর-খামার আছে আশপাশে। সবাই মদ তৈরি করে।'

'আমরা একটার নাম শুনে এসেছি, কী যেন ওটা... বিভারি?'

'বিভারি না, বুভারি,' শুধরে দিল ফ্যেনুয়্যা।

'ও হ্যাঁ, বুভারিই তো।'

'আপনার এখানে ওদের মদ আছে?' জিজ্ঞেস করল আসিফ।

'জী না, মসিয়ো রেজা,' মাথা নাড়ল ফরাসি তরুণ। 'রাখতে পারলে ভাল হতো, জিনিসটা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। বুভারিরা খুব অল্প পরিমাণে বানায়, সেটা যায় ইয়োরোপ-আমেরিকার ধনী লোকজনের কাছে। এখানে যদি রাখতেও পারি, বিক্রি করতে পারব না। একেক বোতলের দাম হাজার ডলারের বেশি!'

'তাই নাকি?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল তানিয়া। 'বুভারি এস্টেটে যেতে হয় তা হলে। কী এমন আঙুর ওরা চাষ করছে, তা দেখে

আসা দরকার।'

মুখ বাঁকা করল ফ্যেনুয়্যা। 'চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে খুব একটা সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। বুভারিরা একটু অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ।'

'মানে?'

'একেবারেই মিশুক না, দেখা দেয় না কাউকে।' ইতস্তত করল ফ্যেনুয়্যা। 'ইয়ে... পরিবারটা অনেক পুরনো। নানা রকম কেচ্ছা-কাহিনি চালু আছে ওদের সম্পর্কে।'

'কী ধরনের কেচ্ছা-কাহিনি?'

'গুজব বলে মনে হবে আপনাদের কাছে। এলাকার লোকজন বড্ড কুসংস্কারাচ্ছন্ন কি না! ওদের বিশ্বাস, বুভারিরা মানুষের রক্ত চুষে খায়।'

ভুরু কোঁচকাল আসিফ। 'ভ্যাম্পায়ার বলতে চাইছেন?'

হাসল ফ্যেনুয়্যা। 'বলেছি তো, কেচ্ছা-কাহিনি। কখনও ওদের চেহারা দেখে না লোকে, তাই নানা রকম গুজব ছড়াতে শুরু করেছে। একটা ব্যাপার অনস্বীকার্য, ওদের মধ্যে কোনও না কোনও রহস্য আছে। আমরা এমনিতে বেশ মিশুক, অতিথিপরায়ণ। বুভারিরা ঠিক তার উল্টোটা। ওদের কারণে লোকে ভুল বোঝে আমাদেরকে।'

'খামোকা ভয় পাচ্ছেন,' বলল তানিয়া। 'এমন খাতিরযত্ন পাবার পর ভুল বোঝার কোনও অবকাশ নেই।'

হাসল ফ্যেনুয়্যা। এক টুকরো কাগজ এনে বুভারি এস্টেটে যাবার পথনির্দেশ লিখে দিল। বলল, 'আঙুর খেতের কাছে যেতে পারবেন, কিন্তু ওদের শ্যাতোর দিকে ভুলেও তাকাবেন না। *নো ট্রেসপাসিং*-এর সাইনবোর্ড দেখলেই উল্টো ঘুরবেন, ঠিক আছে? পাইভেসির ব্যাপারে ওরা খুবই সিরিয়াস।'

রেস্তোরাঁ মালিককে বিল মিটিয়ে দিল ওরা। তারপর বেরিয়ে

এল। গাড়িতে উঠে হেসে ফেলল তানিয়া। স্বামীকে বলল, 'ভাল অভিনয় করেছ। বেচারা ফ্যেনুয়্যা বুঝতে পারেনি, ওয়াইনের কিছুই জানি না আমরা।'

'বোঝাবুঝির সময় কোথায়?' ইগনিশনের চাবি ঘুরিয়ে বলল আসিফ। 'ও তো হাঁ করে তোমাকে দেখছিল সারাক্ষণ।'

'তোমার হিংসে হচ্ছে?'

'উঁহুঁ,' হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করল আসিফ। 'হিংসা তো করবে ও... তোমাকে আমার পাশে দেখে।'

স্বামীর হাতে চিমটি কাটল তানিয়া। তারপর ড্যাশবোর্ডের উপর থেকে ম্যাপ নিয়ে কোলের উপর বিছাল। ফ্যেনুয়্যার কাছ থেকে পাওয়া পথনির্দেশ মেলাল। বলল, 'দশ মাইল সামনে একটা মোড় পড়বে। ওটা ধরে যাওয়া যাবে শ্যাতো বুভারিতে।'

'ফ্যেনুয়্যা যেভাবে বলল, তাতে তো নাম পাল্টে ক্যাসল ড্রাকুলা ডাকতে হবে,' ঠাট্টা করল আসিফ।

'ভুল,' দ্বিমত পোষণ করল তানিয়া। 'রানার গল্প যদি সত্যি হয়, তা হলে মাদাম বুভারির সামনে কাউন্ট ড্রাকুলা কোনও পাত্তাই পাবে না।'

বিশ মিনিট পর মোড়ের সামনে পৌঁছুল ওরা। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে কাঁচা রাস্তায় নামল আসিফ। দু'পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়সারি, তার গায়ে রয়েছে আঙুরের খেত। চেহারা দেখে বোঝা গেল, নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। আশপাশে কোথাও খামারের নাম লেখা নেই, সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় বলেই। বুভারিদের এক টুকরো জমিও কেউ ভুল করে নিজের ভাববে না।

একটু পর খেত-খামার পেরিয়ে গাছপালায় ছাওয়া অংশে পৌঁছে গেল গাড়ি। গাছের গায়ে ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি আর স্প্যানিশে লেখা সতর্কবাণী চোখে পড়ল। পাত্তা দিল না আসিফ, এগিয়ে চলল। কয়েক মিনিট পর অবশ্য না থেমে উপায় রইল না,

সামনে চেইন-লিঙ্কের বেড়া। গেট আছে, তার গায়ে লাল হরফে সতর্কবাণী—বেড়াটা বিদ্যুতায়িত। ওপাশটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিনা অনুমতিতে ঢোকার চেষ্টা করলে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং আহত হতে হবে।

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল আসিফ। 'ফ্যেনুয়্যা ভুল বলেনি। প্রাইভেসির ব্যাপারে ওরা সত্যিই সিরিয়াস। অতিথি পছন্দ করে না।'

'তা হলে অভ্যর্থনা জানাতে আসছে কেন?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'অভ্যর্থনা!'

'রিয়ারভিউ মিররে দেখো।'

গাছপালার আড়াল থেকে একটা কালো রঙের এস.ইউ.ভি. বেরিয়ে এসেছে। রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে থামল, যাতে আসিফদের পথ আটকে যায়। দু'জন মানুষ নেমে এল ওটা থেকে। একজনের হাতে রাইফেল, অন্যজন একটা হিংস্র লাইওয়েইলার কুকুরের শেকল ধরে রেখেছে। সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে এল। থামল আসিফদের গাড়ির দু'পাশে এসে।

ভাল করে দুই রক্ষীকে দেখল আসিফ। একজন গাঁট্টাগোট্টা, অন্যজন বেশ লম্বা। মাথা-কামানো। হাবভাবে নেতা বলে মনে হচ্ছে। কুকুরের শেকল হাতে, কিন্তু কোমরের হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে চকচকে একটা পিস্তল।

'বেরিয়ে আসুন,' ধমকের সুরে বলল লোকটা।

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামল রেজা দম্পতি। দক্ষ হাতে ওদেরকে সার্চ করল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। বলা বাহুল্য, কিছু পেল না।

'আপনাদের পরিচয়?' জানতে চাইল নেতা।

'আসিফ এবং তানিয়া রেজা,' বলল আসিফ। 'ওয়াইন

মার্চেন্ট।'

'এখানে কী চাই?'

কাছের একটা আঙুর খামারের নাম বলল আসিফ। ওখানে যেতে চায়।

'ভুল পথে এসেছেন,' বলল নেতা। 'এটা বুভারি এস্টেট। মেইন রোড ধরে আরও দু'মাইল গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতে হবে আপনাদেরকে।'

'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না!' মুখ ঝামটা দিল তানিয়া। 'কত করে বললাম, ভালমত রাস্তাঘাট চিনে নাও। এখন শিক্ষা হলো তো?'

মুখ কাঁচুমাঁচু হয়ে গেল আসিফের। সেটা দেখে হেসে উঠল দুই রক্ষী। টাকমাথা লোকটা বলল, 'ইটস্ ওকে, ম্যা'ম। ভুলত্রুটি হতেই পারে। রেহাই দিন বেচারাকে।'

'সো নাইস অভ ইউ,' ভুবনমোহিনী হাসি দিয়ে বলল তানিয়া। 'আপনাদের এখানেও তো আঙুরের খেত আছে। আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারি?'

'ঠিক আছে, দেখুন। কিন্তু বেড়া থেকে দূরে থাকবেন।'

'ধন্যবাদ... অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।' আসিফের দিকে ফিরল তানিয়া। 'কী হলো, দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো!'

গাড়িতে উঠে বসল স্বামী-স্ত্রী। এস.ইউ.ভি. সরিয়ে নেয়া হলো, উল্টো ঘুরে চলতে শুরু করল আসিফের গাড়ি। রিয়ারভিউ মিররে টাকমাথা লোকটাকে শেষবারের মত দেখে নিল তানিয়া। বলল, 'ও-ই সম্ভবত রানার *দোস্ত* ভ্যাসিলি। চেহারার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।'

আসিফ কিছু বলল না। মুখ গোমড়া করে রেখেছে।

তানিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার... কথা বলছ না কেন? বকা দিয়েছি বলে রাগ করেছ? আরে... ওটা তো অভিনয় ছিল!'

'সেজন্য কিছু মনে করিনি,' বলল আসিফ। 'কিন্তু বার বার তুমি মেয়েলি আকর্ষণ খাটিয়ে কাজ উদ্ধার করছ, সেটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। প্রথমে ফ্যেনুয়্যা... এখন আবার ভ্যাসিলি?'

'সমস্যা কোথায়?'

'কামনার দৃষ্টি লক্ষ করেছি আমি ওদের চোখে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।'

'ধ্যাৎ! খামোকাই চিন্তা করছ। চারদিকে মনোযোগ দাও। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এখানে। ওদের সিকিউরিটি ভেদ করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে তার আগেই।'

আঙুর খেতের মাঝে ভাঙাচোরা একটা পথ দেখতে পেয়ে সেখানে গাড়ি ঢোকাল আসিফ। কিছুদূর এগোলে একদল শ্রমিকের দেখা পাওয়া গেল। আঙুর তুলছে। সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে তাদের শ্বেতাঙ্গ সুপারভাইজর। গাড়ি থামিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল রেজা দম্পতি।

'কে আপনারা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সুপারভাইজর।

মদ-ব্যবসায়ীর পরিচয়টা আরেকবার দিল আসিফ। জানাল, ভ্যাসিলির অনুমতি নিয়ে খেত দেখতে এসেছে।

'বেশ, দেখুন যত খুশি,' নিস্পৃহ গলায় বলল সুপারভাইজর।

'ইয়ে... মসিয়ো...'

'মারচান্দ। গাই মারচান্দ।' নিজের নাম বলল সুপারভাইজর।

'হ্যাঁ, মসিয়ো মারচান্দ... আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'কী কথা?'

'না, মানে... খামার সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম। সময় দিতে পারবেন?'

'সময় দিতে পারব না, কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে এখানেই

করুন। এই কালো লেবারগুলো হচ্ছে বদের হাড্ডি, সুযোগ পেলেই কাজে ফাঁকি দেয়।'

'ওটা একটা প্রশ্ন। সব লেবার কালো কেন?'

'অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট,' বলল মারচান্দ। 'সেনেগাল থেকে এসেছে। দু'বেলার খাবার, আর রাতে শোয়ার জায়গা পেলেই খুশি। বুঝতেই পারছেন! এরা থাকতে স্থানীয় লেবার নেবে কেন কেউ?'

'হুম,' মাথা দোলাল তানিয়া। 'আসার পথে একটা রেস্তোরাঁয় থেমেছিলাম। আপনাদের মদের খুব প্রশংসা শুনলাম। একেবারে নাকি ফার্স্ট ক্লাস?'

'ঠিকই শুনেছেন,' হাসি ফুটল সুপারভাইজরের ঠোঁটে। তোয়াজ পেয়ে খুশি হয়েছে। 'আমাদের আঙুর দেখতে চান? আসুন।'

আঙুরলতার কাছে গিয়ে লেকচার ঝাড়তে শুরু করল সে। এখানকার মাটি, পানি আর আবহাওয়া যে আঙুর উৎপাদনের জন্য কত ভাল—তা বোঝাল দুই অতিথিকে। লতা থেকে আঙুর ছিঁড়ে খেতে দিল। ফলগুলো পুরুষ্ট, রসে ভরা। অত্যন্ত মিষ্টি। স্বীকার করতে বাধ্য হলো আসিফ-তানিয়া—এমন চমৎকার আঙুর খুব কম দেখেছে ওরা।

মারচান্দকে অনুসরণ করল ওরা। খেত থেকে আঙুর তুলে কীভাবে ট্রাকে তোলা হয়, তা দেখল।

'মদ তৈরি হয় কোথায়?' জানতে চাইল আসিফ।

'এস্টেটে,' জবাব দিল মারচান্দ। 'মসিয়ো ফিলিপ নিজে সব তদারক করেন।'

'মসিয়ো ফিলিপ আবার কে?'

'ফিলিপ বুভারি... এই খামারের মালিক।'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'না। কারও সঙ্গে দেখা করেন না উনি।'

'আপনারা কখনও দেখেন না ওঁকে?'

'দেখি তো!' উপর দিকে আঙুল তুলল মারচান্দ। 'আকাশে!'

'ঠিক বুঝলাম না কথাটা।'

'নিজের বিমান নিয়ে খামারের উপর উড়ে বেড়ান মসিয়ো ফিলিপ।'

সুপারভাইজরের কথা থেকে জানা গেল, বিমান নিয়ে খেতে কীটনাশক ছড়াবার কাজ ফিলিপ নিজেই করে। একবার শ্রমিকদের উপর বিষ ছিটিয়ে দিয়েছিল। একজন মারা যায় তাতে, বাকিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবৈধ অভিবাসী হওয়ায় পুলিশের কাছে যেতে পারেনি ওরা, কিন্তু মারচান্দ প্রতিবাদ জানিয়েছিল এ-ঘটনার। সবাইকে মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। এস্টেট থেকে জানানো হয়েছে, ওটা স্রেফ দুর্ঘটনা, কিন্তু সুপারভাইজরের স্থির বিশ্বাস—ইচ্ছে করেই ওদের উপর কীটনাশক ছড়িয়েছিল ফিলিপ।

আলাপচারিতার ফাঁকে আঙুর-বোঝাই ট্রাক স্টার্ট হতে দেখল আসিফ। ধীর গতিতে এগোল ওটা, খেত থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল, একটু পর থামল বেড়ার সামনে গিয়ে। দু'জন গার্ড বেরিয়ে এসে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলল, তারপর খুলে দিল গেট। এস্টেটের ভিতরে ঢুকে পড়ল ট্রাক; পিছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল ফটক।

স্ত্রী-র কাঁধে টোকা দিল আসিফ। 'চলো, ফেরার সময় হয়েছে।'

বিদায় নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল ওরা। খামার থেকে বেরিয়ে এল।

'সুপারভাইজরের সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানা গেল,'

বলল তানিয়া। 'রানা বাড়িয়ে বলেনি, বুভারিরা সত্যিই ডেঞ্জারাস পরিবার।' স্বামী গম্ভীর হয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। 'শ্রমিকদের উপর কীটনাশক ছড়ানোর কথা ভাবছি। মারচান্দের সঙ্গে আমি একমত। অ্যাকসিডেন্ট না, ইচ্ছে করে ছড়িয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভ্যাস আছে ওদের, একবিন্দু মূল্য দেয় না কাউকে। ড. হেণ্ডারসন ছাড়াও আরও অনেক বিজ্ঞানীকে খুন করেছে, বেচারা লর্ড ওয়ালটনকেও কী ভয়ানক শাস্তিই না দিয়েছে!'

মাথা ঝাঁকাল তানিয়া। 'মিউট্যান্টদের কথাও ভুলতে পারছি না আমি। বেঁচেও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে ওরা। বুভারিদেরকে পিশাচ বললেও কম বলা হয়।'

স্টিয়ারিঙের উপর কিল বসাল আসিফ। 'ওদের শাস্তি হওয়া দরকার!'

'শান্ত হও,' স্বামীর কাঁধে হাত রাখল তানিয়া। 'শাস্তি অবশ্যই হবে ওদের। কিন্তু সেজন্য রানা আর ববিকে ঢুকতে হবে ওদের প্রাসাদে। কী করা যায়, ভেবেছ কিছু? আমি কিন্তু বেড়া টপকানোর কোনও উপায় দেখছি না।'

'কে বলেছে উপায় নেই?' হাসল আসিফ। 'উপায় পেয়ে গেছি, ডার্লিং। রানা আর ববিকে এবার খবর দিতে হয়!'

কয়েক ঘণ্টা পর পৌঁছে গেল রানা আর ববি। স্থানীয় এক সরাইখানায় ওদের জন্য অপেক্ষা করছে আসিফ-তানিয়া। রাতের খাওয়া সেরে মিটিঙে বসল ওরা।

'বল্ তোর প্ল্যান,' আসিফকে বলল রানা। 'কীভাবে ঢোকা যাবে শ্যাতোয়?'

ব্যাখ্যা করল আসিফ, বেশি সময় লাগল না।

শুনে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হুঁ, মন্দ না।'

'মন্দ না মানে?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'খুবই বাজে প্ল্যান। আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'বিকল্প কোনও আইডিয়া আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'না... মানে... একটু চিন্তাভাবনা করলে...'

'চিন্তাভাবনার সময় নেই,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'এদিকটা সামলাবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম ওদেরকে। ধরে নিতে হবে, এরচেয়ে ভাল আর কোনও রাস্তা নেই। ফ্রেঞ্চ অথরিটিকে একটা টাইমটেবিল দিয়ে এসেছি আমরা, সেটা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই?'

'কীসের কথা বলছিস?' জিজ্ঞেস করল আসিফ। 'প্যারিসে কী করে এসেছিস তোরা?'

'মিটিং,' বলল রানা। 'ফ্রেঞ্চ অথরিটিকে কনভিন্স করার চেষ্টা করেছি বুভারিদের গ্রেফতার করতে।'

'রাজি হয়েছে ওরা?'

'উঁহুঁ। সরাসরি কোনও পদক্ষেপ নেবে না ওরা। শেষ পর্যন্ত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দিয়ে ফোন করাতে হয়েছে। চাপাচাপির মুখে বিকল্প এক প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ওরা।'

'কী রকম?'

'বুভারি এস্টেটে ঢোকার জন্য অজুহাত তৈরি করে দিতে হবে। আমি আর ববি গিয়ে একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি করব। এই ধরো... আগুন, বা এই জাতীয় কিছু। সাহায্য করার জন্য ভিতরে ঢুকবে ফায়ার ব্রিগেড আর পুলিশ। এর মধ্যে লুনাকে উদ্ধার করব আমরা, পুলিশ পৌঁছালে কিডন্যাপিঙের অভিযোগ আনবে ওরা। ফলে অ্যারেস্ট করা হবে মাদাম বুভারি আর তার সুপুত্রকে।'

'তাতে লাভ হবে? কতক্ষণই বা আর ওদেরকে আটকে

রাখতে পারবে পুলিশ? উল্টো আগুন লাগানোর জন্য তোদেরকেই তো ফাঁসিয়ে দিতে পারে!'

'জানি, প্ল্যানটা সুবিধের নয়,' স্বীকার করল রানা। 'তবে এ-ছাড়া আপাতত আর কোনও এক্সিট-স্ট্র্যাটেজি নেই। পুলিশ আমাদেরকে অ্যারেস্ট করলেই বা কী? জান নিয়ে তো বেরুতে পারব শ্যাতো থেকে। ওদেরকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল সন্ধ্যা থেকে মাঝরাতের মধ্যে বুভারি এস্টেটে দুর্ঘটনা ঘটবে।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমাদের প্ল্যানে একটা গোলমাল দেখা দেবে,' শঙ্কা প্রকাশ করল তানিয়া।

'মনে হওয়ার কিছু নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'গোলমাল বাধবেই... আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। আমার আর রানার জন্য ওটা এক ধরনের নিয়তি বলতে পারো।'

'তবু যাবে ওখানে?' অবাক হলো তানিয়া। 'বিপদ হবে জেনেও?'

'অবশ্যই,' দাঁত বের করে হাসল মুরল্যাণ্ড। 'বিপদ আমাদেরকে চুম্বকের মত টানে।' রানার দিকে তাকাল। 'কী বলো, দোস্ত?'

'একদম খাঁটি কথা,' সায় দিল রানা।

ষোলো

সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর বিকেল পাঁচটায় আঙুর খেতের

শ্রমিকরা কাজ শেষ করল। পরদিন ভোরে আবার ফিরবে। ক্লান্ত পায়ে ওরা যখন নিজেদের আবাসস্থলে ফিরছে, তখন পিছনে আঙুর বোঝাই পাঁচটা ট্রাক ছুটল বুভারি এস্টেটের দিকে। গেটের সামনে পৌঁছে থামল ওগুলো, দাড়িঅলা এক গার্ড এসে ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলল, তারপর খুলে দিল পাল্লা বেড়া অতিক্রম করে আবার এগোল ট্রাকগুলো। বড় একটা শেডের দিকে যাচ্ছে, ওখানে আঙুর আনলোড করা হবে।

শেডে ঢোকার আগে গতি কমাল ট্রাকের বহর, সঙ্গে সঙ্গে শেষের ট্রাকের পিছন থেকে লাফ দিয়ে নামল দুটো ছায়ামূর্তি। একছুটে ঢুকে পড়ল গাছপালার সারির ভিতর। আঁধার নেমে আসায় কেউ দেখতে পায়নি ওদের, আড়ালে পৌঁছে থামল দু'জনে। জামাকাপড় থেকে মাটি ঝাড়তে শুরু করল, মুখ আর হাত থেকে মুছতে চেষ্টা করল আঙুরের রস। তাতে অবশ্য বিশেষ লাভ হলো না। বেগুনি রঙে মাখামাখি হয়ে থাকল চেহারা আর পোশাক।

থুঃ করে মুখ থেকে একদলা মাটি ফেলল ববি মুরল্যাণ্ড। সখেদে বলল, 'এই শেষবার আমি ওই জামাই-বউয়ের প্ল্যান ফলো করছি। অবস্থা দেখেছ? বেগুনি চামড়ার ভিনগ্রহবাসীর মত লাগছে আমাদেরকে!'

মাথার চুল থেকে পাতা আর ডাল বের করছে রানা। বলল, 'যতই অভিযোগ করো, প্ল্যানটা যে চমৎকার, তা অস্বীকার করতে পারবে না। কে ধারণা করবে, আমরা আঙুরের তলায় লুকিয়ে এখানে ঢুকতে পারি?'

খুব সহজ, কিন্তু কার্যকর একটা বুদ্ধি দিয়েছে আসিফ। শেষ বিকেলে ও আর তানিয়া আবার এসেছে বুভারিদের আঙুর বাগানে, সুপারভাইজর মারচান্দের সঙ্গে গল্প করার ছলে লোকটাকে ব্যস্ত রেখেছে। গাড়ির ট্রাঙ্কে লুকিয়ে ছিল রানা আর

মুরল্যাণ্ড, সুযোগ বুঝে নেমে গিয়ে সন্তর্পণে উঠে পড়েছে আঙুর-ভর্তি ট্রাকে। গা-ঢাকা দিয়েছে আঙুরের স্তূপের তলায়। এস্টেটে ঢোকার সময় ট্রাক চেক করা হয় না, ফলে নিরাপদেই সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছে ওরা।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোতে শুরু করল দু'বন্ধু। গাছপালার ভিতরে ঘনঘোর অন্ধকার, কিন্তু তাতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। হাতে একটা জিপিএস আর হ্যাণ্ডহেল্ড কম্পাস রয়েছে রানার, ও-দুটোর সাহায্য নিয়ে অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল শ্যাতোর কাছে। আড়াল থেকে উঁকি দিল ওরা। খোলা ময়দানের ওপাশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রাচীরে ঘেরা প্রাসাদ। নিঃসঙ্গ এক গার্ড পাহারা দিচ্ছে ওখানে—পরিখার কিনার ধরে চক্কর দিচ্ছে।

'কপাল ভাল বলতে হবে,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'একজন মাত্র গার্ড দেখতে পাচ্ছি।'

'আমার কাছে ওটা সুবিধের মনে হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল রানা। 'বুভারিদের সম্পর্কে যতটা জেনেছি, সিকিউরিটির ব্যাপারে সামান্য ঢিলও দেয় না ওরা।'

সন্দেহ আরও বাড়ছে ড্র-ব্রিজ নামানো দেখে। শ্যাতোর ফটকের গ্রিলের পাল্লাটাও তুলে রাখা হয়েছে। বাইরের গেস্ট-ড্রাইভওয়ে শূন্য, মাঝখানের ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে বরাবরের মত। কানে ভেসে আসছে পরিখায় বয়ে যাওয়া পানির কুলুকুলু ধ্বনি। বড্ড শান্ত, বড্ড সমাহিত পরিবেশ। যেন ওদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকা হচ্ছে প্রাসাদের ভিতরে। শেষবার রানা যা দেখে গেছে, তার সঙ্গে একেবারেই মেলে না।

'ফাঁদ, তাই না?' বলল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ, নেই শুধু পনিরের টুকরো।'

'কী করা যায় তা হলে?'

'তেমন কোনও বিকল্প দেখতে পাচ্ছি না। হয় উল্টো ঘুরে

পিঠটান দাও, নয়তো বুক ফুলিয়ে ঢুকে পড়ো ফাঁদের ভিতরে।'

'আঙুরের রসে কি খামোকা গোসল করেছি? না বাপু, উল্টো ঘুরতে রাজি নই আমি। চলো, কী ধরনের আপ্যায়ন অপেক্ষা করছে দেখে আসি।'

'কথা দিতে পারি, আমাদেরকে ছাড়তে চাইবে না ওরা।'

'কোনও অসুবিধে নেই। কীভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়, তা জানা আছে আমার। আশা করছি তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। রোলস-রয়েস নিয়ে পরিখায় ডাইভ দিতে হবে না।'

হাসল রানা। 'দেখা যাক কী ঘটে। ঘড়ি মিলিয়ে নাও। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। ঠিক সাড়ে সাতটায় টাইমার সেট করো।'

'দু'ঘণ্টায় কাজ উদ্ধার করা যাবে?' সন্দিহান গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'এত বড় শ্যাতোর কোথায় লুনাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা-ই তো জানি না আমরা!'

'কোথায় ওকে রাখা হয়েছে, তা আন্দাজ করতে পারি,' বলল রানা। 'ডানজনে। খুঁজে বের করতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে বলে মনে হয় না। আসলে... বেশি সময় নিতে চাইছি না। আমাদেরকে দেখামাত্র গুলি করার খায়েশ জাগতে পারে ফিলিপ বুভারির। ব্যাটার মাথা বড্ড গরম। যত কম সময় ওকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়, ততই ভাল।'

শ্যাতোর পিছন ঘুরে আবার উদয় হতে দেখা গেল গার্ডকে। ঘড়ি দেখল রানা—ঠিক ষোলো মিনিট লেগেছে লোকটার প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে। গার্ড দ্বিতীয়বার প্রাচীরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতেই মুরল্যাণ্ডকে ইশারা করল ও, তারপর দুজনে ছুটতে শুরু করল শ্যাতোর দিকে। দু'জনেই কালো পোশাক পরেছে, পিঠের হ্যাভারস্যাকও কালো রঙের। আশা করছে, সাঁঝের ম্লান আলোয় দেখা যাবে না ওদেরকে।

খুব দ্রুত খোলা ময়দান পেরুল ওরা, ড্র-ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল শ্যাতোর আঙিনায়। প্রাচীরের গায়ে শরীর মিশিয়ে এরপর এগোল দু'জনে। ছায়ায় যাতে ওদের আকৃতি ঢাকা পড়ে যায়। শ্যাতোর নীচতলার কয়েকটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, বাকিসব ঘুটঘুটে অন্ধকার। আঙিনায়ও বেশি আলো নেই। সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে রানার।

বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছুনোর পর পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেল। বাড়ির পিছনের দরজায় ছিটকিনি লাগানো নেই। নব ঘোরাতেই হাট করে খুলে গেল পাল্লা। ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল ওরা। করিডোর ধরে হাঁটতে থাকল। এবার আর লুকোচুরির চেষ্টা করছে না রানা। বোঝা যাচ্ছে, ওদের প্রতীক্ষাতেই রয়েছে বুভারি পরিবার। খামোকা গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই।

কাউকেই দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সিকিউরিটি ক্যামেরার খোঁজে দেয়ালে নজর বোলাল রানা, কিন্তু দেখতে পেল না কিছু। ক্যামেরা নিশ্চয়ই ভালমত লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

'দুঃসাহস দেখানো ঠিক হলো কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না,' অস্বস্তিভরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'এরা তো আমাদের জন্য পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি!'

'আমরাও ওদের জন্য তৈরি,' বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না।'

'তুমি যখন চিন্তা করতে মানা করো, তখনই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হয় আমার।'

ডানজনে যাবার একটা পথের মুখে পৌঁছে গেছে ওরা। মুরল্যাণ্ডকে ইশারা করে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল রানা। শেষ মাথায় একটা বড় লোহার দরজা। তালাবদ্ধ। হ্যাভারস্যাক থেকে তালা খোলার কিট বের করল রানা।

'খামোকা সময় নষ্ট করছ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এদিকে নেই তোমার বান্ধবী। থাকলে দরজা খোলা পেতে।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে যে লুনার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে, তা ভাবছ কেন? ওকে এখানে রেখে আমাদেরকে হয়তো বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তেমন হতে পারে না? তা ছাড়া... ওদের দেখিয়ে দেয়া পথে প্রতিটা কদম ফেলতে চাই না আমি। একটু অনিশ্চয়তা থাকা ভাল।'

ছোট একটা ড্রিল আর তামার তার ব্যবহার করে তালা খুলে ফেলল ও। দরজা খুলে পা রাখল অন্ধকার ডানজনে। হ্যাভারস্যাক থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বালল। বাতাসে গুমোট গন্ধ ভাসছে। একে একে ডানজনের সবগুলো প্রকোষ্ঠ দেখল ওরা। যেখানে রানা আর লুনাকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল ফিলিপ, সেখানেও গেল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। সব প্রকোষ্ঠ খালি। এডগার অ্যালান পো-র গল্পের মত করেও আর সাজানো নেই এখন। সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আধঘণ্টা ব্যয় হলো ভূ-গর্ভে, নিষ্ফলভাবে।

'এখানে নেই লুনা,' শেষ পর্যন্ত বলল রানা। 'অন্য কোথাও রেখেছে ওকে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'খুব শীঘ্রি জানা যাবে।'

ডানজন থেকে বেরুনোর সমস্ত দরজা পরখ করতে শুরু করল রানা। তালা দেয়া সব, খোলা পাওয়া গেল মাত্র একটা। সেটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল চারপাশে আলো ফেলতেই দেখতে পেল রানা বুভারি পরিবারের আর্মারিতে পৌঁছে গেছে।

কামরার দূর প্রান্তে একটা বাতি জ্বলছে। সেই আভায় আবছাভাবে আলোকিত হয়ে আছে ডিসপ্লেগুলো। ভৌতিক

পরিবেশ।

নিচু সুরে শিস দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বাহ্, সুন্দর সাজিয়েছে তো! ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরটা কে?'

'নিঃসন্দেহে কোনও রক্তপিপাসু বদমাশ,' বলল রানা। 'এসো, এগোই।'

কামরার আলোকিত অংশ লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল দু'বন্ধু। সারি বেঁধে রাখা ডিসপ্লে-কেসের মাঝ দিয়ে এগোল। খানিক পর বোঝা গেল, ঘোড়ায় চড়া চার নাইটের মূর্তির উপরে জ্বলছে বাতি। মূর্তিগুলো পেরুতেই লুনাকে দেখতে পেল ওরা।

কাঠের এক সিংহাসনে বসে আছে তরুণী আর্কিয়োলজিস্ট, হাত-পা আসনের হাতা আর পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মুখে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ডাক্ট-টেপ, যাতে চেঁচাতে না পারে। দু'পাশে বর্ম-পরা দুই নাইটের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে খোলা তলোয়ার। দেখে মনে হতে পারে, সিংহাসনে বসা রানীকে রক্ষা করতে প্রস্তুত ওরা।

রানা আর মুরল্যাণ্ডকে দেখে লুনার চোখ বড় হয়ে গেল। সজোরে মাথা নাড়তে শুরু করল ও, গোঙানির মত শব্দ বেরুচ্ছে টেপের তলা থেকে—কিছু বলতে চায়। এগিয়ে গেল রানা, বেল্টে আটকানো কমাণ্ডো নাইফ তুলে নিল হাতে, লুনাকে মুক্ত করবে। মেয়েটা আরও জোরে মাথা নাড়ল।

থমকে গেল রানা। বুঝতে পারছে, ওকে এগোতে নিষেধ করছে লুনা। আর তখুনি চোখের কোণে নড়াচড়ার আভাস পেল।

আচমকা নড়ে উঠেছে দুই বর্ম-পরা নাইট, তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটে আসছে সামনে। আক্রমণোদ্যত!

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। তিক্ত দৃষ্টিতে তাকাল হাতের ছুরির দিকে। লোহার বর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রটা একেবারে অচল।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই রানা-মুরল্যাণ্ডের উপর হামলা চালাল দুই নাইট। বাউলি কেটে একপাশে সরে গেল রানা, তলোয়ারের কোপ এড়াল। মুরল্যাণ্ডও একই কায়দায় ফাঁকি দিয়েছে তার নাইটকে। চেঁচাল, 'রানা! পিস্তল?'

'না, সারা দুনিয়া খবর হয়ে যাবে!' মানা করল রানা।

আবার ছুটে এসেছে দুই নাইট। ডাইভ দিয়ে একপাশে সরে গেল ও। মুরল্যাণ্ড তা করল না। মাথা নিচু করে খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে গেল দ্বিতীয় নাইটের দিকে। এমন প্রতি-আক্রমণ আশা করেনি লোকটা, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা আর কাঁধের একাংশ দিয়ে সজোরে আঘাত হানল মুরল্যাণ্ড লোকটার শরীরের মাঝামাঝি। যেন এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে উড়ে চলে গেল নাইট, আছড়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

সঙ্গীর অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে প্রথম নাইট। মুরল্যাণ্ডের দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকাচ্ছে। লোহার বর্ম-পরা কাউকে এভাবে গুঁতো দিয়ে ধরাশায়ী করা সম্ভব, তা বোধহয় ভাবতেও পারেনি। লোকটার এই হতভম্ব অবস্থার সুযোগ নিল রানা। কাছেই দেয়ালে ঝুলছে একটা পুরনো আমলের ভারী মুগুর। ওটা তুলে নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বেসবল ব্যাটের মত চালাল প্রথম নাইটের মাথায়।

ঠং করে বিশ্রী শব্দ হলো, ভুবড়ে গেল নাইটের শিরোস্ত্রাণ। আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। জ্ঞান হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। মুরল্যাণ্ড এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় নাইটের মাথায় ফুটবলের ফ্রি-কিক ঝাড়ল। কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল সে-ও।

'গর্দভের দল!' গাল দিল মুরল্যাণ্ড। 'ভেবেছে বর্ম পরলেই অপরাজেয় হতে পারবে? উল্টো কেমন ঘায়েল হলো!'

'ওদের বোকামির চেয়ে তোমার কৃতিত্বই বেশি,' বলল

রানা। 'দারুণ ট্যাকেল করেছ! প্রফেশনাল রাগবি প্লেয়ারও ফেল!'

'*ইএসপিএন*-এ নিয়মিত রাগবি লিগ দেখার সুফল,' হাসল মুরল্যাণ্ড।

শাফালাফির ফাঁকে হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেছে, ওটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে লুনার দিকে এগিয়ে গেল রানা। দড়ি কেটে মুক্ত করল ওকে, মুখ থেকে খুলে দিল ডাক্ট-টেপ।

'তুমি ঠিক আছ?' জানতে চাইল রানা।

কথা বলল না লুনা, কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল।

'ইশারা দেয়ার ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'নাইট ব্যাটারা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি।'

'ওদের জন্য ইশারা দিইনি তো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লুনা।

'তা হলে?'

জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না লুনা। তার আগেই খনখনে হাসি ভেসে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে। গা কেঁপে উঠল সবার। পরমুহূর্তে একসঙ্গে জ্বলে উঠল আর্মারির সমস্ত বাতি। রানাদের সামনে উদয় হলো সাদা পোশাক পরা দীর্ঘাঙ্গী একটি মূর্তি। মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

'বুঝেছি কীসের জন্য ইশারা দিচ্ছিলে,' তিক্ত গলায় বলল রানা।

'চমৎকার... চমৎকার দেখিয়েছেন, মসিয়ো রানা!' ঘোমটার আড়াল থেকে শোনা গেল মাদাম বুভারির পরিচিত কণ্ঠ। 'সবসময় এমন নাটকীয়তাই বুঝি পছন্দ করেন আপনি?'

ফিলিপ বুভারি, গ্যাস্টন আর ভ্যাসিলি উদয় হলো মহিলার পিছু পিছু। সঙ্গে জনাছয়েক গার্ড। সবার হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র, রানাদের দিকে তাক করে রেখেছে।

নির্বিকার রইল রানা। মেঝেতে পড়ে থাকা দুই নাইটকে ইশারা করে বলল, 'নাটকীয়তা একা আমিই করছি না।'

হাসল মাদাম বুভারি। 'আমার ব্যাপার তো আপনি জানেন! কস্টিউম পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন আপনি।'

'ওটাকে কস্টিউম পার্টি না বলে কিলিং পার্টি বললেই বেশি মানাবে।'

'তা-ই?'

সাদা, নিটোল একটা বাহু উঁচু করল মাদাম বুভারি। আস্তে, খুব আস্তে, চুলের নীচে হাত চালিয়ে একটা বাঁধন খুলল। মুখ থেকে ঘোমটা খসে পড়ল তার। চমকে উঠল রানা, কী দেখছে সামনে! নিজের অজান্তেই ওর চোখজোড়া উঠতে শুরু করল মহিলার গা বেয়ে। সফেদ কাপড়ের আড়াল থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে নিখুঁত রাজকীয় দেহ। নিরেট সোনার তৈরি একটা কোমরবন্ধনী কোমরের সাথে এঁটে রেখেছে সাদা পোশাকটা। এর উপর থেকে ঢেউয়ের মতো রেখায় ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠেছে অপরূপ দেহসুষমা। অপূর্ব এক চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও, তাতে বার্ধক্যের কোনও ছাপ নেই। যৌবন খেলা করছে মুখশ্রীতে। এই অপরূপার জন্য যে-কোনও পুরুষ নিজের সর্বস্ব বাজি ধরবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারাল রানা। গোস্ট সিটির এনযাইম সম্পর্কে জানা আছে ওর, কিন্তু সেটা দিয়ে যে এমন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব, তা কল্পনাও করেনি। করবেই বা কী করে, এখন পর্যন্ত ওই এনযাইমের তৈরি করা একদল মানব-সদৃশ পিশাচ দেখেছে ও। বিশেষ করে ওই এনযাইম দিয়ে যে যৌবন ফিরে পাওয়া সম্ভব... এমন অদ্ভুত সৌন্দর্য অর্জন করা সম্ভব, তা চিন্তাতেও আসেনি। তার মানে ওই ফর্মুলা শুধু অমরত্বের নয়, অনন্ত-যৌবনেরও বটে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল ও। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,

'বেশ, বেশ, ড. হেণ্ডারসনের ফর্মুলা দেখছি তা হলে সত্যিই কাজ দিয়েছে!'

'হেণ্ডারসনকে বেশি কৃতিত্ব দেবেন না, মসিয়ো রানা,' দাম্ভিক কণ্ঠে বলল মাদাম বুভারি। 'ও স্রেফ একটা অনুঘটক ছিল, কিন্তু যে ফর্মুলা আমাকে এ-অবস্থায় এনেছে, সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে হেণ্ডারসনের জন্মের বহুকাল আগে।'

'শেষবার দেখার পর অনেক বদলে গেছেন আপনি। এই অলৌকিক পরিবর্তন কবে ঘটেছে, জানতে পারি?'

'অমরত্বের ওষুধ অত্যন্ত শক্তিশালী,' বলল মাদাম বুভারি। 'তিন ধাপে খেতে হয় ওটা। প্রথম দুই ধাপের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। গত দু'দিনে, চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে খেয়েছি দুই ডোজ। একটু পরে তৃতীয় ডোজ... মানে শেষটুকু খাব।'

বুকের ভিতর ধাক্কিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। তৃতীয় ডোজ... ড. হেণ্ডারসন তৃতীয় ডোজের কথা বলছিল! ওষুধের তৃতীয় ডোজ! কী ঘটবে ওটা খেলে?

'এমনিতেই তো ফুলের মত সুন্দর হয়ে উঠেছেন,' গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল ও। 'আবার এক ডোজ ওষুধ খাবার দরকার কী?'

ফুলের সঙ্গে তুলনা করায় খুশি হলো মাদাম বুভারি। বলল, 'এই সৌন্দর্যকে চিরস্থায়ী করবে তৃতীয় ডোজ। ওটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমর হব আমি। যা হোক, কেমিস্ট্রি নিয়ে অনেক কথা হলো। আপনার হ্যাণ্ডসাম বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন না? ও তো আমার দিক থেকে নজর ফেরাতে পারছে না!'

মাদাম বুভারিকে আগে দেখেনি মুরল্যাণ্ড। রানার সঙ্গে মহিলার আলাপচারিতার অর্থ ধরতে পারছে না ঠিকমত।

অপরূপা এক নারীর দেখা পেয়ে ও স্রেফ মুগ্ধতায় হারিয়ে গেছে। বিড় বিড় করে কী যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না।

'ও হলো আমার বন্ধু... ববি মুরল্যাণ্ড,' বলল রানা। 'ববি, ইনি মাদাম আইরিন বুভারি—আমাদের সমস্ত দুর্ভোগের হোতা!'

'মাদাম বুভারি?' বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল মুরল্যাণ্ডের।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'কোনও সমস্যা?'

'না... মানে, আমি আপনাকে অন্যরকম আশা করেছিলাম।'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল মাদাম বুভারির। 'সন্দেহ নেই, মসিয়ো রানা আমাকে ডাইনি বুড়ি হিসেবে বর্ণনা করেছেন আপনার কাছে।'

'মোটেই না,' হাসল মুরল্যাণ্ড। বিস্ময় কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আপাদমস্তক দেখল মহিলাকে। 'ও শুধু আপনার রূপের কথা বলতে ভুলে গেছে।'

'স্বীকার করছি, নুমার লোকজন অত্যন্ত সাহসী এবং রমণীমোহন,' বলল মাদাম বুভারি। 'তবে কথার মারপ্যাঁচে সুবিধে করতে পারবেন না এখানে।'

'এদের সঙ্গে কথা বলে খামোকা সময় নষ্ট করছ, মা,' বিরক্ত গলায় বলল ফিলিপ। 'অনুমতি দাও, মাথায় একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে দিই।'

ঝট্ করে ছেলের দিকে তাকাল মাদাম বুভারি। চোখে আগুন জ্বলছে। 'যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না,' গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ। 'যদি খুনই করতে চাইতাম ওদেরকে, তা হলে বহু আগে সেটা করা যেত। এখানে টোপ ফেলে ডেকে আনার প্রয়োজন ছিল না।'

ধমক খেয়ে কুঁকড়ে গেল ফিলিপ।

'কিছু যদি করতেই চাও, তা হলে ওদের বডি সার্চ করো,' বলল মাদাম বুভারি। 'মি. রানা চমক দেখাতে ভালবাসেন বলে

রিপোর্ট পেয়েছি। কোনও ঝুঁকি নেয়া যাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্যাস্টন আর ভ্যাসিলিকে ইশারা করল ফিলিপ। এগিয়ে গিয়ে রানা আর মুরল্যাণ্ডের হ্যাভারস্যাক কেড়ে নিল ওরা। দেহতল্লাশি করতে শুরু করল।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে, মাদাম বুভারি,' বলল রানা। 'আমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে কেন, জানতে পারি? নিজেই তো বললেন, খুন করতে চাইলে অনেক আগে করে ফেলতে পারতেন।'

'মিথ্যে আশ্বাস দেব না, মসিয়ো রানা,' বলল মাদাম বুভারি। 'মরতে আপনাদেরকে হবেই। তবে মরার আগে বুঝিয়ে দেয়া দরকার, কার বিরুদ্ধে লাগতে গিয়েছিলেন। আমার সাফল্য দেখবেন আপনারা, তারপর ব্যর্থতার অনুভূতি নিয়ে দুনিয়া ছাড়বেন। কম ভোগাননি আপনি আর আপনার বন্ধুরা, তার বিনিময়ে এটা আপনাদের প্রাপ্য হয়েছে।'

শরীরতল্লাশি শেষ হয়েছে, তিন বন্দিকে পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। রানা আর মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য যা কিছু পাওয়া গেছে, সব নিয়ে নিল গ্যাস্টন আর ভ্যাসিলি। মাদাম বুভারি আর তার ছেলেকে দেখানো হলো সব। হ্যাভারস্যাক উপুড় করেও মাটিতে ফেলা হলো ভিতরের জিনিসপত্র। মাত্র দুটো পিস্তল, জিপিএস, কম্পাস, টুলকিট, দড়ি-দড়া, ইত্যাদি দেখে মুখ বাঁকাল ফিলিপ।

বলল, 'এসব নিয়ে এসেছেন বাঘের গুহায় হানা দিতে? আমি সত্যিই হতাশ হয়েছি।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল মাদাম বুভারি। 'খামোকাই ঝুঁকি নিয়েছেন। আমাদের বাগানের আঙুরের স্বাদ চাখাই যদি প্রধান উদ্দেশ্য হতো, এক বোতল মদ কিনে নিলেই পারতেন।'

'আপনাদের মদ কেনার সাধ্য নেই আমার,' কাঁধ ঝাঁকাল

রানা।

'বড্ড আত্মবিশ্বাস আপনার, মসিয়ো রানা। শুধু বোকাদেরই এমন আত্মবিশ্বাস থাকে। কী ভেবেছিলেন, সবার চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকতে পারবেন শ্যাতোয়? সার্ভেইলান্স ক্যামেরাগুলোকেই তো ফাঁকি দিতে পারেননি। আমরা আপনাকে ঢুকতে দিয়েছি, বুঝলেন? নইলে কস্মিনকালেও শ্যাতোর ধারেকাছে ভিড়তে পারতেন না।'

'বুঝতে পারছি,' নীরস গলায় বলল রানা। 'দরজা-জানালা খুলে রাখায় আন্তরিক ধন্যবাদ!'

'সাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু কী ভেবে এসেছেন এখানে, জানতে পারি?'

'ভেবেছিলাম লুনাকে নিয়ে যাব।'

'আপনার সেই অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।'

'তা-ই তো দেখছি। আচ্ছা, সাহস দেখানোয় একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেতে পারি না? এতকিছু ঘটে গেল... কিন্তু কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, তার কিছুই জানি না। মরার আগে ওসব জানতে না পারলে আক্ষেপ থেকে যাবে। বলুন না! বিনিময়ে আপনিও যা জানতে চাইবেন, সব বলব আমি।'

'আপনার কাছে কিছুই জানার নেই আমার, মসিয়ো রানা,' কাটা কাটা স্বরে বলল মাদাম বুভারি। 'তবে হ্যাঁ, সাহসিকতার কদর করি আমি। তাই আপনার কৌতূহল মেটানো যেতে পারে।' ফিলিপের দিকে ফিরল সে। 'সবাইকে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

'ওদের গায়ে হাত না দিলেই ভাল করবে!' বুভারি-তনয়কে ভয়ানক সুরে বলল রানা।

নিদাপের হাসি হাসল মাদাম বুভারি। 'আপনার তুলনা হয় না মসিয়ো রানা। এমন পরিস্থিতিতেও হুমকি দিচ্ছেন?

এনিওয়ে, ভয়ের কিছু নেই। ওদেরকে কামরার বাইরে নেয়া হবে না। আপনার দৃষ্টিসীমাতেই থাকবে। আমি একান্তে কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।'

লুনার চেয়ারে রানাকে বসতে ইশারা করল সে। গার্ডরা মেঝে থেকে সবকিছু ভরে ফেলল হ্যাভারস্যাকদুটোয়। অজ্ঞান দুই নাইটকে সরিয়ে নেয়া হলো, মুরল্যাণ্ড আর লুনাকেও টেনে নিয়ে যাওয়া হলো আর্মারির এক প্রান্তে।

রাজকীয় একটা চেয়ার আনা হয়েছে মাদাম বুভারির জন্য। রানার মুখোমুখি সেটায় বসল সে। বলল, 'হ্যাঁ, এবার কথা বলার পরিবেশ পাওয়া গেছে। আরেকটা ব্যাপার, কোনও রকম কুমতলব থাকলে ভুলে যান এখুনি। আমার উপর হামলা চালাতে গেলে আপনার বন্ধুরা খুন হয়ে যাবে।'

'হাত বেঁধে রেখেছেন, সব কেড়ে নিয়েছেন... চাইলেও কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' বলল রানা। 'সবকিছু জানার আগে তেমন কোনও ইচ্ছেও নেই আমার। তো বলুন... পুরনো আমলের সন্ন্যাসিনীর সাজ নিয়েছেন কেন?'

'কস্টিউম পছন্দ করি আমি, তা তো জানেন। কেন, ভাল দেখাচ্ছে না?'

শান্ত চোখে মাদাম বুভারির পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল রানা। সুপারমডেল হার মেনে যাবে, এমনই দেহবল্লরী। পোশাকের আড়ালে শরীরের প্রতিটি বাঁক আর উত্থান-পতন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সবই অসাধারণ, শুধু চোখদুটো ছাড়া। সেখানে বরফের শীতলতা, প্রাণের সাড়া নেই।

'বেশ লাগছে আপনাকে,' বলল ও। 'তবে...'

'আমার সত্যিকার বয়স জানেন বলে আকর্ষণ বোধ করছেন না, এই তো?'

'বয়সের ব্যাপারে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ঠাণ্ডা

মাথার খুনির ব্যাপারে আপত্তি আছে।'

একটা ভুরু উঁচু হলো মাদাম বুভারির। 'আপনি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন?'

'ধরে নিন তা-ই।'

'খুব খারাপ।' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল মাদাম বুভারি। 'গত একশো বছরে প্রচুর প্রেমিক এসেছে আমার জীবনে, ওদের কেউ আপনার নখেরও যোগ্য নয়। আপনি সুদর্শন, বিপজ্জনক... সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একজন পুরুষ। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার মৃদু ইচ্ছে আছে আমার, কিন্তু বার বার সেটাকে অসম্ভব করে তুলছেন আপনি।'

'শুনে খুব ভাল লাগছে,' বলল রানা। 'কিন্তু একশো বছরের ব্যাপারটা কী?'

'শীঘ্রি জানতে পারবেন। আগে আপনার দিকটা শুনি। কতটুকু জেনেছেন আপনি আমাদের সম্পর্কে?'

'খুব বেশি না। ড. হেণ্ডারসন এবং তাঁর টিমকে ভাড়া করেছিলেন আপনারা অমরত্বের ফর্মুলা আবিষ্কার করবার জন্য। ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন অগণিত মানুষ খুন করে। শেষ পর্যন্ত গবেষণা সফল হয়েছে বটে, কিন্তু মাঝে বেশ কিছু মিউট্যান্ট বানিয়ে বসেছেন আপনারা।'

'সারসংক্ষেপ হিসেবে মন্দ বলেননি। কিন্তু বেশিরভাগ তথ্যই আপনার অজানা।'

'জানিয়ে কৃতার্থ করুন।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বলতে শুরু করল মাদাম বুভারি। 'মিনোয়ান সভ্যতা পর্যন্ত আমাদের পরিবারের শেকড় ট্রেস করা গেছে। স্যান্টোরিনির দ্বীপে কুখ্যাত অগ্ন্যুৎপাতের আগে বাস করতেন আমাদের পূর্বপুরুষরা—পেশায় ছিলেন মিনোয়ান সর্পদেবীর পুরোহিত। যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাঁদের, তবে

বিরুদ্ধবাদী একদল লোকের ষড়যন্ত্রে আমাদের পুরো পরিবারকে দ্বীপ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই অগ্ন্যুৎপাতে গোটা দ্বীপ ধ্বংস হয়ে যায়। সাইপ্রাসে বসত গাড়ে আমাদের পরিবার—প্রথমে কামারশালা খোলে, পরে অস্ত্র-ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। গল্পটা শুনেছেন আপনি আগে আমার মুখে।'

'সেখান থেকে মিউট্যান্ট বানানো পর্যন্ত পৌঁছুলেন কেমন করে?'

'ব্যবসার লজিক্যাল আউটগ্রোথ বলতে পারেন ওটাকে। গত শতাব্দীর শুরুতে সুপার-সোলজার তৈরির জন্য একটা গবেষণাগার স্থাপন করি আমরা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ দেখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ভবিষ্যতে ট্রেঞ্চ-ওয়ারফেয়ার কতটা অসার হয়ে পড়বে। ওতে পাল্লা করে হামলা চালায় দুই পক্ষ, কেউই খুব একটা লাভবান হয় না। অটোমেটিক ওয়েপন আবিষ্কারের পর দেখা গেল, গুলিবৃষ্টির সামনে দাঁড়াবারই সাহস নেই সৈনিকদের। তাই এমন একদল সৈন্য প্রয়োজন, যারা গুলিকে ভয় পাবে না, হামলা চালিয়ে যাবে যে-কোনও মূল্যে। প্রাণহানি কমানোর জন্য এদের বাড়তি স্ট্যামিনা, সেইসঙ্গে অতি দ্রুত আঘাত থেকে সেরে ওঠার ক্ষমতা থাকা চাই। ফর্মুলাটা কিছু সৈনিকের উপর প্রয়োগ করি আমরা।'

'পিয়েরে লোর্ডার মত?'

ভুরু কোঁচকাল মালায় বুভারি। 'নামটা আমার পরিচিত নয়।'

'ক্যাপ্টেন লোর্ডা ছিলেন ফরাসি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। আপনাদের তৈরি করা প্রথম মিউট্যান্টদের একজন সে।'

'হুম... এবার কিছুটা মনে পড়ছে। বেশ হ্যাণ্ডসাম এক লোক ছিল, তাই না?'

'একশো বছর আগেকার একজন সৈনিককে আপনি চিনছেন কীভাবে?' বিস্মিত হলো রানা।

'ধৈর্য ধরুন। যথাসময়ে জানবেন। আরেকটা ব্যাপার, ওদের পরিণতির জন্য আমাদেরকে দুষবেন না। সবাই ছিল ভলান্টিয়ার, নিজ ইচ্ছেয় যোগ দিয়েছিল অতিমানব হবার লোভে।'

'নিশ্চয়ই ওরা জানত না, অতিমানবের বদলে স্রেফ একদল পিশাচে পরিণত হবে?'

'কেউই তা জানত না, মসিয়ো রানা। তখন বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। ফর্মুলাটা প্রাথমিকভাবে সফল হয়—সাবজেক্টরা অস্বাভাবিক শক্তি আর দ্রুততা অর্জন করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ থেকে জানোয়ারে পরিণত হয়।'

'অমর জানোয়ার।'

'অমরত্বের ব্যাপারটা ছিল অপ্রত্যাশিত সাইড-এফেক্ট। সবচেয়ে বড় কথা, ওতে বয়স কমারও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা ফর্মুলার দোষত্রুটি প্রায় সারিয়ে নিয়েছিলাম, মাঝখান থেকে আমার ভাই থিয়োডর তাতে বাগড়া দিয়ে বসল।'

'আপনার ভাই?' থমকে গেল রানা। পরমুহূর্তে ধরতে পারল রহস্যটা—কেন বার বার একশো বছরের কথা বলছে মাদাম বুভারি। 'আপনি তা হলে অরিজিন্যাল আইরিন বুভারি, তাঁর নাতনি নন?'

'ভেরি গুড, মসিয়ো রানা! আপনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন!'

অবাক হলো না রানা। এর মধ্যে এমন সব অদ্ভুত জিনিস দেখে ফেলেছে, তাতে আর অবাক হবার ক্ষমতা নেই ওর। বলল, 'কী ঘটেছিল? আপনার ভাইয়ের ভিতর বিবেক জেগে উঠেছিল?'

'বিবেক না, ওটা ছিল পাগলামি!' রাগী গলায় বলল মাদাম

বুভারি। 'মানবজাতির জন্য দরদ উথলে উঠেছিল ওর ভিতর। যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছিলাম আমরা, সেটার প্রতিবাদ করে বসল। দাবি জানাল ফর্মুলাটা জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য। ওর বিপক্ষে গোটা পরিবারকে একাট্টা করি আমি, ওকে নজরবন্দি করি। কিন্তু বদমাশটা সবার নজর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল একপাদা দলিল, গোপের প্রতিনিধিকে দেখিয়ে দুনিয়ার সামনে আমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবে বলে। অনেক কষ্টে আল্পসের উপরে ওকে ঠেকিয়ে দিই আমরা।'

'হেলমেটটা নিয়েছিল কেন?'

'ওটা ছিল পরিবারের কর্তৃত্বের প্রতীক। প্রতি প্রজন্মের পারিবারিক প্রধানের কাছে রাখার নিয়ম ওটা। থিয়োডর নিজের বোকামির কারণে পদটা হারায়। নিয়ম অনুসারে হেলমেট তুলে দেয়ার কথা আমার হাতে, কিন্তু সেটা সে করতে চায়নি।'

'হুম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'থিয়োডর তো পথ থেকে সরে গেল... সমস্ত দলিলসহ। কিন্তু রিসার্চ ঠেকাবার কোনও উপায় বোধহয় ছিল না তার।'

'পালিয়ে যাবার আগেই রিসার্চের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বদমাশটা,' বিরক্ত গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলেছিল, ফর্মুলা খোদাই করে নিয়েছিল হেলমেটের গায়ে। জিনিসটা নিয়ে যাবার পিছনে ওটা আরেকটা কারণ। পাক্কা হারামি ছিল, জানত কীভাবে মরেও আমাদের শায়েস্তা করা যাবে। পুরো গবেষণা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয় আমাদেরকে। মিউট্যান্টগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় পুরনো প্রজেক্টের নমুনা হিসেবে। এর মাঝে হাজার রকমের বাধা এল—যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা... আরও কত কী! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রায় সফল হয়ে এসেছিলাম আমরা, কিন্তু মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণে আমাদের ল্যাবরেটরি ধ্বংস হয়ে

গেল। কী ভয়ানক হতাশা অনুভব করেছি, তা বলে বোঝানো যাবে না।'

হাসল রানা। 'বলছেন, নিজেরা যে-যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন, সেটাই সর্বনাশ করেছে আপনাদের? নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে!'

'হ্যাঁ, নিয়তিই বটে,' স্বীকার করল মাদাম বুভারি।

'হুম, এর মাঝে আপনি বুড়ো হতে থাকলেন।'

'ঠিক বলেছেন, বয়স বাড়ল আমার,' দুখি গলায় বলল মাদাম বুভারি। 'সুন্দরী যুবতী থেকে বুড়িতে পরিণত হলাম আমি। আয়ু বাড়াবার ব্যাপারে কিছুটা সফল হয়েছিলাম আমরা, সেটা দিয়ে আমার আর ফিলিপের মৃত্যু ঠেকিয়েছি, পার করেছি শত বছরের সীমানা... কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম—কবরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই সঠিক ফর্মুলা তৈরি করা যাচ্ছিল না। এমন সময় একদিন আমার এক বিজ্ঞানী জানাল গোস্ট সিটির এনযাইমের কথা। বয়স থামাবার গুণ নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে ওতে। দেরি না করে ল্যাবটা কিনে নিলাম আমি, যারা ওই এনযাইম নিয়ে গবেষণা করছে তাদের সহ। ড. হেণ্ডারসনের অধীনে একদল প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে ভাড়া করলাম দিনরাত গবেষণা করার জন্য। সাবমেরিন বানানো হলো গোস্ট সিটি থেকে অর্গানিজম সংগ্রহ করার জন্য। স্কটিশ দ্বীপপুঞ্জে নতুন একটা ল্যাব দাঁড় করালাম টেস্টিং শুরু করার জন্য। এরপরের ঘটনা সম্ভবত আপনি জানেন...'

'ড. হেণ্ডারসনের টিমের বিজ্ঞানীদেরকে খুন করলেন কেন?'

'প্রজেক্টের খবর গোপন রাখার জন্য। এটা নতুন কিছু না। আমার আগেও বহু লোক এ-কাজ করেছে। তা ছাড়া হিউম্যান টেস্টিঙের খবর ফাঁস করে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছিল ওরা।'

'কিন্তু ওদের কাজ তো তখনও শেষ হয়নি। হিউম্যান টেস্টিঙে নতুন একদল মিউট্যান্ট তৈরি করে বসেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, হিসেবে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল। এনযাইমটা যে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি, তা বুঝতে পারিনি কেউ। পরে অবশ্য ভুল শোধরানোর ব্যবস্থা করি আমি। হেণ্ডারসনকে ফিরিয়ে এনে নতুন একটা টিম গড়ে দিই। ওরা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে।'

'ডরমেয়ার গ্লেসিয়ারের টানেলে যে-ঘটনা ঘটেছে, তার জন্যে কে দায়ী? আপনি, না আপনার ছেলে?'

'দুঃখের বিষয়, ওটা ফিলিপের কাণ্ড। হেলমেটের আসল গুরুত্ব জানা ছিল না ওর, তাই ওটা উদ্ধারের চেষ্টা করেনি। ওর পোষা কুকুরটা শুধু স্ট্রংবক্স নিয়ে ফিরে আসে, সাক্ষীদেরকে খুন করার চেষ্টা করে টানেল পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে। কপাল ভাল যে, মাদমোয়াজেল পারসেল ওটা বের করে নিয়ে এসেছিলেন। ওটার খোদাই থেকে ড. হেণ্ডারসন পুরনো ফর্মুলার সমীকরণ পেয়েছে; এমনিতেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সে, তবে পুরনো সমীকরণ পাওয়ায় খুব দ্রুত শেষ করতে পেরেছে নতুন ফর্মুলার কাজ। আমিও পরিবারের মহামূল্য রেলিক ফিরে পেয়েছি।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল রানা। 'তা হলে তো সব কূলই রক্ষা পেয়েছে আপনার!'

'অবশ্যই!' গর্ব ফুটল মাদাম বুভারির কণ্ঠে। 'আমরা ভুল করি, মসিয়ো রানা। কিন্তু সে-ভুল থেকে শিক্ষাও নিই। তাই কেউ হারাতে পারে না আমাদেরকে। অন্যদিকে আপনি... স্রেফ একজন আবেগপ্রবণ মানুষ, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে জানেন না। একবার কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন এখান থেকে; তারপরও আবার ফিরে এসেছেন বান্ধবীকে উদ্ধার করতে। ফলাফল? মৃত্যু!'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

'কী বলতে চান?'

'নিজেকে যতটা অক্ষত ভাবছেন, ততটা অক্ষত আর নন আপনি। স্কটিশ ওর্কনির ওই ল্যাবের খবর পাননি এখনও?'

'না তো! কী হয়েছে?'

'ওখানে আপনার সমস্ত গোমর ফাঁস হয়ে গেছে। দ্বীপটা এখন ব্রিটিশ সরকারের দখলে। গোপন গবেষণার সব খবর জেনে গেছে ওরা, মিউট্যান্টদেরকে পেয়েছে। খুব শীঘ্রি আপনার হাতে হাতকড়া পরাতে আসছে পুলিশ।'

'অসম্ভব! দ্বীপের মালিক যে আমি, তা কেউ জানে না।'

'তা হলে আমি জেনেছি কীভাবে?' হাসল রানা। 'মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মনকে শান্ত রাখতে পারেন, কিন্তু জেনে রাখুন—জেলখানা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য... অনন্তকাল থাকবেন ওখানে। আপনার মরণ নেই কিনা!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মাদাম বুভারি। তারপরই হেসে উঠল হা হা করে। 'স্বীকার করছি, ভয় দেখাতে জানেন আপনি, মসিয়ো রানা। কিন্তু আফসোস, ভুল লোককে ভয় দেখাতে চাইছেন। ভেবেছেন চাইলেই আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে পুলিশ বা আর কেউ? আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর জন্য লইয়ারদের রীতিমত একটা আর্মি পুষি আমি। ওরা যদি ফেলও মারে... পুরো ইউরোপ আর আমেরিকার কত মন্ত্রী আর সংসদ সদস্য আমার পকেটে আছে, তা জানেন? আমার কথায় ওঠে-বসে ওরা, আমার দয়ায় বাঁচে। ওরা কখনোই জেলে যেতে দেবে না আমাকে।'

'অমন কথা অনেকেই ভেবেছে অতীতে, তাদের কারও পরিণতিই সুখকর হয়নি। আমি নিজে তার সাক্ষী। নিশ্চিত থাকুন, আপনার নোংরা পরিকল্পনা কোনোদিন সফল হবে না।'

'কে ঠেকাবে আমাকে? আপনি? মাফ করবেন, তবে আমার

মনে হয় না অমর কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এর আগে লড়াই হয়েছে আপনার। চিন্তাই করতে পারছেন না আমাদের ক্ষমতা কতখানি।'

'তা দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি আমি,' টিটকিরির সুরে বলল রানা।

'দেখবেন, খুব শীঘ্রি দেখবেন।' বলে উঠে দাঁড়াল মাদাম বুভারি। 'আমাদের আলাপ শেষ হয়েছে, এবার বুভারি পরিবারের জয়যাত্রা শুরু করতে হয়।' ফিলিপকে ইশারা করল সে।

চঞ্চল চোখে আর্মারির দেয়ালে লাগানো ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। কথাবার্তা বলে অনেকটা সময় ব্যস্ত রাখা গেছে মাদাম বুভারিকে; আর আধঘণ্টা পরেই ওর প্ল্যান মোতাবেক সবকিছু ঘটবে। কথা হলো, আর ত্রিশটা মিনিট ওদের আয়ু আছে কি না।

সতেরো

অস্ত্রের মুখে তিন বন্দিকে নামিয়ে আনা হলো ডানজনে। ফিলিপ একটা গুপ্ত পথের দরজা খুলল, ওটা আগে দেখেনি রানা। হাতে একটা মশাল নিয়ে সবার আগে থাকল মাদাম বুভারি, তার পিছু পিছু বাকিরা। প্রবেশপথ পেরুলে প্রথমেই বড় একটা প্রকোষ্ঠ, কিছুদূর যাওয়ার পর সিঁড়ি। নামতে শুরু করল ওরা। অসংখ্য

ধাপ সিঁড়িটায়। নামছে তো নামছে। প্রায় ষাট ফুট নেমে যাওয়ার পর শেষ হলো সিঁড়ি। উপর দিকে উঠে যাওয়া অদ্ভুতদর্শন গর্ত বা নল তৈরি করে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।

এগিয়ে চলল ওরা। হঠাৎ শেষ হয়ে গেল পথ। পেছন পেছন আসা গার্ডদেরকে মশাল উঁচু করে ধরতে বলল মাদাম বুভারি। কাঁপা কাঁপা শিখার আলোয় অদ্ভুত এক দৃশ্য ভেসে উঠল বন্দিদের চোখের সামনে।

বিশাল এক ভূগর্ভস্থ চেম্বার ওটা—বৃত্তাকার। প্রাকৃতিক নয়, মানুষের হাতে গড়া। ঠিক যেন প্রাচীন আমলের কোনও অ্যাম্ফিথিয়েটার; পার্থক্য শুধু এই যে, এটা মাটির তলায়। চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে গ্যালারি, একপ্রান্তে উঁচু মঞ্চ—উচ্চপদস্থ দর্শকদের বসার জন্য। ওখানে একটা বেদি রয়েছে। মাঝখানের বৃত্তাকার অ্যারেনা বালিতে ঢাকা।

'কী এটা?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের শ্যাতোর হৃৎপিণ্ড—আণ্ডারগ্রাউণ্ড কলোসিয়াম,' জানাল মাদাম বুভারি। 'আমাদের যে-পূর্বপুরুষ এই শ্যাতো তৈরি করেন, তিনি ছিলেন রোমান গ্ল্যাডিয়েটর লড়াইয়ের মহা-ভক্ত। কিন্তু এ-দেশে ওই খেলা বৈধ ছিল না। তাই শ্যাতো তৈরির সময় মাটির তলায় এই অ্যাম্ফিথিয়েটার বানান তিনি, এখানেই গোপনে গ্ল্যাডিয়েটররা যুদ্ধ করত। তা দেখে আনন্দ পেত অভিজাত সমাজ। পুরনো আমলের ইল্‌লিগাল স্ট্রিট-ফাইটিং আর কী!'

'এখনও হয় ওই খেলা?'

হেসে উঠল মাদাম বুভারি। 'রোমান ফ্যাসিনেশন বহু আগেই কাটিয়ে উঠেছি আমরা, মসিয়ো রানা। এই কলোসিয়াম এখন আমাদের পারিবারিক কাউন্সিল এবং সব ধরনের সভা-

সমাবেশের জায়গা।'

'বোঝা যাচ্ছে, কনফারেন্স রুমের কথা শোনেননি কখনও আপনারা,' ফোড়ন কাটল মুরল্যাণ্ড।

গ্যালারির উপর নজর বোলাল রানা। পুরোপুরি শূন্য নয়, এক প্রান্তে চোখে পড়ছে বসে থাকা অনেকগুলো ছায়ামূর্তি—নড়ছে না একটুও।

'কারা ওরা?' জানতে চাইল ও।

'আসুন, দেখাচ্ছি।'

গ্যালারির কাছে এগিয়ে গেল দলটা। উপবিষ্ট দেহগুলোর উপর আলো পড়তেই আতঙ্কে গুটিয়ে উঠল লুনা। জ্যান্ত নয় একটিও, সব লাশ—পুরনো, শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে। শুকনো চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে হাড়, দাঁত আর মাড়ি। বীভৎস।

'ভয় পেয়ো না,' লুনাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'দর্শকের অভাব পড়েছে আপনাদের?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'সিট ভরানোর জন্য লাশ রাখতে হলো শেষ পর্যন্ত? কলোসিয়াম না, এ তো স্রেফ এক সমাধি!'

'যা খুশি বলতে পারেন,' গর্ব ফুটল মাদাম বুভারির কণ্ঠে। 'কিন্তু এই কলোসিয়াম আমাদের পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানেই আমাদের সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, তাই এখানেই উপস্থিত থাকে পরিবারের প্রতিটি সদস্য—জীবিত এবং মৃত... দু'রকমই।' উঁচু মঞ্চের দিকে হাত তুলল সে। '১৯১৪ সালে ওখানে দাঁড়িয়ে থিয়োডরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আমি, ওকে আমাদের পরিবারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলাম। বোকা ছেলে, কথা না শুনে কী ভুলটাই না করেছে! যদি পালিয়ে না যেত, তা হলে বয়ফের ওই পিণ্ডের বদলে এখানে...

পরিবারের সম্মানিত চিরনিদ্রার জায়গায় স্থান পেত।'

'ওটাকে সম্মান ভাবেননি হয়তো,' বলল রানা। 'কেমন মানুষ ছিলেন থিয়োডর, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এমন একটা খুনে পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ করা কম সাহসের কাজ নয়।'

'ওটা স্রেফ বিরুদ্ধাচরণ নয়,' রাগী গলায় বলল মাদাম বুত্তারি। 'পরিবারের পাঁচ হাজার বছরের নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখাতে চাইছিল ও। কে ওটা মেনে নেবে, বলুন? ঐতিহ্যের পূজারী আমরা। উদাহরণ তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। ক্রুসেডারদের সঙ্গে আমরা যখন ফ্রান্সে আসি, তখন আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষও নিয়ে আসা হয়। বছরের পর বছর লেগেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এখান পর্যন্ত মমিগুলো নিয়ে আসতে, বহু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে... কিন্তু আমরা পিছু হটিনি। শেষ পর্যন্ত এই মহান পরিবেশে ঠাঁই পেয়েছেন পূর্বপুরুষেরা। ঐতিহ্যকে গুরুত্ব না দিলে কে এ-কাজ করবে?'

'আমি বুঝতে পারছি না, শুকনো কতগুলো লাশ নিয়ে এত ঝক্কি পোহানোর দরকার কী?'

'আমাদের পরিবার চিরকাল অমরত্বের অন্বেষণ করেছে, মসিয়ো রানা। প্রাচীন মিশরীয়দের মত আমরাও বিশ্বাস করি, দেহকে সংরক্ষণ করা গেলে মৃত্যুর পর আত্মা অটুট থাকে। লাশগুলো মমি বানানো হয়েছে সে-কারণেই।'

মায়ের কাছে এগিয়ে এল ফিলিপ। কানে কানে বলল, 'অতিথিরা এসে পড়েছে, মা। অনুষ্ঠান শুরু করা যেতে পারে।'

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। সাদা আলখাল্লা পরা একদল নারী-পুরুষ নেমে আসছে সিঁড়ি ধরে। অ্যারেনায় এসে মাদাম বুত্তারিকে অভিবাদন জানাল, হাঁটু গেড়ে চুমো খেল তার

হাতের উল্টোপিঠে, তারপর গ্যালারিতে গিয়ে আসন গ্রহণ করল।

রানার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ করে মাদাম বুভারি বলল, 'এদেরকে আপনি চেনেন। আমাদের তিন আদি-পরিবারের উত্তরাধিকারী... এখনকার আর্মস্-কার্টেলের পার্টনার। সবাইকে আপনি কস্টিউম পার্টিতে দেখেছেন।'

'দেখতেই পাচ্ছি, ওই পার্টি এখনও শেষ হয়নি,' অতিথিদের পরিধেয় নিয়ে খোঁচা মারল রানা।

'যত খুশি ঠাট্টা করুন, মসিয়ো রানা। কিন্তু আমরাই খুব শীঘ্রি দুনিয়ার সবচেয়ে অভিজাত মানুষ হতে চলেছি। বিশ্বজয় করব আমরা, আমাদের পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাবে পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা, অবাক করে দিল সবাইকে। বলল, 'তা হলে এই-ই আপনার মহা-পরিকল্পনা? বিশ্বজয়? মানবজাতির উপর প্রভুত্ব?'

ধক করে দু'চোখ জ্বলে উঠল মাদাম বুভারির। 'এর মধ্যে হাসির কী দেখলেন?'

'না হেসে উপায় কী? আপনার আগে বহু পাগলই এ-স্বপ্ন দেখেছে। হিটলার, চেঙ্গিস খান, নেপোলিয়ন! নিজের এবং অপরের রক্ত ঝরানো ছাড়া কিছুই করতে পারেনি ওরা। আপনিও পারবেন না।'

'ওদের কেউই অমর ছিল না। যদি ওরা অনন্তকাল বাঁচত, তা হলে দুনিয়ার চেহারা কী দাঁড়াত, তা ভেবে দেখেছেন?'

'মনে হয় না কেউ তা খুব আনন্দের সঙ্গে মেনে নিত।'

'ভুল বললেন। দস্তয়ভস্কি কী বলেছেন, জানেন না? মানবজাতি চিরকালই পুজো করার জন্য কাউকে না কাউকে খোঁজে। পৃথিবীর সমস্ত সাগর যখন নোংরা জলায় পরিণত হবে,

তখন ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হব আমরা। আমাদেরকে সাদরে বরণ করে নেবে সবাই।'

'নোংরা জন্মা?'

'কাম অন, আপনি নুমার লোক। এ-কথা বলবেন না যে, সাগরে ছড়িয়ে পড়া সবুজ ক্যান্সারের কথা আপনি এখনও শোনেননি।'

'গরগন-উইডের কথা বলছেন?'

'এ-নাম দিয়েছেন নাকি? হুম, শুনতে মন্দ লাগছে না।'

'তারমানে ভয়ঙ্কর ওই শৈবালের খবর আপনি জানেন?'

'জানব না কেন? গোস্ট সিটিতে আমাদের মাইনিঙের ফলে ওটার সৃষ্টি হয়েছে, আমার বিজ্ঞানীরা সেটা জানিয়েছে আমাকে। জিনিসটা প্রতিরোধের একটা উপায় খুঁজতে চেয়েছিল ওরা, আমি মানা করেছি। ছড়াক ওটা, ছড়িয়ে পড়ুক। পুরো দুনিয়া তলিয়ে যাক মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর অর্থনৈতিক মন্দার আড়ালে। ধ্বংস হয়ে যাক সনাতন সমাজ-ব্যবস্থা!'

'আর সে-দুনিয়ার মালকিন হবেন আপনি?'

'হ্যাঁ, মসিয়ো রানা! যখন দুরাশার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সবাই, সমস্ত সরকারের পতন ঘটবে, তখন ওদেরকে উদ্ধার করব আমি। আমাকে দুনিয়া দেবীর সম্মান দেবে, বসাবে সর্বোচ্চ আসনে। প্ল্যানটা চমৎকার নয়?'

'সেজন্যে গরগন-উইডের অভিশাপ দূর করতে হবে আপনাকে। কীভাবে করবেন?'

'কঠিন কিছু নয়। ওটা কীভাবে মিউটেশনের শিকার হয়েছে, তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে আমার হাতে। প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে কষ্ট হবে না। শুধু খেয়াল রাখতে হচ্ছে, অন্য কেউ যেন সে-প্রতিষেধক তৈরি করতে না পারে।'

'এ-কারণেই গোস্ট সিটির এক্সপিডিশনে হামলা চালিয়েছেন

আপনি?'

'ঠিক ধরেছেন, মসিয়ো রানা। আমি কোনও কম্পিটিশন চাই না।' হাসল মাদাম বুভারি। 'এনিওয়ে, গল্পগুজব যথেষ্টই হলো, এবার আমাকে অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়।'

গটমট করে হেঁটে চলে গেল সে। উঠে পড়ল উঁচু মঞ্চে। বেদির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফিলিপ দাঁড়াল তার পাশে। তিন বন্দিকে অ্যারেনার মাঝখানে নিয়ে এল গার্ডরা, হাঁটু গেড়ে নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে বসতে বাধ্য করল। আদেশ দিল মাথা নুইয়ে রাখতে। মাদাম বুভারির সামনে মাথা নত করার ইচ্ছে নেই কারও, কিন্তু অযথা ঝামেলা পাকাতে চাইল না রানা। সঙ্গীদেরকে বলল আদেশ মেনে নিতে।

'বুভারি পরিবারের প্রিয় সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, কলোসিয়ামে স্বাগতম!' উদাত্ত কণ্ঠে সম্ভাষণ জানাল মাদাম বুভারি। 'আজকের এই বিশেষ দিনে তোমাদের সবাইকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আজ ইতিহাস রচিত হবে এখানে, ক্ষমতার এক নতুন সোপানে পা রাখব আমরা সবাই।'

হাততালি দিল দর্শকরা।

'রানা!' ফিসফিসিয়ে ডাকল মুরল্যাণ্ড।

'কী?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার প্ল্যানের বারোটা বাজতে চলেছে। হ্যাভারস্যাকগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা, দেখতে পেয়েছ?'

দেখেছে রানা। ওর আর মুরল্যাণ্ডের হ্যাভারস্যাকদুটো নিয়ে আসা হয়েছে অ্যাম্ফিথিয়েটারে, অ্যারেনার একপ্রান্তে পড়ে আছে এ-মুহূর্তে।

'হুঁ,' বলল রানা। 'সমস্যা বটে। কিন্তু প্ল্যানের বারোটা বেজেছে বলা ঠিক নয়, একটু ঝামেলা দেখা দিয়েছে আর কী!'

'এটাকে স্রেফ ঝামেলা বলছ?' বিরক্ত হলো মুরল্যাণ্ড। 'ভর্তা

হয়ে যেতে পারি আমরা!'

'অ্যাই! কীসের কথা বলছ তোমরা?' চাপা গলায় জানতে চাইল লুনা।

'হ্যাভারস্যাকে বোমা আছে, টাইমার ফিট করা,' বলল রানা। 'ওগুলো ফাটিয়ে শ্যাতোয় একটা বিপর্যয় ঘটাতে চেয়েছিলাম, যাতে পুলিশ এসে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে...'

'কীসের বোমা?' বিস্মিত গলায় বলল লুনা। 'হ্যাভারস্যাক উপুড় করে সব চেক করেছে ওরা; কই, বোমা-টোমা তো দেখিনি।'

'সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'পাতলা করে হ্যাভারস্যাকের লাইনিঙের তলায় লুকিয়ে রেখেছি, চেক করলেও যাতে ধরা না পড়ে।'

'ধরা পড়েনি তো। সমস্যা কোথায়?'

'কোথায় ফাটবে ওগুলো, বুঝতে পারছ না?' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার... শকওয়েভ বেরুনোর কোনও রাস্তা নেই। দেয়ালে ফাটল দেখা দেবে, ফাউণ্ডেশনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে—পুরো শ্যাতো ধসে পড়বে আমাদের মাথার ওপর।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল লুনা। 'কখন ফাটবে বোমা?'

'খুব বেশি হলে পাঁচ-সাত মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে।'

'কিছু একটা করা দরকার, রানা,' সিরিয়াস গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'শ্যাতোর তলায় চাপা পড়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

'ঝেড়ে দৌড় দেয়া ছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছি না।'

'গার্ডরা সবাই বন্দুক তাক করে রেখেছে আমাদের দিকে।

দৌড়ানোর চেষ্টা করলেই ঝাঁকরা করে দেবে। ডাইভারশন দরকার।'

'পাওয়া যাবে,' আত্মবিশ্বাস ফুটল রানার কণ্ঠে। 'অপেক্ষা করো।'

তখনও ভাষণ দিচ্ছে মাদাম বুভারি। '...কাজেই বুঝতে পারছ বন্ধুরা, বিজয়ের দিন সমাগত। আমরা অমর হতে চলেছি—রূপক অর্থে নয়, বাস্তবে। আমি সূচনা করছি সেই শুভলগ্নের, তারপর সামনে হাঁটু গেড়ে থাকা এই তিন অবিশ্বাসী শত্রুর রক্তে পূর্ণতা পাবে আমাদের অনুষ্ঠান।'

হর্ষধ্বনি করে উঠল গ্যালারির দর্শকরা।

গলা থেকে একটা চেইন খুলল মাদাম বুভারি, লকেটের জায়গায় সেখানে একটা ছোট্ট শিশি শোভা পাচ্ছে: ভিতরটা স্বচ্ছ তরলে ভরা। হাত উঁচু করে সেটা সবাইকে দেখাল, তারপর খুলে ফেলল মুখ।

'অমরত্ব... তুমি আমার!' মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল সে। মুখে ঢেলে দিল তরল।

তুমুল করতালি আর চেঁচামেচিতে ভরে গেল অ্যাম্ফিথিয়েটার। বিজয়ীর ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকাল মাদাম বুভারি, হাসছে উন্মাদিনীর মত। মিনিটখানেক দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, তারপর হাসতে হাসতে ফিলিপের দিকে এগোল: একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করল রানা, আগের মত সাবলীল ছন্দ যেন নেই মাদাম বুভারির হাঁটায়। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল ছেলেকে, কিন্তু তার হাতের সেই সৌন্দর্য কোথায়? সরু কাঠির মতো হয়ে গেছে। চোখের পলকে বুড়োটে হতে শুরু করল মুখ! ফিলিপও দেখতে পেয়েছে এই পরিবর্তন: ছিটকে দু'পা পিছনে সরে গেল সে।

'কী ব্যাপার, ফিলিপ?' বলল মাদাম বুভারি, ফ্যাসফেসে

কর্কশ শোনাল গলা। কণ্ঠের মাধুর্য হারিয়ে গেছে। 'আরে, এ কী?' বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে বলল সে। 'এমন ঝিমুনি আসছে কেন আমার? ফিলিপ! আমার চোখে কী হয়েছে? সব ঝাপসা দেখছি কেন?' দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চুল খসে পড়ল মাটিতে। একটা চুলও নেই মাথায়! কুৎসিত এক টাক যেন ভেঙচি কাটছে ওখানে।

ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল অ্যাম্ফিথিয়েটারে উপস্থিত প্রতিটি নারী। আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সবার চোখ। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য—ধীরে ধীরে কুঁচকে যাচ্ছে মাদাম বুভারির দেহ। সোনার কোমরবন্ধনী পিছলে নেমে গেল সুগঠিত কোমর থেকে। সাদা ত্বকের রঙ বদলে হলদেটে বাদামি হয়ে গেছে, তাতে ছোপ ছোপ দাগ। নিখুঁত হাতদুটোয় হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না মাদাম বুভারি। পড়ে গেল মেঝেতে। তারপর রক্তহিম করা কর্কশ গলায় বিকট এক চিৎকার করে উঠল।

'মা!' আর্তনাদ করে উঠল ফিলিপ।

'কী হচ্ছে এসব!' হতভম্ব গলায় বলল মুরল্যাণ্ড।

'ড. হেণ্ডারসনের প্রতিশোধ,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ফর্মুলা বদলে দিয়ে গেছেন উনি। তৃতীয় ডোজে অমরত্ব পাবে না লোকে, বরং এক লাফে বয়স বেড়ে যাবে কয়েক গুণ। পরশ পাথরের বদলে র‍্যাপিড এইজিঙের ফর্মুলা ধরিয়ে দিয়েছেন উনি ভাইনিটার হাতে।'

কুঁচকে যাওয়া একটা বানরের মত ছোট হয়ে গেছে মাদাম বুভারির আকৃতি। মুখটার দিকে তাকালে ভয় করে। শরীরের দিকে তাকালে জেগে ওঠে ঘৃণা। বিশ্বাস করা কঠিন, এই সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইরিন বুভারি। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না

সে, সাদাটে চোখদুটোর ওপর ঘষা কাচের মতো একটা পর্দা পড়ে গেছে। চেঁচাচ্ছে অবিরাম। ধীরে ধীরে কমে এল গলার জোর। শেষবারের মত কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

আর সহ্য করতে পারল না দর্শকরা। হুড়োহুড়ি শুরু করল অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যেতে। মায়ের পরিণতি দেখে স্থবির হয়ে গেছে ফিলিপ; ভ্যাসিলি আর গ্যাস্টন-সহ রক্ষীবাহিনীও হতভম্ব। সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা, মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার, ববি!'

সজোরে মেঝেতে জুতো ঠুকল দু'জনে। সাঁৎ করে জুতোর ডগা থেকে বেরিয়ে এল ধারালো ছুরির ফলা। হাতের বাঁধন কাটতে সময় লাগল মাত্র এক সেকেণ্ড। লুনাকেও মুক্ত করল ওরা।

'দৌড়াও!' চেঁচাল রানা।

দর্শকদের পাশাপাশি ছুটতে শুরু করল তিনজনে, কেউ বাধা দিল না। থামতে হলো সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে, ওখানে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে—কে কার আগে যেতে পারে। ভিড়ের মাঝে নির্মমভাবে কনুই চালাল রানা-মুরল্যাণ্ড, আলখাল্লাধারীদেরকে সরিয়ে এগোচ্ছে দ্রুত।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল ফিলিপ। রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে। ওর ধারণা, মায়ের পরিণতির জন্য মাসুদ রানা দায়ী। অ্যারেনার দিকে তাকিয়ে আরও খেপল। চঞ্চল চোখে খুঁজে বের করল তিন পলাতককে। ভিড় ঠেলে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে।

'ভ্যাসিলি! গ্যাস্টন!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'হাঁ করে দেখছ কী? গুলি করো ওদেরকে!'

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল গার্ডের দল। সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ল ফিলিপ, 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল সবক'টা রাইফেল। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল

বেশ ক'জন আলখাল্লাধারী।

'ফায়ার!' আবার চেঁচাল ফিলিপ।

আবার গুলি করল রক্ষীরা। আরও ক'জন আলখাল্লাধারী পিঠে গুলি খেলো। চেঁচামেচির ঝড় বয়ে গেল। গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য এদিক-ওদিক ছুটছে সবাই।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'ছোকরা বুভারি পাগল হয়ে গেছে, রানা।'

'মাথা তুলো না,' বলল রানা। প্রথম দফা গুলি হতেই মেঝেতে শুয়ে পড়েছে ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠছে। 'এগোতে থাকো।'

ছুটন্ত লোকজনের মাঝে গুলি করা কঠিন হয়ে উঠল গার্ডদের জন্য। ফিলিপের চিৎকারে ভয় পেয়ে বিচ্ছিন্ন একটা দুটো শট নিচ্ছে তারা। খেপে গিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এল বুভারি-তনয়। খামচে ধরল ভ্যাসিলির কলার। হিসিয়ে উঠে বলল, 'রানার লাশ দেখতে চাই আমি!'

মাথা ঝাঁকাল পরিবারের বিশ্বস্ত রক্ষী-প্রধান। ছুটল সিঁড়ির দিকে।

'গ্যাস্টন! সঙ্গে যাও ওর।' হুকুম দিল ফিলিপ।

ভ্যাসিলির পিছু নিল দৈত্য। দু'জনে প্রবল বিক্রমে এগোচ্ছে, সামনে যাকেই পাচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে দু'দিকে। সিঁড়িতে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। হামাগুড়ি দিয়ে রানারা তখন খুব বেশিদূর যেতে পারেনি। ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা।

খপ্ করে রানা-মুরল্যাণ্ডের গোড়ালি চেপে ধরল দুই গুণ্ডা। হিড়হিড় করে টেনে নামাতে শুরু করল সিঁড়ি থেকে। বাধা দেয়ার সুযোগ পেল না ওরা, একেকটা ধাপের সঙ্গে নির্মমভাবে ঠোকর খাচ্ছে বুক-মাথা।

'রানা!' আর্তনাদ করে উঠল লুনা। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ

নেই কারও।

অ্যারেনার সীমানায় রানা আর মুরল্যাণ্ডকে আঙ্কড়ে ফেলল ভ্যাসিলি আর গ্যাস্টন। লাথি মারতে শুরু করল। শরীর কুঁকড়ে আঘাত সইল দু'বন্ধু। উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না। উপায়ান্তর না দেখে মেঝেতে গোড়ালি ঠুকল রানা, জুতোর ডগায় ছুরির ফলা বেরুতেই সজোরে পা চালাল। ঘ্যাচ করে গ্যাস্টনের উরুতে বিঁধে গেল ফলা। আর্তনাদ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল রানা, তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকাল দৈত্যের দিকে। মনে পড়ে যাচ্ছে, এই লোকের হাতে খুন হয়েছে অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

ঝট্ করে কোমরে হাত দিল দৈত্য, জামার তলা থেকে বের করে আনল একটা লুকানো ছুরি। ওকে সেটা ব্যবহারের সুযোগ দিল না রানা, বিদ্যুৎবেগে পা চালাল গলা লক্ষ্য করে। জুতোর ডগায় লাগানো ছুরির ফলার স্পর্শে দ্বিখণ্ডিত হলো গ্যাস্টনের গলা। জবাই করা পশুর মত ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুল, তারপর ধপাস করে অ্যারেনার বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

সঙ্গীর পরিণতি দেখে থমকে গেল ভ্যাসিলি এক মুহূর্তের জন্য। এই সুযোগে হাঁটুতে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো মুরল্যাণ্ড, সজোরে ঘুসি হাঁকল লোকটার তলপেটে। হুক করে একটা শব্দ করল ভ্যাসিলি, ঝুঁকে পড়ল সামনে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে তার চোয়ালে আপার-কাট মারল মুরল্যাণ্ড। উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল রক্ষী-প্রধান। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত পর। দলের অন্যান্য গার্ডের উদ্দেশে চেঁচাল, 'গাধার বাচ্চারা! দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গুলি কর ওদেরকে!'

রানা-মুরল্যাণ্ডের দিকে ঘুরে গেল সবক'টা অস্ত্রের নল। আর

তখুনি তীক্ষ্ণ একটা *বিপ বিপ* শব্দ ভেসে এল হ্যাভারস্যাকের দিক থেকে। টাইমারের যিরো কাউন্টডাউনে পৌঁছানোর সঙ্কেত ওটা। ডাইভ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা-মুরল্যাণ্ড, পিছু পিছু চোখ ধাঁধানো আলো দেখা গেল, গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হলো ওদের হ্যাভারস্যাক দুটো। কাছাকাছি দাঁড়ানো গার্ড আর বুভারি পরিবারের পার্টনাররা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বাকিরা উড়ে গেল শকওয়েভের ধাক্কায়।

মাটিতে শোয়া থাকলেও ধাক্কাটা ঠিকই টের পেল রানা আর মুরল্যাণ্ড। গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল তীব্র উত্তাপের হলকা, প্রচণ্ড আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্য অন্ধ এবং বধির হয়ে গেল ওরা। ঘোর কেটে গেলে উঠে বসল রানা, কান তখনও ভোঁ ভোঁ করছে। চারদিকে তাকাল—আহত-নিহতের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। ক্ল্যাসিলিকে দেখতে পেল গ্যালারির রেলিঙের পাশে—শকওয়েভের ধাক্কায় ওখানে আছড়ে পড়েছে সে; নড়ছে না, শরীর রক্তাক্ত। ফিলিপকে কোথাও দেখা গেল না।

আশপাশের কঁকানি-গোঙানি ছাপিয়ে একটু পরেই নতুন আওয়াজ পাওয়া গেল; ইট-পাথর ভাঙার শব্দ। রানার বিস্ফারিত চোখের সামনে অ্যাম্ফিথিয়েটারের ছাদ আর দেয়ালে ফাটল দেখা দিল। বাড়ছে দ্রুত।

'ববি, ওঠো!' মুরল্যাণ্ডকে ধাক্কা দিল রানা। 'এখুনি সরে পড়তে হবে এখান থেকে।'

গোঙাতে গোঙাতে উঠে দাঁড়াল দু'বন্ধু, সারা শরীর টনটন করছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোতে শুরু করল। সিঁড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে শুরু করল চেম্বারের ছাত। ফাটল দেখা দিল সিঁড়িতেও।

'রানা! ববি!' উপর থেকে শোনা গেল লুনার ডাক।

'তাড়াতাড়ি!'

'দৌড়াও!' চেঁচাল রানা, তারপর ছুটতে শুরু করল সিঁড়ি ভেঙে। ওকে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড।

পিছনে ধীরে ধীরে ধসতে শুরু করল ছাদের একের পর এক অংশ—মুহুর্মুহু আওয়াজে কান ঝালাপালা, মেঝে পর্যন্ত কেঁপে উঠছে একেকটা পতনে। সামনের ছাদেও চিড় ধরতে দেখল ওরা, কয়েক জায়গা ধসে পড়ল, শেষ মুহূর্তে ডান-বামে সরে গিয়ে মৃত্যুফাঁদগুলোকে ফাঁকি দিল দুজনে। দ্রুতপায়ে উঠে এল উপরের প্রকোষ্ঠে; লুনা ওখানে দাঁড়িয়ে।

ওর হাত খামচে ধরল রানা, ওকে ছুটতে বাধ্য করল পাশাপাশি। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল ডানজন থেকে। থামল না, দৌড়াতে থাকল। যেন ভূমিকম্প ঘটছে, এমন ভঙ্গিতে পুরো শ্যাতো কাঁপছে। দেয়াল আর ছাত ভাঙতে শুরু করল, ধূলিকণার মাঝ দিয়ে একের পর এক করিডোর পেরুল ওরা, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শ্যাতো থেকে।

'থেমো না,' বলল রানা। ছুটে চলল, যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছে।

শকওয়েভের কারণে মাটি কাঁপছে ভীষণভাবে, ফাটল দেখা দিল, ছুটন্ত তিনজন মানুষের পিছনে দেবে যেতে শুরু করল নরম তুলোর মত। তারপর... হঠাৎ তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ধসে পড়ল শ্যাতো বুভারি। বুভারি পরিবারের অটল দুর্গ পরিণত হলো ইঁট-পাথর আর কড়িকাঠের মূল্যহীন ধ্বংসস্তূপে।

থামল রানা। উল্টো ঘুরে তাকাল শ্যাতোর ধ্বংসাবশেষের দিকে। ওরা ছাড়া আর কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনি। সবাই চাপা পড়েছে ধসের তলায়। আশপাশে কোনও গার্ড দেখা গেল না। সবাই সম্ভবত যোগ দিতে গিয়েছিল অ্যাক্সিথিয়েটারের অনুষ্ঠানে—বুভারি পরিবারের মহা-বিজয় দেখার জন্য।

লুনা আর মুরল্যাণ্ডও থেমেছে। শ্যাতোর অবস্থা দেখে বিড়বিড় করল লুনা, 'হা, যিশু!'

'কেউই বেরুতে পারল না?' বলল মুরল্যাণ্ড। অপরাধবোধ জেগেছে ওর ভিতর—এতগুলো মানুষ মারা যাওয়ায়। হাজার হোক, বোমা তো ও আর রানাই নিয়ে গিয়েছিল ভিতরে।

'দ্য ফল অভ দ্য হাউস অভ আশার,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'কী?' বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকাল লুনা আর মুরল্যাণ্ড।

'অ্যালান পো-র গল্প,' বলল রানা। 'নিজেদের পাপের তলায় চাপা পড়েছিল *আশার* পরিবার, ঠিক এই বুভারিদের মত। ওদের রাজপ্রাসাদও ধসে পড়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস... পো-র ভক্ত ছিল মাদাম বুভারি। নিজের পরিণাম হয়েছে প্রিয় লেখকেরই এক গল্পের মত।'

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কারও মুখে কোনও কথা ফুটছে না। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল পিছন থেকে অস্ত্র কক করার শব্দ ভেসে আসায়। ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরল ওরা, চমকে উঠল ফিলিপ বুভারিকে দেখতে পেয়ে। হাতে একটা এম.পি-ফাইভ সাবমেশিনগান, তাক করে রেখেছে রানাদের দিকে।

'হ্যালো, ফিলিপ!' শান্ত গলায় বলল রানা।

মুখ খারাপ করে একটা গাল দিল বুভারি-তনয়। বলল, 'মরার জন্য তৈরি হও, রানা!'

'আজরাইলকে ফাঁকি দিয়েছ কীভাবে, জানতে পারি?'

'মঞ্চের তলায় একটা এস্কেপ টানেল ছিল। ধসে পড়ার আগেই ওটায় ঢুকে পড়ি আমি।'

তীক্ষ্ণ চোখে ফিলিপকে দেখল রানা, সময়মত টানেলে

ঢুকতে পারলেও পলায়ন-পর্ব খুব একটা আরামের হয়নি বেচারার। মাকড়সার জাল আর ধুলোবালিতে ভরে আছে সারা দেহ, এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ—শরীরে অগণিত কাটাছেঁড়া। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে।

'অস্ত্রটা ফেলে দাও, ফিলিপ,' বলল রানা। 'সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদেরকে খুন করে কোনও লাভ হবে না তোমার।'

'প্রতিশোধের আনন্দ তো পাব!' খ্যাপাটে গলায় বলল ফিলিপ। 'তোমার... আর তোমার বন্ধুদের কারণে আমার মা মারা গেছে, আমাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। কিছুতেই তোমাদেরকে বাঁচতে দেব না আমি!'

'পাপের ভারে ধ্বংস হয়েছ তোমরা, আমাদের কিছু করার ছিল না।'

'আর কোনও কথা নয়, রানা।' মেশিনগান ধরা হাত একটু উঁচু করল ফিলিপ। 'বিদায়!'

শরীর শক্ত করে ফেলল রানা গুলির আঘাত সহ্য করার জন্য, কিন্তু গুলি করল না ফিলিপ। তার আগেই দূর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, হেডলাইটের আলো পড়ল তার গায়ে। প্রচণ্ড বেগে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। ঝট্ করে উল্টো ঘুরল ফিলিপ, গুলি করল গাড়ি লক্ষ্য করে। উইণ্ডশিল্ডে সামান্য চিড় ধরাতে পারল সে, তারপরই গাড়িটা ছুটে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। ধাক্কা দিয়ে মুরল্যাণ্ড আর লুনাকে গাড়ির পথ থেকে সরিয়ে দিল রানা, তিনজনে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভাঁজ হয়ে গেল ফিলিপের দেহ, মাথা বাড়ি খেল বনেটে। হাড়গোড় ভাঙার বিশ্রী আওয়াজ হলো, আর্তনাদ করল সে, ছিটকে গেল কয়েক গজ দূরে। মাটিতে আছড়ে পড়ল তার রক্তাক্ত দেহ। থরথর করে কাঁপল কিছুক্ষণ, তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বুভারি-তনয়কে ধাক্কা দিয়েই ব্রেক কষেছে ড্রাইভার। রানাদের ঠিক পাশে এসে থেমে গেল গাড়ি। জানালা দিয়ে মাথা বের করল ড. আসিফ রেজা। 'হাই, কারও লিফট্ দরকার?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা, মুরল্যাণ্ড আর লুনা। তানিয়াও আছে স্বামীর পাশে। হাসছে দুজনেই।

'তোরা...' রানার কথা আটকে যাচ্ছে। 'কীভাবে বুঝলি আমাদের সাহায্য দরকার?'

'জানিই তো, তোদের প্ল্যানে ভজকট দেখা দেবে,' বলল আসিফ। 'তাই কাছাকাছি অপেক্ষা করছিলাম। দেখতেই পাচ্ছিস, ভাল করেছি। এখন ওঠ্ গাড়িতে, সারারাত বসে থাকতে পারব না।'

'ফ্রেঞ্চ অথরিটি...'

শ্যাতোর ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাল আসিফ। 'যা ঘটিয়েছিস, সেটা ওদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারবি? তারচেয়ে কেটে পড়া ভাল না?'

'খাঁটি একটা কথা বলেছ, দোস্তো!' বলল মুরল্যাণ্ড। 'চলো, চম্পট দিই। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করা যাবে।'

দরজা খুলে গাড়ির পিছনে উঠে পড়ল ওরা। গাড়ি ঘোরাল আসিফ। ফিলিপের নিথর দেহের দিকে শেষবার তাকাল লুনা। বলল, 'ও কি...'

'আশি মাইল স্পিডে ধাক্কা দিয়েছি ওকে,' বলল আসিফ। 'এ-ধরনের কলিশনে কেউ সাধারণত বাঁচে না। ভুলে যান ওর কথা।'

এরপর আর পিছনে তাকাল না কেউ।

আঠারো

এক সপ্তাহ পর।

সন্ধে সাতটায় প্যারিসের বিখ্যাত *বুইলঁ রাসিন* রেস্তোরাঁয় ঢুকল চমৎকার এক জুটি। যুবকটি সুদর্শন, ঋজু; তার সঙ্গিনীও অপরূপ সুন্দরী। রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। যুবকটি বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমাদের একটা রিজার্ভেশন আছে।'

'নাম, সার?' বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইল কাউন্টারে দাঁড়ানো রিসেপশনিস্ট।

'মাসুদ রানা আর লুনা পারসেল।'

খাতা দেখল লোকটা। 'ইয়েস, সার। আট নম্বর টেবিল।'

ধোপদুরস্ত পোশাক পরা এক ওয়েইটার অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল টেবিলে। তারপর বাড়িয়ে ধরল মেন্যু কার্ড। অর্ডার দিল রানা, খাবার আনতে চলে গেল ওয়েইটার।

'শেষ পর্যন্ত এলাম আমরা ডিনারে!' হাসিমুখে বলল লুনা।

'কথা দিলে সাধারণত সেটার বরখেলাপ করি না আমি,' বলল রানা। 'কেন, তোমার সন্দেহ ছিল?'

'গত একটা সপ্তাহ চেহারা দেখিনি তোমার। ফোনেও যোগাযোগ করতে পারিনি। আমার তো সন্দেহ হচ্ছিল, আদৌ তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না।'

'সরি, খুব ব্যস্ত ছিলাম। এতকিছু ঘটে গেল, সমস্ত ছেঁড়া সুতো জোড়া দিতে হয়েছে।'

'কী ঘটেছে, তার কিছুই কিন্তু জানাওনি আমাকে!' অভিযোগ করল লুনা। 'আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, কখন না জানি পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করবার জন্য হাজির হয়!'

'অমন কোনও ভয় নেই,' আশ্বাস দিল রানা। 'ফরবিডেন আইল্যাণ্ড থেকে বুভারিদের সমস্ত কুকীর্তির প্রমাণ উদ্ধার করেছে ব্রিটিশরা। অফিশিয়ালি সেটা জানানো হয়েছে ফ্রান্সকে। বুভারিরা মারা গেছে, ব্যাপারটা নিয়ে তাই নাড়াচাড়া না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাদের সরকার। অফিশিয়ালি শুধু ওদের শ্যাতোয় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রচার করা হয়েছে মিডিয়াতে।'

'কী পাওয়া গেছে দ্বীপে?'

'ল্যাব, গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্র, ওদের সাবমেরিন আর মিউট্যান্টের দল। সবার টনক নড়াবার জন্য তা-ই যথেষ্ট ছিল।'

'মিউট্যান্টদের নিয়ে কী করা হচ্ছে?'

'একদল বিজ্ঞানী দায়িত্ব নিয়েছেন। চেষ্টা করে দেখবেন, ওদেরকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় কি না। কিন্তু কাজটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। অমরত্বের ফর্মুলার কিছুই পাওয়া যায়নি দ্বীপের ল্যাবে।'

'কেন?'

'ড. হেণ্ডারসনের কীর্তি। দ্বীপ থেকে পালাবার আগে কম্পিউটারের সমস্ত ডেটা মুছে দিয়েছিলেন উনি। ফর্মুলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। যাতে কেউ আর ও-জিনিস তৈরি করতে না পারে। বুভারিদের হেলমেটও শ্যাতোর ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে গেছে। খোঁজাখুঁজি করে দ্বীপের ল্যাবরেটরিতে শুধু তৃতীয় ডোজের ফর্মুলা পাওয়া গেছে, আর কিছু না।'

'ওটা রেখে গেলেন কেন হেগ্রারসন?'

'জিনিসটা আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি বলে।'

'মানে?'

'জিনিয়াস এক লোক—বুঝতে পেরেছিলেন, র‍্যাপিড এইজিঙের মাধ্যমে সব ঝামেলা মেটানো যাবে। ওষুধের প্রথম দুই ডোজে সাময়িকভাবে কমানো যায় বয়স। সেটা দেখিয়ে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন মাদাম বুভারিকে, তৃতীয় ডোজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বয়স বাড়ার সেরাম। শত্রুকে খতম করেছেন ওভাবে, একই সঙ্গে আমাদেরকে মরার আগে বলে যাবার চেষ্টা করেছেন—সেরাম দিয়ে গরগন-উইডের মোকাবেলাও করা যাবে।'

'কীভাবে?'

'পোস্ট সিটির এনযাইম হলো সবকিছুর মূল। ওটাই মিউটেশন ঘটাচ্ছে মানবশরীর, কিংবা শৈবালে। তৃতীয় ডোজে এই এনযাইম র‍্যাপিড এইজিঙের মাধ্যমে সাবজেক্টকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সেটা মানুষ এবং শৈবাল... দুটোর ব্যাপারেই কার্যকর।'

'তারমানে গরগন-উইডকে থামানো গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'নুমা আর উডস্ হোল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট একসঙ্গে কাজ করছে। সমস্ত শৈবাল-উপদ্রুত এলাকায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে সেরামটা। আসিফ আর তানিয়ার দম ফেলার সময় নেই।'

'আর তোমার বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড?'

'চামোয়াঁ মাউন্টেইনে ওর ফরাসি বান্ধবীর কাছে ফিরে গেছে। নিশ্চয়ই খুব আনন্দে আছে, আমার ফোন ধরছে না গত দু'দিন থেকে।'

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

'চমৎকার!' মন্তব্য করল লুনা। 'সবকিছু তা হলে ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে। দুঃখ একটাই, অমরত্বের ফর্মুলা আবিষ্কৃত হবার পরও হারিয়ে গেল।'

'তাতে দুঃখ পাবার কী আছে?' বলল রানা। 'চিরদিন বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি হয়নি মানুষ। সেটা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। অমর যদি হতেই হয়, তা হতে হবে কেবল কাজের মাধ্যমে... ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয়ে। ড. হেণ্ডারসন তা জানতেন। জানতেন বলেই সব নষ্ট করে দিয়ে গেছেন। অসাধারণ এক মানুষ... ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠিকমত পরিচিত হতে পারলে খুব খুশি হতাম আমি।'

'আমিও,' সুর মেলাল লুনা। 'খুশি হতাম থিয়োডর বুভারির দেখা পেলেও।'

'অবশ্যই,' রানা বলল। 'তাঁর মত মানুষ হয় না। যদি পরিবারের বিরুদ্ধাচরণ না করতেন, যদি হেলমেট নিয়ে পালিয়ে না আসতেন... তা হলে জনমেয়ার গ্লেসিয়ারে কোনও লাশ পাওয়া যেত না; আমরাও টের পেতাম না, গোপনে বুভারি পরিবার কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র এঁটেছে। এবং সেটা ভেস্তে দিতে পারতাম না। সত্যি... ড. হেণ্ডারসন আর থিয়োডর বুভারির তুলনা হয় না।'

'এখানে আমার দ্বিমত আছে,' হাসল লুনা। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'ওঁদের সঙ্গে তুলনা করার মত অন্তত একজন মানুষকে আমি চিনি।'

'পাম দিয়ো না,' হাতজোড় করল রানা। 'নিজেকে আমি ওঁদের নখেরও যোগ্য বলে মনে করি না।'

'আর আমার?' ভুরু নাচাল লুনা। 'নিজেকে আমার যোগ্য বলে মনে করো?'

'হুম,' গম্ভীর হবার ভান করল রানা, 'এ-প্রশ্নের জবাব তুমি

পাবে আজ রাতে... বিছানায়!'

'বদমাশ কোথাকার!' ন্যাপকিন ছুঁড়ে মারল লুনা।

খাবারের ট্রে নিয়ে ওয়েইটার এসে পড়েছে। হাসিমুখে যার যার প্লেট টেনে নিল ওরা।

***